

মাধ্যমিক জীববিজ্ঞান

নবম-দশম শ্রেণী



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা

জাতীয় শিক্ষা ক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষ
থেকে নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

মাধ্যমিক জীববিজ্ঞান

নবম-দশম শ্রেণী

রচনা

ড. ইকবাল আজীজ মুত্তাকী

নাসিম বানু

ড. মোঃ আবুল হাসান

গুল আনার আহমেদ

সম্পাদনা

ড. সৈয়দ হাদীউজ্জামান

জাহান আফরোজ বেগম হাবিবা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : মার্চ, ১৯৯৬
সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০০
পরিমার্জিত সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০০৮

কম্পিউটার কম্পোজ
লেজার স্ক্যান লিমিটেড
ফোন : ৯৫৬২৮৬৫, ৯৫৬৭৬০৮

প্রচ্ছদ
সেলিম আহমেদ

চিত্রাঙ্কন
আরিফ রেজা খান
আবু হাসমি মোঃ ফায়সাল
নজরুল ইসলাম দুলাল

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

শিক্ষার উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারায় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহ যাতে পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হয়, সেই লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে আশির দশকের প্রারম্ভে প্রবর্তিত হয় নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের নতুন পাঠ্যপুস্তক। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রচলিত ছিল।

উন্নয়নের ধারায় ১৯৯৪ সালে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম সংস্কার, পরিমার্জন ও বাস্তবায়নের জন্য “শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স” গঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সময়ের সাথে সাথে দেশ ও সমাজের চাহিদা পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ২০০০ সালে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনরায় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। ২০০৮ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত শিক্ষা বিষয়ক টাস্কফোর্সের সুপারিশে প্রচলিত প্রণয়ন, বানান ও তথ্যগত বিষয় সংশোধনসহ পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় করা যায় এতে করে পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষক-শিক্ষার্থীর নিকট আরো গ্রহণযোগ্য ও সমন্বয়যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

শিক্ষাক্রমের আলোকে মূল্যায়নকে আরো ফলপ্রসূ করার জন্য দেশের সুধীজন ও শিক্ষাবিদগণের পরামর্শের প্রেক্ষিতে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায়শেষে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। প্রত্যাশা করা যায়, এতে শিক্ষার্থীর মুখস্থনির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবন বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে বা যে-কোনো বিষয়কে বিচার-বিশ্লেষণ অথবা মূল্যায়ন করতে পারবে।

পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের কাঠামোতে জীববিজ্ঞানের প্রধান দুটি শাখা উদ্ভিদ ও প্রাণিবিজ্ঞানকে আলাদা না করে সমন্বিত করা হয়েছে। জীববিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষাদান কেবল তত্ত্বীয় পাঠ আয়ত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে পরীক্ষাগারে ব্যবহারিক কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ রাখা হয়েছে। ব্যবহারিক পরীক্ষাগুলো পাঠ্যপুস্তকে পৃথকভাবে সন্নিবেশ করা হয়েছে। শ্রেণীশিক্ষকের সহায়তায় নির্ধারিত ব্যবহারিক পরীক্ষাগুলো সম্পন্ন করলে শিক্ষার্থীরা জীববিজ্ঞান তথা বিজ্ঞানশিক্ষার প্রতি অধিক আগ্রহী হবে। আশা করি নবম ও দশম শ্রেণীর ‘জীববিজ্ঞান’ পাঠ্যপুস্তকে বর্তমান শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির উদ্দেশ্যগুলো যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

আমরা জানি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। কাজেই পাঠ্যপুস্তকের আরো উন্নয়নের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে প্রত্যাশিত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার নিরন্তর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সংস্করণে কিছু পরিমার্জন করা হয়েছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকগুলো আরো সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

যাঁরা এই পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। যাদের জন্য পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হল, আশা করি তারা উপকৃত হবে।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
এক	জীববিজ্ঞান পরিচিতি	১
দুই	জীবকোষের গঠন ও প্রকৃতি	১০
তিন	কোষ বিভাজন	২০
চার	বহুকোষী উদ্ভিদের শ্রম বণ্টন : টিস্যু ও টিস্যুতন্ত্র	২৫
পাঁচ	প্রাণিকলা, অঙ্গ ও অঙ্গতন্ত্র	৩২
ছয়	উদ্ভিদের শ্রেণীবিন্যাস	৪৫
সাত	প্রাণিবৈচিত্র্য ও শ্রেণীবিন্যাস	৬৪
আট	প্রাণীর দৈহিক সংগঠন ও পরিচিতি	৭০
	(অ্যামিবা, গোলক্ৰিমি এবং কুনোব্যাঙ	
নয়	উদ্ভিদের জৈবিক কার্যাবলি : পুষ্টি	১২২
	ইমবাইবিশন, অভিস্রবণ, রস উত্তোলন ও প্রস্বেদন,	
	সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বাসন, উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পরিবর্ধন	
দশ	ফুল	১৫৪
এগার	পরাগায়ন, নিষেক, ফল ও বীজের বিস্তরণ	১৬০
বার	উদ্ভিদের প্রজনন	১৭০
তের	জীব ও পরিবেশ	১৭২
চৌদ্দ	পরিবেশ দূষণ ও পরিবেশ সংরক্ষণ	১৮২
পনের	বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য-উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিস্তৃতি	১৯০
ষোল	অর্থনৈতিক জীববিদ্যা	২০৫
ব্যবহারিক	উদ্ভিদবিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞান	২২৮

(অধ্যায় ১, ২, ৩, ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬- সমন্বিত অংশ, অধ্যায় ৪, ৬, ৯, ১০, ১১ ও ১২-উদ্ভিদ অংশ, অধ্যায় ৫, ৭ ও ৮ প্রাণী অংশ)

অধ্যায় এক

জীববিজ্ঞান পরিচিতি

অ্যারিস্টটল, সক্রেটিস, থিওফ্রাসটাস এবং এ রকম আরও অনেক প্রাচীন মনীষী আছেন যাদের অবদান আজকাল আমরা জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখতে পাই। আজকালকার মনীষীদের বেলায় কিন্তু এটা সম্ভব নয়। তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগবে কেন সম্ভব নয়। এর কারণ হল প্রাচীন যুগে জ্ঞানের পরিসীমা ছিল অত্যন্ত সীমিত। জ্ঞান সাধনায় নিয়োজিতদের সংখ্যাও ছিল কম। এখন জ্ঞানের পরিধি বেড়েছে বহুগুণ। একাধিক ক্ষেত্রে অবদান রাখা তাই আর সম্ভব নয়। আমাদের জানার এবং বুঝার সুবিধার জন্য আমাদের সঞ্চিত জ্ঞান সমগ্রকে আমরাই ভাগ করেছি নানাভাবে। এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলা, সামাজিক বিজ্ঞান এ রকম আরও অনেক শাখা-প্রশাখার। মানুষের জ্ঞান সামগ্রিকভাবে অখণ্ড। শেখার ও বুঝবার সুবিধার জন্য একে নানাভাবে ভাগ করা হয়েছে।

তোমরা হয়তো জান বিজ্ঞানের জ্ঞান খুব দ্রুত বাড়ছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষকদের প্রচুর গবেষণার ফলে তা হচ্ছে। অনেকের মতে বিজ্ঞান বিষয়ের জ্ঞান প্রতি ৮ বছরে দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের নতুন নতুন বিষয়ের সৃষ্টি হচ্ছে। এ বিশাল জ্ঞানভান্ডার কারো পক্ষেই একা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। তাই গবেষকদের দেখা যায় তারা বিশেষ কোন এক দিক নিয়েই গবেষণা করেছেন। বিজ্ঞানের সমগ্র জ্ঞানকে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন সময়ে নানান রকমভাবে ভাগ করেছেন। বিজ্ঞানের জ্ঞান যত বাড়ছে এর শাখা-প্রশাখার বিভক্তিক্রমও তত বাড়ছে। বিজ্ঞানের প্রধান দুটি ভাগ বা শাখা হচ্ছে জড়বিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞান।

জড়বিজ্ঞানের আরেক নাম ভৌতবিজ্ঞান। জড়বিজ্ঞানে জীবনহীন জড় পদার্থের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, ক্রিয়াবিক্রিয়া, বহুরূপতা এবং এ রকম আরও অনেক বিষয়ে আলোচনা এবং পরীক্ষণ করা হয়।

জীববিজ্ঞানের আলোচনা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা যাদের জীবন আছে তাদেরকে নিয়ে। **Biology** -এর বাংলা পরিভাষা জীববিজ্ঞান। **Biology** শব্দটি এসেছে দুটি গ্রিক শব্দ (**bios** যার অর্থ জীবন এবং **logos** অর্থ জ্ঞান) থেকে। অ্যারিস্টটলকে জীববিজ্ঞানের জনক বলা হয়।

প্রকৃতিতে আমরা প্রধানত দু ধরনের জীবন দেখতে পাই। একটি উদ্ভিদ এবং অপরটি প্রাণী। জীববিজ্ঞানকে তাই দুটি শাখায় ভাগ করা হয়েছে : উদ্ভিদবিজ্ঞান (Botany) এবং প্রাণিবিজ্ঞান (Zoology)। উদ্ভিদবিজ্ঞান গাছপালার বৈশিষ্ট্য এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা এবং গবেষণা করে থাকে। প্রাণিবিজ্ঞান প্রাণীদের বিভিন্ন বিষয়ে সীমাবদ্ধ।

বর্তমান কালকে জীববিজ্ঞানের কাল বলা যায়। কারণ এ শতাব্দীর সত্তরের দশক হতে জীববিজ্ঞানের জ্ঞান এত ব্যাপকভাবে বেড়েছে, যা অন্য কোন সময়ে হয়নি।

জীববিজ্ঞানের প্রধান শাখাসমূহ

জীবের ধরন অনুযায়ী জীববিজ্ঞানকে প্রধানত উদ্ভিদবিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞান এ দুটি শাখায় ভাগ করা হয়েছে। এ ছাড়া বর্তমানে অণুজীবদের সম্বন্ধে অনেক বিস্তারিত গবেষণা হচ্ছে। এরা মানুষের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। তাই এদের নিয়ে আলোচনা করার জন্য একটি নতুন শাখার সৃষ্টি হয়েছে। একে অণুজীববিজ্ঞান (Microbiology) বলে। জীব ও জীবদেহের কোন দিক নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে তার ওপর ভিত্তি করে সামগ্রিকভাবে জীববিজ্ঞানকে নিম্নলিখিত প্রধান শাখায় ভাগ করা হয়ে থাকে।

১। **মরফোলজি (Morphology)** বা **অঙ্গসংস্থান বিদ্যা** : এ শাখায় জীবের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। অভ্যন্তরীণ গঠন বিষয়কে **এনাটমি (Anatomy)** বলা হয়।

২। **সাইটোলজি (Cytology)** বা **কোষবিদ্যা** : এক বা একাধিক কোষ নিয়ে প্রতিটি জীবদেহ গঠিত। জীববিজ্ঞানের এ শাখায় জীবকোষের গঠন ও কাজ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

- ৩। হিস্টোলজি (Histology) বা টিস্যুতত্ত্ব : এ শাখায় জীবদেহের বিভিন্ন টিস্যুর আণুবীক্ষণিক গঠন, অবস্থান ও কাজ নিয়ে আলোচনা করা হয়।
- ৪। ফিজিওলজি (Physiology) বা শারীরবিদ্যা : এ শাখায় জীবদেহের বৃদ্ধি, শ্বসন, রেচন, সালোকসংশ্লেষণ ইত্যাদি নানা ধরনের জৈবনিক প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়।
- ৫। ট্যাক্সোনমি (Taxonomy) বা শ্রেণীবিন্যাস-বিদ্যা : এ শাখায় জীবদেহের শনাক্তকরণ, নামকরণ ও বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্তিকরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়।
- ৬। জেনেটিক্স (Genetics) বা বংশগতিবিদ্যা : জীবের বৈশিষ্ট্য কীভাবে মাতাপিতা থেকে সন্তানে উত্তরিত হয় এবং কীভাবে তা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন হরা যায় এগুলো আলোচনা ও গবেষণা করাই এ শাখার কাজ।
- ৭। ইকোলজি (Ecology) বা বাস্তুবিদ্যা : এ শাখায় কোন জীব বা জীব সম্প্রদায়ের ওপর তার চারপাশের পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।
- ৮। ইভোলিউশন (Evolution) বা অভিব্যক্তি : জীববিজ্ঞানের এ শাখায় জীবের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

ওপরে বর্ণিত শাখাগুলো হল জীববিজ্ঞানের মৌলিক শাখা। ক্রমে মৌলিক শাখার জ্ঞানকে বিজ্ঞানীগণ মানব কল্যাণে কাজে লাগাতে শুরু করল। এর ফলে সৃষ্টি হল জীববিজ্ঞানে ফলিত শাখার। কৃষিবিজ্ঞান (Agriculture), চিকিৎসা বিজ্ঞান (Medical Science), সুপ্রজননবিদ্যা (Breeding) এগুলো হল জীববিজ্ঞানের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ফলিত (Applied branch) শাখা। বনবিজ্ঞান, মৎস্য প্রতিপালন, ক্ষতিকর পোকা দমন, পশুপালন এগুলোও ফলিত জীববিজ্ঞানের শাখা।

পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী আছে। সাধারণত একজাতীয় উদ্ভিদ বা প্রাণীকে এক একটি দলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কোন বিশেষ দলের জীব নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করা হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে জীববিজ্ঞানের কিছু বিশেষ শাখার সৃষ্টি হয়েছে; যেমন— ফাইকোলজি—তে কেবল শৈবাল সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়; মাইকোলজি—তে কেবল ছত্রাক সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়; ভাইরোলজি—তে কেবল ভাইরাস সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়; হেলমিনথোলজি—তে কেবল ক্রিমি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়, এনটোমোলজি—তে কেবলমাত্র কীটপতঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয় ইত্যাদি।

ওপরে উল্লিখিত বিভাগগুলোর প্রতিটির মধ্যে আরও অনেক উপবিভাগ বা শাখাপ্রশাখা আছে। আগেই বলা হয়েছে জীববিজ্ঞানে গবেষণা এখন ব্যাপকভাবে হচ্ছে। তার দরুন এর শাখা-প্রশাখাও দিনদিন বাড়ছে।

জীববিজ্ঞানকে আমরা এখন যেভাবে দেখছি আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে কিন্তু এ রকম ছিল না। একসময় ধারণা ছিল যে পুরুষের ঘামে ভেজা গরম কাপড় এবং কিছু গম একটা বাস্তব যত্ন করে রেখে দিলে কিছুদিন পরে তা থেকে ইঁদুর জন্মাবে। জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে এ ভ্রান্ত ধারণা বহুদিন চালু ছিল। পরবর্তীকালে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর গবেষণার ফলে জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে ধারণার বহুল পরিবর্তন হয়।

যেসব গবেষকের গবেষণা ও চিন্তার ফল হিসেবে আমরা আজকের জীববিজ্ঞান পেয়েছি তাদের মধ্যে কয়েক জন জীববিজ্ঞানীর সর্গক্ষিপ্ত পরিচিতি তোমাদের জানার জন্য এ অধ্যায় দেওয়া হয়েছে।

অ্যারিস্টটল (Aristotle : ৩৮৪-৩২২ খ্রি.পূ)

মহাজ্ঞানী গ্রিক বিজ্ঞানী অ্যারিস্টটলকে প্রাণিবিজ্ঞানের জনক বলা হয়। তিনি সর্বপ্রথম প্রাণিবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের একটা শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। অ্যারিস্টটল একাধারে একজন বিজ্ঞানী, কবি, চিন্তাবিদ ও দার্শনিক ছিলেন। তিনিই প্রথম প্রাণী এবং উদ্ভিদের মূল গঠনের সামঞ্জস্যের কথা উল্লেখ করেন।

তিনি লেখবছ নামে একটা দ্বীপে একাধারে পাঁচ বছর অবস্থান করে প্রাণীদের ওপর গবেষণা করেন। প্রাণীদের সম্বন্ধে তিনি “Historia animalium” নামে একখানা জ্ঞানগর্ভ ও তথ্যবহুল পুস্তক রচনা করেন।

থিওফ্রাসটাস (Theophrastus : খ্রি. পূ. ৩৭০-২৮৫)

গ্রিক দার্শনিক থিওফ্রাসটাসের প্রকাশিত কাজের মধ্যে খুব কম কাজ আমরা পেয়েছি। যা পাওয়া গেছে তার মধ্যে ‘On the History of Plants’ এর নয়টি এবং ‘On the Causes of Plants’ এর ছয়টি ভল্যুম উল্লেখযোগ্য। থিওফ্রাসটাস বিখ্যাত দার্শনিক অ্যারিস্টটলের ছাত্র ছিলেন। তিনি সমস্ত উদ্ভিদকে Trees (বৃক্ষ), Shrubs (গুল্ম), Undershrubs (উপগুল্ম) এবং Herbs (বীরুৎ) এই চার ভাগে ভাগ করেন। তাকে উদ্ভিদবিজ্ঞানের জনক বলা হয়।

আল বিরুনী (AL Biruni : ৯৭৩-১০৪৮)

বিশ্বখ্যাত শিক্ষাবিদ এবং বিজ্ঞানী হিসাবে পরিচিত আল বিরুনী একজন আরবীয় ছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম আবু রায়হান মোহাম্মদ ইবনে আহমদ আল বিরুনী। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি বিশেষ অবদান রেখেছেন। গজনির সুলতান মাহমুদের সময়ে তিনি ভারতবর্ষে বেড়াতে আসেন এবং সে সময়ে ভাবতবর্ষের অবস্থা সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেন।

ইবনে সিনা (Ibn Sina : ৯৮০-১০৩৭)

ইনি একজন বিখ্যাত মুসলিম দার্শনিক ও বিজ্ঞানী ছিলেন। রসায়নবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা এবং ভাষাবিদ্যায় তাঁর অসামান্য পারদর্শিতা ছিল। তার সম্পূর্ণ নাম ছিল আবু আলী হুসাইন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সিনা। তিনি বিভিন্ন বিষয়ের উপর একশতেরও বেশি বই লিখেন। তার মধ্যে ১৬ খানা বই চিকিৎসাশাস্ত্রের ওপর। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রের ওপর ‘আলকানুন’ নামক ১৪ খণ্ডাংশের একটি বই লিখেন।

আল নাকীস (Al Nafis) :

ইনি একজন আরবীয় বৈজ্ঞানিক ছিলেন। ইনি সর্বপ্রথম (উইলিয়াম হার্ভের ৩০০ বছর পূর্বে) মানুষের রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক বর্ণনা দেন। তিনি একজন সফল চিকিৎসাবিদও ছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম আবু আল হাসান আলী ইবনে আন নাকীস। ধারণা করা হয় তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। তবে তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে সঠিক জানা যায়নি। তিনি সুদীর্ঘকাল বিজ্ঞানের সাধনা করে প্রায় ৮০ বছর বয়সে দামেস্কে পরলোকগমন করেন।

উইলিয়াম হার্ভে (William Harvey : ১৫৭৮-১৬৫৭)

উইলিয়াম হার্ভে একজন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি ১৬২৮ সালে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া পুনরায় আবিষ্কার করেন এবং অতীতের সব ধারণার অবসান ঘটান। ১৬৫১ সালে তিনি বলেন যে, ডিম্বাণু থেকেই সকল জীবনের সূত্রপাত হয়। তাঁকে শারীরবিদ্যার জনক বলা হয়। তিনি প্রাণীদের রক্ত সঞ্চালন এবং রেচন প্রক্রিয়ার সুস্পষ্ট ধারণা দেন ও উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের নাম ‘On the motion of the heart and blood in animals’.

এনথনি ফন লিউয়েনহোক (Anthony Von leeuwenhoek : ১৬৩২-১৭২৩)

ডাচ বিজ্ঞানী লিউয়েনহোক সর্বপ্রথম অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরী করেন। তবে তাঁর অণুবীক্ষণ যন্ত্র এখনকার অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মতো এত উন্নত ছিল না। নিজের তৈরী অনুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করে তিনি ব্যাকটেরিয়া, স্নায়ুকোষ, হাইড্রা, ভলভক্স ইত্যাদি জীবের যে বর্ণনা লিখে গেছেন তা অত্যন্ত সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

ক্যারোলাস লিনিয়াস (Carolus Linnaeus : ১৭০৭-১৭৭৮)

সুইডিস বিজ্ঞানী লিনিয়াস জীবদের দ্বিপদ নামকরণের (Binomial Nomenclature) প্রবর্তক। পেশাগত জীবনে তিনি ছিলেন ডাক্তার, আপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরতত্ত্বের অধ্যাপক। তিনি বহু উদ্ভিদ ও প্রাণী সংগ্রহ করে তাদের শ্রেণীবিন্যাস ও নামকরণ করেন। জীবজগতের শ্রেণীবিন্যাসের ওপর রচিত ‘Systema Naturae’ তাঁর বিখ্যাত গবেষণা গ্রন্থ। এ ছাড়া ‘Species Plantarum’ এবং ‘Genera Plantarum’ নামে তাঁর আরও দুটি বিখ্যাত গবেষণামূলক উদ্ভিদবিজ্ঞানের বই রয়েছে। তাঁকে শ্রেণীকরণবিদ্যার জনক বলা হয়।

চার্লস রবার্ট ডারউইন (Charles Robert Darwin : ১৮০৯-১৮৮২)

ইংরেজ প্রকৃতি বিজ্ঞানী ডারউইন প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদের (Theory of Natural Selection) প্রবর্তক। গেলাপেগোস দ্বীপপুঞ্জের জীবসম্প্রদায় পর্যবেক্ষণ করে ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে বিখ্যাত গবেষণা পুস্তক ‘Origin of Species by means of Natural Selection’ এ তিনি তাঁর মতবাদ প্রকাশ করেন।



অ্যারিস্টটল



থিওফ্রাসটাস



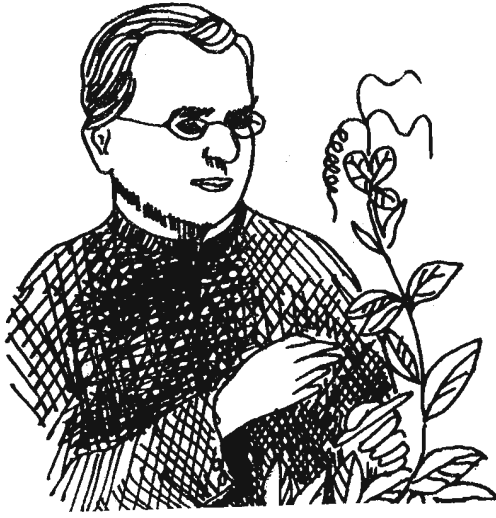
এনথনি ফন লিউয়েনহোক



ক্যারোলাস লিনিয়াস



চার্লস ডারউইন



গ্রেগর জোহান মেন্ডেল



আলেকজান্ডার ফ্লেমিং



সালিম আলী



ওয়াটসন

আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস (Alfred Russel Wallace : ১৮২৩-১৯১৩)

ইংরেজ প্রকৃতিবিজ্ঞানী ওয়ালেস চার বছর আমাজন নদীর অববাহিকায় ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করেছেন। তার বিখ্যাত বই ‘Travels on the Amazon and Rio Negro’ এর অভিজ্ঞতা থেকেই লেখা। মালয় উপদ্বীপে তিনি আট বছর গবেষণা করে ‘The Malay Archipelago’ লিখেছেন। তাঁর পোকামাকড়ের বিরাট সংগ্রহ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হোপ সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। তিনি চার্লস ডারউইনের সাথে প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ তত্ত্ব ঘোষণার জন্য খ্যাতি লাভ করেন।

গ্রেগর জোহান মেন্ডেল (Gregor Johann Mendel : ১৮২২-১৮৮৪)

অস্ট্রিয়ার ধর্মযাজক মেন্ডেল তার গির্জার বাগানে মটরশুঁটি উদ্ভিদ নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করেন। এ গবেষণা থেকে তিনি বংশগতি বা জেনেটিক্স এর দুটি সূত্র প্রকাশ করেন, যা এখনও যথাযথ বলে স্বীকৃত। তাঁকে বংশগতিবিদ্যার জনক বলে আখ্যায়িত করা হয়।

জর্জ বেনথাম (George Bentham : ১৮০০-১৮৮৪)

ইংরেজ উদ্ভিদবিজ্ঞানী বেনথামের সবচেয়ে বিখ্যাত কাজ হচ্ছে জোসেফ ড্যালটন হুকার -এর সাথে রচিত তিন ভল্যুম-এর 'Genera Plantarum'। এ ছাড়া তাঁর রচিত অন্যান্য বই হচ্ছে 'Handbook of the British Flora', 'Flora Hongkongensis', 'Flora Australiensis', ইত্যাদি।

থমাস হেনলি হাক্সলী (Thomas Henly Huxley: ১৮২৫-১৮৯৫)

বিখ্যাত ইংরেজ প্রাণিবিদ টি এইচ হাক্সলী পাখিদের ওপর অনেক কাজ করেন। তিনি পাখিকে 'মহিমাম্বিত সরীসৃপ' বলে উল্লেখ করেন এবং প্রমাণ করেন যে, সরীসৃপ পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তনের ধারায় পাখিদের উদ্ভব হয়েছে। এ ছাড়া তিনি প্রাণিবিদ্যার ওপর অনেক গবেষণা করেন। তিনি চার্লস ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদের বিশিষ্ট সমর্থক ছিলেন। হাক্সলী প্রোটোপ্লাজমকে জীবনের ভৌত ভিত্তি হিসেবে বর্ণনা করেন।

আলেকজান্ডার ফ্লেমিং (Alexander Fleming : ১৮৮১-১৯৫৫)

আলেকজান্ডার ফ্লেমিং ছিলেন একজন অণুজীববিদ। ১৯১৮ সালে তিনি দেখেন যে ব্যাকটেরিয়া কালচার পাত্রে *Penicillium* ছত্রাক জন্মালে তার চারপাশে কোন ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে পারে না। তার এ পর্যবেক্ষণ থেকে তিনি অনুসন্ধান শুরু করেন। এ অনুসন্ধান ও গবেষণা থেকে তিনি পরবর্তীকালে পেনিসিলিন নামক অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ আবিষ্কার করেন, যা লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন রক্ষা করেছে। অন্য দু জন বিজ্ঞানীর সাথে মিলিতভাবে তিনি ১৯৪৫ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

ডেভিড প্রেইন (David Prain)

ডেভিড প্রেইন একজন ইংরেজ চিকিৎসক। এবার্ডিন এবং এডিনবরা থেকে মেডিসিনে ডিগ্রি লাভ করে তিনি ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিস-এ যোগদান করেন ১৮৮৩ সালে ভারতবর্ষে আসেন। তাঁর প্রথম কর্মস্থল ছিল নোয়াখালীর লক্ষ্মীপুরে। পরে তিনি এ অঞ্চলের উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। ১৮৮৭ থেকে ১৮৯৭ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতা বোটানিক্যাল গার্ডেনের ডাইরেক্টর ছিলেন।

বাংলাদেশ ও এর আশপাশের অঞ্চলের গাছপালার বিবরণ সংক্রান্ত তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হল দুই খণ্ডে প্রকাশিত 'Bengal Plants'। তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল 'Flora of Sundribuns'।

সালিম আলী (Salim Ali : ১৮৯৬-১৯৮৭)

সালিম আলী ভারতের The Birdman of India নামে পরিচিত বিশিষ্ট পক্ষীবিদ। তিনি ভারতের সকল পাখিকে বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে পর্যবেক্ষণ করে 'The Indian Birds' নামে একখানা তথ্যবহুল গ্রন্থ রচনা করেন। এ ছাড়াও তিনি পাখিদের সম্বন্ধে আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর নিজের আত্মজীবনীও বেশ বিখ্যাত গ্রন্থ। ১৯৮৩ সালে ভারত সরকার সালিম আলীকে তাঁর গবেষণার স্বীকৃতি স্বরূপ পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত করেন।

স্যার হ্যানস ক্রেবস (Sir Hans Krebs : ১৯০০-১৯৮১)

ইংরেজ বিজ্ঞানী ক্রেবস ১৯৫৩ সালে কোষীয় বিপাকের উপর গবেষণার জন্য F. A. Lipmann এর সাথে মেডিসিন এবং ফিজিওলজিতে নোবেল পুরস্কার পান। ১৯৫৪ সালে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রির বিভাগীয় প্রধান নিযুক্ত হন। জীবের শ্বসন প্রক্রিয়ার ক্রেবস চক্র তাঁরই আবিষ্কার।

জেমস্ ওয়াটসন এবং ফ্র্যানসিস ক্রীক (James Watson and Francis Crick)

ওয়াটসন এবং ক্রীক দু জন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী মানুষের বংশগতির ধারক ডিএনএ (DNA) অণুর আণবিক গঠন আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পি এইচ ডি ডিগ্রির জন্য গবেষণা করার সময় তাঁরা ১৯৫৩ সালে ডিএনএ (DNA) অণুর আণবিক গঠন আবিষ্কার করেন। এ আবিষ্কারের জন্য তাঁরা ১৯৬৩ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। ওয়াটসন এবং ক্রীক সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন যে ডিএনএ (DNA) অণু দ্বিসূত্রক এবং হেলিক্যাল (সর্পিলা)।

মেলভিন ক্যালভিন (Melvin Calvin : জন্ম ১৯১১)

আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্যালভিন সবুজ উদ্ভিদে কার্বন বিজারণ পথ সংক্রান্ত গবেষণার জন্য বিখ্যাত। ক্যালভিন আর একজন বিজ্ঞানী ব্যাশাম এর সহযোগিতায় উদ্ভিদে কার্বন বিজারণ এর যে প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন তা ক্যালভিন-ব্যাশাম-এর পথ নামে পরিচিত। তিনি ১৯৬১ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৈশিষ্ট্য

উদ্ভিদ ও প্রাণীর অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্য থেকে প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আমরা উদ্ভিদ ও প্রাণীর তুলনা করব।

- ১। আকার ও আকৃতি : উদ্ভিদের নির্দিষ্ট আকার ও আকৃতি থাকে না কিন্তু প্রাণীদের নির্দিষ্ট আকার ও আকৃতি থাকে।
- ২। জীবনকাল : উদ্ভিদের জীবনকাল নির্দিষ্ট থাকে না। উপযুক্ত পরিবেশে বহুকাল বেঁচে থাকে। অনুকূল পরিবেশে প্রাণী একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকে।
- ৩। বৃদ্ধি : উপযুক্ত পরিবেশে উদ্ভিদের বৃদ্ধি বহুকাল ধরে চলতে থাকে। প্রাণীদের বৃদ্ধি জীবনের একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত হয়। তারপর বন্ধ হয়ে যায়।
- ৪। চলাচল : স্থলজ উদ্ভিদের বেশিরভাগ মাটিতে শিকড়ের সাহায্যে স্থলগ্ন থাকে। এ কারণে মুক্তভাবে চলাচল করতে পারে না। তবে কোন কোন অঙ্গ সামান্য নড়াচড়া করতে পারে। বেশিরভাগ প্রাণীই মুক্তভাবে চলাচল করতে পারে। কিছু প্রাণী (যেমন- স্পঞ্জ) চলাচলে অক্ষম।
- ৫। খাদ্যের প্রকৃতি : উদ্ভিদ কঠিন খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না। প্রাণী কঠিন, তরল সব ধরনের খাদ্য গ্রহণ করতে পারে।
- ৬। পুষ্টি : উদ্ভিদ স্বভোজী, সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় খাদ্য নিজেই তৈরি করতে পারে। প্রাণী নিজের খাদ্য নিজের দেহে তৈরি করতে পারে না। খাদ্যের জন্য এরা মূলত উদ্ভিদ এবং অন্যান্য জীবের ওপর নির্ভরশীল।
- ৭। কোষের গঠন : উদ্ভিদ কোষের কোষপ্রাচীর মৃত, কোষগহ্বর বড় এবং কোষে প্লাস্টিড থাকে। প্রাণী কোষে কোষপ্রাচীর থাকে না, ছোট ছোট কোষগহ্বর থাকে, সেন্ট্রিওল থাকে, প্লাস্টিড থাকে না।
- ৮। প্রজনন : উদ্ভিদের অঙ্গজ, অযৌন এবং যৌন প্রজনন প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি ঘটে। প্রাণীদের প্রজনন প্রধানত যৌন প্রক্রিয়ায় হয়। কিছু কিছু প্রাণীতে অঙ্গজ এবং অযৌন প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি হয়।
- ৯। তন্ত্র : উদ্ভিদ দেহে তন্ত্র থাকে না। বেশিরভাগ প্রাণীদের দেহে বিভিন্ন তন্ত্র থাকে।

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশ উন্নয়নে জীববিজ্ঞানের ভূমিকা

জীববিজ্ঞানের প্রধান দুটি শাখা উদ্ভিদবিজ্ঞান এবং প্রাণিবিজ্ঞান। এ ছাড়া জীববিজ্ঞানের আরও শাখা-প্রশাখা আছে। এদের কিছু কিছু তোমরা এ অধ্যায়ের আগের অংশে জেনেছ। তোমাদের এ জ্ঞানের ভিত্তিতে জীববিজ্ঞানের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করব।

কৃষিবিদ্যার অনেক শাখাপ্রশাখা আছে। মৎসবিদ্যা, পশুপালন, কৃষি, হাঁস-মুরগি পালন, মৌমাছি পালন, রেশম পোকা পালন ইত্যাদি অন্যতম। এসব জ্ঞানের প্রয়োগ করে অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব।

উদ্ভিদ এবং প্রাণী উভয়েই প্রাকৃতিক পরিবেশের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। উদ্ভিদ এবং প্রাণী বিভিন্নভাবে একে অপরের ওপর নির্ভরশীল তোমরা তা জান। বাস্তুবিদ্যা আমাদেরকে উদ্ভিদ ও প্রাণীর গুরুত্ব এবং পরিবেশে এদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করে দেয়। জ্ঞান সম্পন্ন সচেতন নাগরিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেক ক্ষেত্রে পরিবেশের বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বাস্তুবিদ্যার সঠিক প্রয়োগে পরিবেশের বিপর্যয় রোধ করা যায়। আর্থিক সচ্ছলতা এবং সুন্দর পরিবেশ সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করে।

প্রকৃতি ও জীবের উদ্ভব

প্রকৃতি কাকে বলে তোমরা তা জান। আমরা প্রকৃতিতে বাস করছি। আমাদের চারপাশে মাটি, পানি, বায়ু, নানা রকমের গাছপালা, জীবজন্তু, পোকামাকড় রয়েছে। এ সব মিলেই প্রকৃতি। প্রকৃতিকে আমরা এখন যেমন দেখছি লক্ষ লক্ষ বছর আগের চেহারা কিন্তু এমন ছিল না। লক্ষ বছর পরেও এর চেহারা এমন থাকবে না। এর অর্থ হচ্ছে প্রকৃতি পরিবর্তনশীল। প্রকৃতির পরিবর্তন নানান রকম প্রাকৃতিক শক্তি যেমন নদীর স্রোত, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি কারণে হয়। মানুষের নানান রকম কাজও প্রাকৃতিক পরিবর্তন ঘটায়; যেমন, বনভূমি ধ্বংস, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি।

প্রকৃতির উদ্ভব হয়েছে কীভাবে এ নিয়ে বিজ্ঞানীদের চিন্তাভাবনার অন্ত নেই। পৃথিবীর জন্ম নিয়ে নানা রকম তত্ত্ব আছে। এসব তত্ত্বের মধ্যে মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব অনুযায়ী সূর্য বা সূর্যের মতো কোন নক্ষত্রের অংশবিশেষ অপর আর এক নক্ষত্রের টানে ছিটকে বের হয়ে আসে। পৃথিবীসহ অন্য গ্রহ উপগ্রহগুলো ছিটকে আসা সূর্যের অংশ থেকেই সৃষ্টি।

এ তত্ত্ব অনুযায়ী পৃথিবী প্রথমে উত্তপ্ত গ্যাসীয় অবস্থায় ছিল। পরে ঠাণ্ডা ও ঘনীভূত হয়ে বর্তমান পৃথিবীর রূপ নিয়েছে। পৃথিবীর অভ্যন্তর এখনও অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং তরল ও গ্যাসীয় অবস্থায় রয়েছে। প্রকৃতি প্রাথমিক অবস্থায় জীবন ধারণের জন্য একেবারেই উপযোগী ছিল না। পরে ধীরে ধীরে প্রকৃতি জীবন ধারণের উপযোগী হয়ে ওঠে। এখন তোমাদের প্রশ্ন হতে পারে প্রকৃতিতে জীবন এলো কীভাবে? উদ্ভিদ ও প্রাণী কী প্রথম থেকেই প্রকৃতিতে ছিল?

জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কেও নানা ধরনের মতবাদ প্রচলিত আছে। এ অধ্যায়ের প্রথমে এ সম্পর্কে একটি প্রাচীন মতবাদের কথা তোমাদের বলেছি। তবে জীবনের উদ্ভব সম্পর্কে ওপারিন নামে রাশিয়ান বিজ্ঞানীর মতবাদই এখন পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য রয়েছে।

ওপারিনের (Oparin) মতবাদ অনুসারে জীবনের উদ্ভবের সময় প্রকৃতি অনেক গরম ছিল। বায়ুমণ্ডলে নানা রকমের গ্যাস ছিল, যার মধ্যে অ্যামোনিয়া (NH_3) হাইড্রোজেন (NH_2) মিথেন (CH_4) হাইড্রোজেন সাইনাইড (HCN) ছিল। প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং বজ্রপাত হত। এ রকম পরিবেশে বিভিন্ন গ্যাসের সর্ধমিশ্রণে জীববিজ্ঞানীগণ যাকে জীবনের প্রথম অণু বলে থাকেন, যা অ্যামাইনো এসিড নামে পরিচিত, তার উদ্ভব হয়। অ্যামাইনো এসিডকে অন্তর্ভুক্ত করেই প্রথম কোষ বা জীবনের উদ্ভব হয়। আদি প্রকৃতির জলজ পরিবেশেই প্রথম জীবনের উদ্ভব হয়।

প্রথম কোষে প্রোটোপ্লাজম ছিল, অ্যামাইনো এসিড ছিল, যার অনেকগুলো অণু একত্রিত হয়ে ডিএনএ (DNA) অণুর সৃষ্টি হয়েছিল। নিউক্লিয়াসবিহীন এ কোষ থেকেই প্রথমে নিউক্লিয়াসসহ কোষ এবং পরবর্তীকালে বহুকোষী জীবের উদ্ভব হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। গ্রেগর জোহান মেন্ডেল কী জন্য বিখ্যাত?

ক. প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদের জন্য

খ. রক্ত চলাচল প্রক্রিয়া আবিষ্কারের জন্য

গ. পেনিসিলিন আবিষ্কারের জন্য

ঘ. বংশগতির সূত্রের জন্য

২। বাংলাদেশের উদ্ভিদের বিশদ বিবরণ প্রদানের জন্য কোন বিজ্ঞানীর অবদান বেশি?

i. অ্যারিস্টটল

ii. থিওফ্রাসটাস

iii. ডেভিড প্রেইন

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
গ. iii
খ. ii
ঘ. ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদ অবলম্বনে ৩ নং ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

প্রকৃতিতে জীবের উদ্ভব সম্পর্কে ওপারিনের মতবাদ অধিক গ্রহণযোগ্য। এ মতবাদ অনুযায়ী জীব সৃষ্টির শুরুতে বিভিন্ন গ্যাসের স্ফমিশ্রণে জীবনের প্রথম অণু অ্যামাইনো এসিডের সৃষ্টি হয়। অতঃপর অ্যামাইনো এসিডকে অন্তর্ভুক্ত করেই জলজ পরিবেশে প্রথম কোষ বা জীবনের উদ্ভব হয়। প্রথম কোষ নিউক্লিয়াসবিহীন ছিল। তা থেকে নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষ এবং পরবর্তীতে বহুকোষী জীবের উদ্ভব হয়।

৩। ওপারিনের মতবাদ অনুযায়ী এবং প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে জীব সৃষ্টির শুরু থেকে বর্তমানের দিকে পর পর সাজালে নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. অ্যামাইনো এসিড → এক কোষী শৈবাল → ব্যাকটেরিয়া → এক কোষী অ্যামিবা
খ. অ্যামাইনো এসিড → এক কোষী অ্যামিবা → ব্যাকটেরিয়া → এক কোষী শৈবাল
গ. অ্যামাইনো এসিড → ব্যাকটেরিয়া → এক কোষী শৈবাল → এক কোষী অ্যামিবা
ঘ. অ্যামাইনো এসিড → ব্যাকটেরিয়া → এক কোষী অ্যামিবা → এক কোষী শৈবাল

৪। ওপারিনের মতবাদ অনুযায়ী এবং প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে স্থলজ পরিবেশে নিচের কোন জীবটির আগমন সবার শেষে ঘটান কথা?

- ক. পাখি
গ. মহিষ
খ. মানুষ
ঘ. বটবৃক্ষ

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১। সিংগুয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালেই কালীদাস উদ্ভিদ ও প্রাণীদের ব্যাপারে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। তার এ কৌতূহল দেখে বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ তাকে বড় হয়ে জীববিজ্ঞানের ওপর পড়াশুনার পরামর্শ দেন। কালীদাস সে মোতাবেক বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করেন। তার পঠিত বিষয়ের মধ্যে জীববিজ্ঞানের মৌলিক শাখা; যেমন, শারীরবিদ্যা ও ফলিত শাখা উভয়ই অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি ফলিত শাখার ওপর কাজ শুরু করেন এবং উচ্চ ফলনশীল বহু ফল ও ফসল উদ্ভাবন করেন। তিনি আজও এ কাজে নিয়োজিত আছেন।

- ক. জীববিজ্ঞান কাকে বলে?
খ. শারীরবিদ্যাকে জীববিজ্ঞানের মৌলিক শাখা বলা হয় কেন?
গ. কালীদাসের কাজ কেন জীববিজ্ঞানের ফলিত শাখার অন্তর্ভুক্ত তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. কালীদাসের সাফল্যের পিছনে মৌলিক শাখার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

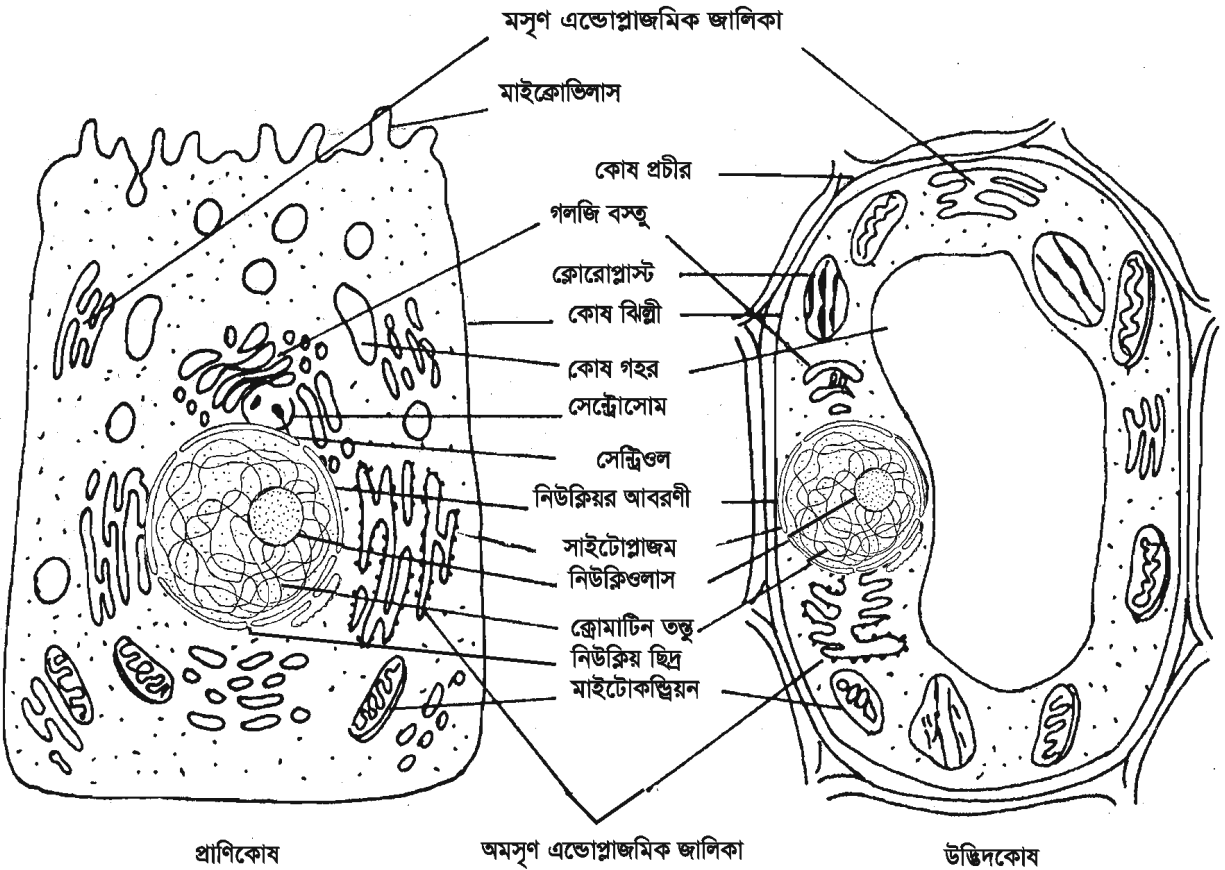
অধ্যায় দুই

জীবকোষের গঠন ও প্রকৃতি

যার জীবন আছে সেই জীব। অণুজীব, উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন আছে, তাই এরা সকলেই জীব। অণুজীব, উদ্ভিদ ও প্রাণী নিয়েই জীবজগৎ গঠিত। প্রতিটি জীব এক বা একাধিক কোষ নিয়ে গঠিত। কোষ হল জীবদেহের গঠন ও কাজের একক। জীবদেহের সব ধরনের ক্রিয়া-বিক্রিয়া কোষভিত্তিক। কাজেই যে কোন জীব সম্বন্ধে জানতে হলে অবশ্যই জীবকোষ সম্বন্ধে প্রথমে জানতে হবে।

সকল জীবকোষ এক রকম নয়, এদের মধ্যে গঠনগত পার্থক্য যেমন আছে, তেমনই আছে আকার, আকৃতি ও কাজের পার্থক্য। এখানে কোষের প্রকারভেদ সম্বন্ধে সর্বাঙ্গীণ আলোচনা করা হল।

উদ্ভিদ ও প্রাণীদের সকল কোষই সুকেন্দ্রিক কিন্তু এদের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য আছে। অধ্যায়ের শেষের দিকে ছকের সাহায্যে উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষের পার্থক্যগুলো দেখান হয়েছে। এদের প্রধান পার্থক্য হল যে উদ্ভিদ কোষে একটি জড় কোষ প্রাচীর থাকে যা প্রাণী কোষে থাকে না।



চিত্র ২.১ : সার্বিক উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষ (ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা)

(ক) নিউক্লিয়াসের গঠন অনুসারে

প্রাককেন্দ্রিক কোষ (Prokaryotic cell বা Protocell) : কোষে নিউক্লিয়াস সুগঠিত নয়, নিউক্লিয়ার মেমব্রেন (আবরণী) এবং নিউক্লিওলাস থাকে না। ক্রোমোসোমে কেবল DNA থাকে; রাইবোসোম ছাড়া সাধারণত অন্যান্য অঙ্গাণু থাকে না। কোষ বিভাজন হয় অ্যামাইটোসিস (amitosis) প্রক্রিয়ায়।

সুকেন্দ্রিক কোষ : (Eukaryotic cell বা Eucell): কোষে সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে, সুস্পষ্ট নিউক্লিয়ার মেমব্রেন এবং নিউক্লিওলাস থাকে। ক্রোমোসোমে (DNA) প্রোটিন ও অন্যান্য উপাদান থাকে। রাইবোসোম ছাড়া ক্লোরোপ্লাস্ট, মাইটোকন্ড্রিয়াসহ বিভিন্ন অঙ্গাণু থাকে। মাইটোসিস (Mitosis) প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজন হয়।

(খ) কার্যকারিতা অনুসারে

দেহকোষ (Somatic cell) : এ কোষগুলো জীবদেহ গঠন করে কিন্তু জনন কাজে অংশ নেয় না। নিম্নশ্রেণীর জীবে এরা হ্যাপ্লয়েড অর্থাৎ মাত্র এক প্রস্থ ক্রোমোজোম থাকে কিন্তু উচ্চশ্রেণীর জীবে এরা ডিপ্লয়েড অর্থাৎ নিউক্লিয়াসে দুই প্রস্থ ক্রোমোসোম থাকে।

জননকোষ (Reproductive cell) : এ কোষগুলো জীবের যৌন জনন কাজে অংশ নেয়, মূল দেহ গঠন করে না। কোষগুলো হ্যাপ্লয়েড। শূক্রাণু এবং ডিম্বাণু হল জননকোষ।

জীবকোষের আকার, আকৃতি ও গঠন

কোষের আকার, আকৃতি ও গঠনে কিছু বিভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক। এখানে সুকেন্দ্রিক কোষের (প্রকৃত কোষ) আকার, আকৃতি ও গঠন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

আকার : কোষ ০.১ মাইক্রন হতে ৫৫ সেমি, এমনকি এর চেয়েও বেশি হতে পারে। [১ মিলিমিটার = ১০০০ মাইক্রন]

আকৃতি : কোষ বিভিন্ন আকৃতির হয়ে থাকে। গোলাকার, ডিম্বাকার, আয়তাকার, পিপাকৃতি ও বহুভুজাকৃতি কোষই বেশি দেখা যায়।

একটি সার্বিকৃত কোষের গঠন (Structure of a typical cell)

গঠনগত দিক হতে কোষ বিচিত্র ধরনের। তাই কোন একটি কোষে সকল অঙ্গাণু বা গঠন উপাদান নাও থাকতে পারে। সে কারণে আলোচনার সুবিধার জন্য একটি কোষে সর্ববিধ উপাদানের উপস্থিতি ধরে কোষের যে গঠনরূপ কল্পনা করা হয় তাকে সার্বিকৃত কোষ (Generalized Cell) বলে। একটি সার্বিকৃত উদ্ভিদকোষ প্রধানত দুটি অংশে বিভক্ত, কোষপ্রাচীর এবং প্রোটোপ্লাজম।

কোষপ্রাচীর (Cell wall)

কোষপ্রাচীর উদ্ভিদকোষের অনন্য বৈশিষ্ট্য। জড় ও শক্ত যে প্রাচীর দিয়ে উদ্ভিদকোষ পরিবেষ্টিত থাকে তাকে কোষপ্রাচীর বলে। সর্বপ্রথম রবার্ট হুক ১৬৬৫ সালে কোষপ্রাচীর প্রত্যক্ষ করেন। প্রাণিকোষে কোষ প্রাচীর নেই।

রাসায়নিক উপাদান

কোষপ্রাচীর প্রধানত সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ, পেক্টোজ, লিগনিন, সুবেরিন প্রভৃতি কার্বোহাইড্রেট জাতীয় উপাদানে গঠিত। ছত্রাকের কোষপ্রাচীর কাইটিন নামক কার্বোহাইড্রেট দিয়ে গঠিত। ব্যাকটেরিয়ার কোষপ্রাচীর প্রোটিন, লিপিড ও পলিমার দিয়ে গঠিত।

কাজ : কোষের আকৃতি দান, কোষকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করা, প্রয়োজনীয় দৃঢ়তা প্রদান করা এবং কোষের ভিতর ও বাইরের মধ্যে তরল পদার্থের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করা কোষপ্রাচীরের কাজ।

প্রোটোপ্লাজম (Protoplasm)

প্রোটোপ্লাজম হল বিভিন্ন যৌগের মিশ্রণে গঠিত জেলির ন্যায় একটি স্বচ্ছ, আঠালো, বর্ণহীন, অর্ধতরল, জটিল সজীব পদার্থ। এতে জীবনের সব গুণাবলি বিদ্যমান। প্রোটোপ্লাজম তিন অংশে বিভক্ত : প্লাজমামেমব্রেন, সাইটোপ্লাজম এবং নিউক্লিয়াস।

১। প্লাজমামেমব্রেন বা কোষঝিল্লী (Plasma membrane or Cell membrane) :

কোষপ্রাচীরের ঠিক নিচে সমস্ত প্রোটোপ্লাজমকে ঘিরে যে সজীব নরম মেমব্রেন বা ঝিল্লী থাকে তাকে প্লাজমামেমব্রেন বলে। একে সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন বা সেল মেমব্রেনও বলা হয়। বাংলায় একে কোষঝিল্লী বলে।

গঠন : প্লাজমামেমব্রেন দুই স্তরবিশিষ্ট। প্লাজমামেমব্রেনে ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপে দুটি গাঢ় স্তরের মাঝে একটি হালকা স্তর দেখা যায়। কোন কোন এপিথেলিয়াল কোষের কোষ ঝিল্লীতে আঙুলের মতো কতকগুলো প্রবৃদ্ধি দেখা যায়। এদের মাইক্রোভিলি (Microvilli) বলে (একবচনে মাইক্রোভিলাস)। এরা কোষের পরিশোধণ তল বৃদ্ধি করে। দুটি পার্শ্ববর্তী কোষের মধ্যে অবস্থিত কোষ ঝিল্লীগুলো নানাভাবে পরিবর্তিত হয়ে দুটো কোষের সংযোগ দৃঢ় করে এবং কোষগুলোর মধ্যে বিভিন্ন দ্রব্যাদির চলাচল সুগম করে। অনেক কোষে কোষ ঝিল্লীর মধ্যস্থ ফাঁকা স্থান বা ক্ষেত্র বেশ চওড়া হতে পারে।

কাজ : (ক) কোষের অভ্যন্তর এবং বাইরের মধ্যে বিভিন্ন দ্রব্যের আদান প্রদান। (খ) দেহের বাইরের থেকে বিভিন্ন দ্রব্যের (প্রধানত পুষ্টিদ্রব্য) পরিশোধণ (absorption) (গ) কোষদেহকে সুরক্ষা ও আকার প্রদান।

২। সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm)

নিউক্লিয়াসের বাইরে অবস্থিত এবং কোষঝিল্লী দিয়ে পরিবেষ্টিত প্রোটোপ্লাজমই সাইটোপ্লাজম নামে পরিচিত। এটি বিভিন্ন জৈব ও অজৈব যৌগ, পানি, বিভিন্ন নিউক্লিয়িক এসিড ও এনজাইম দিয়ে গঠিত। সাইটোপ্লাজমের বাইরের দিকের অপেক্ষাকৃত ঘন, কম দানাদার এবং শক্ত অঞ্চলকে এন্ডোপ্লাজম এবং কেন্দ্রস্থ অপেক্ষাকৃত কম ঘন অঞ্চলকে এন্ডোপ্লাজম বলে।

সাইটোপ্লাজমে প্লাস্টিড, মাইটোকন্ড্রিয়া, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, রাইবোসোম, গলজি বস্তু, লাইসোসোম, সেন্ট্রোসোম প্রভৃতি অঙ্গাণু এবং বিভিন্ন জড় পদার্থ থাকে।

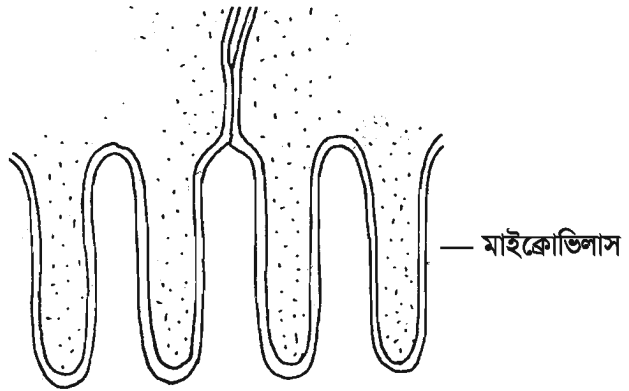
কাজ : (ক) বিভিন্ন অঙ্গাণু ধারণ করা এবং (খ) কতিপয় জৈবিক কাজ করা।

নিচে সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত অঙ্গাণুসমূহের বিবরণ দেয়া হল :

প্লাস্টিড (Plastid)

সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত অঙ্গাণুগুলোর মধ্যে প্লাস্টিড আকারে সবচেয়ে বড়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এদের স্পষ্ট দেখা যায়। ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া প্রভৃতি জীবে প্লাস্টিড নেই। প্রাণিকোষে প্লাস্টিড থাকে না।

প্লাস্টিড প্রধানত দু প্রকার— লিউকোপ্লাস্টিড বা লিউকোপ্লাস্ট এবং ক্রোমোটোপ্লাস্টিড বা ক্রোমোটোপ্লাস্ট। লিউকোপ্লাস্টিড বর্ণহীন এবং ক্রোমোটোপ্লাস্টিড বর্ণময়। ক্রোমোটোপ্লাস্টিড আবার দু প্রকার— ক্রোমোপ্লাস্ট এবং ক্লোরোপ্লাস্ট।



চিত্র ২.২ : দ্বিস্তর বিশিষ্ট কোষঝিল্লী

লিউকোপ্লাস্ট (Leucoplast) : এরা বর্ণহীন। কারণ এতে কোন রঞ্জক পদার্থ থাকে না। আলোর সংস্পর্শে এলে লিউকোপ্লাস্ট, ক্রোমোপ্লাস্ট, বিশেষ করে ক্লোরোপ্লাস্টে রূপান্তরিত হতে পারে। আলোর অনুপস্থিতিতে বিপরীত অবস্থা ঘটতে পারে।

অবস্থান : মূল, ভূনিম্নস্থ কাণ্ড প্রভৃতি যেসব অঙ্গে সূর্যালোক পৌঁছায় না সেসব অঙ্গের কোষে লিউকোপ্লাস্ট থাকে।

আকার : লিউকোপ্লাস্ট অর্ধবৃত্তাকৃতি বা নলাকৃতির হতে পারে।

কাজ : এদের কাজ খাদ্য সঞ্চয় করা।

ক্রোমোটোপ্লাস্ট (Chromatoplast) : ক্রোমোটোপ্লাস্ট সবুজ বা অন্যান্য বর্ণের হয়। সবুজ হলে তাকে ক্লোরোপ্লাস্ট এবং অন্যান্য রঙের হলে তাকে ক্রোমোপ্লাস্ট বলে।

ক্রোমোপ্লাস্ট (Chromoplast) : এরা সবুজ বর্ণ ব্যতীত অন্যান্য বর্ণের, বিশেষ করে হলুদ ও লাল বর্ণের হয়ে থাকে। আকৃতিতেও এরা ভিন্নতর। উদ্ভিদের বর্ণময় অঙ্গসমূহে ক্রোমোপ্লাস্ট থাকে। যেমন— ফুলের পাপড়ি, রঙিন ফল ও বীজ, গাজরের মূল ইত্যাদি।

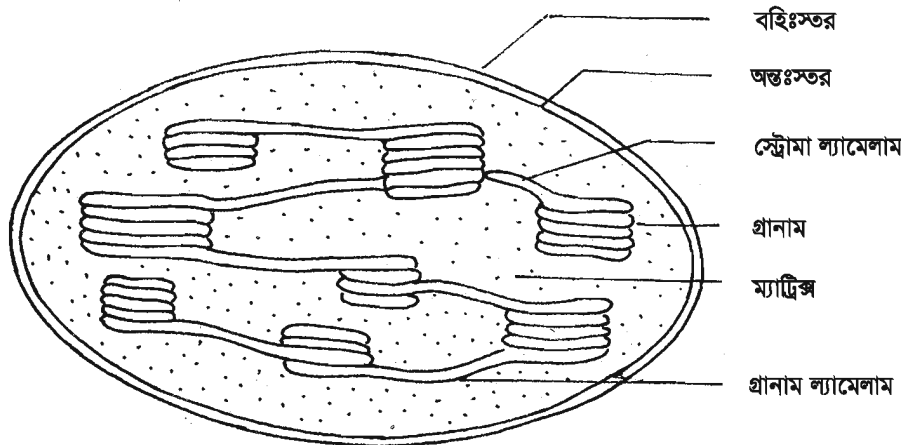
কাজ : এদের উপস্থিতির জন্য পুষ্প রঙিন ও সুন্দর হয়। তাই কীটপতঙ্গ আকৃষ্ট হয়ে পরাগায়নে সাহায্য করে।

ক্লোরোপ্লাস্ট (Chloroplast) : ক্লোরোফিল নামক সবুজ বর্ণকণিকা (pigment) অধিক মাত্রায় ধারণ করে বলে এরা সবুজ হয়। এদের অন্যান্য বর্ণকণিকাও কিছু কিছু পরিমাণে থাকে। প্রতি কোষে এক হতে একাধিক ক্লোরোপ্লাস্ট থাকতে পারে।

উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদকোষে ক্লোরোপ্লাস্টের আকৃতি সাধারণত লেন্সের মতো হয়ে থাকে। শৈবাল কোষে এদের আকৃতি হরেক রকম; যেমন, পেয়ালাকৃতি, সর্পিলাকার, জালিকাকার, তারাকাকার অর্ধচক্রাকার আকৃতির হতে পারে।

গঠন : নিম্নলিখিত অংশ নিয়ে ক্লোরোপ্লাস্ট গঠিত—

- (১) সমস্ত ক্লোরোপ্লাস্ট একটি দুই স্তরবিশিষ্ট অর্ধভেদ্য (Semipermeable) ঝিল্লি দিয়ে আবৃত থাকে। এটি লিপিড ও প্রোটিন দিয়ে গঠিত। এই ধরনের যৌগকে লাইপোপ্রোটিন বলে।
- (২) ঝিল্লি দ্বারা আবৃত পানিগ্রাহী ম্যাট্রিক্স বিদ্যমান। এই ম্যাট্রিক্সকে স্ট্রোমা (stroma) বলে।
- (৩) স্ট্রোমাতে সুবিন্যস্ত ৪০-৮০ পিঁপা আকৃতির গ্রানা (grana) (একবচনে – গ্রানাম) বিদ্যমান। একটি গ্রানামে ৫-২৫টি গ্রানাম চাকতি (granum disc) থাকে। গ্রানাম চাকতির অভ্যন্তরে কুঠুরির মতো স্থান আছে, সম্ভবত এই কুঠুরিতে ক্লোরোফিল ও সালোকসংশ্লেষণের অন্যান্য বস্তু অবস্থান করে।



চিত্র ২.৩ : ক্লোরোপ্লাস্টের বিভিন্ন অংশ (ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট এবং সরলীকৃত)।

- (৪) দুটি পাশাপাশি গ্রানার কিছু সংখ্যক গ্রানাম চাকতি সূক্ষ্ম নালিকা দিয়ে সংযুক্ত থাকে। এই সংযোগকারী নালিকাকে স্ট্রোমা ল্যামেলী বলে।
- (৫) গ্রানাম চাকতির ঝিল্লীর ভিতরের দিকে বহু স্ফটিকাকার বস্তু সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো থাকে। এদের কোয়ান্টোসোম (Quantosome) বলে। সালোকসংশ্লেষণের অন্ধকার পর্যায়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড সংবন্ধন মূলত কোয়ান্টোসোমে হয়ে থাকে।

কাজ : ক্লোরোপ্লাস্ট-এর কাজ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করা।

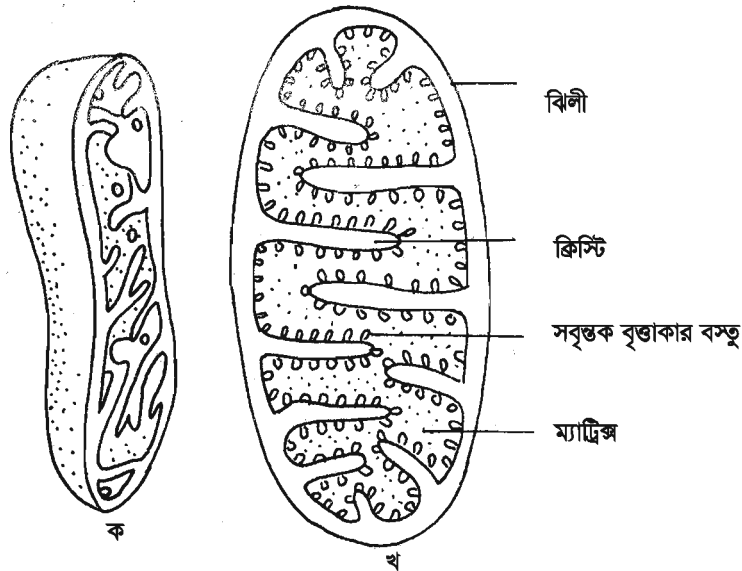
মাইটোকন্ড্রিয়া (Mitochondria)

মাইটোকন্ড্রিয়াতে (এক বচনে-মাইটোকন্ড্রিয়ন) ক্রেব্‌স্ চক্র, ফ্যাটি এসিড চক্র, ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট প্রক্রিয়া প্রভৃতি ঘটে থাকে। শক্তি উৎপাদনের সকল প্রক্রিয়া এর অভ্যন্তরে ঘটে থাকে বলে মাইটোকন্ড্রিয়াকে পাওয়ার হাউসের সাথে তুলনা করা হয়।

প্রকারভেদে প্রতি কোষে এদের সংখ্যা বিভিন্ন হতে পারে। সাধারণত গড়ে প্রতি কোষে ৩০০ থেকে ৪০০ টি মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে।

আকৃতিতে এরা বৃত্তাকার, দণ্ডাকার, তন্তুকার, তারাকাকার ও কুণ্ডলী আকার হতে পারে।

মাইটোকন্ড্রিয়ন একটি দুই স্তরবিশিষ্ট ঝিল্লী দিয়ে আবৃত। ঝিল্লীটি লিপিড ও প্রোটিন সমৃদ্ধ লাইপোপ্রোটিন দিয়ে গঠিত। বহিঃস্তরটি মসৃণ কিন্তু ভিতরের স্তরটি বিভিন্নভাবে ভিতরের দিকে ভাঁজ হয়ে থাকে। এ ভাঁজ হওয়া অংশগুলোকে ক্রিস্টি (cristae) বলে। ক্রিস্টির গায়ে সুবিন্যস্তভাবে বহু সবুজক বৃত্তাকার বস্তু থাকে। এদের অক্সিসোম (auxisome) বলে। শ্বসনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন এনজাইম অক্সিসোমে সুবিন্যস্ত থাকে। এতে প্রায় ৭০ রকম এনজাইম এবং ১৪ রকম কো-এনজাইম আছে। মাইটোকন্ড্রিয়নের অভ্যন্তরে থাকে ম্যাট্রিক্স (matrix)। শক্তি উৎপাদন তথা শ্বসন, অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন, ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট প্রভৃতি মাইটোকন্ড্রিয়ার প্রধান কাজ।



চিত্র ২.৪ : ক ও খ ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট মাইটোকন্ড্রিয়ার দৈর্ঘ্যচ্ছেদ
(ক) অর্ধাংশ ত্রিমাত্রিক, (খ) পাতলা দৈর্ঘ্যচ্ছেদ



অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ও মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম

চিত্র ২.৫ : এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম (সরলীকৃত)

এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম (Endoplasmic reticulum) বা ER

পরিণত কোবের সাইটোপ্লাজমে যে জালিকা বিন্যাস দেখা যায় তাকে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম বলে। এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম দু'প্রকার—মসৃণ এবং অমসৃণ। ER এর গায়ে রাইবোসোম দানা থাকলে তাকে অমসৃণ ER বলে।

গঠন : এরা দুই স্তরবিশিষ্ট অর্ধভেদ্য ঝিল্লী দিয়ে আবৃত। এরা সাধারণত শাখাবিহীন কিন্তু সমান্তরালভাবেও অবস্থান করতে পারে। নিউক্লিয়ার মেমব্রেন হতে কোষঝিল্লী পর্যন্ত এদের বিস্তৃতি। রাসায়নিকভাবে লাইপোপ্রোটিন দিয়ে এ ঝিল্লী গঠিত। এতে ক্ষুদ্রাকার কণা থাকতে পারে।

কাজ : এরা প্রোটোপ্লাজমের কাঠামো হিসেবে কাজ করে। অমসৃণ রেটিকুলামে প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়। মসৃণ রেটিকুলামে সম্ভবত লিপিড, মতান্তরে বিভিন্ন হরমোন, গ্রাইকোজেন, প্রভৃতি সংশ্লেষিত হয়। এরা লিপিড ও প্রোটিনের অন্তর্বাহক হিসেবে কাজ করে।

রাইবোসোম (Ribosome)

রাইবোসোম অতি ক্ষুদ্র ও গোলাকার অঙ্গাণু। এরা মুক্ত অবস্থায় সাইটোপ্লাজম এবং অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের গায়ে লেগে থাকতে পারে।

গঠন : এরা গোলাকার এবং দুই স্তরবিশিষ্ট ঝিল্লী দিয়ে আবৃত। প্রধানত এরা প্রোটিন দিয়ে তৈরি।

কাজ : রাইবোসোমে বিভিন্ন অ্যামাইনো এসিড অণু যুক্ত হয়ে প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়।

গলজি বস্তু (Golgi bodies)



চিত্র ২.৬ : গলজি বস্তুর গঠন

গল্জি বস্তু চ্যাপ্টা, গোলাকার বা লম্বা হতে পারে। এরা সাধারণত নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি অবস্থান করে। গল্জি নামক বিজ্ঞানী ১৮৯৮ সালে প্রথম পঁচা ও বিড়ালের স্নায়ুকোষে এদের দেখতে পান। তাঁর নামানুসারে পরবর্তীকালে এই অজাগুর নাম রাখা হয় গল্জি বস্তু। উদ্ভিদ কোষে এরা অল্প পরিমাণে থাকে। তাই অণুবীক্ষণ যন্ত্রে সর্বদা দেখা যায় না।

গঠন : গল্জি বস্তু নালিকা, ছোট ফোসকা, গহ্বর, লম্বা চৌবাচ্চা বা ল্যামেলীর ন্যায় হয়ে থাকে। এরা দুই স্তরবিশিষ্ট ঝিল্লী দিয়ে আবদ্ধ ফাঁকা স্থান বিশেষ।

কাজ : এরা লাইসোসোম তৈরি, অ-প্রোটিন জাতীয় পদার্থের সংশ্লেষণ, কিছু এনজাইম নির্গমন, কোষস্থ পানি বের করা, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে প্রস্তুতকৃত দ্রব্যাদি ঝিল্লীবদ্ধ করা প্রভৃতি কাজ করে থাকে।

লাইসোসোম (Lysosome): বিভিন্ন এনজাইম একটি ঝিল্লী দিয়ে আবদ্ধ হয়ে একটি লাইসোসোম তৈরি করে। এরা সাধারণত বৃত্তাকার। এদের ঝিল্লী দু স্তরবিশিষ্ট।

কাজ : এদের কাজ হল ফ্যাগোসাইটোসিস (phagocytosis) বা আক্রমণকারী জীবাণু ভক্ষণ, বিগলনকারী এনজাইমসমূহকে আবদ্ধ রেখে কোষের অন্যান্য অজাগুকে রক্ষা করা এবং পরিপাকে সাহায্য করা।

সেন্ট্রোসোম (Centrosome)

প্রাণিকোষে নিউক্লিয়াসের বাইরে একটি গোলাকার বস্তু দেখা যায়, এটিই সেন্ট্রোসোম। যে তরল পদার্থ দিয়ে এটি গঠিত তাকে সেন্ট্রোস্ফিয়ার (centrosphere) বলে। সেন্ট্রোস্ফিয়ারের কেন্দ্রস্থলে সেন্ট্রিওল (centriole) নামক দুটি বেলুনাকার বস্তু অবস্থিত। কোষ বিভাজনের সময় সেন্ট্রিওল জোড়া আলাদা হয়ে দুই মেরুতে চলে যায়।

কাজ : কোষ বিভাজনের সময় স্পিন্ডল ফাইবারের মেরু নির্দেশ করা এবং বিভাজনে সাহায্য করা।

কোষগহ্বর (Vacuole)

সাইটোপ্লাজমে দৃশ্যত যে ফাঁকা অংশ দেখা যায় তাই কোষগহ্বর। অপরিণত কোষে এদের সংখ্যা অনেক এবং আকারে অত্যন্ত ছোট। কিন্তু পরিণত উদ্ভিদকোষে সবগুলো গহ্বর মিলিতভাবে একটি বড় গহ্বর সৃষ্টি করে। যে পাতলা পর্দা এ গহ্বরকে বেষ্টিত করে থাকে তাকে টোনোপ্লাস্ট (tonoplast) বলে। গহ্বরের অভ্যন্তরের রসকে কোষরস (cell sap) বলে।

কোষরসে পানি, নানা প্রকার অজৈব লবণ, জৈব এসিড, শর্করা, আমিষ, চর্বি, বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ, বিভিন্ন প্রকার রং ইত্যাদি থাকে।

কাজ : কোষরস ধারণ এবং পানির সমতা রক্ষা করা।

৩। নিউক্লিয়াস (Nucleus)

প্রোটোপ্লাজমে যে অধিকতর ঘন ও অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট অঙ্গ দেখা যায় তাই নিউক্লিয়াস। রবার্ট ব্রাউন (Robert Brown) ১৮৩১ সালে অর্কিড পাতার কোষে নিউক্লিয়াস আবিষ্কার ও এর নামকরণ করেন। প্রতি কোষে সাধারণত একটি নিউক্লিয়াস থাকে। কিছু সংখ্যক প্রকৃত কোষ, যেমন- সিঁচ কোষ, স্তন্যপায়ীদের পরিণত লোহিত রক্তকণিকা প্রভৃতিতে নিউক্লিয়াস থাকে না। সাধারণত নিউক্লিয়াস বৃত্তাকার এবং কোষের মধ্যখানে অবস্থান করে। কোষগহ্বর বড় হলে এরা কিনারার দিকে অবস্থান করে। আকার ও আয়তনে নিউক্লিয়াস ছোট বা বড় হতে পারে।

কাজ : নিউক্লিয়াস কোষের সকল কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।

গঠন : রাসায়নিকভাবে এরা মূলত নিউক্লিয়িক এসিড ও প্রোটিন দিয়ে গঠিত। এতে থাকে সাধারণ প্রোটিন, সামান্য DNA এবং RNA, কিছু পরিমাণ কো-এনজাইম ও অন্যান্য উপাদান।

ভৌতভাবে নিম্নলিখিত অংশ নিয়ে এরা গঠিত—
নিউক্লিয়ার মেমব্রেন, নিউক্লিওপ্লাজম,
নিউক্লিওলাস এবং ক্রোমোসোম।

নিউক্লিয়ার মেমব্রেন (Nuclear membrane):
নিউক্লিয়াসের দ্বি-স্তরবিশিষ্ট স্বচ্ছ ঝিল্লি এবং
বহিরাবরণীকে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন বলে। উপরের
স্তরটি ছিদ্রযুক্ত এবং ভিতরের স্তরটি ছিদ্রবিহীন।
রাসায়নিকভাবে ঝিল্লিটি প্রোটিন এবং লিপিড দিয়ে
গঠিত।

কাজ : সাইটোপ্লাজম হতে নিউক্লিওপ্লাজম,
ক্রোমোসোম ও নিউক্লিয়াসকে স্বতন্ত্র রাখাই এর প্রধান
কাজ। অভ্যন্তরীণ দ্রব্য ও বহিঃস্থ সাইটোপ্লাজমের
মধ্যে যোগাযোগও পরিবহণ ঝিল্লীর মাধ্যমে হয়ে
থাকে।

নিউক্লিওপ্লাজম (Nucleoplasm): এরা নিউক্লিয়ার
মেমব্রেন দিয়ে আবৃত স্বচ্ছ ও ঘন তরল পদার্থ।
নিউক্লিওলাস ও ক্রোমোসোম এতে অবস্থান করে।

কাজ : ক্রোমোসোম ধারণ করে এবং নিউক্লিয়াসের
বিভিন্ন জৈবিক কাজে সাহায্য করে।

নিউক্লিওলাস (Nucleolus) : নিউক্লিয়াসে যে
ছোট ও অধিকতর ঘন গোলাকার বস্তু দেখা যায় তাই
নিউক্লিওলাস। প্রতি নিউক্লিয়াসে সাধারণত একটি
নিউক্লিওলাস থাকে। নিউক্লিওলাস সাধারণত নির্দিষ্ট
ক্রোমোসোমের একটি নির্দিষ্ট স্থানে লাগানো থাকে।
ক্রোমোসোমের যে স্থানটিতে এরা লাগানো থাকে সে
স্থানটিকে স্যাটেলাইট বলা হয়।

রাসায়নিক উপাদান : নিউক্লিওলাসের প্রধান রাসায়নিক
উপাদান হল প্রোটিন RNA এবং যৎসামান্য DNA।

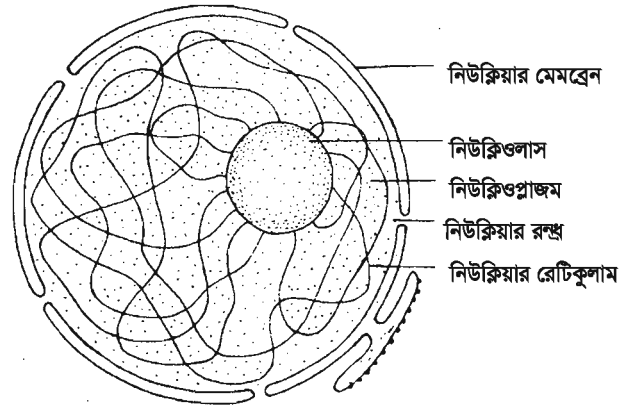
ভৌত গঠন : নিউক্লিওলাসকে সাধারণত তন্তুময়,
দানাদার ও ম্যাট্রিক্স—এই তিন অংশে ভাগ করা যায়।

কাজ : বিভিন্ন প্রকার DNA এবং প্রোটিন সংশ্লেষণ ও সংরক্ষণ করা।

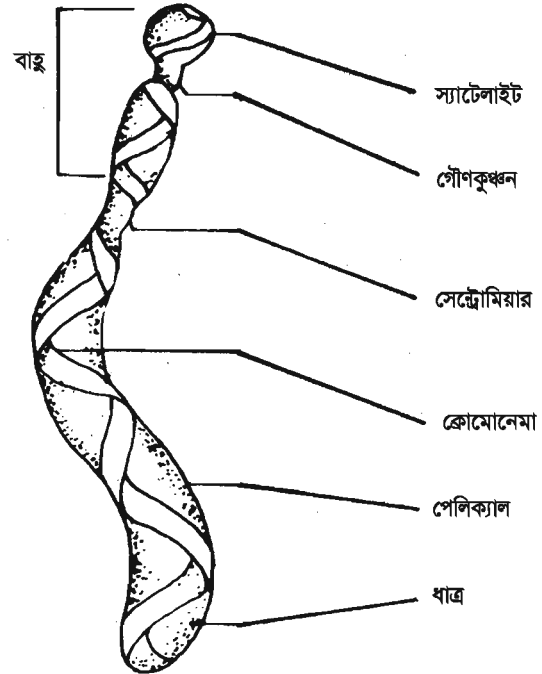
ক্রোমোসোম : প্রত্যেক নিউক্লিয়াসে সাধারণত প্রজাতির বৈশিষ্ট্য অনুসারে নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে।
অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কেবলমাত্র বিভাজনরত কোষেই বিশেষ রঞ্জক পদ্ধতিতে এদের দেখা যায়। প্রতিটি
ক্রোমোসোমে এক বা একাধিক সেন্ট্রোমিয়ার, একটি ক্রোমোনেমা বা একাধিক ক্রোমোনেমাটা এবং কোন কোন
ক্রোমোসোমে স্যাটেলাইট থাকে। ক্রোমোসোমে কতকগুলো জিন থাকে এবং জিনগুলোই প্রজাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য
প্রকাশের জন্য দায়ী।

ক্রোমোসোমের রাসায়নিক গঠন : রাসায়নিকভাবে প্রতিটি ক্রোমোসোম DNA, RNA হিস্টোন ও ননহিস্টোন
প্রোটিন দিয়ে গঠিত; এ ছাড়া কিছু ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়ামও থাকে।

ফর্ম-৩, মাধ্যমিক জীববিজ্ঞান-৯ম



চিত্র ২.৭ : ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে দৃষ্ট নিউক্লিয়াস।



চিত্র ২.৮ : এনাফেজ দশায় দৃশ্যমান ক্রোমোসোমের
একটি কাল্পনিক গঠন চিত্র

কাজ : ক্রোমোসোম বংশগতির বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক।

৪। কোষস্থ জড় বস্তু (Ergastic substance)

পরিণত কোষে উপরিউক্ত বস্তুগুলো ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার জড়বস্তু দেখতে পাওয়া যায়। এরা সাইটোপ্লাজমে অবস্থান করে। জড়বস্তুকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা- সঞ্চিত খাদ্য (reserve food), নিঃসৃত পদার্থ (secretory materials) এবং বর্জ্য (excretory materials) পদার্থ।

উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষের মধ্যে প্রধান প্রধান পার্থক্য

উদ্ভিদকোষ	প্রাণিকোষ
১। অধিকাংশ উদ্ভিদকোষ সেলুলোজ নির্মিত জড় কোষপ্রাচীর দিয়ে বেষ্টিত।	১। প্রাণিকোষে কোষপ্রাচীর নেই, শুধু প্লাজমাঝিল্লী দিয়ে বেষ্টিত।
২। বিভিন্ন প্রকার প্লাস্টিড থাকে।	২। প্লাস্টিড নেই।
৩। সাধারণত এক বা একাধিক কোষগহ্বর থাকে।	৩। কতকগুলো নিম্নশ্রেণীর প্রাণী ব্যতীত অধিকাংশ প্রাণিকোষে কোষগহ্বর থাকে না।
৪। উদ্ভিদকোষে সাধারণত সেন্ট্রোসোম থাকে না।	৪। প্রাণিকোষে সর্বদা সেন্ট্রোসোম থাকে।
৫। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে গলজি বস্তুর উপস্থিতি কম দেখা যায়।	৫। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে প্রায়শ গলজি বস্তু দেখা যায়।
৬। উদ্ভিদকোষে সঞ্চিত খাদ্য মূলত শ্বেতসার।	৬। প্রাণিকোষের সঞ্চিত খাদ্য মূলত গ্লাইকোজেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। নিউক্লিওপ্লাস্ট উদ্ভিদের কোন অঙ্গে অবস্থান করে?

ক. ফুলে

খ. কাণ্ডে

গ. মূলে

ঘ. শাখায়

২। নিউক্লিয়াস সম্পর্কে যথার্থ উক্তি হল, এটি—

i. কোষের কেন্দ্রে অবস্থান করে

ii. কোষ বিভাজন নিয়ন্ত্রণ করে

iii. ক্রোমোসোম ধারণ করে

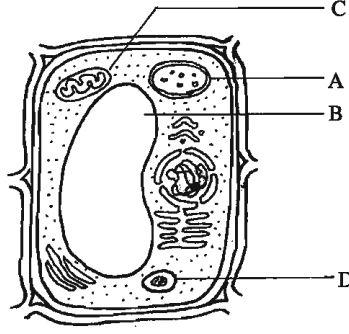
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. i ও iii

ঘ. ii ও iii



ওপরের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৩নং ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

৩। C চিহ্নিত অংশটিতে কোনটি পাওয়া যায়?

- | | |
|-----------------|--------------|
| ক. সেন্ট্রোসোম | খ. অক্সিসোম |
| গ. কোয়ান্টোসোম | ঘ. ক্রোমোসোম |

৪। A চিহ্নিত অঙ্গানুটি জীবকে কীভাবে বাঁচিয়ে রাখতে সহায়তা করে?

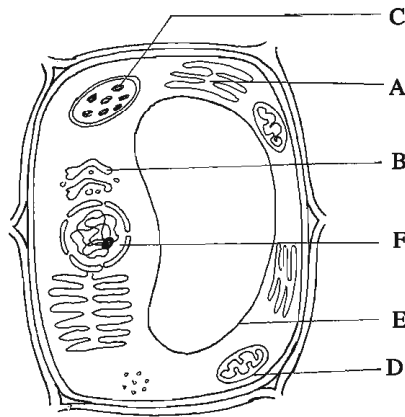
- খাদ্য তৈরি করে
- শ্বসন ক্রিয়া সম্পন্ন করে
- অভিস্রবণ ঘটিয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।



চিত্র-উদ্ভিদ কোষ

- D চিহ্নিত অংশটির নাম কী?
- A এবং B চিহ্নিত অঙ্গানুগুণের মধ্যে ২টি পার্থক্য লিখ।
- E চিহ্নিত অঙ্গানুটির অনুপস্থিতিতে অন্যান্য অঙ্গানুগুণের অবস্থান দেখিয়ে কোষটির চিহ্নিত চিত্র আঁক।
- জীবকোষে C চিহ্নিত অঙ্গানুগুণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

অধ্যায় তিন

কোষ বিভাজন

প্রতিটি জীবদেহ কোষ দিয়ে গঠিত। কোন কোন জীব একটি মাত্র কোষ দিয়ে গঠিত। এদের বলা হয় এককোষী জীব, যেমন- ব্যাকটেরিয়া, অ্যামিবা, প্লাজমোডিয়াম, কতক ছত্রাক ও কতক শৈবাল। কোন কোন জীব একাধিক কোষ দিয়ে গঠিত। এদের বলা হয় বহুকোষী জীব। অনেক বহুকোষী জীব আছে যারা লক্ষ লক্ষ কোষ দিয়ে গঠিত। মানুষ, আম, জাম ইত্যাদি জীব লক্ষ লক্ষ কোষ দিয়ে গঠিত। এককোষী জীবসমূহ কোষ বিভাজনের মাধ্যমে একটি থেকে দুটি, দুটি থেকে চারটি এভাবে বংশবৃদ্ধি করে থাকে। আবার বহুকোষী জীবসমূহের ভ্রূণও কোষ বিভাজনের মাধ্যমে একটি নিষিক্ত ডিম্বক হতে লক্ষ লক্ষ কোষের একটি বিশাল দেহে পরিণত হয়। একটি চারাগাছ কোষ বিভাজনের মাধ্যমেই ক্রমান্বয়ে বড় বৃক্ষে পরিণত হচ্ছে। আবার কোষ বিভাজনের মাধ্যমেই পুং ও স্ত্রী গ্যামেট সৃষ্টি করে নতুন প্রজন্মের জন্ম দিচ্ছে। কিন্তু এসব বিভাজন একই রকম নয়। বিভাজন প্রক্রিয়াও ভিন্ন এবং বিভাজনের ফসলও ভিন্ন।

কোষ বিভাজনের প্রকার

কোষ বিভাজন তিন প্রকার। যথা: ১। অ্যামাইটোসিস (Amitosis); ২। মাইটোসিস (Mitosis) এবং ৩। মিয়োসিস (Meiosis)।

অ্যামাইটোসিস : (Amitosis) : এই কোষ বিভাজন সাধারণত ব্যাকটেরিয়া ঈস্ট প্রভৃতি এককোষী প্রোক্যারিওটিক জীবে দেখা যায়। এ বিভাজনে নিউক্লিয়াসটির নিউক্লিয় সামগ্রী প্রথমে সরাসরি দুই অংশে বিভক্ত হয় এবং পরে কোষটিও মধ্যভাগ বরাবর দু ভাগে বিভক্ত হয়। এর ফলে একটি কোষ থেকে দুটি কোষ সৃষ্টি হয়।

২। মাইটোসিস (Mitosis) : মাইটোসিস এক প্রকার কোষ বিভাজন; যার মাধ্যমে একটি সুকেন্দ্রিক কোষ বিশেষ প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে দুটি কোষে পরিণত হয়। এই বিভাজন প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াস ও ক্রোমোসোম একবার বিভক্ত হয় এবং নতুন সৃষ্ট কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা, গঠন ও গুণাগুণ হুবহু মাতৃকোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা, গঠন ও গুণাগুণ সম্পন্ন হয়। মাইটোসিসকে ইকুয়েশনাল ডিভিশন বা সমীকরণিক বিভাজনও বলা হয়। এ বিভাজন সাধারণত দেহকোষে হয়ে থাকে এবং এ বিভাজনের ফলে প্রাণী ও উদ্ভিদ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বৃদ্ধি পায়। উদ্ভিদের সকল ভাজক কোষে মাইটোসিস হয়।

মিয়োসিস (Meiosis) : মিয়োসিস এক প্রকার কোষবিভাজন যার মাধ্যমে একটি সুকেন্দ্রিক কোষ বিশেষ প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে চারটি কোষে পরিণত হয়। এই বিভাজন প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াস দু বার কিন্তু ক্রোমোসোম একবার বিভক্ত হয় এবং নতুন সৃষ্ট কোষে ক্রোমোসোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোসোম সংখ্যার অর্ধেক হয়। এ বিভাজনে ক্রোমোসোম সংখ্যা অর্ধেক হ্রাস পায় বলে এ প্রক্রিয়াকে হ্রাসমূলক বিভাজনও বলা হয়। গ্রিক শব্দ Meiosis অর্থ হ্রাস করা এবং এর থেকেই মিয়োসিস শব্দের উদ্ভব হয়েছে। এই কোষ বিভাজন ডিপ্লয়েড জীবের মাতৃজনন কোষে হয়। ফলে হ্যাপ্লয়েড গ্যামেট সৃষ্টি হয় অথবা হ্যাপ্লয়েড জীবের জাইগোট কোষে হয়। জীবটি পুনরায় হ্যাপ্লয়েড অবস্থায় ফিরে আসে।

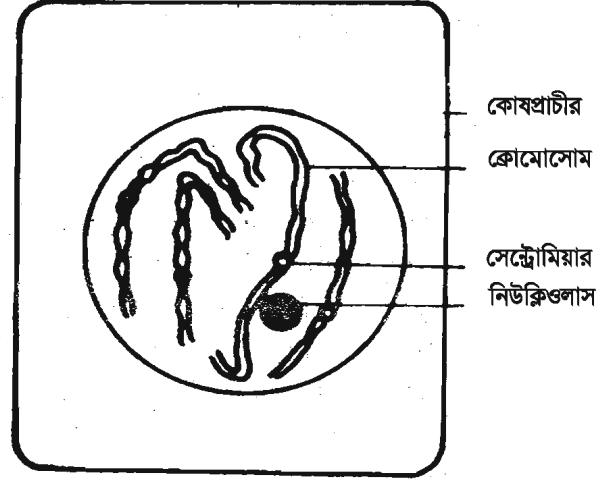
মাইটোসিস বিভাজনের ধাপসমূহ

মাইটোসিস একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। একটি জটিল পরিবর্তনের মাধ্যমে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। জটিল পরিবর্তনের

ধারা ও ধাপ অনুযায়ী এ ধারাবাহিক প্রক্রিয়াকে সাধারণত পাঁচটি ধাপে বিভক্ত করা হয়।
ধাপগুলো হল :

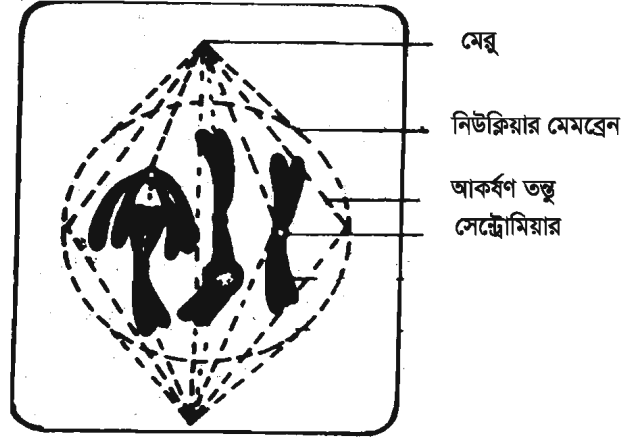
১। প্রোফেজ ২। প্রো-মেটাফেজ, ৩। মেটাফেজ, ৪। এনাফেজ এবং ৫। টেলোফেজ।

১। **প্রোফেজ (Prophase)** : বিভাজনের এ ধাপে কোষের নিউক্লিয়াস আকারে বড় হয়। ক্রোমোসোম থেকে পানি হ্রাস পেতে থাকে। ফলে ক্রোমোসোমগুলো ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হয়ে খাট ও মোটা হয়। তখন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এদের দেখা সম্ভব হয়। এ ধাপের শেষে নিউক্লিওলাস এবং নিউক্লিয়ার মেমব্রেন বিলুপ্ত হয়।



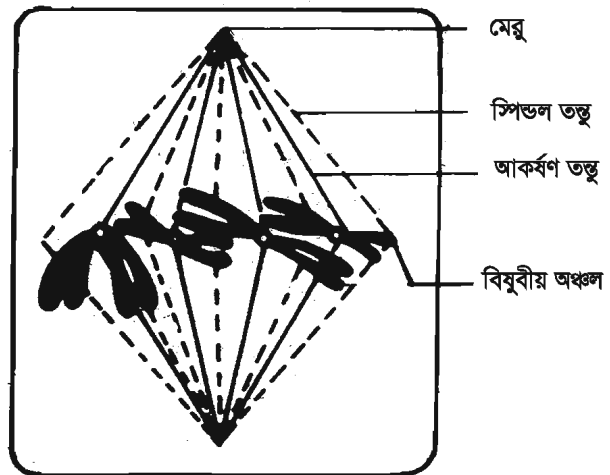
প্রোফেজ

২। **প্রো-মেটাফেজ (Prometaphase)** : এ ধাপে তত্ত্বময় প্রোটিনের সমন্বয়ে কোষে দু মেরুযুক্ত মাকু বা স্পিন্ডল যন্ত্রের সৃষ্টি হয়। প্রতিটি ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ার স্পিন্ডল যন্ত্রের (Spindle apparatus) একটি তন্তুর সাথে সংযুক্ত হয়। স্পিন্ডল যন্ত্রের প্রতিটি তন্তুকে স্পিন্ডল তন্তু বলে। যে তন্তুর সাথে সেন্ট্রোমিয়ার সংযুক্ত হয় তাকে ট্র্যাকশন তন্তু (traction fibre) বা আকর্ষণ তন্তু বলা হয়। ক্রোমোসোমের সাথে সংযুক্ত বলে এদের ক্রোমোসোমাল তন্তুও বলা হয়। প্রাণিকোষে দুই মেরুতে অবস্থিত সেন্ট্রিওল হতে অ্যাস্টার তন্তু বিচ্ছুরিত হয়।



প্রো-মেটাফেজ

৩। **মেটাফেজ (Metaphase)**: ক্রোমোসোমগুলো স্পিন্ডল যন্ত্রের বিষুবীয় অঞ্চলে (দুই মেরুর মধ্যখানে) অবস্থান করে। প্রতিটি ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ার বিষুব অঞ্চলে এবং বাহু দুটি মেরুমুখী হয়ে অবস্থান করে। এ পর্যায়ে ক্রোমোসোমগুলো সর্বাধিক মোটা ও খাট হয়। ক্রোমোসোমের দুটি ক্রোমাটিড স্পষ্ট হয় এবং সেন্ট্রোমিয়ার দুটি খণ্ডে বিভক্ত হয়।

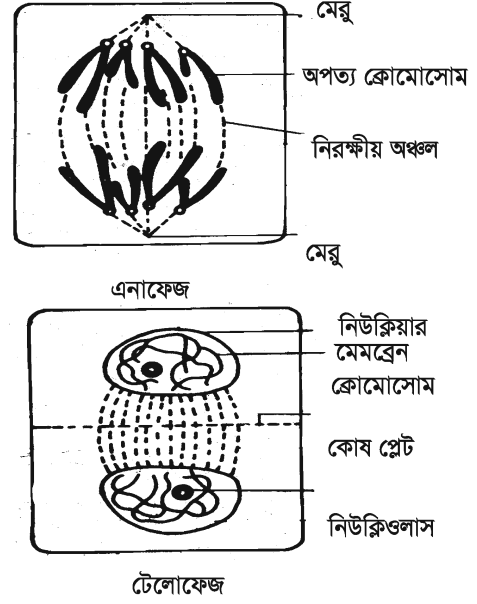


মেটাফেজ

৪। **এনাফেজ (Anaphase)** : প্রতিটি ক্রোমোসোমের দুটি আলাদা ক্রোমাটিড স্পিন্ডল যন্ত্রের দু বিপরীত মেরুর দিকে অগ্রসর হয়। ক্রোমাটিড তথা অপত্য ক্রোমোসোমের এ মেরুমুখী চলনে সেন্ট্রোমিয়ার অগ্রগামী এবং

বাহুদ্বয় অনুগামী হয়। অপত্য ক্রোমোসোমগুলো মেরুর কাছাকাছি পৌঁছালে এনাফেজ ধাপের সমাপ্তি ঘটে।

৫। টেলোফেজ (Telophase) : অপত্য ক্রোমোসোমগুলো দু'বিপরীত মেরুতে অবস্থান নেয়। ক্রোমোসোমগুলো পুনরায় পানি শোষণ করে ক্রমান্বয়ে প্রসারিত হয়ে সরু ও লম্বা হয়। ক্রোমোসোমের চারদিক ঘিরে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন সৃষ্টি হয় এবং স্যাট ক্রোমোসোমের গৌণকুণ্ডলে নিউক্লিওলাসের আবির্ভাব ঘটে। এক পর্যায়ে স্পিন্ডল যন্ত্র অদৃশ্য হয়ে যায়। এ ধাপের শেষের বিষুবীয় অঞ্চল বরাবর ধীরে ধীরে একটি কোষপ্রাচীর গঠিত হয়, ফলে মাতৃকোষটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে দুটি নতুন অপত্য কোষে পরিণত হয়। প্রাণিকোষে কোষপ্রাচীর গঠনের পরিবর্তে কোষঝিল্লীটি চারদিকে থেকে ঢুকে যায় এবং কোষটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়।



মাইটোসিস-এর গুরুত্ব

জীবকুলে মাইটোসিস প্রক্রিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। এখানে কয়েকটি গুরুত্বের কথা উল্লেখ করা হল।

- ১। **দৈহিক বৃদ্ধি :** মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে জীবের দৈহিক বৃদ্ধি হয়। এককোষী ভূণ লক্ষ লক্ষ কোষের একটি পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত হয়। ছোট একটি ভূণ সুবিশাল বটবৃক্ষে পরিণত হয়।
- ২। **ক্রোমোসোমের সমতা রক্ষা :** এ বিভাজনের মাধ্যমে বহুকোষী জীবদেহের সকল কোষে একই সংখ্যক ও একই গুণসম্পন্ন ক্রোমোসোম বিতরণ নিশ্চিত হয়।
- ৩। **নির্দিষ্ট আয়তন রক্ষা :** এ বিভাজনের ফলে কোষের নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন বজায় থাকে।
- ৪। **ক্ষতিপূরণ :** এ বিভাজনের মাধ্যমে নতুন কোষ সৃষ্টি হয়ে বহুকোষী জীবের বিভিন্ন প্রকার ক্ষতিপূরণ হয়।
- ৫। **জননাজ্ঞ সৃষ্টি :** এ বিভাজনের মাধ্যমেই বহুকোষী জীবের জননাজ্ঞ সৃষ্টি হয়। ফলে বংশবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকে।
- ৬। **গুণগত স্থিতিশীলতা :** এ বিভাজনের মাধ্যমে জীবজগতের গুণগত স্থিতিশীলতা রক্ষা হয়।

অস্বাভাবিক কোষ বিভাজন

টিউমার, ক্যান্সার— এ শব্দগুলোর সাথে আমরা সবাই পরিচিতি। এগুলো অস্বাভাবিক কোষ বিভাজনের ফসল। মাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় একটি থেকে দুটি, দুটি থেকে চারটি এভাবে কোষের সংখ্যা বাড়তে থাকে। কিন্তু কোষ বিভাজন প্রক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রিত থাকে। কোন কারণে এই নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হয়ে গেলে অস্বাভাবিকভাবে কোষ বিভাজন চলতে থাকে। এর ফলে টিউমার সৃষ্টি হয়।

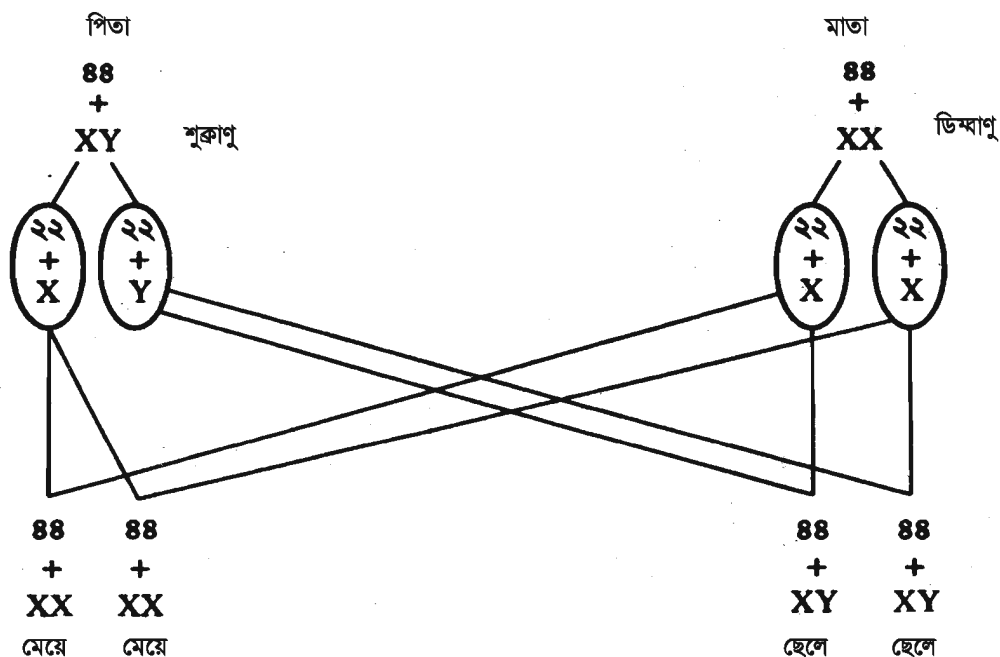
ক্যান্সার কোষও এই নিয়ন্ত্রণহীন অস্বাভাবিক কোষ বিভাজনেরই ফসল। গবেষণায় দেখা গেছে বিভিন্ন প্রকার প্যাপিলোমা ভাইরাস ক্যান্সার কোষ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। এ ভাইরাসের ই৬ এবং ই৭ নামের দুটি জিন এমন কিছু রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টি করে, যা কোষ বিভাজন নিয়ন্ত্রক দুটি প্রোটিন অণুকে স্থানচ্যুত করে। এর ফলে কোষ বিভাজনের নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হয়ে যায়, সৃষ্টি হয় অর্বদ। অনেক সময় এ দুটি জিন পোষক কোষের জিনের সাথে একীভূত হয়ে যায় এবং কোষের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণকারী প্রোটিন অণুসমূহের কাজ বন্ধ করে দেয়। সৃষ্টি হয় ক্যান্সার কোষ তথা ক্যান্সার।

ক্যান্সার একটি মারাত্মক রোগ। প্রতি বছর কেবলমাত্র জরায়ুর ক্যান্সারেই পৃথিবীতে পাঁচ থেকে ছয় লক্ষ রোগী মারা যায়। ক্যান্সার হয় লিভারে, ফুসফুসে, মস্তিষ্কে, স্তনে, ত্বকে অর্থাৎ দেহের প্রায় সকল অঙ্গে। এখনও ক্যান্সার প্রতিরোধের ভাল ওষুধ আবিষ্কৃত হয়নি।

স্ত্রী-পুরুষ নির্ধারক ক্রোমোসোম : প্রতিটি জীবে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। মানুষের ২৩ জোড়া ক্রোমোসোম আছে। এর মধ্যে ২২ জোড়া স্ত্রী ও পুরুষে একই রকম। এরা হল অটোসোম (autosome)। অবশিষ্ট এক জোড়া ক্রোমোসোমের সদস্য স্ত্রী ও পুরুষে পৃথক ধরনের হয়। এই এক জোড়া ক্রোমোসোমই মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ (স্ত্রী হবে, না পুরুষ হবে) করে। লিঙ্গ নির্ধারণ করে বলে এই ক্রোমোসোমকে **সেক্স ক্রোমোসোম** বা **লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোসোম** বলা হয়। সেক্স ক্রোমোসোম—এর একটি হল X ক্রোমোসোম এবং অন্যটি হল Y ক্রোমোসোম। সেক্স ক্রোমোসোম যদি XY হয়, তা হলে সন্তানটি পুরুষ (ছেলে) হবে, আর যদি XX হয়, তাহলে সন্তানটি স্ত্রী (মেয়ে) হবে। ড্রোসোফিলা নামক প্রাণীতেও XX হলে স্ত্রী হয় এবং XY হলে পুরুষ হয়। কাজেই লিঙ্গ নির্ধারণে X এবং Y ক্রোমোসোমের ভূমিকাই মুখ্য।

সন্তান ছেলে হবে কী মেয়ে হবে?

সন্তান ছেলে হবে, কী মেয়ে হবে তার জন্য পুরুষ দায়ী হবে, না স্ত্রী দায়ী হবে তা আমরা সহজে বুঝতে পারি। স্ত্রী এবং পুরুষ উভয় ক্ষেত্রেই ৪৪টি অটোসোম এবং এক জোড়া সেক্স ক্রোমোসোম থাকে। স্ত্রীর সেক্স ক্রোমোসোম হল XX এবং পুরুষের সেক্স ক্রোমোসোম হল XY। পুরুষের গ্যামেট (শুক্রাণু) X এবং Y ক্রোমোসোম বহন করবে। কিন্তু স্ত্রীর গ্যামেট (ডিম্বাণু) হবে X এবং X। স্ত্রীর X ডিম্বাণুর সাথে যদি পুরুষের Y শুক্রাণুর মিলন হয়, তবে সন্তান হবে XY অর্থাৎ ছেলে। দেখা যাচ্ছে Y ক্রোমোসোম না থাকলে কখনো ছেলে হবে না। স্ত্রীতে কোন Y ক্রোমোসোম থাকে না, Y ক্রোমোসোম থাকে কেবল পুরুষেই। কাজেই কোন দম্পতির যদি কোন ছেলে সন্তান না হয় তার জন্য স্বামীই সম্পূর্ণ দায়ী, স্ত্রী কোন ক্রমেই দায়ী নয়। একটি ছকের সাহায্যে এটিকে দেখানো যায়—



সন্তান ছেলে অথবা মেয়ে হবার কারণ এবং এতে সেক্স ক্রোমোসোমের ভূমিকা কী তা তোমরা জেনেছ। এবার নিচের ছকটি পূরণ কর। কোন সন্তান ছেলে হবে এবং কোন সন্তান মেয়ে হবে তা লেখ।

♀ মা	♂ বাবা	X	Y	X	Y
X		XX মেয়ে			XY ছেলে
X					
X					
X					

বহুকোষী উদ্ভিদের শ্রম বণ্টন : টিস্যু এবং টিস্যুতন্ত্র

টিস্যু টিস্যুতন্ত্র (Tissue)

এককোষী জীবের সব কাজ একটিমাত্র কোষই সম্পন্ন করে থাকে। কোষভিত্তিক কাজ ভাগ করে নেবার বা শ্রম বণ্টনের কোন সুযোগ এখানে নেই। অপরদিকে বহুকোষী জীবে একটি শ্রম বণ্টন ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। এসব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একগুচ্ছ কোষ খাদ্য তৈরি করে, একগুচ্ছ কোষ খাদ্য সঞ্চয় করে, একগুচ্ছ কোষ খাদ্যের উপাদান আনা-নেয়া করে, একগুচ্ছ কোষ কোন অঙ্গকে দৃঢ়তা প্রদান করে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় একগুচ্ছ কোষ একই উৎস থেকে উৎপত্তি লাভ করে নিবিড়ভাবে একই স্থানে অবস্থান করছে এবং মিলিতভাবে একই কাজ সম্পন্ন করছে। এ ধরনের কোষগুচ্ছকে বলা হয় টিস্যু (tissue)। বহুকোষী জীবে শ্রমবিভাগই টিস্যু সৃষ্টির প্রধান কারণ।

টিস্যুর প্রকারভেদ : কোন কোন টিস্যুর কোষসমূহ বিভাজনক্ষম আবার কোন কোন টিস্যুর কোষসমূহ বিভাজন ক্ষমতাহীন। বিভাজন ক্ষমতা অনুসারে টিস্যু দু প্রকার। যথা: ১। ভাজক টিস্যু এবং ২। স্থায়ী টিস্যু।

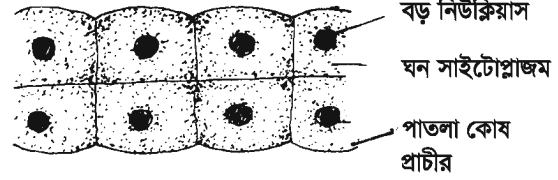
১। ভাজক টিস্যু (Meristematic tissue) :

ভাজক কোষ দিয়ে ভাজক টিস্যু গঠিত। এ টিস্যুর কোষগুলো বার বার বিভক্ত হয়, ফলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি হয়। ভাজক টিস্যু হতেই অন্যান্য স্থায়ী টিস্যু সৃষ্টি হয়।

ভাজক টিস্যুর বৈশিষ্ট্য

ভাজক টিস্যুর কোষগুলোর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ –

- ১। কোষগুলো বিভাজন ক্ষমতা সম্পন্ন।
- ২। কোষগুলো সাধারণত আয়তাকার বা ডিম্বাকার।
- ৩। কোষপ্রাচীর সেলুলোজ নির্মিত এবং পাতলা।
- ৪। কোষের নিউক্লিয়াস অপেক্ষাকৃত বড় এবং সাইটোপ্লাজম ঘন।
- ৫। কোষে সাধারণত কোন কোষ গহবর থাকে না।
- ৬। ভাজক কলার কোষগুলোর মাঝে সাধারণত কোন আন্তঃকোষীয় ফাঁক থাকে না। অর্থাৎ এরা অত্যন্ত নিবিড়ভাবে অবস্থিত।



চিত্র ৪.১ : ভাজক টিস্যু

ভাজক টিস্যু মূল ও কাণ্ডের শীর্ষে অবস্থিত। অবস্থান অনুযায়ী এরা **শীর্ষস্থভাজক টিস্যু (Apical meristems)**। উৎপত্তি অনুসারে এরা **প্রাথমিক ভাজক টিস্যু (Primary meristems)**। কারণ ভ্রূণ অবস্থায়ই এদের উৎপত্তি হয়। এ টিস্যুর কোষগুলোর বিভাজনের ফলে মূল ও কাণ্ড দৈর্ঘ্যে বাড়তে থাকে।

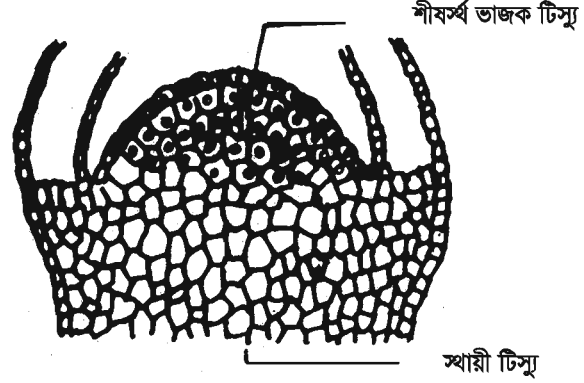
নগ্নবীজী উদ্ভিদ এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের পরিণত মূল ও কাণ্ডের অভ্যন্তরে নতুন করে টিস্যুর সৃষ্টি হয়। স্থায়ী টিস্যু হতে এদের উৎপত্তি হয় বলে এদের বলা হয় **সেকেন্ডারি ভাজক টিস্যু (Secondary meristems)**। অবস্থান অনুযায়ী এরা **পার্শ্বীয় ভাজক টিস্যু (Lateral meristem)**। এ টিস্যুর কোষগুলো বিভাজনের ফলে মূল ও কাণ্ডের বেড় বাড়তে থাকে অর্থাৎ মূল ও কাণ্ড ক্রমান্বয়ে মোটা হয়।

২। স্থায়ী টিস্যু (Permanent tissue) :

স্থায়ী টিস্যু গঠনকারী কোষগুলো বিভাজনে অক্ষম। এ কারণেই এ টিস্যুকে স্থায়ী টিস্যু বলা হয়। ভাজক টিস্যু হতেই এদের উৎপত্তি হয়। ভাজক টিস্যু ছাড়া বাকি সব টিস্যুই স্থায়ী টিস্যু।

স্থায়ী টিস্যুর বৈশিষ্ট্য :

- ১। এ টিস্যুর কোষগুলো বিভাজন ক্ষমতাহীন।
- ২। কোষগুলো পূর্ণভাবে বিকশিত এবং সঠিক আকৃতি প্রাপ্ত।
- ৩। কোষপ্রাচীর অপেক্ষাকৃত পুরু।
- ৪। নিউক্লিয়াস অপেক্ষাকৃত ছোট এবং সাইটোপ্লাজম কম।
- ৫। সাধারণত কোষে কোষ গহবর থাকে।
- ৬। কোষগুলোর মাঝে আন্তঃকোষীয় ফাঁক থাকতে পারে।



চিত্র ৪.২ : কাষ্ঠ শীর্ষে ভাজক টিস্যু

স্থায়ী টিস্যুর প্রকারভেদ :

স্থায়ী টিস্যু তিন প্রকার। যথা : (ক) সরল টিস্যু, (খ) জটিল টিস্যু এবং (গ) ক্ষরণকারী টিস্যু।

(ক) সরল টিস্যু (Simple tissue) : একই প্রকার কোষ নিয়ে গঠিত টিস্যুই সরল টিস্যু। সরল টিস্যু তিন প্রকার, যথা:

প্যারেনকাইমা (Parenchyma) : প্যারেনকাইমা টিস্যুর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

- কোষগুলো দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতায় মোটামুটিভাবে একই রকম।
- কোষগুলো গোলাকার, ডিম্বাকার বা বহুভুজাকৃতির হয়।
- কোষপ্রাচীর সমভাবে পুরু।
- কোষগুলো সজীব এবং এতে প্রচুর প্রোটোপ্লাজম থাকে।
- পাশাপাশি কোষের মাঝে আন্তঃকোষীয় ফাঁক থাকতে পারে।

প্যারেনকাইমা টিস্যুতে ক্লোরোফিল থাকলে তাকে ক্লোরেনকাইমা (chlorenchyma) বলা হয়। পাতার ক্লোরেনকাইমাকে মেসেফিল (mesophyll) বলে। জলীয় উদ্ভিদের বড় বড় বায়ু কুঠুরিযুক্ত প্যারেনকাইমাকে অ্যারেনকাইমা (aerenchyma) বলা হয়।

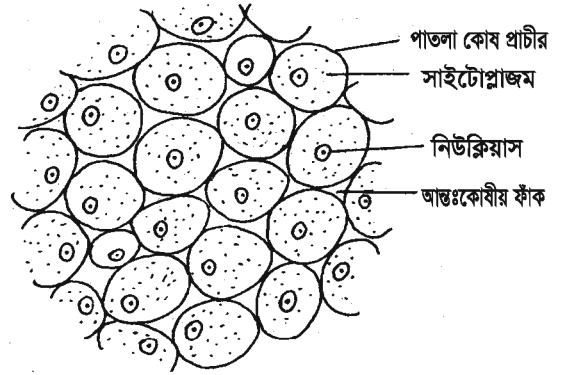
কাজ

- ক্লোরেনকাইমা খাদ্য প্রস্তুত করে।
- খাদ্য পরিবহণে সাহায্য করে।
- খাদ্য সঞ্চয় করে রাখে।
- ত্বকের প্যারেনকাইমা প্রতিরক্ষার কাজ করে।

অবস্থান : সাধারণত মজ্জা, মজ্জারশ্মি, ত্বক, এবং কর্টেক্স-এর অধিকাংশ অংশ এ টিস্যু দিয়ে গঠিত।

কোলেনকাইমা (Collenchyma) : কোলেনকাইমা টিস্যুর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

- কোষসমূহ কিছুটা লম্বাকৃতির।
- কোষ সজীব এবং প্রোটোপ্লাজম যুক্ত।
- কোষপ্রাচীর অসমভাবে পুরু, প্রাচীরের কোণ অধিক পুরু।



চিত্র ৪.৩ : প্যারেনকাইমা টিস্যু

- পাশাপাশি কোষের মাঝে আন্তঃকোষীয় ফাঁক থাকতে পারে।

কাজ ● ক্লোরোফিলযুক্ত হলে খাদ্য প্রস্তুত করে।

- বর্ধিষ্ণু অঙ্গে দৃঢ়তা প্রদান করে।

অবস্থান : ত্বকের নিচে, পাতার বোঁটা শিরায় এবং ফুলের বোঁটায়।

স্কেলেনকাইমা (Sclerenchyma) : স্কেলেনকাইমা টিস্যুর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

- কোষসমূহ লম্বা আকৃতির, প্রান্ত দুটো সরু,
- কোষপ্রাচীর লিগনিন যুক্ত হয়ে বেশ পুরু হয়, প্রাচীর সমান পুরুত্ব বিশিষ্ট হয়।
- পরিপক্ব কোষগুলো মৃত এবং নিউক্লিয়াস ও প্রোটোপ্লাজমবিহীন।

- প্রস্থচ্ছেদে কোষসমূহ বহুভুজাকৃতি।

কাজ ● উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গকে দৃঢ়তা প্রদান করাই এ টিস্যুর প্রধান কাজ।

- মৃত কোষ অনেক সময় গাছের বর্জ্য পদার্থ ধারণ করে।
- কখনো কখনো বাইরে শক্ত আবরণ সৃষ্টি করে ভিতরের নরম অংশ রক্ষা করে (যেমন- নারিকেল ও তালের বীজের আবরণ)।

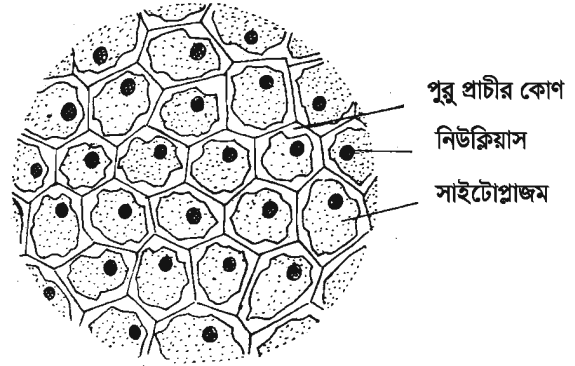
অবস্থান : কটেক্স, জাইলেম, ফ্লোয়েম, পেরিসাইকল

(খ) **জটিল টিস্যু (Complex tissue) :** একাধিক প্রকার কোষ দিয়ে গঠিত টিস্যুই জটিল টিস্যু। জটিল টিস্যু দু প্রকার, যথা: জাইলেম টিস্যু এবং ফ্লোয়েম টিস্যু।

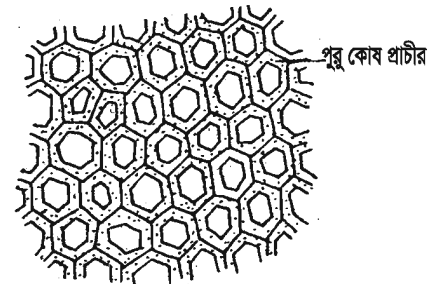
জাইলেম টিস্যু (Xylem tissue) : ট্রাকিড, ভেসেল (Trachea), জাইলেম ফাইবার এবং জাইলেম প্যারেনকাইমা-এ চার প্রকারের কোষ নিয়ে জাইলেম টিস্যু গঠিত।

● **ট্রাকিড (Tracheid) :** কোষগুলো মৃত, লম্বা, তির্যক প্রান্তবিশিষ্ট, বড় গহবরযুক্ত; প্রাচীর শক্ত, দৃঢ় ও লিগনিন যুক্ত। দৃঢ়তা প্রদান করা পানি ও দ্রবীভূত খনিজ লবণ মূল হতে পাতায় পরিবহণ করা এ কোষের কাজ।

● **ভেসেল (Vessel বা trachea) :** কোষগুলো মোটা, খাট, একাধিক কোষ মাথায় মাথায় যুক্ত হয়ে একটি লম্বা ফাঁপা নালিকার সৃষ্টি করে। পানি ও পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণ মূল হতে পাতায় পরিবহণ করা এ কোষসমূহের কাজ।



চিত্র ৪.৪: কোলেনকাইমা টিস্যু



প্রস্থচ্ছেদ

চিত্র ৪.৫: স্কেলেনকাইমা টিস্যু

● **জাইলেম ফাইবার**– স্ক্লেরেনকাইমা জাতীয় কোষ। দৃঢ়তা প্রদান করাই এর কাজ।

● **জাইলেম প্যারেনকাইমা**– প্যারেনকাইমা জাতীয় কোষ। খাদ্য সঞ্চয় ও খাদ্য পরিবহণ এ কোষের কাজ।

জাইলেম টিস্যুর কাজ হল; উদ্ভিদ অঙ্গকে দৃঢ়তা প্রদান করা, পানি ও অন্যান্য খাদ্য উপাদান পরিবহণ করা, খাদ্য পরিবহণ ও খাদ্য সঞ্চয় করা।

ফ্লোয়েম টিস্যু (Phloem tissue) : সীভনল, সঙ্গীকোষ, ফ্লোয়েম ফাইবার এবং ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা–এ চার প্রকার কোষ নিয়ে ফ্লোয়েম টিস্যু গঠিত।

● **সীভনল (Sieve tube) :** কোষগুলো লম্বা; এর ফাঁপা, একটির মাথায় আর একটি বসে লম্বা নলের সৃষ্টি করে। মাথায় মাথায় যুক্ত দুটি সীভকোষের মধ্য প্রাচীর ছোট ছোট ছিদ্রযুক্ত। ছিদ্রযুক্ত এ প্রাচীরকে **সীভপ্লেট** বলে। পরিণত সীভনলে নিউক্লিয়াস থাকে না। পাতায় তৈরি খাদ্যদ্রব্য পরিবহণ করাই এর কাজ।

● **সঙ্গীকোষ (companion cell) :** এটি প্যারেনকাইমা জাতীয় সরু ও লম্বা কোষ এবং সবসময় সীভনলের সাথে অবস্থান করে। এর সাইটোপ্লাজম ঘন এবং নিউক্লিয়াস বড়। প্রাচীরের ছিদ্র দিয়ে সীভনলের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। খাদ্য পরিবহণে সীভনলকে সহায়তা করাই এর কাজ।

● **ফ্লোয়েম ফাইবার :** এটি স্ক্লেরেনকাইমা জাতীয় কোষ। ফ্লোয়েম ফাইবার বাস্ট ফাইবার নামেও পরিচিত। দৃঢ়তা প্রদান করাই এর কাজ।

● **ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা :** এটি প্যারেনকাইমা জাতীয় কোষ। খাদ্য সঞ্চয় ও পরিবহণে সাহায্য করাই এর কাজ।

ফ্লোয়েম টিস্যুর কাজ :

● পাতায় প্রস্তুতকৃত খাদ্য গাছের বিভিন্ন অংশে পরিবহণ করাই এ টিস্যুর প্রধান কাজ।

● অঙ্গকে দৃঢ়তা প্রদান করে।

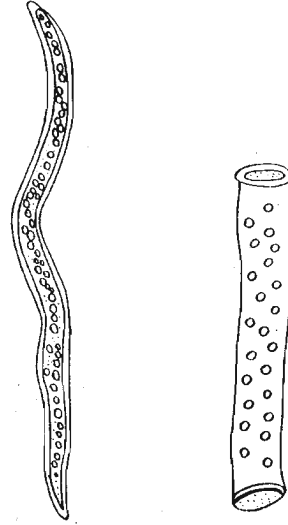
● প্রয়োজনে কিছু পরিমাণ খাদ্য সঞ্চয় করে।

জটিল টিস্যুর গুরুত্ব

শারীরবৃত্তীয় ও অর্ধনৈতিক দিক থেকে জটিল টিস্যু বেশ গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভিদের মূল থেকে কাণ্ড ও তার শাখা–প্রশাখা হয়ে শিরা–উপশিরার মাধ্যমে পাতা পর্যন্ত জটিল টিস্যু অবিচ্ছেদ্যভাবে অবস্থিত।

শারীরবৃত্তীয় গুরুত্ব

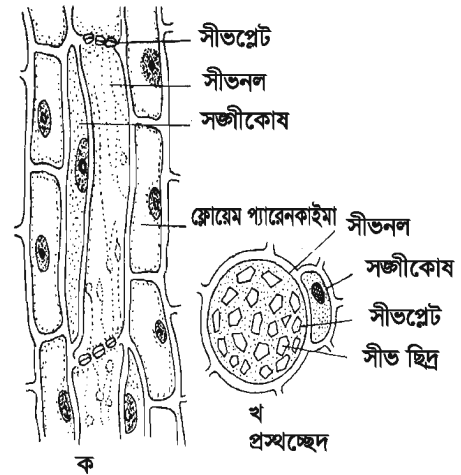
খাদ্য তৈরির কাঁচামাল পাতায় পাঠান এবং পাতা থেকে তৈরিকৃত খাদ্য পুনরায় প্রতিটি সজীব কোষে পৌঁছানোর কাজটি করে থাকে জটিল টিস্যু। খাদ্যের কাঁচামাল ও প্রস্তুতকৃত খাদ্য পরিবহণের কাজ করে বলে এ টিস্যুর অপর নাম পরিবহণ টিস্যু।



ট্রাকিড

ভেসেল

চিত্র ৪.৬ : জাইলেম টিস্যু



চিত্র ৪.৭ : ফ্লোয়েম টিস্যু

- খাদ্য তৈরি ছাড়াও বহু বিক্রিয়ায় পানির প্রয়োজন হয়। ঐ পানি মূলের জাইলেম নামক জটিল টিস্যুর মাধ্যমে উপরের কাণ্ডে প্রবাহিত হয়।
- পানির সাথে দ্রবীভূত খনিজ লবণও জাইলেম টিস্যুর মাধ্যমে উপরে প্রবাহিত হয়।
- প্রস্বেদন প্রক্রিয়ার জন্য যে পানির প্রয়োজন হয় তা জাইলেম টিস্যুর মাধ্যমেই পাতায় পৌঁছায়।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

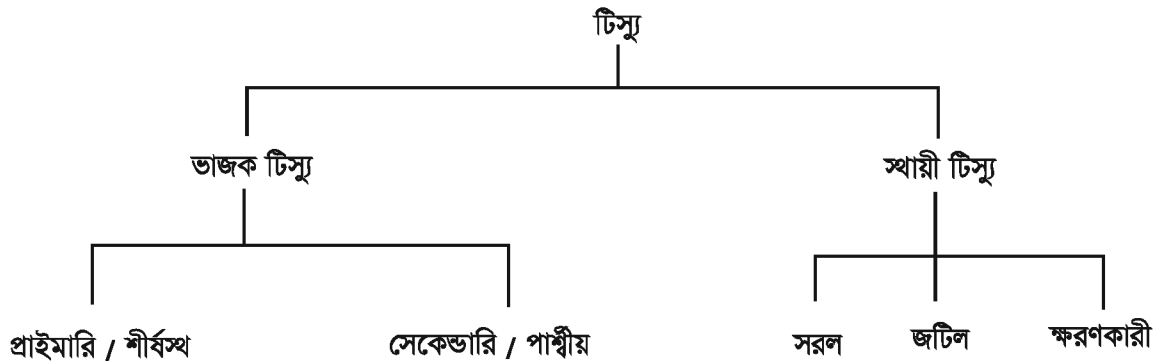
বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অর্থকরী ফসল হল পাট তথা পাটের আঁশ। পাটের আঁশ হল সেকেন্ডারি ফ্লোয়েম ফাইবার অর্থাৎ বাস্ট ফাইবার।

বাড়িঘর নির্মাণে, আসবাবপত্র তৈরিতে, জ্বালানি হিসেবে, নৌকা তৈরিতে, বাদ্যযন্ত্র তৈরিতে ইত্যাদি যাবতীয় কাজে আমরা যে কাঠ ব্যবহার করি তা হল সেকেন্ডারি জাইলেম।

- (গ) **ক্ষরণকারী টিস্যু (Secretory tissue)** : যে টিস্যু হতে নানা প্রকার তরল পদার্থ নিঃসৃত হয় তা হল ক্ষরণকারী টিস্যু। রজন, আঠা, রবার, ইত্যাদি ক্ষরণকারী টিস্যু হতে পাওয়া যায়। ক্ষরণকারী টিস্যু দু প্রকার যথা- তরুক্ষীর টিস্যু ও গ্রন্থি টিস্যু।

তরুক্ষীর টিস্যু (Laticiferous tissue) : তরুক্ষীর (Latex) এক প্রকার সাদা, হলুদ অথবা বর্ণহীন তরল পদার্থ। এতে শর্করা, আমিষ, আঠা, চর্বি প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে। শিয়ালকাঁটা, কলা, রবার, আফিম, আকন্দ, ছাতিম প্রভৃতি গাছ হতে তরুক্ষীর পাওয়া যায়।

গ্রন্থি টিস্যু (Glandular tissue) : গ্রন্থি টিস্যু থেকে সাধারণত মধু, উৎসেচক, আঠা, রজন, তেল প্রভৃতি পাওয়া যায়।



- (১) প্যারেনকাইমা (১) জাইলেম (১) তরুক্ষীয়
(২) কোলেনকাইমা (২) ফ্লোয়েম (২) গ্রন্থি
(৩) স্ক্লেরেনকাইমা

টিস্যুতন্ত্র (Tissue system)

একই কাজ করে এমন এক বা একাধিক টিস্যু মিলে একটি টিস্যুতন্ত্র গঠিত হয়। টিস্যুতন্ত্রকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা: ১। ত্বকীয় টিস্যুতন্ত্র, ২। ভিত্তি টিস্যুতন্ত্র এবং ৩। পরিবহণ টিস্যুতন্ত্র।

১। ত্বকীয় টিস্যুতন্ত্র (Epidermal tissue system) : মূল, কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা, পাতা, ফল এসব উদ্ভিদ অঙ্গের ত্বক (বহিরাবরণ) এ টিস্যুতন্ত্রে গঠিত। সাধারণত একসারি ঘন সন্নিবেশিত প্যারেনকাইমা কোষই ত্বকীয় টিস্যুতন্ত্র গঠন করে। ত্বকতন্ত্রে এককোষী বা বহুকোষী রোম থাকতে পারে।

কাজ : অভ্যন্তরীণ অংশকে রক্ষা করা।

২। ভিত্তি টিস্যুতন্ত্র (Ground tissue system) : এটি হল মূল বা কাণ্ডের প্রধান টিস্যুতন্ত্র। ভিত্তি টিস্যুতন্ত্রকে বহিঃমজ্জা বা কর্টেক্স এবং অন্তঃমজ্জা—এ দুটো অংশে ভাগ করা হয়। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ কাণ্ডের কর্টেক্স অধঃত্বক, সাধারণ বহিঃমজ্জা এবং অন্তঃত্বক নিয়ে গঠিত। পরিচক্রের ভিতরে মজ্জা ও মজ্জারশ্মি নিয়ে অন্তঃমজ্জা গঠিত।

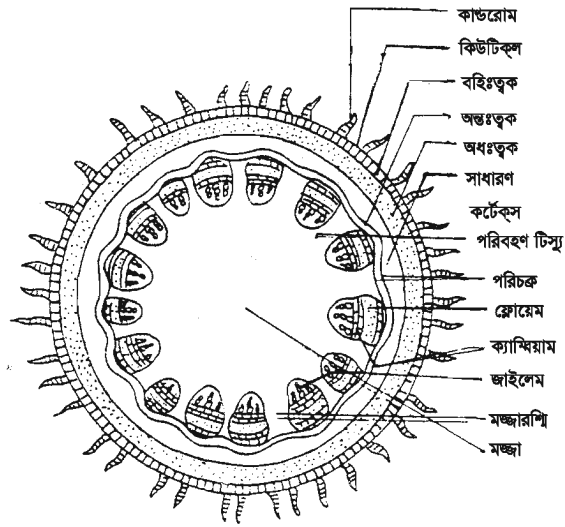
কাজ : কাণ্ডকে দৃঢ়তা প্রদান করা, খাদ্য সঞ্চয় করা এ টিস্যুতন্ত্রের কাজ।

৩। পরিবহণ টিস্যুতন্ত্র (Vascular tissue system) : জাইলেম ও ফ্লোয়েম নামক জটিল টিস্যুর সমন্বয়ে পরিবহণ টিস্যুতন্ত্র গঠিত হয়। ভিত্তি টিস্যুর মাঝে এ টিস্যুর অবস্থান। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে জাইলেম ও ফ্লোয়েম টিস্যু পাশাপাশি এবং এদের মাঝখানে ক্যাম্বিয়াম নামক ভাজক টিস্যু থাকে। ফ্লোয়েম টিস্যু কাণ্ডের পরিধির দিকে এবং জাইলেম টিস্যু কাণ্ডের কেন্দ্রের দিকে থাকে।

একটি দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ কাণ্ডের লম্বচ্ছেদ ও প্রস্থচ্ছেদে বিভিন্ন প্রকার টিস্যুতন্ত্রের বিন্যাস দেখানো হল।

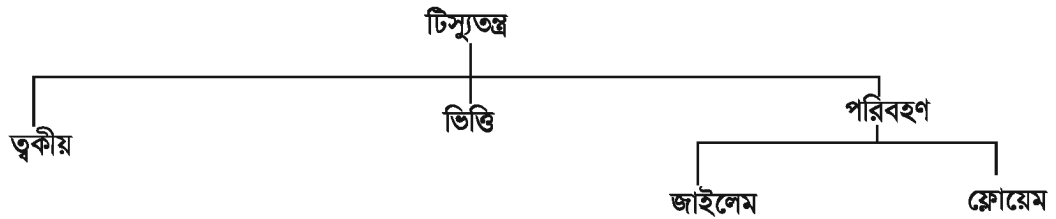


চিত্র ৪.৮ : দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ কাণ্ডের লম্বচ্ছেদে বিভিন্ন প্রকার টিস্যুতন্ত্রের বিন্যাস।



চিত্র ৪.৯ : প্রস্থচ্ছেদে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ কাণ্ডে বিভিন্ন প্রকার টিস্যুবিন্যাস।

কাজ : পানি ও দ্রবীভূত খাদ্যদ্রব্য পরিবহণ করা, প্রস্তুতকৃত খাদ্য পরিবহণ করা, কাণ্ডকে দৃঢ়তা প্রদান করা ও প্রয়োজনে খাদ্য সঞ্চয় করা।



অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। অ্যারেনকাইমা পাওয়া যায় কোনটিতে?

- ক. মুথা ঘাসে
গ. বাঁশে

- খ. শাপলায়
ঘ. পেয়ারায়

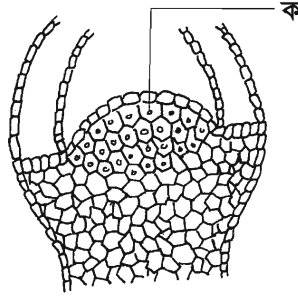
২। স্থায়ী টিস্যুর ক্ষেত্রে—

- কোষ প্রাচীর অপেক্ষাকৃত পুরু
- কোষে কোষ গহ্বর থাকে
- কোষের সাইটোপ্লাজম ঘন

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের চিত্র অবলম্বনে ৩ নং ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



৩। চিত্রের ক চিহ্নিত অংশটি কী?

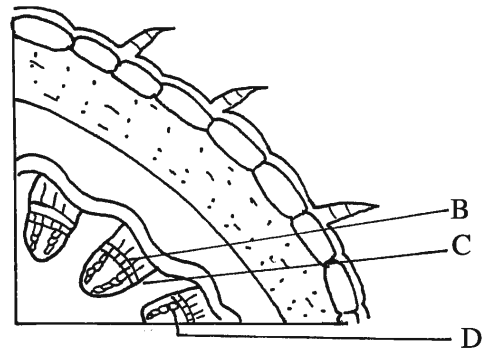
- | | |
|----------------|-----------------|
| ক. স্থায়ী কলা | খ. ভাজক কলা |
| গ. জাইলেম কলা | ঘ. ফ্লোয়েম কলা |

৪। চিত্রের ক চিহ্নিত অংশটির কারণে উদ্ভিদ—

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| ক. কাণ্ডের বেড় বাড়ে | খ. কাণ্ডের দৈর্ঘ্য বাড়ে |
| গ. মূলের বেড় বাড়ে | ঘ. মূলের দৈর্ঘ্য বাড়ে |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। ব্যাকটেরিয়া, অ্যামিবা প্রভৃতি জীবে টিস্যু অনুপস্থিত কিন্তু মানুষ, আম, জাম প্রভৃতি জীবে টিস্যু উপস্থিত। টিস্যু আবার দু ধরনের— ভাজক টিস্যু ও স্থায়ী টিস্যু। নিচে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদের একাংশ দেখানো হল।



- ভাজক টিস্যু কী?
- ব্যাকটেরিয়ায় টিস্যু থাকে না কেন ব্যাখ্যা কর?
- B অংশটির চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করে এর কাজ বর্ণনা কর।
- একটি আম গাছে B ও C টিস্যু সৃষ্টির কারণ বিশ্লেষণ কর।

অধ্যায় পাঁচ

প্রাণিকলা, অঙ্গ ও অঙ্গতন্ত্র (Animal Tissue, Organ and Organ system)

প্রোটোজোয়া (Protozoa) জীব দেহে একটি মাত্র কোষ থাকে। Porifera পর্বের প্রাণীরা সরলতম বহুকোষী প্রাণী, এদের কোষগুলো প্রকৃত টিস্যু গঠন করে না। Cnidaria, ইতিপূর্বে Coelenterata নামে পরিচিত ছিল। এই পর্বের প্রাণীদের টিস্যু, অঙ্গ বা তন্ত্র গঠিত না হলেও এদের দেহের কোষগুলো দুটি স্তরে সজ্জিত।

Platyhelminthes থেকে chordata পর্ব পর্যন্ত প্রাণীদের দেহে টিস্যু, অঙ্গ ও অঙ্গতন্ত্র দেখা যায়। এসব পর্বের প্রাণীরা ত্রিভুগুস্তরী। এদের ভ্রূণের এন্টোডার্ম, মেসোডার্ম এবং এন্ডোডার্ম নামক ভ্রূণীয় কোষস্তর থেকে এসব টিস্যু, অঙ্গ এবং তন্ত্রসমূহ গঠিত হয়।

টিস্যু (কলা) : বহুকোষী প্রাণীদের দেহে এক জাতীয় কিছুসংখ্যক কোষ একত্রে অবস্থান করে কোন বিশেষ কাজে নিয়োজিত থাকে। ভ্রূণের এন্টোডার্ম, মেসোডার্ম, এন্ডোডার্ম থেকে এসব কোষ তৈরি হয়ে একত্রে অবস্থান করে। এসব কোষের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানে অন্তঃকোষীয় পদার্থ বা মাতৃকা থাকে। কোষগুলো এক বা একাধিক ধরনের হয়। একই ভ্রূণীয় কোষস্তর থেকে উৎপন্ন হয়ে এক বা একাধিক ধরনের কিছুসংখ্যক কোষ জীবদেহের কোনও নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে সমষ্টিগতভাবে একটা সাধারণ কাজে নিয়োজিত থাকলে ঐ কোষ সমষ্টি এবং তাদের নিঃসৃত আন্তঃকোষীয় পদার্থ বা মাতৃকা (matrix) কে একত্রে টিস্যু (tissue) বলে। অর্থাৎ একটি টিস্যুর কোষগুলোর উৎপত্তি, কাজ এবং গঠন একই ধরনের হয়। বিভিন্ন ধরনের টিস্যু নিয়ে আলোচনাকে টিস্যুতত্ত্ব বা হিস্টোলজি বলে।

টিস্যু ও কোষের মধ্যে পার্থক্য :

ক. টিস্যু (কলা) : একই গঠন ও কাজ বিশিষ্ট একাধিক কোষ একই স্থান থেকে উৎপন্ন হয়ে একটা সাধারণ কাজ করতে থাকলে ঐ কোষ সমষ্টি এবং তাদের সৃষ্ট আন্তঃকোষীয় পদার্থকে একত্রে টিস্যু বলে। যেমন, রক্ত এক ধরনের তরল যোজক টিস্যু (ফ্লুইড কানেকটিভ টিস্যু)। রক্তের তরল মাতৃকা বা প্লাজমার মধ্যে লোহিত কণিকা, শ্বেতকণিকা এবং অণুচক্রিকাগুলো অবস্থান করে। রক্ত ভ্রূণের মেসোডার্ম থেকে উৎপন্ন হয়।

খ. কোষ Cell : কোষ টিস্যুর গঠন ও কার্যকরী একক। যথা : লোহিত রক্তকণিকা (এরিথ্রোসাইট), শ্বেতরক্তকণিকা (লিউকোসাইট) এবং অণুচক্রিকা (থ্রোম্বোসাইট) বিভিন্ন ধরনের রক্তকোষ। এদের মধ্যে লোহিত কণিকা অক্সিজেন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহণ করে। শ্বেতকণিকা দেহের প্রতিরক্ষায় অংশ নেয় এবং অণুচক্রিকা ক্ষতস্থানে রক্ত জমাট বাঁধায় অংশ নিয়ে রক্তপাত বন্ধ করে। রক্তকোষসমূহ এবং প্লাজমা একত্রে রক্তটিস্যু বা ব্লাডটিস্যু তৈরি করে। রক্ত সাধারণভাবে দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবহণে অংশ নেয়।

টিস্যুর প্রকারভেদ :

কোনও বিশেষ টিস্যু গঠনকারী কোষের সংখ্যা, বৈশিষ্ট্য এবং তাদের নিঃসৃত বা সৃষ্ট আন্তঃকোষীয় পদার্থ বা মাতৃকার (matrix) বৈশিষ্ট্য, পরিমাণ, উপস্থিতি, অনুপস্থিতির ভিত্তিতে টিস্যু প্রধানত চার ধরনের হয়।

১। এপিথেলিয়াল (আবরণী কলা) টিস্যু (Epithelial tissue)

২। কানেকটিভ (যোজক কলা) টিস্যু (Connective tissue)

৩। মাসকুলার (পেশি কলা) টিস্যু (Muscular tissue)

৪। নার্ভ (স্নায়ু কলা) টিস্যু (Nerve tissue)

প্রাণিদেহের বিভিন্ন ধরনের টিস্যুর অবস্থান, গঠন বৈশিষ্ট্য ও কাজ

(১) এপিথেলিয়াল টিস্যুর গঠন বৈশিষ্ট্য, কাজ ও অবস্থান :

এপিথেলিয়াল টিস্যুর গঠন বৈশিষ্ট্য : এই টিস্যুর কোষগুলো ঘন সন্নিবেশিত এবং একটি ভিত্তিপর্দার উপর বিন্যস্ত

থাকে। এ টিস্যুর মাতৃকা থাকে না। কোষের আকৃতি, প্রানিদেহে অবস্থান ও কাজের প্রকৃতিভেদে এ টিস্যু তিন ধরনের হয়। যথা :

(ক) স্কোয়ামাস (আঁইশাকার) এপিথেলিয়াল টিস্যু : এই টিস্যুর কোষগুলো আঁইশের মতো চ্যাপটা ও নিউক্লিয়াস বড় (চিত্র : ৫.১)। উদাহরণ : বৃক্কের বোম্যান্স ক্যাপসুল প্রাচীর।

কাজ : প্রধানত ছাঁকন এবং আবরণ।

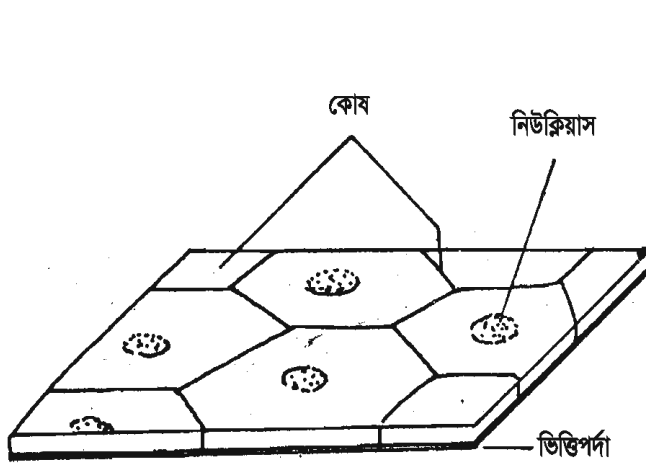
(খ) কিউবয়ডাল (ঘনাকার) এপিথেলিয়াল টিস্যু : এই টিস্যুর কোষগুলো ঘনাকার অর্থাৎ কোষগুলোর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা প্রায় সমান (চিত্র : ৫.২)। উদাহরণ : বৃক্কের সংগ্রাহক নালিকা।

কাজ : প্রধানত পরিশোধণ এবং আবরণ।

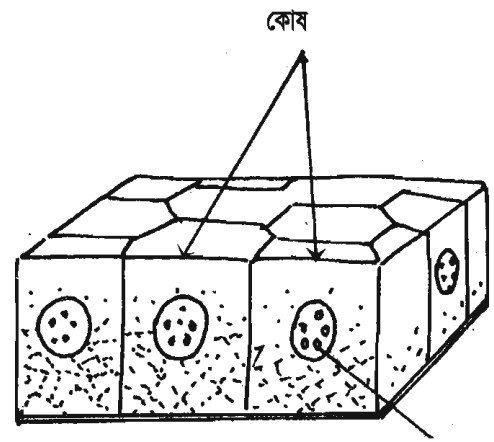
(গ) কলামনার (স্তম্ভাকৃতি) এপিথেলিয়াল টিস্যু : এই টিস্যুর কোষসমূহ স্তম্ভের মতো সরু ও লম্বা (চিত্র : ৫.৩)।

উদাহরণ : প্রাণীদের অন্ত্রে অন্তঃপ্রাচীর।

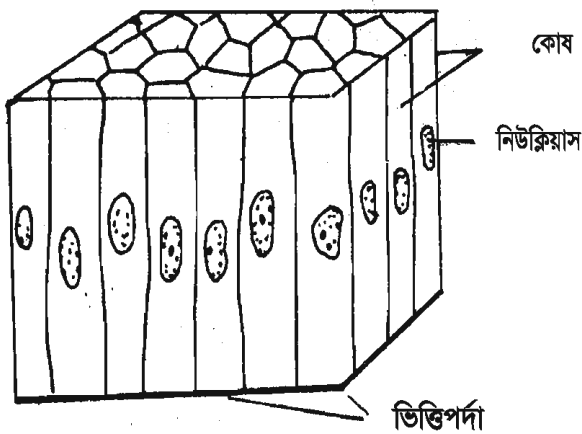
কাজ : প্রধানত স্রবণ, রক্ষণ ও শোষণ।



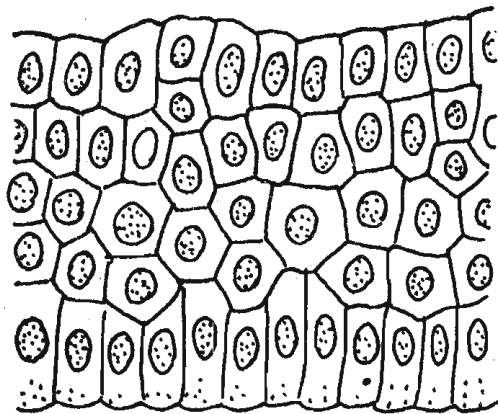
চিত্র ৫.১ : স্কোয়ামাস (আঁইশাকার) আবরণী টিস্যু



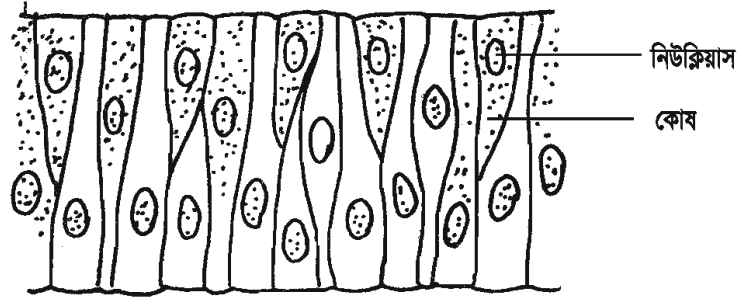
চিত্র ৫.২ : কিউবয়ডাল (ঘনাকৃতি) আবরণী টিস্যু



চিত্র ৫.৩ : কলামনার (স্তম্ভাকার) এপিথেলিয়াল টিস্যু



চিত্র ৫.৪ : স্ট্র্যাটিফাইড (স্তরীভূত) বা যৌগিক আবরণী টিস্যু



চিত্র ৫.৫ : সিউডো স্ট্র্যাটিকাইড এপিথেলিয়াল টিস্যু

ভিত্তি পর্দার উপর সজ্জিত কোষগুলোর সংখ্যার ভিত্তিতে এপিথেলিয়াল টিস্যু তিন প্রকার। যথা :

(ক) সিম্পল এপিথেলিয়াল টিস্যু : ভিত্তিপর্দার উপর কোষসমূহ একস্তরে সজ্জিত।

উদাহরণ : বৃক্কের বোম্যানস ক্যাপসুল, বৃক্কীয় নালিকা, অন্ত্র প্রাচীর (চিত্র ৫.১, ৫.২, ৫.৩)।

(খ) স্ট্র্যাটিকাইড এপিথেলিয়াল টিস্যু : ভিত্তিপর্দার উপর কোষগুলো একাধিক স্তরে সজ্জিত।

উদাহরণ : মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ত্বক (চিত্র ৫.৪)।

(গ) সিউডোস্ট্র্যাটিকাইড এপিথেলিয়াল টিস্যু : এই টিস্যুর কোষগুলো ভিত্তিপর্দার উপর একস্তরে বিন্যস্ত। কিন্তু কোষগুলো বিভিন্ন উচ্চতায় হওয়ায় এই টিস্যুকে দেখতে স্তরীভূত টিস্যু মনে হয়।

উদাহরণ : ট্রাকিয়া (চিত্র ৫.৫)।

এছাড়া এপিথেলিয়াল টিস্যু কোষগুলো বিভিন্ন কাজের জন্য নানাবিধে রূপান্তরিত হয়। যেমন :

(১) সিলিয়াযুক্ত এপিথেলিয়াল টিস্যু : মেরুদণ্ডী প্রাণীদের শ্বাসনালীর প্রাচীরে।

(২) ফ্লাজেলাযুক্ত এপিথেলিয়াল টিস্যু : হাইড্রার এন্ডোডার্মে।

(৩) ক্ষণপদযুক্ত এপিথেলিয়াল টিস্যু : হাইড্রার এন্ডোডার্মে এবং মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অঙ্গে।

(৪) গ্রন্থি এপিথেলিয়াল টিস্যু : বিশেষভাবে রূপান্তরিত আবরণী টিস্যু যা থেকে রস উৎপন্ন হয়।

(৫) জার্মিনাল এপিথেলিয়াল টিস্যু : এক ধরনের রূপান্তরিত আবরণী টিস্যু যা থেকে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু উৎপন্ন হয়।

এপিথেলিয়াল টিস্যুর সাধারণ কাজ

(১) কোনও অঙ্গের বা নালীর ভিতরের ও বাইরের আবরণ তৈরি করা।

(২) এই টিস্যু রূপান্তরিত হয়ে রক্ষণ, ক্ষরণ, শোষণ, ব্যাপন, পরিবহন ইত্যাদি কাজে অংশ নেয়। সুতরাং এপিথেলিয়াল টিস্যু রূপান্তরিত হয়ে গ্রন্থি টিস্যু এবং জার্মিনাল টিস্যুতে পরিণত হয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে।

(২) কানেক্টিভ টিস্যুর গঠন বৈশিষ্ট্য, কাজ ও অবস্থান

গঠন বৈশিষ্ট্য : কানেক্টিভ টিস্যুতে মাতৃকার পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি এবং কোষের সংখ্যা কম। মাতৃকা জেলির মতো তরল, নমনীয় বা কঠিন ও ভজ্জুর হতে পারে। মাতৃকায় এক বা একাধিক ধরনের তন্তু এবং ক্যালসিয়াম কার্বনেট জাতীয় পদার্থ থাকতে পারে।

কাজ : কানেক্টিভ টিস্যু পেশির সাথে পেশির, অস্থির সাথে পেশির এবং অস্থির সাথে অস্থির সংযোগ স্থাপন করে।

তাছাড়া কানেক্টিভ টিস্যু রূপান্তরিত হয়ে কঙ্কাল টিস্যু, তন্তুজ টিস্যু এবং তরল কানেক্টিভ টিস্যু ইত্যাদিতে পরিণত হয়।

গঠন ও কাজের ভিত্তিতে কানেক্টিভ টিস্যু প্রধানত তিন ধরনের হয়। যথা :

(ক) ফাইব্রাস বা তন্তুজ কানেক্টিভ টিস্যু : এই ধরনের কানেক্টিভ টিস্যু দেহত্বকের নিচে, পেশির মধ্যে থাকে। এদের মাতৃকায় বিভিন্ন ধরনের তন্তুর আধিক্য দেখা যায়।

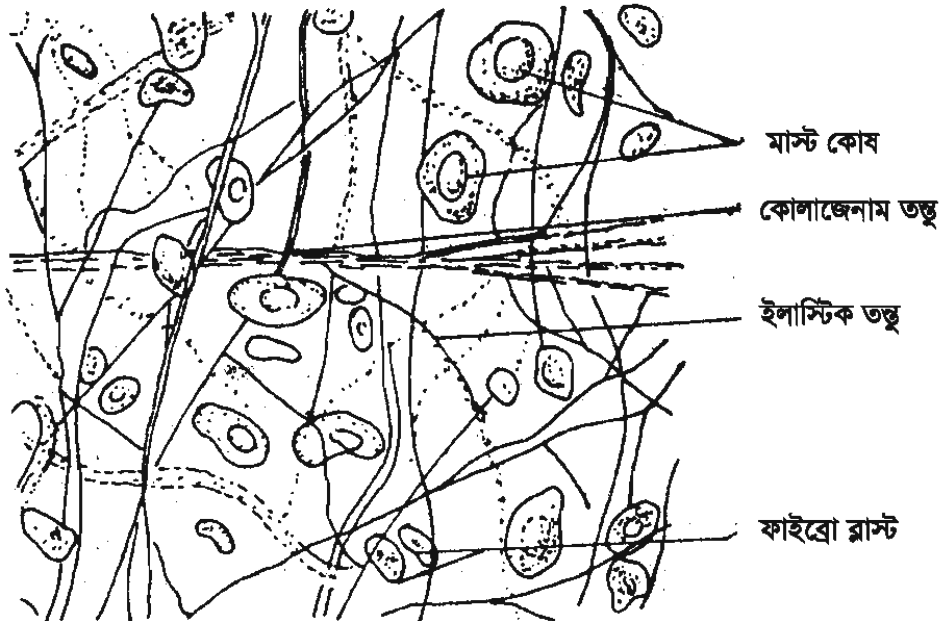
(খ) স্কেলেটাল কানেক্টিভ টিস্যু : দেহের অভ্যন্তরীণ কাঠামো গঠনকারী টিস্যুকে কঙ্কাল যোজক বা স্কেলেটাল কানেক্টিভ টিস্যু বলে।

কাজ :

- ১। এই টিস্যু দেহের অভ্যন্তরীণ কাঠামো গঠন করে। যেমন- কঙ্কালতন্ত্র।
- ২। দেহকে নির্দিষ্ট আকৃতি ও দৃঢ়তা দেয়
- ৩। অঙ্গা সঞ্চালন ও চলনে সহায়তা করে।
- ৪। দেহের নরম ও নাজুক অঙ্গসমূহকে (যেমন- মস্তিষ্ক, সুষুম্নাকাণ্ড, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি) রক্ষা করে।
- ৫। বিভিন্ন ধরনের রক্তকণিকা উৎপাদন করে।
- ৬। ঐচ্ছিক পেশিসমূহের সংযুক্তির ব্যবস্থা করে।

গঠনের ভিত্তিতে স্কেলেটাল কানেক্টিভ টিস্যু দু ধরনের হয় :

অ) তরুণাশি (Cartilage) : তরুণাশি এক ধরনের নমনীয় স্কেলেটাল কানেক্টিভ টিস্যু। এদের মাতৃকা কঠিন অথচ কোমল হয় এবং কোষগুলোর মধ্যে বড় ফাঁক থাকে যেমন : স্তন্যপায়ীদের নাকের ও কানের পিনার তরুণাশি, হিউমেরাস, ফিমার ইত্যাদি অস্থির দুই প্রান্তে অবস্থিত তরুণাশি (চিত্র ৫.৬)।



চিত্র ৫.৬ : কানেক্টিভ টিস্যু

আ) অস্থি (Bone): দৃঢ়, ভঙ্গুর এবং অনমনীয় স্কেলেটাল কানেক্টিভ টিস্যু। এদের মাতৃকায় চূন জাতীয় পদার্থ জমা হয়ে অস্থির দৃঢ়তা প্রদান করে। কতগুলো অস্থি নিরেট হয়। যেমন : মেরুদণ্ডীদের অগ্রপদের লম্বা অস্থিসমূহ। লম্বা অস্থিসমূহের গহ্বর সঙ্লগ্ন অংশ স্পঞ্জের মতো ছিদ্রাল হয়।

(গ) তরল কানেক্টিভ টিস্যু :

গঠন বৈশিষ্ট্য : এই টিস্যুর মাতৃকা তরল। মাতৃকায় বিভিন্ন ধরনের জৈব পদার্থ কলয়েড এবং দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে।

কাজ : এ টিস্যুর প্রধান কাজ দেহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন দ্রব্যাদি পরিবহণ করা এবং রোগ প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা রাখা। এই টিস্যু দু'ধরনের হয়। যথা : অ) রক্ত আ) লসিকা।

অ) রক্ত (Blood) : রক্ত এক ধরনের স্ফারীয়, ঈষৎ লবণাক্ত, লালবর্ণের তরল কানেক্টিভ টিস্যু। ধমনী, শিরা ও কৈশিক নালীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে রক্ত অভ্যন্তরীণ পরিবহণে অংশ নেয়। রক্ত, রক্তনালী ও হৃৎপিণ্ডের সমন্বয়ে রক্ত সংবহনতন্ত্র গঠিত।

গঠন বৈশিষ্ট্য : রক্তের উপাদান দুটি; যথা :

(১) রক্তরস (Plasma) : এটি রক্তের তরল অংশ। এর রং ঈষৎ হলুদাভ। এর প্রায় ৯১-৯২% পানি এবং ৮-৯% জৈব ও অজৈব পদার্থ। এসব জৈব পদার্থের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের রক্তে প্রোটিন ও বর্জ্য পদার্থ থাকে। অজৈব পদার্থের মধ্যে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্লোরাইড, লৌহ, কার্বন ডাইঅক্সাইড, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি ধাতব পদার্থ থাকে।

(২) রক্তকণিকাসমূহ (Blood cells or Blood corpuscles) : রক্ত কণিকাসমূহ রক্তের অন্যতম উপাদান। রক্তকোষ তিন ধরনের (চিত্র ৫.৭)। যথা :



চিত্র ৫.৭ : বিভিন্ন ধরনের রক্তকণিকা

(ক) এরিথ্রোসাইট (Erythrocyte) বা লোহিত রক্তকণিকা : এসব রক্ত কণিকা হিমোগ্লোবিনযুক্ত ও লাল রঙের। উভচর প্রাণীর লোহিত রক্তকণিকা দ্বি-উত্তল, নিউক্লিয়াসযুক্ত ও ডিম্বাকার। অপরপক্ষে স্তন্যপায়ীদের রক্তের লোহিত কণিকা দ্বি-অবতল, নিউক্লিয়াসবিহীন ও গোলাকার। লোহিত রক্তকণিকায় হিমোগ্লোবিন নামে একটি লৌহ গঠিত যৌগ থাকে, যার জন্য রক্ত লাল হয়। হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে অক্সিজেন একটি শিথিল যৌগ (অক্সি-হিমোগ্লোবিন) গঠন করে। এইভাবে এরা শরীরের বিভিন্ন স্থানে অক্সিজেন পরিবহণ করে এবং প্রয়োজনমত অক্সিজেন যোগান দিয়ে পুনরায় হিমোগ্লোবিনে পরিণত হয়।

কাজ : অক্সিজেন পরিবহণ এবং আংশিকভাবে কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহণ করে।

(খ) লিউকোসাইট (Leucocyte) বা শ্বেত রক্তকণিকা : এদের কোন সুনির্দিষ্ট আকৃতি নেই এবং এরা নিউক্লিয়াসযুক্ত। শ্বেতকণিকার সাইটোপ্লাজম দানাদার অথবা দানাবিহীন হয়।

কাজ : শ্বেতকণিকা জীবাণু ধ্বংস করে আত্মরক্ষায় অংশ নেয়। এর বিভিন্ন অঙ্গ গঠনেও অংশ নেয়।

(গ) থ্রম্বোসাইট (Thrombocyte) বা অণুচক্রিকা (Platelet) : মেরুদণ্ডী প্রাণীদের রক্তে নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট মাকু

আকৃতির রক্তকণিকাকে থ্রম্বোসাইট বলে। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের থ্রম্বোসাইটে নিউক্লিয়াস থাকে না। এদের থ্রম্বোসাইটকে প্লেটলেটও বলে।

কাজ : থ্রম্বোসাইট রক্ততঞ্চন বা রক্ত জমাট বাঁধায় অংশ নেয়।

আ) লসিকা (Lymph) : বিভিন্ন টিস্যুর মধ্যবর্তী ক্ষেত্রে (Space) যে জলীয় পদার্থ জমা হয়, সেগুলো কতগুলো ছোট নালীর মাধ্যমে সংগৃহীত হয়। ছোট নালীগুলো মিলিত হয়ে আবার বৃহত্তর নালীতে পরিণত হয়। এইভাবে যে নালিকাতন্ত্র গঠিত হয় তাকে লসিকাতন্ত্র বলে। নালীগুলোকে লসিকানালী এবং সংগৃহীত রসকে লসিকা বলে। পরে এই বৃহত্তর লসিকা নালী মানুষের স্কস্পদদেশের শিরার মধ্যে প্রবেশ করে। লসিকার মধ্যে কিছু কোষও থাকে। এদের লসিকা কোষ (Lymphocyte) বলে। লসিকা ঈষৎ স্ফারীয়, স্বচ্ছ ও হলুদ বর্ণের তরল।

৩। পেশি টিস্যু (Muscular tissue) : ভূগীয় মেসোডার্ম থেকে উৎপন্ন সংকোচন প্রসারণশীল বিশেষ ধরনের টিস্যুকে পেশি টিস্যু বলে (চিত্র ৫.৮)।

গঠন বৈশিষ্ট্য : এদের মাতৃকা প্রায় অনুপস্থিত। পেশি কোষগুলো সরু, লম্বা ও তন্তুময়। তন্তুগুলো মাকু আকৃতির। এ তন্তুগুলোকে মায়োফাইব্রিল বলে। পেশি কোষের সাইটোপ্লাজমে এক বা একাধিক নিউক্লিয়াস থাকে। পেশি কোষের কোষপর্দাকে সারকোলেমা বলে। যেসব মায়োফাইব্রিলে আড়াআড়ি ডোরা থাকে তাদের ডোরাকাটা পেশি (straited muscle) এবং ডোরাবিহীন মায়োফাইব্রিলকে মসৃণপেশি (smooth muscle) বলে।

কাজ : পেশি কোষ সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে অঙ্গ সঞ্চালন, চলন ও অভ্যন্তরীণ পরিবহণে অংশ নেয়। অবস্থান, গঠন এবং কাজের ভিত্তিতে পেশি টিস্যু তিন ধরনের। যথা :

ক) ঐচ্ছিক (voluntary) বা ডোরাকাটা (straited) পেশি : ঐচ্ছিক পেশি প্রাণীর ইচ্ছানুযায়ী সংকুচিত বা প্রসারিত হয়। ঐচ্ছিক পেশি টিস্যুর কোষগুলো নলাকার, শাখাবিহীন ও আড়াআড়ি ডোরাযুক্ত হয়। এদের সাধারণত একাধিক নিউক্লিয়াস থাকে। এই পেশি দ্রুত সংকুচিত ও প্রসারিত হতে পারে। এ পেশিকে ডোরা কাটা বা কঙ্কাল (Skelcton) পেশিও বলে।

অবস্থান : ঐচ্ছিক পেশি অস্থিতন্ত্রে সংলগ্ন থাকে। যথা : মানুষের হাড় ও পায়ের পেশিসমূহ।

কাজ : বিভিন্ন অস্থির ঐচ্ছিক নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালন এবং চলন নিয়ন্ত্রণ করে।

(খ) অনৈচ্ছিক পেশি (Involuntary muscle) বা মসৃণ পেশি (Smooth muscle)

গঠন বৈশিষ্ট্য : এ পেশি টিস্যুর সংকোচন ও প্রসারণ প্রাণীর ইচ্ছাধীন নয়। এ পেশি কোষগুলো মাকু আকৃতির। এদের গায়ে আড়াআড়ি দাগ থাকে না। এজন্য এ পেশিকে মসৃণ পেশি বলে।

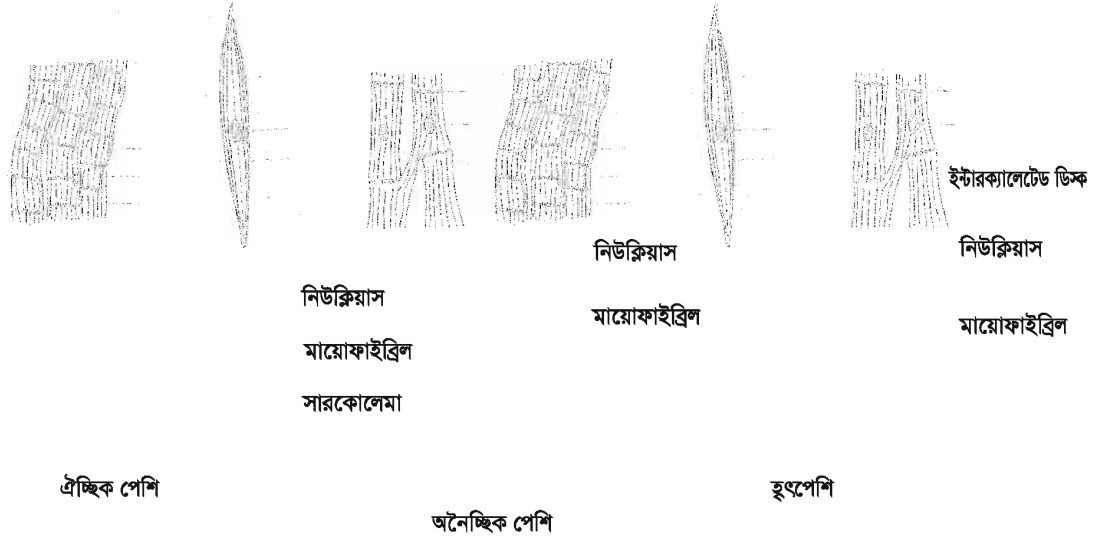
অবস্থান : মেরুদণ্ডী প্রাণীদের রক্তনালী, পৌষ্টিক নালী ইত্যাদির প্রাচীরে অনৈচ্ছিক পেশি থাকে।

কাজ : অনৈচ্ছিক পেশি প্রধানত দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গাদির সঞ্চালনে অংশ নেয়। যেমন : অস্ত্রের ক্রমসংকোচন।

(গ) হৃৎপেশি বা কার্ডিয়াক পেশি (Cardiac muscle)

গঠন বৈশিষ্ট্য : মেরুদণ্ডী প্রাণীদের হৃৎপিণ্ড যে বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি দিয়ে গঠিত, তাকে কার্ডিয়াক পেশি বলে। এই পেশি টিস্যুর কোষগুলো নলাকৃতি (অনেকটা ঐচ্ছিক পেশির মতো), শাখান্বিত ও আড়াআড়ি দাগযুক্ত। এ টিস্যুর কোষগুলোর মধ্যে নিবেশিত ফলক (Intercalated disc) থাকে। এদের সংকোচন ও প্রসারণ প্রাণীর ইচ্ছাধীন নয়। অর্থাৎ হৃৎপেশির গঠন ঐচ্ছিক পেশির মতো এবং কাজ অনৈচ্ছিক পেশির মতো। হৃৎপেশির কোষগুলো শাখার সাহায্যে পরস্পর যুক্ত থাকে। হৃৎপিণ্ডের সকল হৃৎপেশি একত্রে সমন্বিতভাবে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়।

কাজ : ভূগীয় দশায় একটা বিশেষ পর্যায় থেকে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত কার্ডিয়াক পেশি একটা ছান্দিক গতিতে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে দেহের মধ্যে রক্ত চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।



চিত্র ৫.৮ : বিভিন্ন ধরনের পেশি

(৪) স্নায়ু টিস্যু (Nerve tissue)

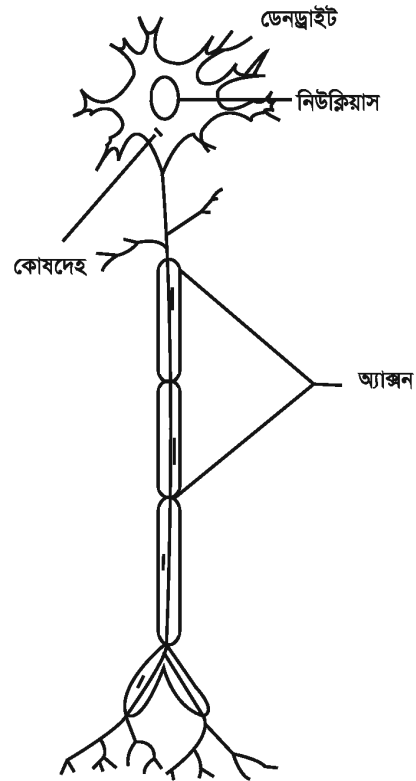
গঠন বৈশিষ্ট্য : যে বিশেষ টিস্যু দিয়ে স্নায়ুতন্ত্র গঠিত তাকে স্নায়ুটিস্যু বলে। স্নায়ুটিস্যু পরিবেশ থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে দেহের ভিতরে পরিবাহিত করতে পারে এবং সেই অনুযায়ী উপযুক্ত প্রতিবেদন সৃষ্টি করতে পারে। স্নায়ুটিস্যু যে বিশেষ কোষ দ্বারা গঠিত, তাকে স্নায়ুকোষ বা নিউরন (Neuron) বলে। সুতরাং নিউরন স্নায়ুতন্ত্রের গাঠনিক একক। এটা ভ্রূণীয় এস্টোডার্ম জাত। নিউরন বা স্নায়ুকোষ বিভিন্ন ধরনের বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনা ও স্নায়ুতাড়না গ্রহণ করতে পারে এবং দেহের অভ্যন্তরে তা পরিবহণ করতে পারে।

নিউরনের গঠন : একটা পরিণত নিউরনের তিনটি অংশ থাকে (চিত্র ৫.৯)। যথা :

ক. কোষদেহ (Cell body): কোষদেহ বহুভুজাকৃতি এবং নিউক্লিয়াসযুক্ত। কোষের সাইটোপ্লাজমে মাইটোকন্ড্রিয়া, গলজিদ্রব্য, রাইবোসোম, আন্তঃপ্রাঙ্গমীয় নালিকা ইত্যাদি অঙ্গাণু থাকে। তবে নিউরনের সাইটোপ্লাজমে সক্রিয় সেন্ট্রিওল থাকে না বলে নিউরন বিভাজিত হয় না।

খ) ডেনড্রাইট (Dendrites) : কোষদেহ থেকে একাধিক কোষ শাখা বের হয়। এরা উদ্দীপনা বা স্নায়ুতাড়না নিউরনের দেহের দিকে পরিবাহিত করে। সাধারণত এরা অ্যাক্সন এর বিপরীত দিকে হয় এবং সংখ্যায় এক বা একাধিক থাকে।

গ) অ্যাক্সন (Axon): নিউরনের কোষদেহ থেকে একটা লম্বা তন্তু স্নায়ু উদ্দীপনা পরবর্তী নিউরনের ডেনড্রাইটের দিকে পরিবহণ করে। একটা নিউরনে একটা মাত্র অ্যাক্সন থাকে।



চিত্র ৫.৯ : একটি নিউরন

পরপর দুটো নিউরনের প্রথমটার অ্যাক্সন এবং পরেরটার ডেনড্রাইটের মধ্যে একটা স্নায়ুসন্ধি গঠিত হয়। একে সাইন্যাপ্স বা সিন্যাপ্স (synapse) বলে। সিন্যাপ্স এর মধ্য দিয়েই একটা নিউরন থেকে স্নায়ু উদ্দীপনা পরবর্তী নিউরনে প্রবাহিত হয়।

অবস্থান : স্নায়ুতন্ত্রে স্নায়ুটিস্যু অবস্থান করে। প্রাণীর স্নায়ুতন্ত্রে অসংখ্য নিউরন থাকে।

কাজ : (১) উদ্দীপনা গ্রহণ করে উপযুক্ত প্রতিবেদন সৃষ্টি করে এবং তা বাস্তবায়ন করে।

(২) উচ্চতর প্রাণীতে স্মৃতি সংরক্ষণ করে, এবং

(৩) দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।

অঙ্গ :

এক বা একাধিক টিস্যুর সমন্বয়ে গঠিত এবং নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনে সক্ষম প্রাণিদেহের অংশ বিশেষকে অঙ্গ (organ) বলে। অর্থাৎ কোন অঙ্গে একই অথবা একাধিক ধরনের টিস্যু থাকে এবং উক্ত অঙ্গ কোন-না-কোন নির্দিষ্ট কাজ করতে পারে। অঙ্গসমূহ নিয়ে জীববিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করা হয় তাকে অঙ্গসংস্থানবিদ্যা (Anatomy) বলে।

মানবদেহের প্রয়োজনীয় অঙ্গসমূহ :

অবস্থানভেদে মানবদেহে দু ধরনের অঙ্গ আছে।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হাত, পা, মাথা ইত্যাদি বাহ্যিক অঙ্গসমূহের অঙ্গসংস্থান সম্বন্ধে জীববিজ্ঞানের যে শাখায় বিশদভাবে আলোচনা করা হয় তাকে বহিঃঅঙ্গসংস্থান (Morphology) বলে। আর জীবদেহের ভিতরের অঙ্গসমূহ সম্বন্ধে জীববিজ্ঞানের যে শাখায় বিশদভাবে আলোচনা করা হয় তাকে অন্তঃঅঙ্গসংস্থান (Internal Anatomy) বলে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হাত, পা, মাথা ইত্যাদি মানবদেহের বহিঃস্থ অঙ্গ এবং পাকস্থলি, ডিম্বডেনাম, ইলিয়াম, মলাশয়, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয়, প্লীহা, ফুসফুস, বৃক্ক, শূক্ৰাশয়, ডিম্বাশয় ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ অঙ্গ।

তন্ত্র :

পরিপাক, শ্বসন, রেচন, প্রজনন ইত্যাদি শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রাণিদেহে কতকগুলো অঙ্গের সমন্বয়ে বিভিন্ন তন্ত্র গঠিত হয়। যথা :

১. পরিপাকতন্ত্র (Digestive system) : এই তন্ত্র খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক, শোষণ এবং অপাচ্য খাদ্যাংশ নিষ্কাশনের সাথে জড়িত। পরিপাকতন্ত্রের দুটো প্রধান অংশ থাকে। যথা :

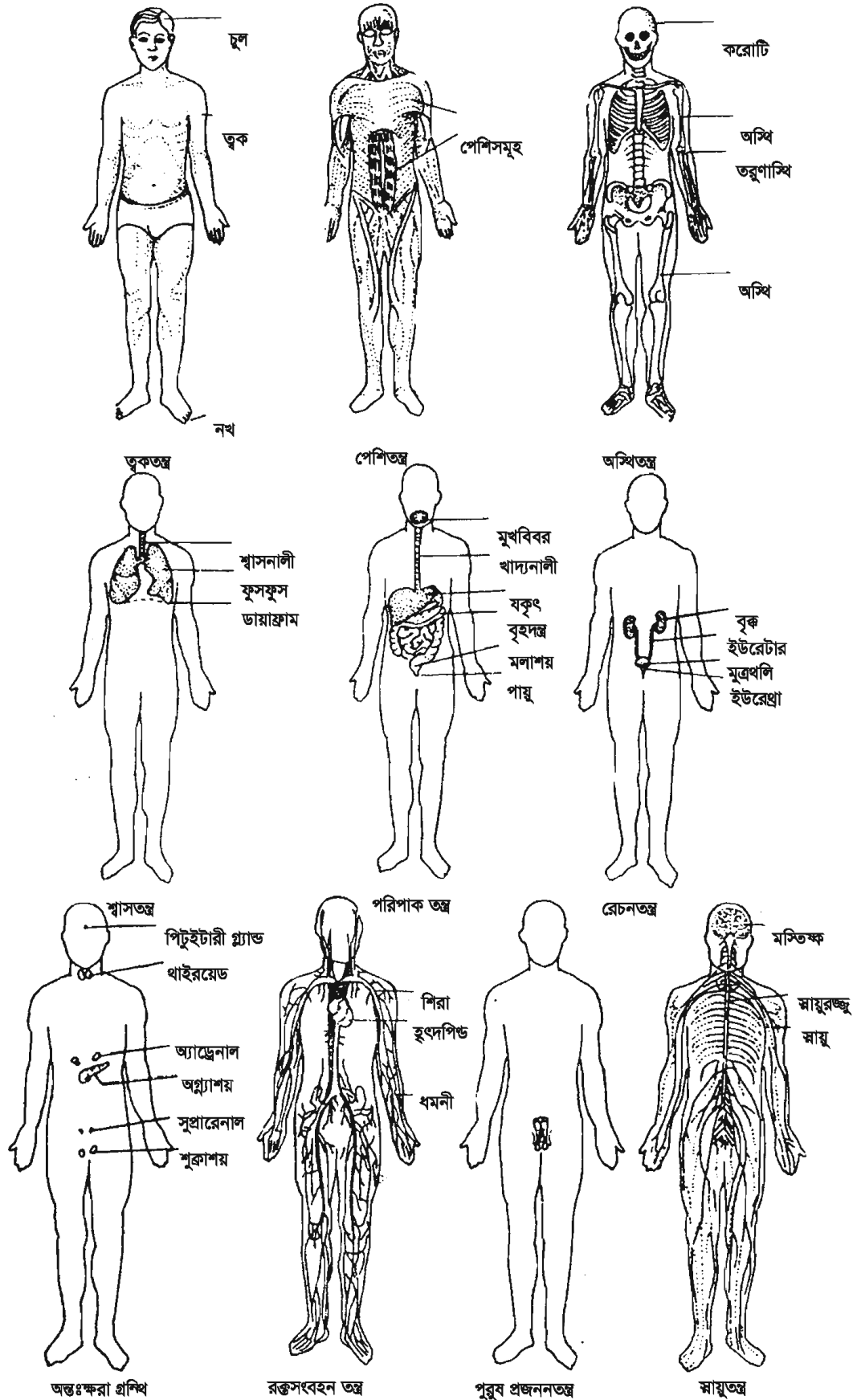
(ক) **পৌষ্টিক নালী (Digestive canal) :** এই নালী মুখছিদ্র, মুখগহ্বর, গলবিল, অনুনালী, পাকস্থলি, ডিম্বডেনাম, ইলিয়াম, রেক্টাম বা মলাশয় এবং পায়ুছিদ্র নিয়ে গঠিত।

(খ) **পৌষ্টিক গ্রন্থি (Digestive glands) :** মানুষের লালাগ্রন্থি, যকৃৎ এবং অগ্ন্যাশয় পৌষ্টিকগ্রন্থি হিসেবে কাজ করে।

২. শ্বসনতন্ত্র (Respiratory system) : মানুষের নাসারন্ধ্র, গলবিল, ল্যারিংস, ট্রাকিয়া, ব্রঙ্কাস, ব্রঙ্কিওল, অ্যালভিওলাই এবং এক জোড়া ফুসফুস নিয়ে মানুষের শ্বসনতন্ত্র গঠিত। এই তন্ত্রের মানুষের দেহের সঞ্চিত খাদ্যকে পরিবেশ থেকে গৃহীত অক্সিজেনের সাহায্যে জারণ প্রক্রিয়ায় শক্তি উৎপাদন করে যা দেহের বিভিন্ন দৈনন্দিন কাজে সহায়তা করে।

৩. স্নায়ুতন্ত্র (Nervous system) : দেহের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনা গ্রহণ করা এবং সেই অনুযায়ী উপযুক্ত প্রতিবেদন সৃষ্টি করা এই তন্ত্রের কাজ। মস্তিষ্ক, সুষুম্নাকাণ্ড এবং করোটিকা ও সুষুম্নায়ু নিয়ে স্নায়ুতন্ত্র গঠিত। এছাড়া স্নায়ুক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র নামে স্নায়ুতন্ত্রের আরও একটি অংশ আছে। স্নায়ুতন্ত্রের এই অংশ দেহের অনৈচ্ছিক কাজগুলো নিয়ন্ত্রণ করে।

৪. রেচনতন্ত্র (Excretory system) : বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় বিপাক ক্রিয়ার ফলে দেহে উপজাত দ্রব্য হিসেবে কিছু বর্জ্য পদার্থ তৈরি হয়। এসব বর্জ্য পদার্থ সাধারণত দেহের জন্য ক্ষতিকর। এজন্য এসব বর্জ্য পদার্থ দেহ থেকে নিষ্কাশন করতে হয়। দেহ থেকে অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন করার পদ্ধতিকে রেচন প্রক্রিয়া (Excretion) বলে। রেচন প্রক্রিয়া যে তন্ত্রের সাহায্যে সম্পাদিত হয়, তাকে রেচনতন্ত্র বলে। এক জোড়া বৃক্ক, এক জোড়া মূত্রনালী, একটি মূত্রথলি এবং একটি ইউরেটার নালী নিয়ে মানুষের রেচনতন্ত্র গঠিত।



চিত্র ৫.১২ : মানবদেহের বিভিন্ন তন্ত্রের সরল চিত্র

৫. প্রজননতন্ত্র (Reproductive system) : প্রজাতির ধারাকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এই তন্ত্র নিজস্ব বৈশিষ্ট্যযুক্ত নতুন প্রজন্মের সৃষ্টি করে। এরা পরিণত বয়সে প্রজনন করতে পারে। এভাবে প্রজননের মাধ্যমে প্রজাতির ধারা অব্যাহত থাকে। মানুষ একলিঙ্গ প্রাণী। পুরুষ মানুষের দেহে পুরুষ প্রজননতন্ত্র এবং স্ত্রীলোকের দেহে স্ত্রী প্রজননতন্ত্র বিদ্যমান। এ ছাড়া মানবদেহে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তন্ত্র রয়েছে। যথা :

(ক) ত্বক তন্ত্র (Integumentary system) : দেহের বাইরের দিকে যে আচ্ছাদনকারী আবরণ থাকে তাকে ত্বক বা চামড়া (Skin) বলে। এই তন্ত্র দেহকে আচ্ছাদন করে রাখে, বাইরের আঘাত এবং জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। এ ছাড়া দেহের জলীয় অংশ দেহের ভিতর সংরক্ষণ করে।

(খ) অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র (Endocrine system) : প্রাণীদের দেহে কতকগুলো নালীবিহীন বা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি আছে। এসব গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসকে হরমোন (hormone) বা প্রাণরস বলে। এদের পরিবহণ করার জন্য কোন নির্দিষ্ট নালী থাকে না। রক্তই একস্থান থেকে এইসব প্রাণরস বা হরমোন অন্যস্থানে পরিবহণ করে। পিটুইটারী, থাইরয়েড, প্যারাইরয়েড, অগ্যাশয়ের আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যানস, সুপ্রারেনাল ইত্যাদি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির সমন্বয়ে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র গঠিত।

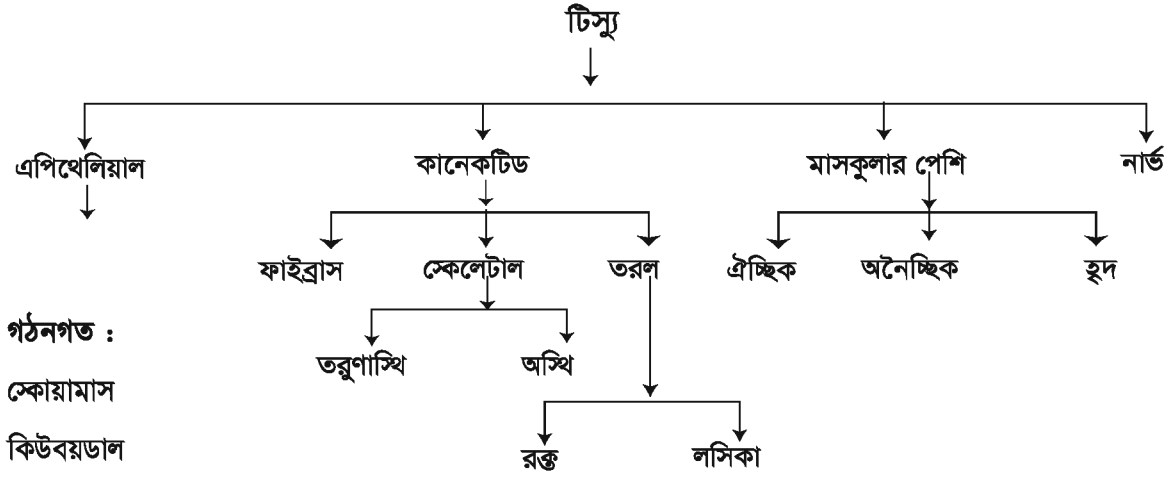
অঙ্গ ও তন্ত্রের পার্থক্য :

আলোচনা বিষয়	অঙ্গ (organ)	তন্ত্র (system)
১. কাকে বলে	এক বা একাধিক কলা বা টিস্যুর সমন্বয়ে গঠিত এবং প্রাণিদেহে নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনে সক্ষম অংশবিশেষকে অঙ্গ বলে।	একাধিক সংশ্লিষ্ট অঙ্গের সমন্বয়ে তন্ত্র গঠিত হয়। প্রতিটি তন্ত্র পৃথক পৃথকভাবে নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করে থাকে।
২. উদাহরণ	চক্ষু, কর্ণ, পাকস্থলি, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, বৃক্ক, শুক্রাশয়, ডিম্বাশয় ইত্যাদি	পরিপাকতন্ত্র, রক্তসংবহন তন্ত্র, রেচনতন্ত্র, প্রজননতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র ইত্যাদি।

দেহকে সচল রাখার ক্ষেত্রে অঙ্গ ও তন্ত্রের সমন্বয় :

মানুষ ও অন্যান্য উন্নত প্রাণীদের দেহ কতগুলো নির্দিষ্ট তন্ত্রের সমন্বয়ে গঠিত। কোনও বিশেষ তন্ত্র আবার কয়েকটি সংশ্লিষ্ট অঙ্গ নিয়ে গঠিত। এসব অঙ্গের প্রতিটির নির্দিষ্ট গঠন এবং কাজ রয়েছে। প্রতিটি তন্ত্রের অঙ্গগুলোর কাজের মধ্যে সমন্বয় থাকে। প্রতিটি তন্ত্র একইভাবে পৃথক পৃথক অথচ সুনির্দিষ্ট কাজ ঠিকমত করে চলে। যেমন—পরিপাকতন্ত্রের কাজ প্রধানত খাদ্য পরিপাক, পরিপাককৃত খাদ্য শোষণের পর অপাচ্য অংশ সাময়িকভাবে জমা রাখা এবং দেহ থেকে নিষ্কাশন করা। এই তন্ত্রের লালাগ্রন্থি, যকৃৎ এবং অগ্যাশয় নামে পুষ্টিগ্রন্থিসমূহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় রস নিঃসৃত করে পরিপাকে অংশ নেয়। এই তন্ত্রের গলবিল ও অনুনালী খাদ্য গলাধঃকরণ করায়, পাকস্থলি ও ডিওডেনাম খাদ্য পরিপাক করায়, ইলিয়াম খাদ্য পরিপাক ও শোষণ উভয়ই এবং মলাশয় অপাচ্য খাদ্য জমা রাখায় অংশ নেয়। তন্ত্রগুলো আবার পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত এবং নির্ভরশীল। সুতরাং কোনও নির্দিষ্ট তন্ত্রের প্রতিটি অঙ্গের যথাযথভাবে কাজ করার মাধ্যমে সেই তন্ত্রের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। আবার বিভিন্ন তন্ত্রের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমেই মানুষের এবং সকল প্রাণীর দেহের স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপ সম্পাদিত হয়। সকল উন্নত প্রাণীর ক্ষেত্রে স্নায়ুতন্ত্র এবং অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র সম্মিলিতভাবে সকল অঙ্গের অর্থাৎ সকল তন্ত্রের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ ও

পরিচালনা করে দেহকে সচল ও কর্মক্ষম রাখে। এদের মধ্যে স্নায়ুতন্ত্রের কাজ প্রত্যক্ষ এবং সাধারণত ক্ষিপ্ততার সাথে সম্পাদিত হয়। অপরপক্ষে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বা নালীবিহীন গ্রন্থিসমূহ কর্তৃক নিঃসৃত হরমোনের কার্যকারিতা তুলনামূলকভাবে ধীর।



গঠনগত :

স্কোয়ামাস

কিউবয়ডাল

কলামনার

স্তর সংখ্যার ভিত্তিতে :

সিম্পল

স্ট্রাটিফাইড

সিউডোস্ট্রাটিফায়েড

রূপান্তরিত :

সিলিয়াযুক্ত

ফ্লাজেলাযুক্ত

ক্ষণপদযুক্ত

গ্রন্থি এপিথেলিয়াম

জার্মিনাল এপিথেলিয়াম

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। নিচের কোনটি রেচনতন্ত্র?

ক. ফুসফুস

খ. যকৃৎ

গ. বৃক্ক

ঘ. হৃদপিণ্ড

২। তরুণাঙ্ঘি হচ্ছে—

i. এপিথেলিয়াল টিস্যু

ii. কানেকটিভ ইস্যু

iii. মাসকুলার টিস্যু

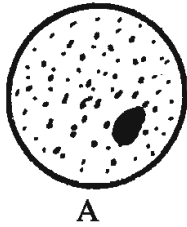
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

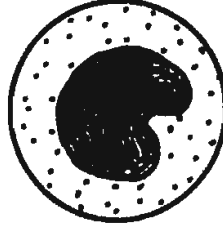
খ. ii

গ. i ও iii

ঘ. ii ও iii



A



B

উপরের চিত্র অবলম্বনে ৩নং ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

৩। দেহে B চিহ্নিত অংশটির কাজ কী?

ক. প্রতিরক্ষা

খ. রক্ততঞ্চন

গ. শ্বসন

ঘ. পরিপাক

৪। কোন প্রাণীতে A চিহ্নিত কোষটির নিউক্লিয়াস অনুপস্থিত?

i. ভিমি

ii. কুমীর

iii. বানর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

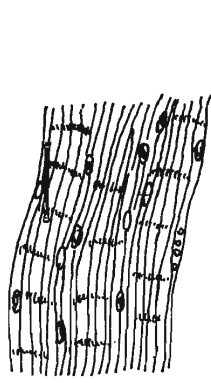
খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

- ১। প্রাণীর ত্বকের নিচে ও হাড়ের কাঠামোর উপর মাংস বলে পরিচিত বিশেষ টিস্যু স্তর রয়েছে।
নিচে বিভিন্ন ধরনের টিস্যুর চিত্র দেওয়া হল।



চিত্র-A



চিত্র-B



চিত্র-C

- ক. প্রাণিদেহে প্রধানত কত প্রকারের টিস্যু রয়েছে?
খ. প্রাণী ইচ্ছানুযায়ী A নং চিত্রের টিস্যু সংকোচন-প্রসারণ করতে পারে কেন ব্যাখ্যা কর।
গ. B নং চিত্রের টিস্যু ক্ষতিগ্রস্ত হলে শরীরে কী সমস্যা হতে পারে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. A নং ও B নং চিত্রের টিস্যুর সাথে C নং চিত্রের টিস্যুর যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে তা বর্ণনা কর।

অধ্যায় ছয়

উদ্ভিদের শ্রেণীবিন্যাস

সৃষ্টিকর্তা বিচিত্র ধরনের উদ্ভিদ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন উদ্ভিদজগৎ। এখানে এমন ক্ষুদ্র উদ্ভিদ আছে, যা খালি চোখে দেখা যায় না; আবার এমন বড় উদ্ভিদ আছে যা বহু দূর থেকে দেখা যায়। অনেক উদ্ভিদ আছে যাদের কখনো ফুল হয় না, আবার এমন উদ্ভিদ আছে যাদের মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা চলে না। কিছু উদ্ভিদ আছে যাদের ফুল হয় কিন্তু ফল হয় না। অনেক উদ্ভিদ আছে যাদের দেহে ক্লোরোফিল নেই, এরা সবুজ নয় এবং এরা নিজেরা খাদ্য তৈরি করতে পারে না। বিচিত্র এ উদ্ভিদজগতে উদ্ভিদের সংখ্যাও অসংখ্য, হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ। এ সুবিশাল বিচিত্র উদ্ভিদজগৎকে কীভাবে জানা যায়? এর জন্য চাই একটি সুচিন্তিত ও সুবিন্যস্ত পদ্ধতি, আর এটি হল উদ্ভিদের শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি।

শ্রেণীবিন্যাস হল উদ্ভিদজগৎকে সহজে জানার একটি সহজ বিন্যাস পদ্ধতি। বিচিত্র ধরনের অসংখ্য উদ্ভিদরাজির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে একজাতীয় উদ্ভিদকে একসাথে স্থাপন করে পৃথিবীর সব উদ্ভিদকে পর্যায়ক্রমে বিভাগ, শ্রেণী, বর্গ, গোত্র, গণ এবং প্রজাতি প্রভৃতি দল-উপদলে বিন্যাস করার পদ্ধতিকে বলা হয় শ্রেণীবিন্যাস।

শ্রেণীবিন্যাসের লক্ষ্য মূলত একটাই, আর তা হচ্ছে—এই বিশাল ও বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদজগৎকে সহজভাবে অল্প আয়াসে এবং অল্প সময়ে সঠিকভাবে জানা।

শ্রেণীবিন্যাসের উদ্দেশ্য একাধিক :

- ১। প্রতিটি দল-উপদল সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করা।
- ২। উদ্ভিদজগতের বিভিন্নতার প্রতি আলোকপাত করা।
- ৩। আহরিত জ্ঞানকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা।
- ৪। পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানকে সর্ক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা।
- ৫। প্রতিটি একক (unit) এর নাম প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- ৬। মানব কল্যাণে প্রয়োজনীয় উদ্ভিদসমূহকে শনাক্ত করা।

শ্রেণীবিন্যাসের একক এবং ধাপসমূহ (Units of classification and taxa) : উদ্ভিদজগতের শ্রেণীবিন্যাসের জন্য কতকগুলো সুনির্দিষ্ট ধাপ আছে। এই ধাপগুলোকে ট্যাক্সা (Taxa) বলে এক বচনে ট্যাক্সন-(Taxon)। এই ধাপগুলোকে ব্যবহার করেই শ্রেণীবিন্যাস করতে হয়। ICBN তথা International Code of Botanical Nomenclature হল উদ্ভিদ নামকরণের আন্তর্জাতিক সংবিধান। ICBN স্বীকৃত প্রধান ধাপ হল সাতটি। এইগুলো নিম্নরূপে—

- ১। কিংডম (Kingdom) বা উদ্ভিদজগৎ : পৃথিবীতে যত রকম এবং যত সংখ্যক উদ্ভিদ আছে সবগুলো নিয়েই গঠিত হয়েছে উদ্ভিদজগৎ (Plant Kingdom)। প্রায় সাড়ে চার লক্ষ প্রজাতি নিয়ে উদ্ভিদজগৎ গঠিত।
- ২। ডিভিশন (Division) বা বিভাগ : উদ্ভিদজগৎকে ভাগ করা হয়েছে একাধিক ডিভিশন বা বিভাগে।
- ৩। ক্লাস (Class) বা শ্রেণী : প্রতিটি ডিভিশনকে একাধিক ক্লাসে (শ্রেণীতে) ভাগ করা হয়েছে।
- ৪। অর্ডার (Order) বা বর্গ : প্রতিটি ক্লাসকে একাধিক অর্ডারে (বর্গে) ভাগ করা হয়েছে।
- ৫। ফ্যামিলি (Family) বা গোত্র (পরিবার) : প্রতিটি অর্ডারকে একাধিক ফ্যামিলিতে (গোত্রে) ভাগ করা হয়েছে।
- ৬। জেনাস (Genus) বা গণ : প্রতিটি ফ্যামিলিকে একাধিক জেনাসে (গণ) ভাগ করা হয়েছে।

৭। স্পিসিস (Species) বা প্রজাতি : প্রতিটি জেনাসকে একাধিক প্রজাতিতে ভাগ করা হয়েছে।

ফলদায়ী উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা পৃথিবীতে প্রায় আড়াই লক্ষ। প্রজাতির নাম সবসময় ছোট হাতের অক্ষর দিয়ে শুরু করতে হয়। সাধারণত একাধিক সদস্য নিয়ে তার উপরের একক গঠিত হয়, অর্থাৎ একাধিক স্পিসিস নিয়ে একটি জেনাস গঠিত হবে, একাধিক জেনাস নিয়ে একটি ফ্যামিলি গঠিত হবে; তবে কখনো কখনো মাত্র একটি সদস্য নিয়েও তার উপরের একক গঠিত হতে পারে। বিশেষ প্রয়োজন হলে যে কোন একককে উপ-এককে ভাগ করা যায়। এ জন্য মূল এককের সাথে Sub কথাটি যুক্ত করতে হবে। যেমন- সাব অর্ডার (উপ-বর্গ), সাব ফ্যামিলি (উপ-গোত্র), সাব জেনাস (উপ-গণ), সাব স্পিসিস (উপ-প্রজাতি) ইত্যাদি।

দ্বিপদ নামকরণ

একটি উদ্ভিদের পূর্ণাঙ্গ নাম দ্বিপদী হয় অর্থাৎ জেনাস এবং স্পিসিস—এ দুয়ে মিলে পূর্ণাঙ্গ নাম হয়। যেমন—*Artocarpus heterophyllus*। এটি বাংলাদেশের জাতীয় ফল কাঁঠালের বৈজ্ঞানিক নাম। এ নামটিতে দুটি পদ আছে। প্রথমটি হল *Artocarpus* এবং দ্বিতীয়টি হল *heterophyllus*—এরূপ দুটি পদ নিয়ে গঠিত নামকে বলা হয় দ্বিপদ নাম এবং নামকরণের এই দ্বিপদী প্রক্রিয়াকে বলা হয় দ্বিপদ নামকরণ। স্পিসিস বা প্রজাতির নাম হয় দ্বিপদী। ICBN উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম প্রদান সংক্রান্ত নিয়মনীতি প্রদান করে। ICBN এর নিয়ম অনুযায়ী একটি উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক (উদ্ভিদতাত্ত্বিক) নাম হবে—

১। দ্বিপদী।

২। ভাষা হবে ল্যাটিন।

৩। প্রথম পদের জেনাসের নাম বড় অক্ষর দিয়ে শুরু হবে কিন্তু দ্বিতীয় পদের স্পিসিসের নাম ছোট অক্ষর দিয়ে লিখতে হবে।

৪। অক্ষর হবে রোমান।

৫। ছাপা হবে ইটালিক ফরমে অর্থাৎ ডান দিকে বাঁকা করে অথবা মোটা অক্ষরে।

৬। হাতে লিখলে নিচে দাগ দিতে হবে।

দ্বিপদ নামকরণের প্রবর্তক হলেন সুইডেন দেশীয় উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস।

একই বৈশিষ্ট্যে (অর্থাৎ একই ধরনের) সব উদ্ভিদকে একই দলে স্থাপন করাই হল শ্রেণীবিন্যাসের প্রধান ভিত্তি। ইতিপূর্বে পৃথিবীর সকল জীবকে হয় উদ্ভিদ না হয় প্রাণী জগতে স্থাপন করা হত। কিন্তু বিভিন্ন জীবের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যত বেশি জানা গেল ততই এই দু জগৎ ধারণা সম্বন্ধে বিতর্ক দানা বাঁধতে থাকল। অধুনা এই দু জগৎ ধারণার স্থলে জীবদের পাঁচটি জগৎ ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই ধারণায় (১) সকল প্রোক্যারিওটিক জীবকে মনেরা (Monera) নামক জগতে স্থান দেওয়া হয়। ফলে ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া উদ্ভিদজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

(২) এককোষী ইউক্যারিওট কতগুলো জীব (যেমন *Euglena*) প্রাণী না উদ্ভিদ এ নিয়ে বিতর্ক ছিল। কারণ এদের মধ্যে একাধারে কিছু উদ্ভিদের এবং কিছু প্রাণীর গুণাবলি দেখা যায়। এ বিতর্কের অবসানকল্পে বর্তমানে সকল এককোষী ইউক্যারিওটদের প্রোটিস্টা (Protista) বা প্রোটকটিস্টা (Protoctista) জগতে বিন্যস্ত করা হয়। সকল এককোষী শৈবাল বা প্রোটোজোয়াকে এই জগতে স্থান দেওয়া হয়।

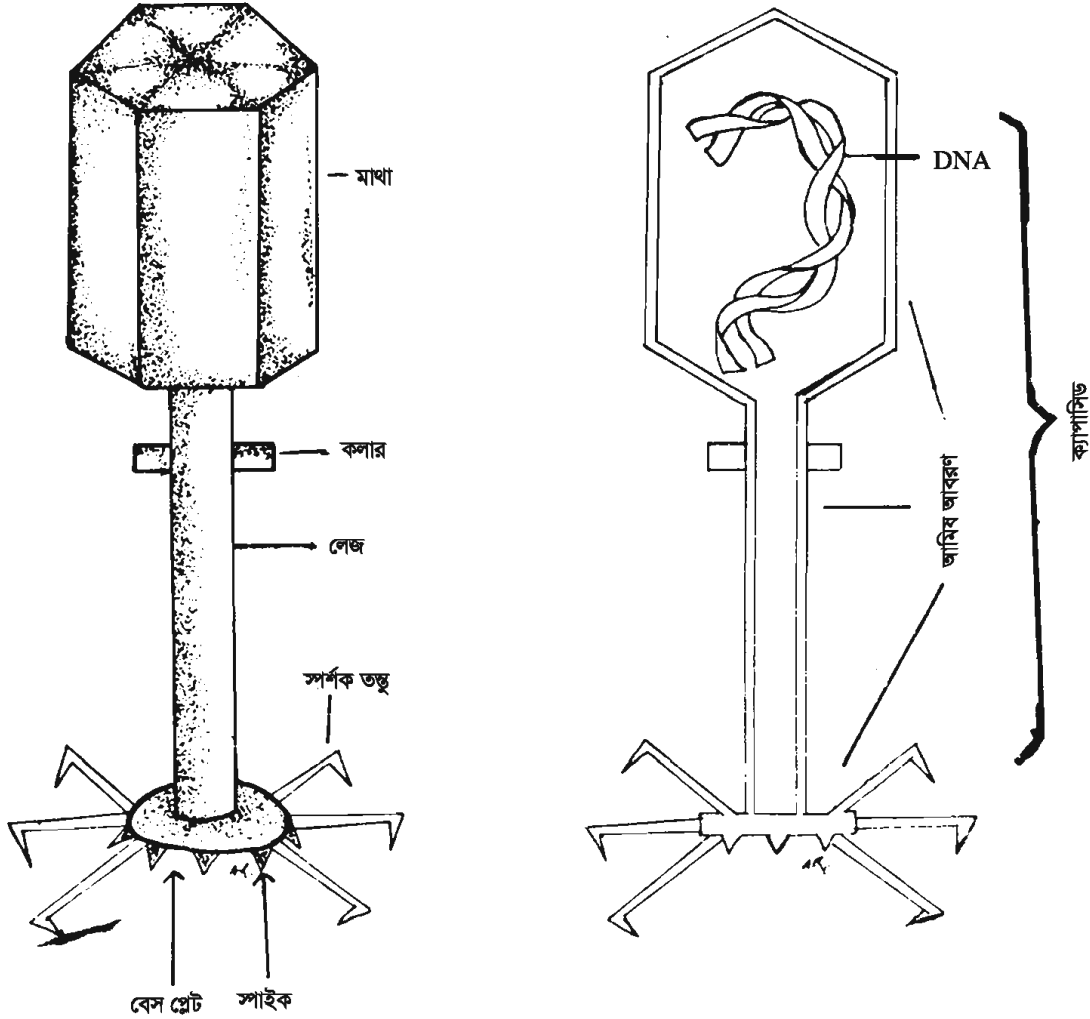
(৩) বাকি যেসব ইউক্যারিওট নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট বহুকোষী জীব থাকল সেগুলোকে তাদের পুষ্টি গ্রহণ পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে তিনটি পৃথক জগতে স্থাপন করা হয়েছে। এরা হল (ক) স্বভোজী অর্থাৎ সালোকসংশ্লেষী সবুজ জীব, উদ্ভিদ (Plantae) জগতের সদস্য। (খ) মৃতজীবী বা যারা তরল খাদ্য শোষণ করে জীবন ধারণ করে তাদের ছত্রাক (Fungi) জগতে স্থাপন করা হয়। (গ) বাকি সব পরভোজী জীবদের প্রাণী (Animalia) জগতে স্থাপন করা হয়। এর ফলে উদ্ভিদ জগতের বিস্তৃতি হ্রাস পেয়েছে কারণ ছত্রাক, শৈবাল, ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস উদ্ভিদজগৎ থেকে আলাদা হয়ে গেছে। নিচের ছকে প্রাক্তন উদ্ভিদ জগতের বর্তমান অবস্থা, এইসব বিভিন্ন দলের নাম, তাদের শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য এবং উদাহরণ দেওয়া হল।

জগতের নাম	জীব দলের নাম	দলের শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
মনেরা (Monera)	ভাইরাস	এরা অতি-আণুবীক্ষণিক এবং অকোষীয়। দেহে কোন নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজম নেই; কেবল প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিড দিয়ে দেহ গঠিত। কেবলমাত্র উপযুক্ত পোষকদেহের অভ্যন্তরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে। এরা সাধারণত রোগ জীবাণু হিসেবে পরিচিত।	T_2 -ফায়, <i>TMV</i> , <i>Influenza virus</i>
	ব্যাকটেরিয়া	এরা প্রাককেন্দ্রিক এককোষীয় আণুবীক্ষণিক জীব। এরা গোলাকার, দণ্ডাকার বা কমার মতো হতে পারে। দ্বিবিভাজন প্রক্রিয়ায় এদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। এদের সাধারণত ক্লোরোফিল থাকে না।	<i>Clostridium</i> , <i>Bacillus</i> , <i>Vibrio</i>
	সায়ানো ব্যাকটেরিয়া	এরা প্রাককেন্দ্রিক এককোষীয়। নীলাভ সবুজ রঞ্জক থাকায় এরা নিজেদের খাদ্য তৈরি করতে পারে। পূর্বে এদের নীলাভ সবুজ শৈবাল বলা হত এবং শৈবাল দলভুক্ত করা হত। কিন্তু নিউক্লিয়াস প্রাককেন্দ্রিক হওয়ায় এদের মনেরা জগতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।	<i>Nostoc</i> , <i>Anabaena</i>
প্রোটকটিস্টা (Protoctista)	শৈবাল	শৈবাল এককোষীয় বা বহুকোষীয় হতে পারে। এরা সুকেন্দ্রিক। এদের কোন পরিবহণ টিস্যু নেই।	<i>Spirogyra</i> , <i>Ulothrix</i>
ফাঙ্গাই (Fungi)	ছত্রাক	এদের দেহে সালোকসংশ্লেষণকারী বর্ণকণিকা নেই। ছত্রাক এককোষীয় বা বহুকোষীয় হতে পারে। এরা সুকেন্দ্রিক। এদের কোন পরিবহণ টিস্যু নেই। এরা পরভোজী বা মৃতজীবী হয়।	<i>Mucor</i> , <i>Agaricus</i> , <i>Penicillium</i>
প্ল্যান্টি (Plantae)	মসবর্গীয় উদ্ভিদ	এদের কতক সদস্যের দেহকে কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা গেলেও এদের মূল থাকে না, মূলের পরিবর্তে রাইজয়েড থাকে। এদের কোন পরিবহণ টিস্যু নেই। এদের ফুল হয় না।	<i>Riccia</i> , <i>Bryum</i> , <i>Barbula</i>
	ফার্নবর্গীয় উদ্ভিদ	এদের দেহকে মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা যায়। দেহের ভিতরে পরিবহণ টিস্যু আছে। এদের ফুল হয় না।	<i>Pteris</i> , <i>Dryopteris</i> , <i>Marsilea</i>
	নগ্নবীজী উদ্ভিদ	এদের দেহকে মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা যায়। দেহের ভিতরে পরিবহণ টিস্যু আছে। এদের ফুল হয় কিন্তু ফল হয় না। কারণ এদের ফুলে গর্ভাশয় থাকে না।	<i>Cycas</i> , <i>Pinus</i> , <i>Gnetum</i>
	আবৃতবীজী উদ্ভিদ (একবীজপত্রী)	এদের ফুল এবং ফল হয়; বীজ ফলের ভিতর থাকে। দেহের ভিতর পরিবহণ টিস্যু আছে। এদের মূল গুচ্ছমূল, পাতার শিরাবিন্যাস সমান্তরাল, ফুল ট্রাইমেরাস; বীজে একটি বীজপত্র থাকে।	<i>Oryza sativa</i> ধান <i>Cocos nucifera</i> নারিকেল
	আবৃতবীজী উদ্ভিদ (দ্বিবীজপত্রী)	এদের ফুল এবং ফল হয়; বীজ ফলের ভিতর থাকে। দেহের ভিতর পরিবহণ টিস্যু আছে। এদের প্রধান মূল থাকে, পাতার শিরাবিন্যাস জালিকা, ফুল টেট্রা বা পেন্টামেরাস; বীজে দুটি বীজপত্র থাকে।	<i>Artocarpus heterophyllus</i> (কাঁঠাল), <i>Psidium guajava</i> (পেয়ারা)

ভাইরাস (Virus)

পৃথিবীতে অনেক ধরনের ভাইরাস আছে। এখানে ভাইরাসের প্রতিনিধি হিসেবে T₂ ফায় ভাইরাসের পরিচিতি ও গুরুত্ব উল্লেখ করা হল।

গঠন বৈশিষ্ট্য : T₂ ফায় অকোষীয়, এর দেহ মাথা ও লেজ—এ দু অংশে বিভক্ত; মাথাটি ষড়ভুজাকৃতির এবং লেজটি দণ্ডাকৃতি। সমস্ত দেহ একটি প্রোটিনের আবরণ দিয়ে গঠিত। মাথার ভিতরে একটি দ্বি-সূত্রক DNA আছে। লেজের উপরের অংশে একটি কলার, নিচের অংশে একটি বেসপ্লেট, স্পাইক ও স্পর্শকতন্তু আছে। ভাইরাসে কোন নিউক্লিয়াস, কোষঝিল্লী, সাইটোপ্লাজম ও অন্য অঙ্গাণু নেই।



চিত্র ৬.১ : T₂ ভাইরাসের গঠন

জনন বৈশিষ্ট্য : ভাইরাস কেবল অন্য কোন জীবকোষের ভিতরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে। T₂-ফায় ব্যাকটেরিয়া কোষকে আক্রমণ করে এবং প্রোটিন আবরণটি বাইরে রেখে কেবল DNA অংশটি কোষের ভিতরে প্রবেশ করে। পরে ব্যাকটেরিয়ার DNA নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে অনেক নতুন ভাইরাস তৈরি করে। শেষ পর্যন্ত নতুন ভাইরাসগুলো ব্যাকটেরিয়ার কোষপ্রাচীর নষ্ট করে বাইরে আসে।

গুরুত্ব : ১। T₂-ফায় ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে। ২। ‘জেনেটিক প্রকৌশল’ এ এর ব্যাপক ব্যবহার হয়।

ভাইরাসের গুরুত্ব : মানুষের হাম, বসন্ত, পোলিও, জলাতঙ্ক, ইনফ্লুয়েন্জা, হার্পিস, ভাইরাল হেপাটাইটিস প্রভৃতি মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে বিভিন্ন ভাইরাস। বিভিন্ন উদ্ভিদ ও ফসলের প্রায় ৩০০ রোগ ভাইরাস দিয়ে হয়ে থাকে। গরু, ছাগল, ভেড়া, শূকর এসব গৃহপালিত পশুর অনেক রোগ হয় ভাইরাসের আক্রমণে। ভাইরাস এইডস (Acquired Immune Deficiency Syndrome= AIDS), ক্যান্সার এসব মারাত্মক রোগের জন্যও দায়ী।

ভাইরাস হতে বিভিন্ন রোগের (বসন্ত, পোলিও, জলাতঙ্ক) প্রতিষেধক টিকাও তৈরি করা হয়।

ব্যাকটেরিয়া (Bacteria)

আমাদের চারপাশে এমনকি দেহের ভিতরও অসংখ্য ব্যাকটেরিয়া আছে। ব্যাকটেরিয়ার প্রতিনিধি হিসেবে এখানে *Clostridium* ব্যাকটেরিয়ার বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব আলোচনা করা হল।

গঠন বৈশিষ্ট্য :

- ১। এটি দণ্ডাকৃতির এবং এককোষী।
- ২। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর অন্ত্রে এবং মাটিতে বাস করে।
- ৩। এটি সালোকসংশ্লেষী রঞ্জকবিহীন।
- ৪। প্রাককেন্দ্রিক অর্থাৎ নিউক্লিয়ার মেমব্রেন, নিউক্লিওলাস ইত্যাদি নেই।
- ৫। কোষের চারদিকে ফ্লাজেলা আছে।
- ৬। এরা অবায়বীয় (anaerobic), গ্রাম পজিটিভ এবং স্পোর সৃষ্টিকারী।

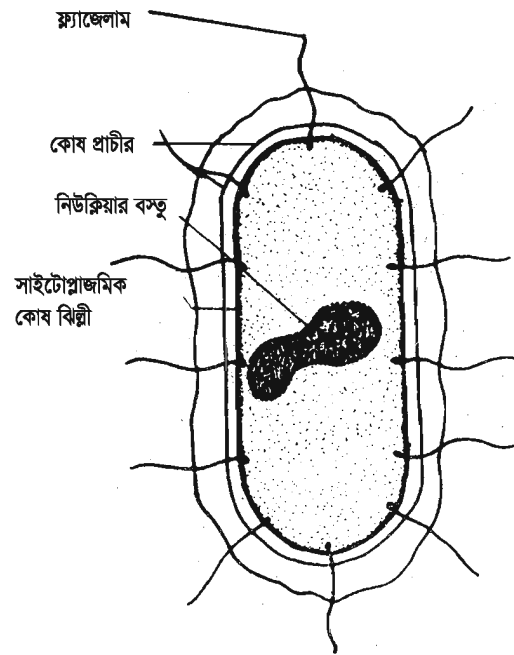
Clostridium-এর গুরুত্ব : *Clostridium tetani* সংক্রমণে ধনুষ্ঠজ্বকার রোগ হয়, *Clostridium botulinum* এর সংক্রমণে বটুলিজম (খাদ্যে বিষক্রিয়া) রোগ হয়।

ব্যাকটেরিয়ার গুরুত্ব : ব্যাকটেরিয়া জীবাণু দিয়ে মানুষের যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড, কলেরা, ডিপথেরিয়া, আমাশয়, ধনুষ্ঠজ্বকার, হুপিংকাশি, মেনিনজাইটিস ইত্যাদি মারাত্মক রোগ হয়ে থাকে। এ ছাড়া ব্যাকটেরিয়া উদ্ভিদেরও বহু রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী। খাদ্যদ্রব্যের পচন ও বিষাক্তকরণ, পানি দূষণ, মাটির উর্বরতা বিনষ্ট এসব ক্ষতির কারণও ব্যাকটেরিয়া।

কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া হতে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ প্রস্তুত করা হয়। কলেরা, টাইফয়েড, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধকও ব্যাকটেরিয়া থেকে তৈরি হয়। এ ছাড়া আবর্জনার পচন, চা, কফি, তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণ, দুধ হতে মাখন, দই, পনির পাটের আঁশ ছাড়ানো, চামড়া হতে লোম ছাড়ানো, কতিপয় বি ভিটামিন প্রস্তুত, পয়ঃপ্রণালির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, মাটির নাইট্রোজেন সংবলন ইত্যাদি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ব্যাকটেরিয়া দিয়ে হয়ে থাকে।

শৈবাল বা অ্যালজি (Algae)

পৃথিবীতে হাজার হাজার প্রজাতির শৈবাল আছে। এদের আকার-আকৃতি ও গঠন—প্রকৃতির মধ্যে আছে ভিন্নতা। তবে এরা সবাই সালোকসংশ্লেষী বিভিন্ন বর্ণকণিকা ধারণ করে অর্থাৎ এরা স্বভোজী। এখানে শৈবালের প্রতিনিধি হিসেবে *Spirogyra*-র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উল্লেখ করা হল।



চিত্র ৬.২ : *Clostridium* ব্যাকটেরিয়াম

গঠন বৈশিষ্ট্য : *Spirogyra* গাঢ় সবুজ বর্ণের অশাখ সূত্রাকার শৈবাল। এদের ক্লোরোপ্লাস্ট ফিতার মত লম্বা এবং কোষের ভিতরে সর্পিলা (Spiral) অবস্থায় বিরাজ করে তাই নাম হয়েছে *Spirogyra*। ক্লোরোপ্লাস্টে পাইরিনয়েড আছে। এদের দেহকোষ লম্বাকৃতির এবং প্রতিটি কোষে একটি সুগঠিত নিউক্লিয়াস এবং বড় কোষ গহ্বর আছে। এদের দেহ পিচ্ছিল এবং কোষপ্রাচীর তিনস্তর বিশিষ্ট।

জনন বৈশিষ্ট্য : কনজুগেশন প্রক্রিয়ায় এদের যৌন জনন হয়। দেহের খন্ডাংশ এবং স্পোর থেকেও এদের বংশবৃদ্ধি হয়।

***Spirogyra*’র গুরুত্ব :** মাছের খাদ্য হিসেবে এটি গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষভাবে প্রক্রিয়াজাত করে মানুষের খাদ্য হিসেবেও ব্যবহার করা যায়, প্রকৃতির খাদ্যচক্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

ছত্রাক (Fungi)

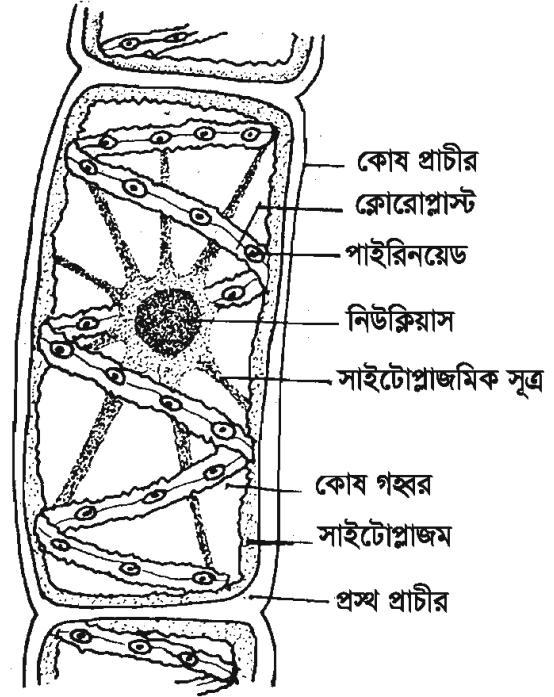
ছত্রাক অসবুজ, কারণ এদের দেহে সালোকসংশ্লেষী বর্ণকণিকা নেই। খাদ্যের জন্য এরা পচা জৈবিক বস্তু অথবা অন্য জীবনের ওপর নির্ভরশীল। ছত্রাকের প্রতিনিধি হিসেবে এখানে *Agaricus* এর সর্ফক্ষিত পরিচিতি উপস্থাপন করা হল।

গঠন বৈশিষ্ট্য : *Agaricus* বহুল আলোচিত একটি ছত্রাক। বাংলায় এটি সচরাচর ব্যাঙের ছাতা নামে পরিচিত।

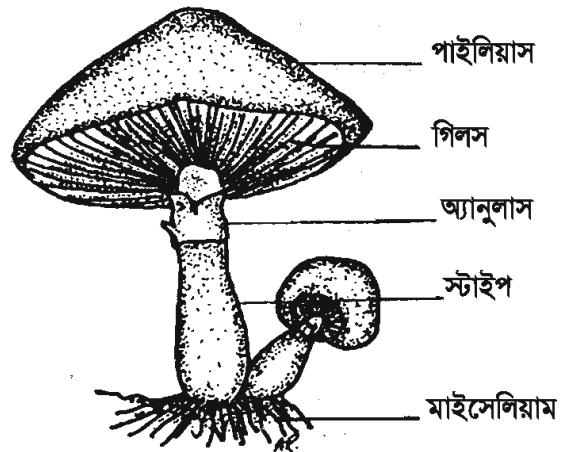
Agaricus এর মূলদেহ অত্যন্ত সরু, সূত্রাকার এবং শাখান্বিত দেহকোষে নিউক্লিয়াস, দানাদার প্রোটোপ্লাজম, তেলের ফোঁটা এবং কোষ গহ্বর থাকে। সাদা সূতার ন্যায় দেহটি সাধারণত মাটির নিচ দিয়ে প্রসারিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত জড়াজড়ি করে মাটির উপরে একটি বিশেষ অঙ্গ গঠন করে। মাটির উপরে এ বিশেষ অঙ্গটিকে বলা হয় ফুটবডি, যা বেসিডিওকার্প নামেও পরিচিত। পূর্ণাঙ্গ ফুটবডি মাশরুম বা ব্যাঙের ছাতা নামে পরিচিত। ছাতার প্রসারিত অংশকে পাইলিয়াস (Pileus) এবং বাটের মত অংশকে স্টাইপ (stipe) বলে। পাইলিয়াসের নিচে গিল (gill) থাকে সেখানে স্পোর উৎপন্ন হয়।

জনন বৈশিষ্ট্য : বেসিডিওস্পোর উৎপাদনের মাধ্যমে এদের বংশবৃদ্ধি হয়।

গুরুত্ব : *Agaricus campestris* নামক প্রজাতি দেশে-বিদেশে প্রচুর চাষ করা হয়। মাশরুম হিসেবে এটি বাজারে বিক্রি হয় এবং উপাদেয় খাদ্য হিসেবে উন্নত হোটেলগুলোতে পরিবেশিত হয়। মাশরুমে বিভিন্ন ধরনের



চিত্র ৬.৩ : *Spirogyra* উদ্ভিদের একাংশ



চিত্র ৬.৪ : *Agaricus* ছত্রাক

উন্নত খাদ্য উপাদান আছে। মাঠে ঘাটে বিষাক্ত মাশরুমও থাকতে পারে। কাজেই নিশ্চিত না হয়ে খাওয়া উচিত নয়।

মসবর্গীয় উদ্ভিদ (Bryophyta)

পৃথিবীতে মসবর্গীয় উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা প্রায় তেইশ হাজার। এদের মাঝে এক বিরাট অংশ দখল করে আছে মস (Moss) নামীয় উদ্ভিদ। বাংলাদেশেও প্রচুর মস উদ্ভিদ জন্মে থাকে। মস উদ্ভিদের প্রতিনিধি হিসেবে এখানে *Bryum* নামক মস-এর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হল। সঁাতসেঁত মাটি, গাছের গুঁড়ি, পুরাতন প্রাচীর প্রভৃতি জায়গায় *Bryum* মস জন্মে।

বৈশিষ্ট্য :

- ১। দেহ রাইজয়েড (মূলের পরিবর্তে), কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত।
- ২। দেহে কোন পরিবহণ টিস্যু নেই।
- ৩। স্ত্রী ও পুরুষ উদ্ভিদ ভিন্ন।
- ৪। পুরুষ মস উদ্ভিদে দ্বিফ্যাজেলা বিশিষ্ট শূক্ৰাণু, স্ত্রী মস উদ্ভিদে সৃষ্ট নিশ্চল ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়ে স্পোরোফাইটের সূচনা করে।
- ৫। স্ত্রী মস উদ্ভিদের মাথায় স্পোরোফাইট সৃষ্টি হয়।
- ৬। ক্যাপসুলের ভিতরে সৃষ্ট স্পোর অঙ্কুরিত হয়ে শৈবালের ন্যায় সবুজ সুত্রাকার প্রোটোনেমা গঠন করে।
- ৭। প্রোটোনেমা হতে মস উদ্ভিদ বিকশিত হয়।

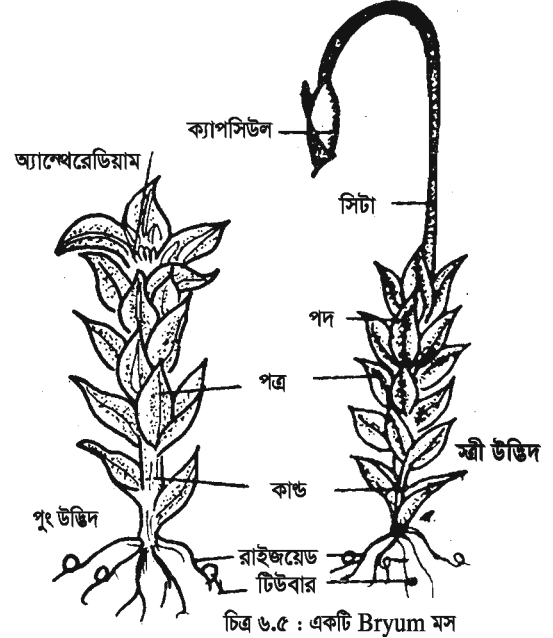
মস উদ্ভিদের গুরুত্ব : মস পাথুরে জায়গায় প্রথম মাটি সৃষ্টিতে সাহায্য করে, মস পানি ধরে রাখতে সাহায্য করে, (*Sphagnum*) মস পিট কয়লা উৎপন্ন করে।

ফার্নবর্গীয় উদ্ভিদ (Pteridophyta)

ফার্নবর্গীয় উদ্ভিদই প্রথম ভাস্কুলার উদ্ভিদ (যাদের পরিবহণ টিস্যু আছে।) ফার্নবর্গীয় উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা প্রায় দশ হাজার। এখানে ফার্নবর্গীয় উদ্ভিদের প্রতিনিধি হিসেবে *Pteris* ফার্ন-এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হল। *Pteris* ফার্ন সানফার্ন নামেও পরিচিতি।

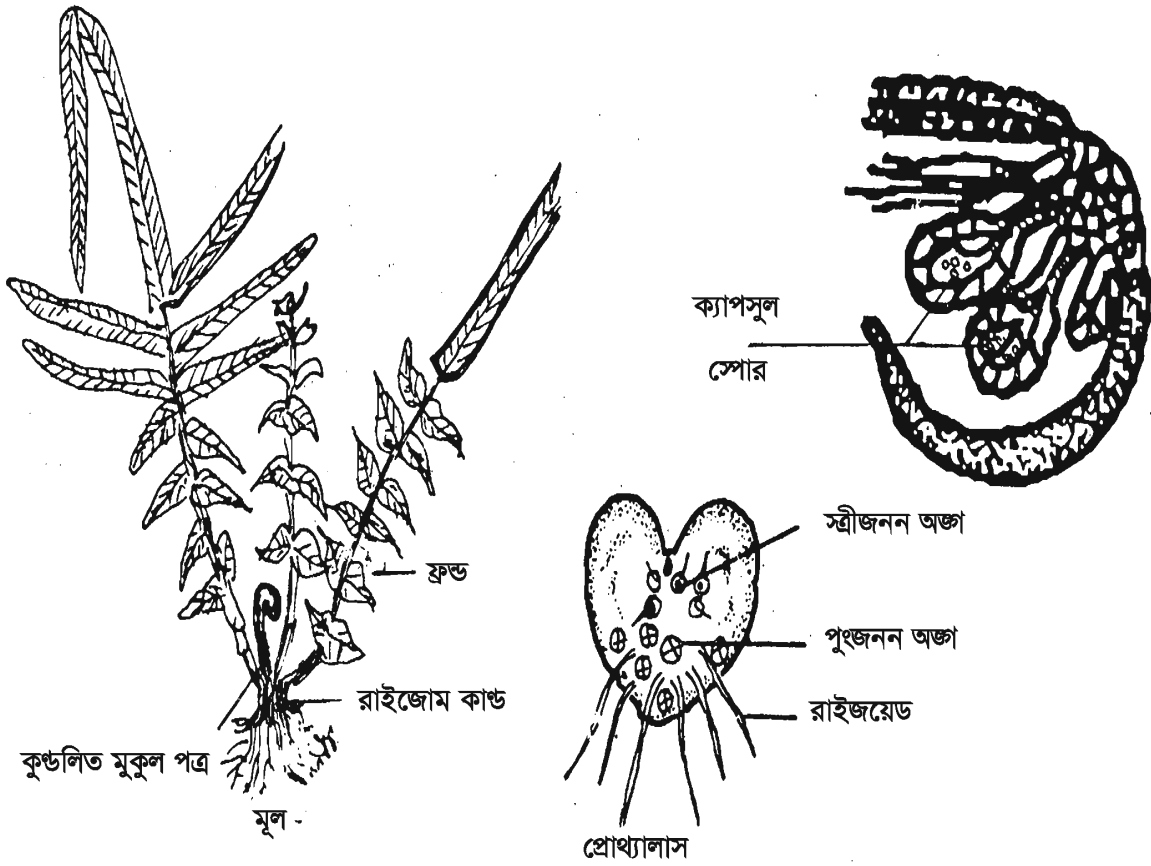
বৈশিষ্ট্য :

- ১। *Pteris* উদ্ভিদ স্পোরোফাইটিক।
- ২। এদের দেহ মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত।
- ৩। কাণ্ড রাইজোম জাতীয়, এর গায়ে শঙ্কুপত্র থাকে।
- ৪। পাতা চিরসবুজ ও পক্ষল যৌগিক। ফার্নের পাতাকে ফ্রন্ড বলে।
- ৫। পাতার মুকুলের পত্রবিন্যাস কুণ্ডলাকৃতি।
- ৬। পরিণত পত্রকের কিনার বরাবর স্পোরাজিয়া উৎপন্ন হয়। স্পোরাজিয়ামের স্ফীত অংশকে ক্যাপসুল বলে। ক্যাপসুলের ভিতরে স্পোর উৎপন্ন হয়।



৭। স্পোর অঙ্কুরিত হয়ে প্রোথ্যালাস (prothallus) নামক সবুজ হৃৎপিণ্ডাকার গ্যামেটোফাইট সৃষ্টি করে। প্রোথ্যালাসে পুং ও স্ত্রী জননাজা সৃষ্টি হয় এবং স্ত্রী ও পুংজনন কোষের মিলনের মাধ্যমে নতুন *Pteris* উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়।

পুরাতন ও ভাঙা প্রাচীরে, পুরাতন ইটের স্তূপে *Pteris* জন্মাতে দেখা যায়।



চিত্র ৬.৬ : একটি *Pteris* ফার্ন ও এর বিভিন্ন অংশ

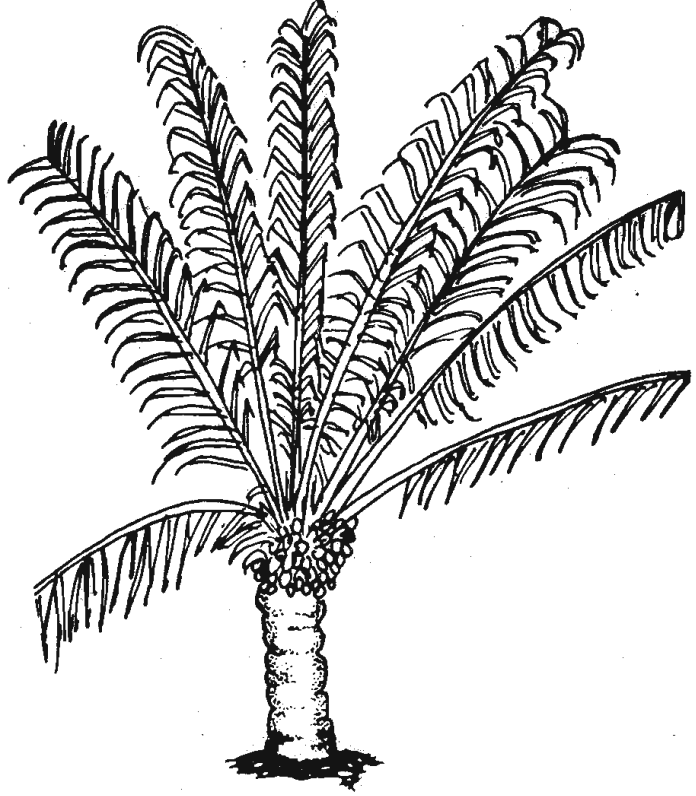
ফার্ন-এর গুরুত্ব : অনেক ফার্ন 'অর্নামেন্টাল' (সাজানো অলংকার) উদ্ভিদ হিসেবে টবে লাগানো হয় টেকি শাক জাতীয় ফার্ন সবজি হিসেবে খাওয়া হয়। কিছু কিছু ফার্ন থেকে ওষুধ তৈরি হয়।

নগ্নবীজি উদ্ভিদ (Gymnosperm)

নগ্নবীজি উদ্ভিদের ফুল হয় এবং বীজও হয় কিন্তু ফল হয় না। একসময় এরা পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত ছিল কিন্তু বর্তমানে এদের সংখ্যা কমে আসছে। সমস্ত পৃথিবীতে নগ্নবীজি উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা মাত্র সাতাশ। বাংলাদেশে মাত্র তিনটি নগ্নবীজি উদ্ভিদ বনে-জঙ্গলে প্রাকৃতিকভাবে জন্মে থাকে। নগ্নবীজি উদ্ভিদের প্রতিনিধি হিসেবে এখানে *Cycas* উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করা হল।

Cycas উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য :

- ১। *Cycas* উদ্ভিদ স্পোরোফাইট। এদের দেহ মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত।
 - ২। এদের পরিবহণ টিস্যু আছে।
 - ৩। পাতা যৌগিক, কতকটা নারিকেল পাতার মত, কাণ্ডের অগ্রভাগে সর্পিলাকারে সজ্জিত থাকে।
 - ৪। মুকুল অবস্থায় পাতাগুলো কুণ্ডলিত থাকে।
 - ৫। মূল দু ধরনের-প্রধান মূল এবং সামুদ্রিক কোরালের মত কোরালয়েড মূল।
 - ৬। স্ত্রী উদ্ভিদ এবং পুরুষ উদ্ভিদ ভিন্ন।
 - ৭। স্ত্রী উদ্ভিদের মাথায় স্ত্রীরেণুপত্র এবং পুরুষ উদ্ভিদের মাথায় পুংরেণুপত্র জন্মে। পুংরেণুপত্র একত্রে মোচার মত হয়।
 - ৮। পরাগায়ন ও নিষেকের পর বীজ তৈরি হয়। বীজ থেকে নতুন গাছ হয়।
- গুরুত্ব : একমাত্র সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যই *Cycas* বাগানে লাগানো হয়। চট্টগ্রামের অরণ্যে *Cycas* বন্য অবস্থায় পাওয়া যায়।



চিত্র ৬.৭ : *Cycas* উদ্ভিদ

একবীজপত্রী উদ্ভিদ (Monocot Plants)

একবীজপত্রী উদ্ভিদের বীজে একটি বীজপত্র থাকে। এদের মূল গুচ্ছমূল, পাতা সমান্তরাল শিরাবিন্যাস যুক্ত, ফুল ট্রাইমেরাস (তিন প্রস্থী) হয়। ধান, গম, ইক্ষু, বাঁশ, তাল, নারিকেল, সুপারি, খেজুর এসব একবীজপত্রী উদ্ভিদ। একবীজপত্রী উদ্ভিদের প্রতিনিধি হিসেবে এখানে নারিকেল (*cocos nucifera*) গাছের চিত্র, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল।

বৈশিষ্ট্য :

- ১। নারিকেল অশাখ বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ।
- ২। পাতা পক্ষল যৌগিক, কাণ্ডের মাথায় গুচ্ছাকারে অবস্থিত।
- ৩। ফুল মঞ্জুরিতে অবস্থিত, একটি কাষ্ঠল খোলস দিয়ে মঞ্জুরি আবৃত থাকে।

৪। ফুল একলিঙ্গ, স্ত্রী ফুলের সংখ্যা কম এবং মঞ্জুরি শাখার গোড়ার দিকে অবস্থিত; পুরুষ ফুল সংখ্যায় বেশি এবং স্ত্রী ফুলের উপরে অবস্থিত।

৫। ফুলে ৩টি বৃত্যংশ, ৩টি পাপড়ি, ৬টি পুংকেশর (পুরুষ ফুলে) এবং ৩টি স্ত্রীকেশর (স্ত্রী ফুলে) আছে।

৬। ফল তন্তুময়, একবীজি।

নারিকেল গাছের গুরুত্ব : কচি নারিকেল অর্থাৎ ডাব একটি কোমল পানীয়, বুনা নারিকেল মিষ্টান্ন তৈরিতে ব্যবহৃত হয়, তরকারি হিসেবেও খাওয়া হয় আবার এ থেকে নারিকেল তেলও পাওয়া যায়। ফলের ছোবা দিয়ে দড়ি, গদি ইত্যাদি তৈরি করা হয়। পাতা ঘরের চাল তৈরির কাজে লাগানো হয়, পত্রকের প্রধান শিরা দিয়ে ঝাড়ু তৈরি করা হয়। পাতা, কাণ্ড জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।



চিত্র ৬.৮ : নারিকেল গাছ

দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ (Dicot Plants)

দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের বীজে দুটি বীজপত্র থাকে। এদের মূল প্রধান মূল, পাতা জালিকা শিরাবিন্যাসযুক্ত, ফুল ট্রেট্রামেরাস (চারপ্রস্থী) (অর্থাৎ ফুলের বৃত্যংশ, পাপড়ি এগুলো ৪টি করে বা ৪ এর গুণিতক) বা পেট্রামেরাস (পাঁচ প্রস্থী) হয়। পৃথিবীতে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের সংখ্যাই বেশি। আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল, শাল, সেগুন, মেহগনি, গর্জন, সুন্দরী এসবই দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের প্রতিনিধি হিসেবে এখানে পেয়ারা গাছের (*Psidium guajava*) বৈশিষ্ট্য ও একটি ছোট শাখা চিত্র দেয়া হল :

বৈশিষ্ট্য :

১। পেয়ারা গাছ স্পোরোফাইট, ছোট ধরনের বৃক্ষ, শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট।

২। পাতা সরল, প্রতিমুখ।

৩। ফুল সাধারণত একক, প্রতি পাতার কক্ষে একটি করে বোঁটা যুক্ত ফুল হয়।

৪। ফুলে গর্ভাশয় থাকে নিচে, অন্যান্য অংশ উপরে।

৫। ফুল উভয়লিঙ্গ, সমাঙ্গ, সাদা, বৃত্যংশ পাঁচটি, মুক্ত, পাপড়ি পাঁচটি, মুক্ত, পুংকেশর মুক্ত এবং অসংখ্য, গর্ভপত্র ৫টি, সংযুক্ত।

৬। পাকা ফল ভিতরে গোলাপি, সাদা বা সাদা-লালের মিশ্রণ, ভিতরে অনেক বীজ থাকে।

গুরুত্ব : পেয়ারার প্রধান গুরুত্ব এর ফলে। ফলের জন্যই চাষ করা হয়। পাকা ফল সুস্বাদু, সবটুকুই খাওয়া যায়। ফল থেকে জ্যাম, জেলি তৈরি করা হয়। পাতা উদরাময়, ও আমাশয় রোগের ঔষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দাঁতের মাড়ির ব্যথায় পেয়ারা পাতা সিন্দু পানি বেশ উপকার সাধন করে।



চিত্র ৬.৯ : পেয়ারা গাছের একাংশ

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। দাঁত ব্যথা উপশমে কোন গাছের পাতাসিন্ধ পানি ব্যবহার করা হয়?

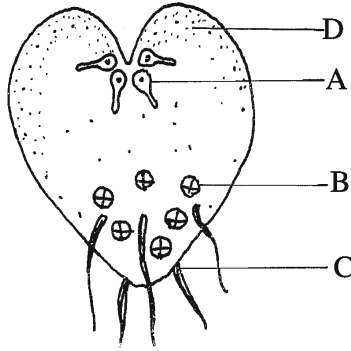
- ক. নিম খ. জাম
গ. পেয়ারা ঘ. চিরতা

২। *Agaricus*-এ ছাতার মত প্রসারিত অংশটি হল-

- i. ফুটবডি
ii. পাইলিয়াস
iii. মাশরুম

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii



উপরের চিত্র অবলম্বনে ৩নং ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

৩। চিত্রে প্রদর্শিত কোন অংশটি পুঞ্জনন কোষ সৃষ্টি করে?

- ক. A খ. B
গ. C ঘ. D

৪। প্রদর্শিত চিত্রটি-

- i. গ্যামেটোফাইট
ii. স্পোরোফাইট
iii. ক্যাপসুল

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। ফ্রান্সের স্কুলগুলোর শীতকালীন ছুটিতে ছাত্রছাত্রীরা প্রায়ই দলবেঁধে ক্যাম্পিং করতে বনে যায়। একবার এ ধরনের এক ক্যাম্পিং-এ ছাত্রছাত্রীরা বনের রাস্তার ধারে নানা ধরনের মাশরুম দেখতে পায় এবং সবাই মিলে মাশরুম খাওয়ার উৎসবে মেতে ওঠে। এতে কিছুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন তাদের দ্রুত হাসপাতালে পাঠানো হয়।

- ক. মাশরুম কী?
খ. কিছুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ার সম্ভাব্য কারণ ব্যাখ্যা কর?
গ. ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে কী করা উচিত তা বর্ণনা কর।
ঘ. বাংলাদেশের মানুষের খাদ্য তালিকায় নিয়মিত মাশরুম খাওয়ার উপযোগিতা যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।

অধ্যায় সাত

প্রাণিবৈচিত্র্য ও শ্রেণীবিন্যাস

প্রাণিবৈচিত্র্য : পৃথিবীর বৈচিত্র্যময় ভৌগোলিক পরিবেশ এবং জলবায়ুর সাথে খাপ খাইয়ে বাস করে অসংখ্য ছোট-বড় উদ্ভিদ এবং প্রাণী। একই প্রজাতির জীব ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে সাফল্যের সাথে টিকে থাকার জন্য ভিন্ন ভিন্নভাবে পরিবর্তিত বা অভিযোজিত হয়। ফলে একটা সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রাণীর এবং উদ্ভিদের আবির্ভাব হয়। জীবদের এই বিভিন্নতা বা বৈচিত্র্যকে জীববৈচিত্র্য (biodiversity) বলে এবং প্রাণিজগতে প্রাণীদের যে বৈচিত্র্য দেখা যায় তাকে প্রাণিবৈচিত্র্য (Animal diversity) বলা হয়। অনুরূপভাবে উদ্ভিদের বৈচিত্র্যকে উদ্ভিদ বৈচিত্র্য (Plant diversity) বলে। অর্থাৎ প্রকৃতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অঞ্চলে সাফল্যমন্ডিতভাবে বংশবিস্তার করে টিকে থাকার উদ্দেশ্যে প্রাণী প্রজাতিগুলোর বহিঃঅঙ্গসংস্থান ও অন্তঃঅঙ্গসংস্থান, আকার, আকৃতি, প্রকৃতি, ইত্যাদির প্রয়োজনীয় পরিবর্তিত সাধন করে অভিযোজিত হওয়ার ফলে প্রাণীদের মধ্যে যে বৈচিত্র্যময়তার উদ্ভব ঘটেছে তাকে প্রাণিবৈচিত্র্য বলে।

এই বৈচিত্র্যের ফলেই পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীদের আবির্ভাব ঘটেছে।

এই বৈচিত্র্যময়তা বা প্রাণিবৈচিত্র্য সম্বন্ধে সর্গক্ষিত বিবরণ :

প্রাণীদের বৈচিত্র্যময়তার জন্য প্রাণিবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ভিত্তিতে প্রাণিজগতের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। যথা :

১. আকার-আকৃতির ভিত্তিতে : আকারের ভিত্তিতে প্রাণী প্রধানত দু ধরনের হয়। যেমন :

ক. আলোক আণুবীক্ষণিক : এসব প্রাণীকে সাধারণ আলোক আণুবীক্ষণিক যন্ত্রের সাহায্যেই ভাল করে পর্যবেক্ষণ করা যায়। যেমন : অ্যামিবা, হাইড্রা, সাইরুপ্স, ড্যাফনিয়া, ইত্যাদি প্রাণী।

খ. বড় প্রাণী : এরা আণুবীক্ষণিক নয়। এসব প্রাণীকে খালি চোখে দেখা যায়। অসংখ্য ছোট, মাঝারি, বৃহৎ ও অতিবৃহৎ প্রাণী এই গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত। যেমন : পিপড়া, মাছি, মশা, জোক, কেঁচো, আরশোলা, ব্যাঙ, কাছিম, টিকটিকি, সাপ, কুমির, কুকুর, বিড়াল, ছাগল, গরু, বাদুড়, তিমি, মানুষ ইত্যাদি প্রাণী।

২. প্রতিসাম্যের ভিত্তিতে : জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গের আনুপাতিক আকৃতি, গঠন, আকারের বিবরণ ইত্যাদিকে প্রতিসাম্য বলে। প্রতিসাম্যের ভিত্তিতে প্রাণী প্রধানত তিন প্রকারের। যথা :

ক. অপ্রতিসাম্য : কোন তল দ্বারাই প্রাণীকে সমদ্বিখন্ডিত করা যায় না। অ্যামিবা, শামুক, ইত্যাদি।

খ. দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম : মাত্র একটি তল দ্বারাই প্রাণীকে সমদ্বিখন্ডিত করা যায়। আরশোলা, টিকটিকি, ব্যাঙ, মাছ, মানুষ ইত্যাদি।

গ. অরীয় প্রতিসম : একাধিক তল দ্বারা প্রাণীকে সমদ্বিখন্ডিত করা যায়। হাইড্রা, জেলি ফিস, তারামাছ ইত্যাদি।

৩. বাসস্থানের ভিত্তিতে : প্রাণী বিভিন্ন প্রকারের হয়। যথা :

ক. স্থলচর (Terrestrial) : এরা স্থলে বা ডাঙায় বাস করে। যথা : আরশোলা, কুনোব্যাঙ, ছাগল, গরু, বাঘ, মানুষ।

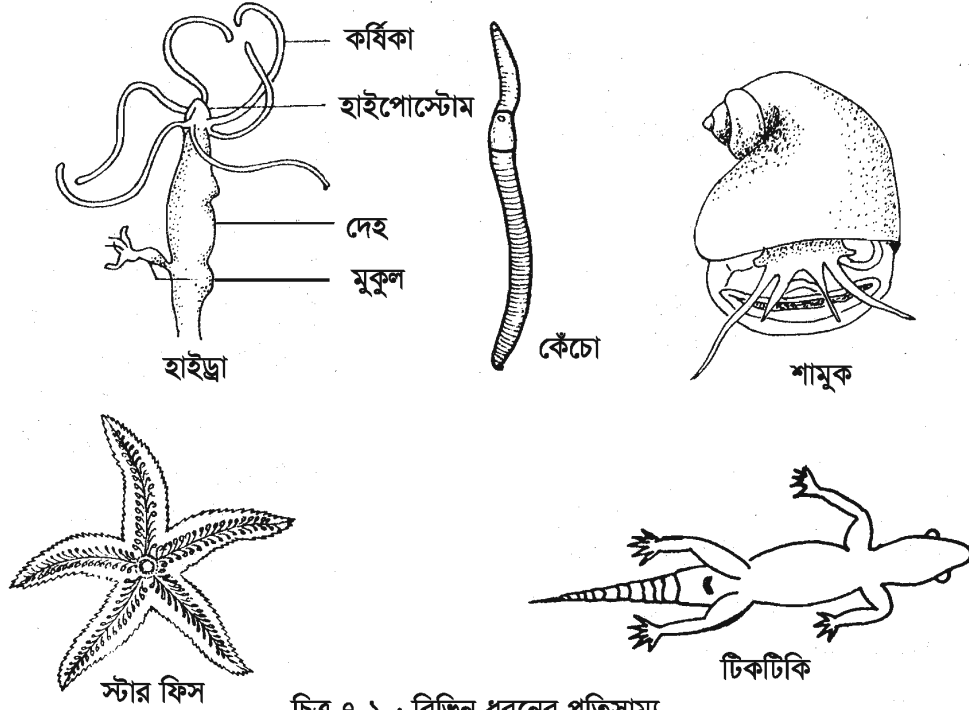
খ. জলচর (Aquatic) : এরা পানিতে বাস করে। জলচর প্রাণী দু ধরনের। যথা :

(i) স্বাদুপানির (Freshwater) প্রাণী : হাইড্রা, শিং মাছ, কই, সোনাব্যাঙ, কচ্ছপ, কুমির ইত্যাদি।

(ii) সামুদ্রিক (Marine) প্রাণী : লইটা মাছ, ডলফিন, তিমি, জেলি ফিস, হাঙর, তারামাছ, প্রবালকীট।

গ. খেচর (Aerial) : এসব প্রাণী আকাশে উড়তে পারে। যথা : বাদুড়, চামচিকা, বিভিন্ন প্রজাতির পাখি।

ঘ. বৃক্ষবাসী বা গেছোপ্রাণী (Arboreal) : এরা গাছে বাস করে। যথা : গেছোব্যাঙ, অজগর সাপ, তক্ষক বিভিন্ন প্রজাতির বানর, লেমুন, চিতাবাঘ ইত্যাদি।



চিত্র ৭.১ : বিভিন্ন ধরনের প্রতীক

ঙ. মরুবাসী : উট, দুগ্ধা ইত্যাদি। এরা মরুভূমির প্রাণী।

চ. গর্তবাসী : ইঁদুর, শিয়াল, প্লাটিপাস, কিছুসংখ্যক সাপ, কেঁচো ইত্যাদি।

ছ. মেরুবাসী : মেরু অঞ্চলের বরফাচ্ছন্ন স্থানে কিছু কিছু প্রাণী বাস করে। যথা : শ্বেতভল্লুক, বন্যহরিণ, পেঙ্গুইন।

জ. অরণ্যবাসী : বাঘ, ভালুক, বানর, হরিণ, ময়ূর, হাতি, বিভিন্ন প্রজাতির সাপ ও পাখি, শূকর, বন্য মহিষ ইত্যাদি প্রাণী গভীর অরণ্যে বাস করে।

ঝ. পর্বতবাসী : গয়াল, পাহাড়ি ছাগল, হাতি ইত্যাদি প্রাণী পাহাড়ি অঞ্চলে বাস করে।

৪. স্বভাবের ভিত্তিতে : স্বভাবের ভিত্তিতে প্রাণী প্রধানত দু প্রকার। যথা :

(ক) দিবাচর (Diurnal) : এরা প্রধানত দিনে সক্রিয় থাকে। যেমন : হরিণ, কাঠবিড়াল, গরু, ঘোড়া, হাঁস, মুরগি, শকুন, প্রজাপতি, ফড়িং, চিল, বক ইত্যাদি।

(খ) নিশাচর (Nocturnal) : এসব প্রাণী রাতের বেলা সক্রিয় থাকে। যেমন : বাঘ, শিয়াল, বিভিন্ন ধরনের মথ, ছুঁচা, পঁচা ইত্যাদি।

৫. খাদ্যের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে : প্রাণী প্রধানত তিন ধরনের। যথা :

(ক) উদ্ভিদভোজী বা শাকাসী বা তৃণভোজী (Herbivorous) : এসব প্রাণী ঘাস বা অন্যান্য উদ্ভিদ ভক্ষণ করে। যথা : ছাগল, ভেড়া, গরু, মহিষ, হাতি, ঘোড়া, খরগোশ, গিনিপিগ ইত্যাদি।

(খ) মাংসাশী বা মাংসভোজী প্রাণী (Carnivorous) : এরা সাধারণত শিকারী প্রাণী। অন্য পশু ভক্ষণ করে। যথা : বাঘ, হিংস, শিয়াল, শকুন, চিল, হায়েনা ইত্যাদি।

(গ) সর্বভুক (Omnivorous) : এরা সব ধরনের খাবার খায়। আরশোলা, কাক, গৃহপালিত কুকুর, বিড়াল ও মানুষ।

৬. পুষ্টি লাভের ভিত্তিতে : প্রাণীদের পুষ্টি সাধারণত হলোজোয়িক বা পরভোজী বা হেটেরোট্রফিক (Heterotrophic) ধরনের। এরা নিজের পুষ্টির জন্য উদ্ভিদ বা প্রাণী খেয়ে থাকে। কারণ এরা নিজের খাদ্য নিজে

তৈরি করতে পারে না। পরভোজী প্রাণী আবার প্রধানত তিন ধরনের হয়। যথা :

- (i) **মৃতজীবী** : এরা উদ্ভিদ বা প্রাণীর মৃতদেহ খেয়ে বাঁচে। যথা : আরশোলা, কাক, শকুন, হায়েনা ইত্যাদি।
- (ii) **পরজীবী** : এরা অন্য জীবের অর্থাৎ পোষকের দেহ থেকে পুষ্টি লাভ করে। এরা আকারে পোষকের চেয়ে ছোট হয়। এরা পোষক দেহের ভিতরে বা বাইরে বাস করে। যথা : গোলক্রিমি মানুষের দেহের অন্তঃপরজীবী, উঁকুন বহিঃপরজীবী হিসেবে মানুষের দেহে বসবাস করে।
- (iii) **শিকারি প্রাণী** : এরা সাধারণভাবে এদের শিকার থেকে আকারে বড়। এরা এদের শিকারকে একেবারে মেরে ফেলে এবং তাদের মাংস খায়। যথা : বাঘ, সিংহ, শিয়াল, নেকড়ে ইত্যাদি।

৭. **মেরুদন্ডের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ভিত্তিতে** : প্রাণিদেহে মেরুদন্ডের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতির ওপর নির্ভর করে প্রাণীদেরকে দুটি প্রধান দলে ভাগ করা যায়। যথা :

(ক) **অমেরুদন্ডী প্রাণী (Invertebrates)** : কেঁচো, আরশোলা, গোলক্রিমি, জেলিমাছ, তারামাছ, অষ্টোপাস, শামুক, ঝিনুক, হুকওয়ান ইত্যাদি অমেরুদন্ডী প্রাণী। এদের মেরুদন্ড থাকে না।

(খ) **মেরুদন্ডী প্রাণী বা মেরুদন্ড বিশিষ্ট প্রাণী (vertebrates)** : এসব প্রাণীর ভূগীয় দশায় নটোকর্ড (Chordata) পর্বের একটা শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য। পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় মেরুদন্ডে পরিণত হয়। যেমন : বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, উভচর প্রাণী, সরীসৃপ, পাখি এবং মানুষসহ বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণী। মেরুদন্ডী প্রাণীদেরকে কর্ডাটা পর্বের অধীনে ভার্টেব্রাটা (vertebrate) বা মেরুদন্ডী উপপর্বে স্থাপন করা হয়েছে।

১. **মানুষের অর্থনৈতিক গুরুত্বের ভিত্তিতে প্রাণীদেরকে প্রধান দুভাগে ভাগ করা যায়। যেমন :**

i) **উপকারী প্রাণী** : পৃথিবীতে বহুসংখ্যক কীটপতঙ্গ ও পশুপাখি আছে, যারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে মানুষের নানা ধরনের উপকার সাধন করে। যথা : মৌমাছি, রেশমপোকা, বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, কুকুর, বিড়াল, ছাগল, গরু, ঘোড়া, গাধা, হাতি, বিভিন্ন পাখি ইত্যাদি।

ii) **ক্ষতিকর প্রাণী** : বহু প্রাণী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের ক্ষতিসাধন করে। যেমন : মশা, মাছি, উইপোকা, ফিতাক্রিমি, গোলক্রিমি বা কেঁচোক্রিমি, সাপ, ইঁদুর, বাঘ, সিংহ ইত্যাদি এবং ফসলের অনিষ্টকারী পোকা।

আপাতদৃষ্টিতে মানুষের জন্য ক্ষতিকর হলেও প্রাণিজগতে সকল প্রাণীরই কোন-না-কোন প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা, খাদ্যশৃঙ্খল ঠিক রাখা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সকল প্রাণীরই বিশেষ ভূমিকা থাকে। কাজেই জীবজগতের তথা মানুষের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য কোন জীবকে অকারণে মেরে ফেলা উচিত নয়। কারণ তাতে পরবর্তী সময়ে বাস্তুতন্ত্রের (ecosystem) ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। এজন্য মানব সমাজের ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া হতে পারে। মানুষের প্রয়োজনীয় উপকারী প্রাণীদেরকে কাজে লাগানোর জন্য এবং ক্ষতিকর প্রাণীদের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রাণিজগতের সদস্যদের সম্মুখে সকলেরই জ্ঞান লাভ করা উচিত। প্রাণীরা দেশের মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় সম্পদ। এদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া এবং এদের সংরক্ষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা সকল সচেতন মানুষের কর্তব্য। নতুবা মূল্যবান প্রাণিজ সম্পদ অচিরেই পৃথিবীর বুক থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে আগামী দিনের মানব সমাজ।

শ্রেণীবিন্যাসবিদ্যা (Taxonomy):

শ্রেণীবিন্যাস : পৃথিবীতে অসংখ্য ছোট বড় ও বৈচিত্র্যময় জীব রয়েছে। এদের প্রত্যেকের সম্মুখে পৃথকভাবে জানা কারও একার পক্ষে সম্ভবপর নয়। এজন্য জীবদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মিল ও অমিলের ভিত্তিতে বিজ্ঞানসন্মত উপায়ে বিভিন্ন দল বা স্তর বা ধাপে (taxon, বহুবচনে taxa) পর্যায়ক্রমে সাজানো হয়। জীবজগৎকে এই ধাপে ধাপে বিন্যস্ত করার পদ্ধতিকে শ্রেণীবিন্যাসকরণ (Classification) বলে। শ্রেণীবিন্যাসকরণের বিদ্যাকে শ্রেণীবিন্যাসবিদ্যা (Taxonomy) বলে। জীবদেরকে বিভিন্ন ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস করা হয়। এসব ভিত্তির মধ্যে প্রাকৃতিক বা আধুনিক শ্রেণীবিন্যাস সর্বাপেক্ষা প্রচলিত। সুইডিস প্রকৃতিবিদ ক্যারোলাস লিনিয়াস (Carolus Linnaeus) প্রাকৃতিক শ্রেণীবিন্যাস প্রথার প্রবর্তন করেন।

শ্রেণীবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা :

(ক) শ্রেণীবিন্যাসের সাহায্যে পৃথিবীর সকল উদ্ভিদ এবং প্রাণী সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মতভাবে অল্প পরিশ্রমে ও অল্প সময়ে জানা যায়।

(খ) কোনও জীবের (উদ্ভিদ/প্রাণীর) শ্রেণীবিন্যাস জানা থাকলে এবং উক্ত শ্রেণীবিন্যাসের ধাপগুলোর (Taxa) শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যাবলি জানা থাকলে সহজেই সেই বিশেষ জীবটির বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়।

(গ) জীবদের বৈশিষ্ট্যের মিল ও অমিলের তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে অপরিচিত জীবকে সহজে চিহ্নিত ও শনাক্ত করা যায়।

(ঘ) ক্ষতিকর এবং উপকারী জীবকে শনাক্ত করা যায়।

সুতরাং কোন উদ্ভিদ বা প্রাণীর বিশেষ করে গাঠনিক বৈশিষ্ট্যাবলির তুলনামূলক নিরীক্ষণ করার ভিত্তিতে উক্ত জীবকে নির্দিষ্ট জগৎ (Kingdom), পর্ব (Phylum), শ্রেণী (Class), বর্গ (Order), গোত্র (Family), গণ (Genus) এবং প্রজাতি (Species) ইত্যাদি ধাপসমূহে স্থাপন করাকে শ্রেণীবিন্যাসকরণ বলে। প্রজাতি শ্রেণীবিন্যাসের একক এবং সর্বনিম্ন ধাপ। উদাহরণ হিসেবে নিচে আরশোলার শ্রেণীবিন্যাস উল্লেখ করা হল।

আরশোলার শ্রেণীবিন্যাস

Kingdom (জগৎ)	:	Animalia
Phylum (পর্ব)	:	Arthropoda
Class (শ্রেণী)	:	Insecta
Order (বর্গ)	:	Dictyoptera (ব্রিটেন ও ইউরোপে ব্যবহৃত) (Orthoptera আমেরিকায় ব্যবহৃত)
Family (গোত্র)	:	Blattidae
Genus (গণ)	:	<i>Periplaneta</i>
Species (প্রজাতি)	:	<i>P. americana</i>

আধুনিক বা প্রাকৃতিক শ্রেণীবিন্যাস লেখার নিয়মাবলি :

১। জগৎ, পর্ব, শ্রেণী, বর্গ, গোত্র, গণ ও প্রজাতি ইত্যাদি ধাপগুলো নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে একটির নিচে অন্যটি লিখতে হয়।

২। ধাপগুলোর সাধারণ নাম ইংরেজি বা বাংলায় এবং বিশেষ নাম অবশ্যই রোমান হরফে লিখতে হবে। যেমন : মানুষের শ্রেণীবিন্যাস লেখার ক্ষেত্রে : মানুষ কর্ডাটা পর্বের প্রাণী। এখানে ধাপের সাধারণ নাম লেখার সময় ইংরেজিতে Phylum বা বাংলায় পর্ব যে কোনও একটা লেখা যায়। কিন্তু ধাপের নাম Chordata অবশ্যই রোমান অক্ষরে লিখতে হবে। কখনো বাংলায় কর্ডাটা লেখা যাবে না।

৩। হাতে লেখার সময় উদ্ভিদ এবং প্রাণী উভয়ের ক্ষেত্রেই Genus বা গণ নামের নিচে এবং Species বা প্রজাতির নামে নিচে দুটি পৃথক সরল রেখা টানতে হবে। যথা : মানুষের ক্ষেত্রে হাতে লিখলে Genus বা গণ : Homo এবং Species বা প্রজাতি : বা Homo sapiens বা H. sapien লেখা যায়।

৪। ছাপার অক্ষরে লেখার সময়ে গণ ও প্রজাতি বাঁকা (italics) অক্ষরে লিখতে হবে। যথা : Genus বা গণ *Homo* এবং Species বা প্রজাতি : *Homo sapiens* বা *H. sapiens* লিখতে হবে।

৫। গণ বা প্রজাতি ব্যতীত হাতে লেখার সময় বা ছাপানোর সময়ে অন্য কোনও ধাপের নিচে দাগ দেওয়া যাবে না।

৬। সকল প্রাণীর গোত্রের নামের শেষে 'idae' এই অক্ষর চারটি থাকবে। যেমন : Hominidae (মানুষের গোত্র), Bufonidae (কুনোব্যাঙের গোত্র)।

৭। অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে ইংরেজিতে Kingdom, Phylum, Class, Order, Family, Genus এবং Species অথবা বাংলায় পর্ব, শ্রেণী, বর্গ, গোত্র, গণ ও প্রজাতি এই ছয়টা ধাপ লিখলেই চলবে। কিন্তু মানুষ, ব্যাঙ, সাপ, মাছ ইত্যাদি সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্ষেত্রে Phylum বা পর্বের নিচে Sub phylum বা উপপর্ব Vertebrata ধাপটা লেখা উচিত। উদাহরণস্বরূপ মানুষ এবং কুনোব্যাঙের শ্রেণীবিন্যাস দেওয়া হল।

(ক) মানুষের শ্রেণীবিন্যাস :

Kingdom (জগৎ)	:	Animalia
Phylum (পর্ব)	:	Chordata
Sub phylum (উপপর্ব)	:	Vertebrata
Class (শ্রেণী)	:	Mammalia
Order (বর্গ)	:	Anthropoidea
Family (গোত্র)	:	Hominidae
Genus (গণ)	:	<i>Homo</i>
Species (প্রজাতি)	:	<i>H. sapiens</i>

(ক) কুনোব্যাঙের শ্রেণীবিন্যাস :

Kingdom (জগৎ)	:	Animalia
Phylum (পর্ব)	:	Chordata
Sub phylum (উপপর্ব)	:	Vertebrata
Class (শ্রেণী)	:	Amphibia
Order (বর্গ)	:	Salientia (ইতিপূর্বে Anura ছিল)
Family (গোত্র)	:	Bufonidae
Genus (গণ)	:	<i>Bufo</i>
Species (প্রজাতি)	:	<i>B. melanostictus</i>

বিঃ দ্রঃ কুনোব্যাঙ, মানুষ ইত্যাদি মেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্ষেত্রে উপপর্ব Vertebrata সহ মোট ৮টি ধাপ লিখতে হবে।

৮। কোনও প্রাণীর শুধু বৈজ্ঞানিক নাম বা প্রজাতিক নাম লেখার সময় অবশ্যই সম্পূর্ণ নামই লিখতে হবে। যেমন: কুনোব্যাঙের বৈজ্ঞানিক নাম : ছাপালে *B. melanostictus* লিখতে হবে। অর্থাৎ শুধু বৈজ্ঞানিক নাম ছাপালে *Bufo melanostictus* লেখা যাবে না।

কিন্তু শ্রেণীবিন্যাস লেখার ক্ষেত্রে Species বা প্রজাতির নাম লেখার সময়ে ছাপালে *Bufo melanostictus* অথবা, *B. melanostictus* লেখা যাবে এবং হাতে *B. melanostictus* বা *Bufo melanostictus* উভয় লেখা যাবে। তবে কখনো শুধু (ছাপালে) *melanostictus* বা (হাতে) *melanostictus* লেখা যাবে না।

৯। বৈজ্ঞানিক নাম সবসময় দুটো পদের সমন্বয়ে লিখতে হয়। এ দুটো পদের প্রথমটা বৈজ্ঞানিক নামের গণ অংশ এবং পরেরটা বৈজ্ঞানিক নামের প্রজাতির অংশ। যথা : কুনোব্যাক্টের বৈজ্ঞানিক নাম *Bufo melanostictus* এখানে Bufo গণ অংশ এবং melanostictus প্রজাতিক অংশ। জীবের নামকরণের এই প্রথা ICZN (International Commission on Zoological Nomenclature) কর্তৃক ১৯৬১ সালে অনুমোদিত হয়।

জীবের বৈজ্ঞানিক নামকরণের ক্ষেত্রে প্রথমে গণের নাম এবং পরে প্রজাতির নাম ব্যবহার করে দুটো শব্দের সমন্বয়ে জীবের (উদ্ভিদ ও প্রাণীর) নামকরণ করার এই পদ্ধতিকে দ্বিপদ নামকরণ বলে।

কয়েকটি প্রাণীর দ্বিপদ নাম :

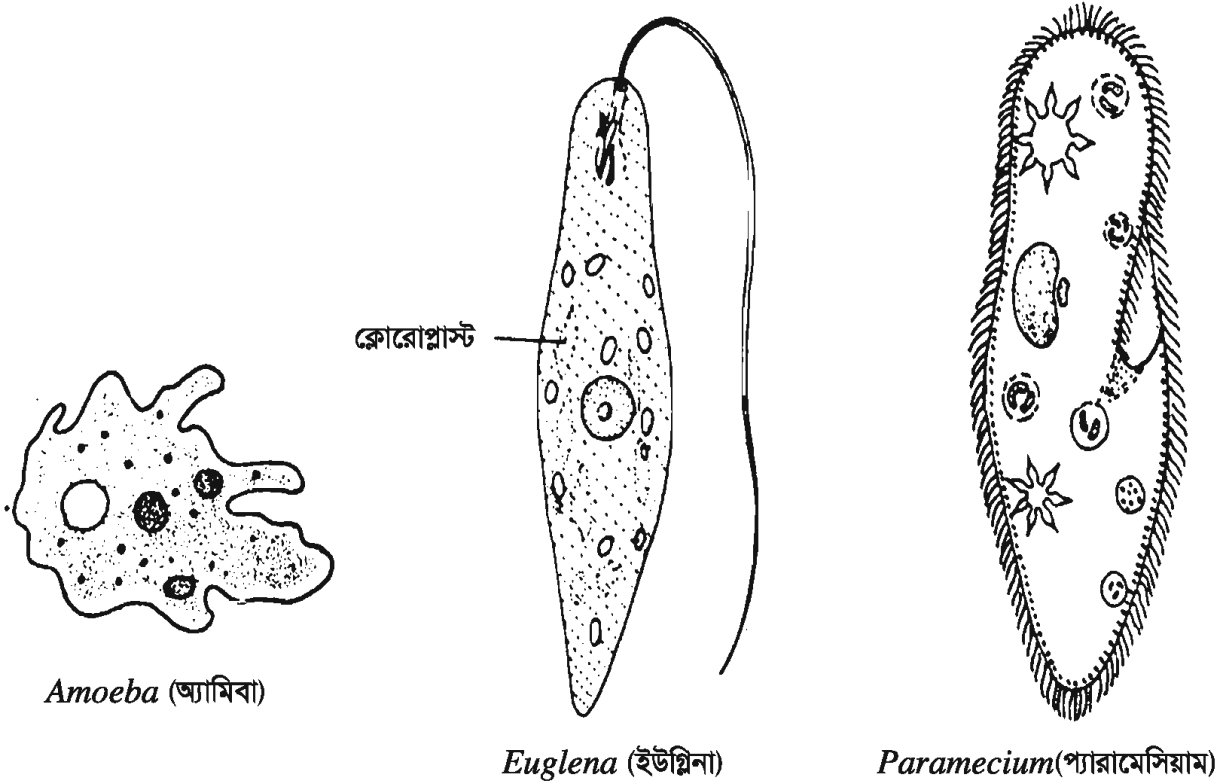
ক্রমিক নং	প্রাণীর নাম	পর্বের নাম	গণ	প্রজাতি
১.	ম্যালেরিয়া জীবাণু	Apicomplexa	<i>Plasmodium</i>	<i>vivax</i>
২.	আরশোলা	Arthropoda	<i>Periplaneta</i>	<i>americana</i>
৩.	মৌমাছি	Arthropoda	<i>Apis</i>	<i>indica</i>
৪.	রুইমাছ	Chordata	<i>Labeo</i>	<i>rohita</i>
৫.	ইলিশ মাছ (জাতীয় মাছ)	Chordata	<i>Hilsa/Tenualosa</i>	<i>ilisha</i>
৬.	সোনাব্যঙ	Chordata	<i>Rana</i>	<i>tigrina</i>
৭.	দোয়েল পাখি (জাতীয় পাখি)	Chordata	<i>Copsychus</i>	<i>saularis</i>
৮.	গোখরা সাপ	Chordata	<i>Naja</i>	<i>naja</i>
৯.	রয়েল বেঙ্গাল টাইগার (জাতীয় প্রাণী)	Chordata	<i>Panthera</i>	<i>tigris</i>
১০.	সিংহ	Chordata	<i>Panthera</i>	<i>leo</i>
১১.	বন মুরগি	Chordata	<i>Gallus</i>	<i>gallus</i>
১২.	মানুষ	Chordata	<i>Homo</i>	<i>sapiens</i>

প্রাণিজগতের প্রধান পর্বগুলোর নাম :

ইতিপূর্বে প্রাণীদের মত এককোষী জীবদের প্রাণিজগতের Protozoa (প্রোটোজোয়া) পর্বের অন্তর্ভুক্ত করা হত। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত ৫-জগৎ ধারণায় এদের প্রাণিজগৎ থেকে আলাদা করে প্রোটিস্টা (Protista) বা প্রোটক্টিস্টা (Protoctista) জগতে স্থান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এযাবৎকাল প্রোটোজোয়ার পর্ব প্রাণিবিদ্যার অন্তর্গত ছিল বলে এখনও এদের প্রাণিবিদ্যায় পাঠ দান করা হয়। গত শতাব্দীর ৮০-এর দশকে আন্তর্জাতিক প্রোটোজোয়ালজিস্টদের সমিতি সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে এককোষী প্রোটোজোয়ারের মধ্যে বিভিন্নতা এত বেশি যে এদের সদস্যদের মাত্র একটি পর্বে বিন্যস্ত করা ঠিক নয়। তাই তারা এদের সাতটি (৭) স্বতন্ত্র পর্বে ভাগ করেন। এই বিন্যাসে Protozoa, Protoctista বা Protista জগতের একটি উপজগৎ (Subkingdom) এবং এতে সাতটি পর্ব স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে অ্যামিবার পর্ব হল Sarcomastigophorea (সার্কোমাস্টিগোফোরিয়া) এবং ম্যালেরিয়া পরজীবীর পর্ব হচ্ছে Apicomplexa (এপিকমপ্লেক্সা)। এদের এবং প্রাণিজগতের প্রধান নয়টি পর্বের নাম উল্লেখ করা হল। পরে এদের শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে।

Phylum (পর্ব) –Sarcomastigophorea (সার্কোম্যাসটিগোফোরিয়া)

স্বভাব ও বাসস্থান : এ পর্বের জীব পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়। এদের কিছু কিছু প্রাণী মুক্তজীবী। তবে কেউ কেউ দলবদ্ধভাবে বাস করে। কোন কোন প্রজাতি ভেজা ও স্যাঁতসৈঁতে মাটিতে বাস করে। আবার বহু প্রজাতি স্বাদু পানিতে অথবা লবণাক্ত পানিতে বসবাস করে। এ পর্বের বহু সদস্য পরজীবী হিসেবে অন্য কোন উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহে বহিঃপরজীবী বা অন্তঃপরজীবী হিসেবে বাস করে। যথা : (*Amoeba*) স্বাধীনজীবী, স্বাদুপানির জীব।



চিত্র ৭.২ : বিভিন্ন ধরনের এককোষী প্রাণী

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য :

- (ক) এ পর্বের প্রাণীরা এককোষী, আগুবীক্ষণিক। এদের জৈবনিক কার্যাবলি একটি কোষ দ্বারা সম্পন্ন হয়।
- (খ) কোষ পর্দার বাইরে এদের কোষ প্রাচীর নেই। সাইটোপ্লাজমে সেন্ট্রিওল ও একাধিক ক্ষুদ্রাকার গহ্বর আছে, প্লাস্টিড নেই।
- (গ) এরা ক্ষণপদের সাহায্যে চলাচল করে।
- (ঘ) এরা একক বা দলবদ্ধভাবে বাস করে।
- (ঙ) এরা মুক্তজীবী প্রাণী।

উদাহরণ : *Amoeba proteus* (অ্যামিবা জীবাণু)।

Kingdom (জগৎ) : Animalia (অ্যানিম্যালিয়া বা প্রাণী)

১। Phylum (পর্ব)– Porifera (পরিফেরা) :

স্বভাব ও বাসস্থান : এ পর্বের প্রাণীরা সাধারণভাবে স্পঞ্জ নামে পরিচিত। এরা বিভিন্ন আকার, আকৃতি ও বর্ণের হয়। এদের পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়। পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় এরা পানির তলদেশে বা ভাসমান কোন বস্তুতে সাথে সংলগ্ন থাকে। এরা সাধারণত দলবদ্ধ অবস্থায় এবং পরস্পর একীভূত হয়ে অবিচ্ছেদ্যভাবে বসবাস করে। এদের প্রায় উদ্ভিদের মত দেখায়। এদের অধিকাংশ প্রজাতি সামুদ্রিক। তবে কিছু কিছু স্বাদু পানিতে বাস করে।

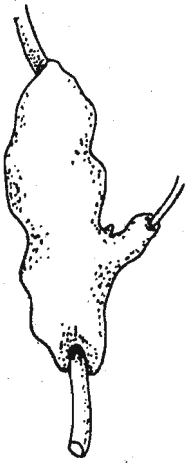
শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য :

- (ক) এরা সরলতম বহুকোষী প্রাণী।
- (খ) এদের দেহে অসংখ্য ক্ষুদ্রাকার ছিদ্র বা অস্টিয়াম থাকে।
- (গ) নালীতন্ত্রের সাহায্যে অভ্যন্তরীণ পরিবহণ ঘটে।
- (ঘ) কোন পৃথক সুগঠিত কলা, অঙ্গ বা তন্ত্র থাকে না।

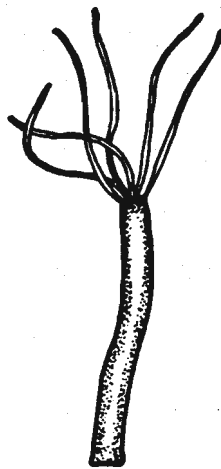
উদাহরণ : *Scypha gelatinosum* (সামুদ্রিক স্পঞ্জ) *Spongilla fragilis* (স্বাদু পানির স্পঞ্জ)

২। Phylum (পর্ব) – Cnidaria (নিডারিয়া) ইতিপূর্বে Coelenterata (সিলেন্টারেটা) নামে পরিচিত ছিল,

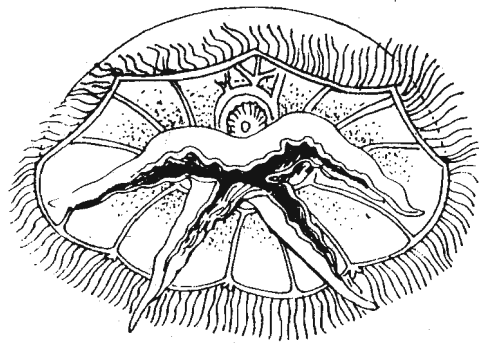
স্বভাব ও বাসস্থান : এ পর্বের বহু প্রজাতি পৃথিবীর প্রায় সকল অঞ্চলের নালী, খাল, পুকুর, নদী, হ্রদ, ঝরনা ইত্যাদি স্বাদু পানির জলাশয়ে বাস করে। তবে এদের অধিকাংশ প্রজাতি সামুদ্রিক। এরা বিচিত্র বর্ণ, আকৃতি ও আকারের হয়। এদের সাগরের সৌন্দর্য বলা হয়। এরা সাধারণত পানিতে ভাসমান কাঠ, পাতা বা অন্য কোনও কিছুর সঙ্গে লেগে থাকে বা মুক্তভাবে সাঁতার কাটে। বহু প্রজাতি এককভাবে এবং বহু প্রজাতি দলবদ্ধভাবে উপনিবেশ গঠন করে বাস করে। যথা : হাইড্রা (*Hydra*) (স্বাদু পানির প্রাণী), জেলি ফিস (লোনা পানির প্রাণী) এবং প্রবালকীট (Corals) সামুদ্রিক।



Spongilla (স্পঞ্জিলা)



Hydra (হাইড্রা)



Aurelia (জেলি ফিস)

চিত্র ৭.৩ : বিভিন্ন পর্বের প্রাণী

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য :

- (ক) এরা দ্বি ভূগস্তরী প্রাণী, দেহ এন্টোডার্ম এবং এন্ডোডার্ম নামে দুটি ভূগীয় কোষস্তর নিয়ে গঠিত। এই দুই স্তরের মধ্যে অকোষীয় মেসোগ্লিয়া থাকে।
- (খ) সিলেন্টেরন বা গ্যাসট্রোভাসকুলার গহ্বর নামক দেহ গহ্বর একাধারে পরিপাক এবং সংবহনে অংশ নেয়।
- (গ) এন্টোডার্মে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নিডোরাস্ট কোষ থাকে।

উদাহরণ : *Hydra vulgaris* (হাইড্রা ভাল্গারিস), *Aurelia aurita* (জেলি ফিস)

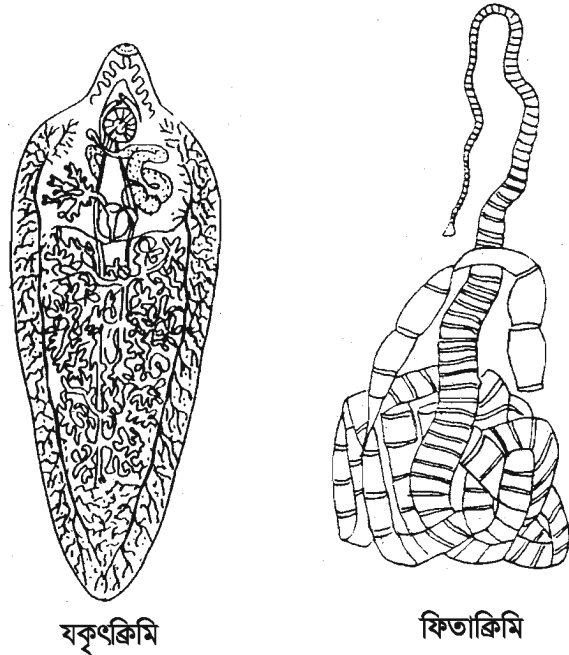
৩। Phylum (পর্ব) Platyhelminthes (প্লাটিহেলমিনথেস) :

স্বভাব ও বাসস্থান : এ পর্বের বহু প্রাণী প্রধানত বহিঃপরজীবী বা অন্তঃপরজীবী হিসেবে অন্য জীবের বাইরে বা ভেতরে বসবাস করে। তবে কিছু কিছু প্রজাতি মুক্তজীবী। এরা স্বাদু পানির নালা, ঝরনা ইত্যাদিতে এবং কিছু কিছু প্রজাতি লবণাক্ত পানিতে বাস করে। আবার এই পর্বের কোন কোন প্রাণী স্যাঁতসেঁতে ও ভেজা মাটিতে বাস করে।

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য :

- (ক) এরা চ্যাপ্টাদেহী, ক্রিমিজাতীয়, উভলিঙ্গা এবং অন্তঃপরজীবী প্রাণী।
- (খ) দেহ পুরু কিউটিকল দ্বারা আবৃত।
- (গ) দেহে চোষক অথবা আংটা আছে।
- (ঘ) রেচন অঙ্গ শিখা কোষ।
- (ঙ) পৌষ্টিক তন্ত্র অসম্পূর্ণ বা অনুপস্থিত।

উদাহরণ : *Taenia solium* (ফিতাক্রিমি), *Fasciola hepatica* (যকৃৎক্রিমি)।



চিত্র ৭.৪: যকৃৎক্রিমি ও ফিতাক্রিমি

৪। (Phylum) পর্ব (Nematoda) (নেম্যাটোডা) : স্বভাব ও বাসস্থান : এ পর্বের অনেক সদস্যই পরজীবী। এদের কেউ কেউ উদ্ভিদের শিকড়ে বা শস্য দানায় (গম, ধান), বিভিন্ন প্রাণীর অন্ত্র, রক্ত এবং অন্যান্য অঙ্গে পরজীবী হিসেবে বাস করে। আবার অনেকেই মুক্তজীবী, এরা মাটি বা পানিতে বাস করে। সদস্য সংখ্যার দিক থেকে এরা প্রাণিজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম পর্ব।

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য :

- (ক) দেহ নলাকার, পুরু ত্বক দ্বারা আবৃত এবং দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম।
- (খ) পৌষ্টিক নালী সম্পূর্ণ (মুখছিদ্র ও পায়ুছিদ্র উভয়ই বিদ্যমান)।
- (গ) দেহ গহ্বর অনাবৃত, প্রকৃত সিলোম নয়।
- (ঘ) সংবহনতন্ত্র এবং শ্বসনতন্ত্র অনুপস্থিত।
- (ঙ) সাধারণত এক লিঙ্গা।



চিত্র ৭.৫: গোলক্রিমি

উদাহরণ : *Ascaris lumbricoides* এ (কেঁচো ক্রিমি বা গোলক্রিমি), *Vermicularis Ancylostoma duodenale* *Enterobius vermicularis* (হুক ওয়ার্ম), (গুঁড়া ক্রিমি), *Rhabditis* মুক্তজীবী, মাটিতে বাস করে।

৫। (Phylum) পর্ব: Annelida (অ্যানিলিডা)

স্বভাব ও বাসস্থান : পৃথিবীর প্রায় সকল নাতিশীতোষ্ণ ও ট্রপিক্যাল অঞ্চলে এই পর্বের প্রাণীদের পাওয়া যায়। এদের স্বভাব, বাসস্থান ও গঠন বৈচিত্র্যপূর্ণ। এদের বহু প্রজাতি স্বাদু পানিতে এবং বহু প্রজাতি সমুদ্রে বাস করে।

এ পর্বের বহু প্রাণী সঁাতসেঁতে মাটিতে বাস করে। এদের মধ্যে কিছু প্রাণী সমুদ্রের পাড়ে, কিছু অগভীর সমুদ্রের তলদেশে বাস করে। অপরপক্ষে কিছু প্রজাতি পাথর বা মাটিতে গর্ত খুঁড়ে বসবাস করে।

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য :

(ক) দেহ প্রকৃত খন্ডায়িত, দেহাবরণ পাতলা কিউটিকল দিয়ে আবৃত।

(খ) নেফ্রিডিয়াম নামক সিলিয়াযুক্ত, গ্রন্থিসমৃদ্ধ প্যাচানো নালিকা রেচন অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।

(গ) সাধারণত সিঁটা সহকারী চলন অঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ : *Pheretima posthuma* (কেঁচো), *Tubifex* (মিঠাপানিতে বাস করে, অ্যাকুরিয়ামের মাছের খাদ্য হিসেবে বিক্রি হয়। ড্রেনে জন্মে। *Hirudo medicinalis* (জ্যাক)।

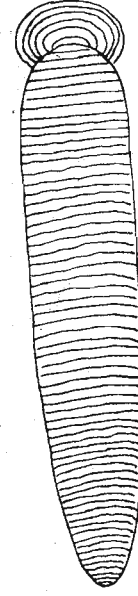
৬। Phylum (পর্ব) Arthropoda (অ্যারথ্রোপোডা)

স্বভাব ও বাসস্থান : এই পর্বটি প্রাণীজগতের সবচেয়ে বড় পর্ব। পৃথিবীর প্রায় ৬০-৬৫% প্রাণী এই পর্বের অন্তর্ভুক্ত। এরা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র বিস্তৃত এবং সম্ভাব্য সকল ধরনের পরিবেশে বসবাস করার জন্য অভিযোজিত। এদের বহু প্রজাতি বহিঃপরজীবী বা অন্তঃপরজীবী হিসেবে বাস করে। ডাঙায়, মিঠা পানিতে এবং সমুদ্রে বসবাসকারী বহু প্রাণী রয়েছে। এদের অনেকেই উড়তে সক্ষম। আরশোলা, প্রজাপতি, বাগদা চিথড়ি, রাজ কাঁকড়া, মাকড়শা ইত্যাদি এই পর্বের সদস্য।

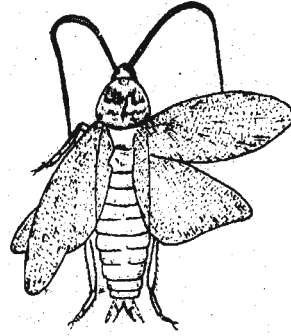
শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য :

(ক) দেহ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত যেমন, মস্তক, বক্ষ ও উদর বা শিরোবক্ষ এবং উদর অথবা মস্তক এবং দেহকাণ্ড (trunk)।
(খ) এ পর্বের প্রাণীদের পাগুলো সন্ধিযুক্ত বা বহুসংখ্যক খন্ডাংশ নিয়ে গঠিত।

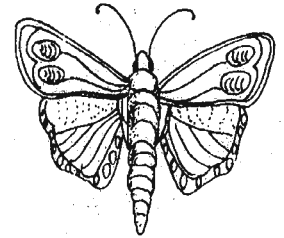
ফর্ম-৯, মাধ্যমিক জীববিজ্ঞান-৯ম



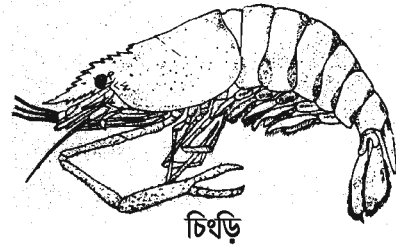
চিত্র ৭.৬: জ্যাক



আরশোলা



প্রজাপতি



চিথড়ি

চিত্র ৭.৭ ক অ্যারথ্রোপোডা পর্বের প্রাণী

গ) দেহ কাইটিন সমৃদ্ধ কিউটিকুল দ্বারা আবৃত।

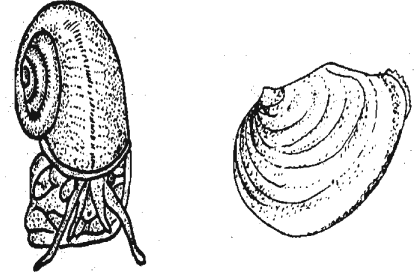
ঘ) মাথায় একজোড়া পুঞ্জাঙ্কী এবং অ্যান্টেনা থাকে।

ঙ) রক্তসমৃদ্ধ দেহগহ্বরকে হিমোসিল বলে।

উদাহরণ : *Periplaneta americana* (আরশোলা), *Bombyx mori* (রেশম পোকা)। (রাজ কাঁকড়া) *Carcinocorpius* একটি জীবন্ত ফসিল।

৭। Phylum (পর্ব) –Mollusca (মলাস্কা)

স্বভাব ও বাসস্থান : এ পর্বের প্রাণীদের গঠন, বাসস্থান ও স্বভাব বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়। এরা পৃথিবীর প্রায় সকল পরিবেশেই বাস করে। এদের অধিকাংশ প্রজাতি খোলকবিশিষ্ট। এরা সামুদ্রিক এবং সাগরের বিভিন্ন স্তরে বসবাস করে। বহু প্রজাতির মলাস্কা পাহাড়ি অঞ্চলে, উপত্যকায়, বনে-জঙ্গলে অথবা সমতলভূমিতে বাস করে। অপরপক্ষে কিছু কিছু প্রজাতি বিভিন্ন ধরনের স্বাদু পানিতে বসবাস করে। যথা- শামুক, অষ্টোপাস ও ঝিনুক।



শামুক

ঝিনুক

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য :

(ক) দেহ নরম, সাধারণত শক্ত খোলক দ্বারা আবৃত।

(খ) দেহের অঙ্গকীয়দেশে স্থূল মাংসপেশি গঠিত পায়ের সাহায্যে চলাচল করে।

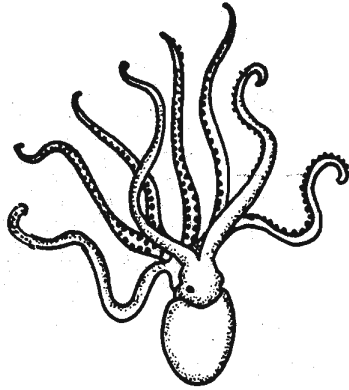
চিত্র ৭.৭ খ মলাস্কা পর্বের প্রাণী

(গ) ফুলকা বা ফুসফুস দিয়ে শ্বসন সম্পন্ন করে।

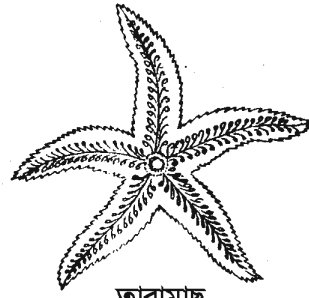
উদাহরণ : *Pila globosa* (আপেল শামুক), *Lamellidens* (ঝিনুক), *Octopus vulgaris* (অষ্টোপাস)।

৮। Phylum (পর্ব) –Echinodermata (একাইনোডার্মাটা)

স্বভাব ও বাসস্থান : এ পর্বের সকল প্রাণীই সামুদ্রিক। এদের স্থলে বা মিঠা পানিতে পাওয়া যায় না। পৃথিবীর সকল সমুদ্রেই নানা প্রজাতির একাইনোডার্মাটা আছে। এদের অধিকাংশ মুক্তজীবী। তবে পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় নিশ্চল জীবন যাপন করে।



অষ্টোপাস



তারামাছ

চিত্র ৭.৮ : অষ্টোপাস ও তারামাছের চিত্র

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য :

(ক) দেহত্বক কাঁটায়ুক্ত।

(খ) দেহ অরীয়ভাবে প্রতিসম বা পাঁচটি সমভাবে বিভক্ত।

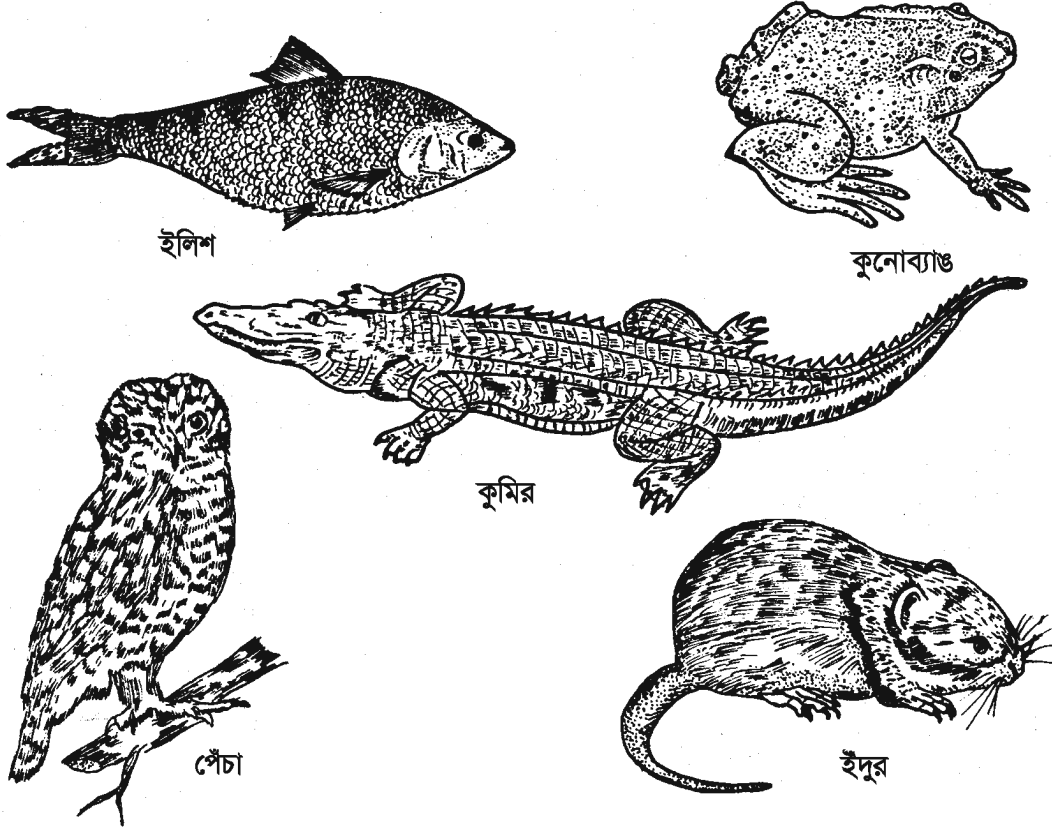
(গ) পানি স্তব্ধনতন্ত্র চলন ও শ্বসন নিয়ন্ত্রণ করে।

(ঘ) পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে মস্তক, পৃষ্ঠীয় বা অঙ্গকীয় তল নির্দেশ করা যায় না। মৌখিক এবং পার্শ্বমুখতল সুস্পষ্ট।

উদাহরণ : *Asterias rubens* (তারামাছ) *Echinus esculentus* (একাইনাস)

৯। Phylum (পর্ব) Chordata (মেরুদণ্ড বিশিষ্ট প্রাণী)

স্বভাব ও বাসস্থান : এরা পৃথিবীর সব পরিবেশে বাস করে। এদের বহু প্রজাতি ডাঙায় বসবাস করে। জলচর কর্ডাটাদের মধ্যে বহু প্রজাতি স্বাদু পানিতে অথবা সামুদ্রিক পানিতে বসবাস করে। বহু প্রজাতি বৃক্ষবাসী, মরুবাসী, মেরুবাসী, গুহাবাসী ও খেচর জীবনযাপন করে। কর্ডাটা পর্বের বহু প্রাণী বহিঃপরজীবী হিসেবে অন্য প্রাণীর দেহে সংলগ্ন হয়ে জীবন ধারণ করে।



চিত্র ৭.৯ : বিভিন্ন ধরনের মেরুদণ্ডী প্রাণী

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য :

কর্ডাটা পর্বের প্রাণীদের সারাজীবন অথবা শুধু ভ্রূণ অবস্থায় চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে। যথা :

১। নটোকর্ড : এদের সারাজীবন অথবা শুধু ভ্রূণাবস্থায় দেহের পৃষ্ঠদেশের মাঝ বরাবর একটা নরম, নমনীয়, দণ্ডাকার, দৃঢ়, অখণ্ডায়িত নটোকর্ড থাকে। উন্নত কর্ডাটায় এটি মেরুদণ্ড দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।

২। পৃষ্ঠদেশে একক, মধ্যম, ফাঁপা মায়ুরজ্জু থাকে।

৩। সারাজীবন অথবা জীবনচক্রের কোন এক পর্যায়ে পার্শ্বীয় গলবিলীয় ফুলকাছিদ্র থাকে।

৪। পায়ুর পশ্চাতে দেহ একটি মাংসল লেজে রূপান্তরিত হয়, যা চলনে বিশেষ সহায়ক, বিশেষত জলচর কর্ডাটাদের জন্য।

উদাহরণ : *Bufo melanostictus* (কুনোব্যাঙ), *Crocodylus porosus* (লোনাপানির কুমির), *Homo sapiens* (মানুষ), *Bubo bubo* (পেঁচা), *Catla catla* (কাতল মাছ), *Ascidia* (অ্যাসিডিয়া), *Scoliodon* (হাঙুর), *Tenualusa ilsha* (ইলিশ), *Mus musculus* (নেংটি ইদুর), *Bandieota indica* (খাড়ি ইদুর)।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোনটির দেহে হিমোসিন থাকে?

- | | |
|------------|----------|
| ক. হাইড্রা | খ. জেঁক |
| গ. চিথড়ি | ঘ. শামুক |

২। হাতির ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য?

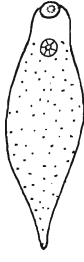
- অরণ্যবাসী ও মাংসাশী
- পর্বতবাসী ও শাকাসী
- মেঝুবাসী ও সর্বভুক

নিচের কোনটি সঠিক?

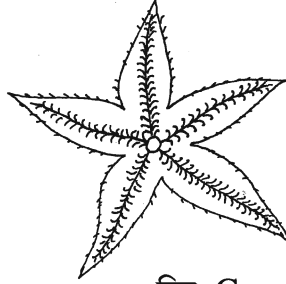
- | | |
|--------|-----------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i ও ii |



চিত্র-A



চিত্র-B



চিত্র-C

উপরের চিত্র অবলম্বনে ৩নং ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

৩। চিত্রের কোন প্রাণীর পুষ্টি অটোট্রফিক?

- A
- B
- C

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|-------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. ii ও iii |

৪। B নং চিত্রের প্রাণীটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল—

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| i. অন্তঃপরজীবী | ii. শিখাকোষ বিদ্যমান |
| iii. অস্ট্রিয়াম বিদ্যমান | |

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। পৃথিবীর বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের প্রাণী বসবাস করে। প্রাণিজগতের বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের মিল ও অমিলের ভিত্তিতে জীববিজ্ঞানীগণ প্রাণীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। নিচে চারটি প্রজাতির প্রাণী চিত্রে দেখানো হল।



- ক. প্রাণিবৈচিত্র্য কাকে বলে?
- খ. জীব বৈচিত্র্য সৃষ্টির একটি কারণ বর্ণনা কর?
- গ. ৪নং চিত্রের প্রাণীটি কোন পর্বভূক্ত তা ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. শ্রেণীবিন্যাস ও বাসস্থান উভয় দিক থেকে চিত্রের কোন দুটি প্রাণীর মধ্যে বেশি মিল ও কোন দুটি প্রাণীর মধ্যে বেশি অমিল রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

অধ্যায় আট

প্রাণীর দৈহিক সংগঠন ও পরিচিতি

অ্যামিবা

Amoeba proteus বা অ্যামিবা একটি এককোষী জীব। এরা আকারে এত ক্ষুদ্র যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া স্পষ্টভাবে এদের দেখা যায় না। অ্যামিবা প্রোটিস্টা (Protista) বা প্রোটোকটিস্টা (Protoctista) জগতের প্রোটোজোয়া উপজগতের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বর্তমানে এরা প্রোটিস্টা জগতের সদস্য হলেও যেহেতু এদের প্রাণীদের সঙ্গেই আলোচনা করা হয়, তাই সেই নিয়ম বলবৎ রেখে প্রাণীদের সঙ্গে এদের পাঠ দান করা হবে।

একটি মাত্র কোষ দিয়ে অ্যামিবার দেহ গঠিত হলেও এ কোষের কাজ কিন্তু খুব সরল নয়। অ্যামিবার কোষে শ্বসন, পুষ্টি, রেচন, বৃদ্ধি, উদ্দীপনা, প্রজনন প্রভৃতি জৈবিক কার্য একটি কোষের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়।

স্বভাব ও বাসস্থান (Habit & Habitat):

সমগ্র পৃথিবীতে অ্যামিবা পাওয়া যায়। পুকুর, নদী, ডোবা ইত্যাদিতে অ্যামিবা বাস করে। নরম সঁাতসঁতে মাটি, জলজ উদ্ভিদের ডাল, পাতা বা কোন কঠিন তলকে অবলম্বন করে এরা বসবাস করে। অ্যামিবা মুক্তজীবী প্রাণী। এদের দেহ থেকে আঙুলের মত ক্ষণপদ সৃষ্টি হয় যা চলাচল ও খাদ্য গ্রহণে সাহায্য করে।

দৈহিক গঠন : অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অ্যামিবাকে বর্ণহীন, স্বচ্ছ এক বিন্দু জেলির মত দেখায়। অ্যামিবার দেহের নির্দিষ্ট কোন আকার নেই কারণ প্রতি মুহূর্তে এরা ক্ষণপদ সৃষ্টির মাধ্যমে আকার বদলায়। তাই এর নির্দিষ্ট আকার যেমন, অগ্র-পশ্চাৎ বা পৃষ্ঠীয়-অঙ্গকীয়দেশ নির্ণয় করা সম্ভবপর হয় না। তাছাড়া অ্যামিবার আকৃতি পরিবর্তনশীল হওয়ায় এর দেহকে সমান দুটি অংশে ভাগ করাও যায় না। এ অবস্থাকে অপ্রতিসম বলে।

একটি পূর্ণাঙ্গ অ্যামিবা আকারে সাধারণত ১ মিলিমিটারের ২০ ভাগের ১ ভাগ থেকে ১ মিলিমিটার পর্যন্ত হতে পারে।

অ্যামিবার দেহকে প্রধান দুটি অংশে ভাগ করা যায়— প্লাজমালেমা ও প্রোটোপ্লাজম।

ক. প্লাজমালেমা (Plasmalemma) বা প্লাজমা পর্দা : অ্যামিবার দেহ প্রোটিন ও লিপিডের সমন্বয়ে গঠিত প্লাজমা পর্দা দ্বারা আবৃত। এ পর্দা পাতলা, সজীব, অর্ধভেদ্য ও স্থিতিস্থাপক।

কাজ

১. প্লাজমা পর্দা অ্যামিবার আকার দান করে।
২. এটি কোষ প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে বিভিন্ন অঙ্গাণুকে ধারণ করে।
৩. পর্দাটি স্থিতিস্থাপক হওয়ায় সহজেই ক্ষণপদ সৃষ্টি করতে পারে।
৪. ব্যাপন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন ও পানি গ্রহণ এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ও বর্জ্য পদার্থ নিঃসরণ করে।
৫. এটি কঠিন তলের সাথে অ্যামিবাকে আটকে রাখতে সাহায্য করে।

খ. প্রোটোপ্লাজম (Protoplasm) : প্লাজমাপর্দা দ্বারা বেষ্টিত জেলির মত পদার্থটি হল প্রোটোপ্লাজম। প্রোটোপ্লাজমকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস।

১। সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm) : নিউক্লিয়াস ব্যতীত প্রোটোপ্লাজমের বাকি অংশটি হল সাইটোপ্লাজম। এটি দুটি অংশে বিভক্ত। যথা : এন্টোপ্লাজম ও এন্ডোপ্লাজম।

এন্টোপ্লাজম (Ectoplasm) : প্লাজমা পর্দার ঠিক পরবর্তী অংশটিই হল এন্টোপ্লাজম। এ অংশটি ঘন, স্বচ্ছ, দানাহীন ও সংকোচনশীল।

কাজ

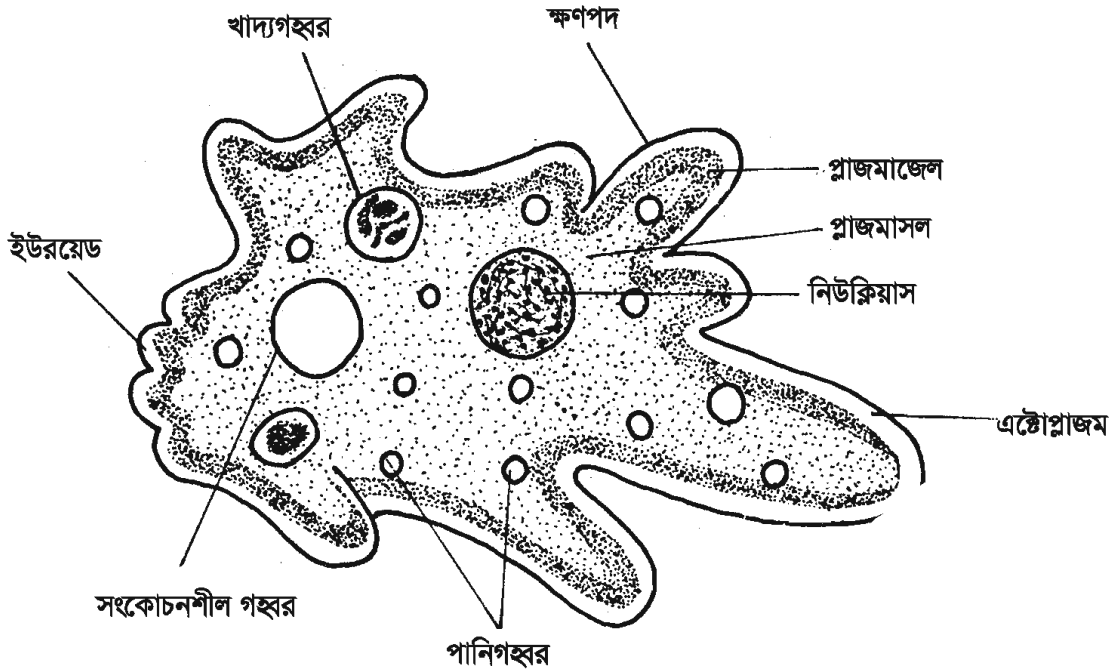
১. এন্টোপ্লাজম দেহের অভ্যন্তরের অঙ্গাণুসমূহকে রক্ষা করে।
২. দেহের আকৃতি বজায় রাখে।
৩. অ্যামিবাকে ক্ষণপদ সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

এন্টোপ্লাজম (Endoplasm) : এন্টোপ্লাজম বেষ্টিত দানাদার অংশের নাম হল এন্টোপ্লাজম। অ্যামিবার দেহের এ অংশটুকু দানাদার, অর্ধস্বচ্ছ ও অপেক্ষাকৃত তরল পদার্থ দিয়ে তৈরি।

এন্টোপ্লাজমের বাইরের অপেক্ষাকৃত ঘন অংশটি প্লাজমাজেল (plasmagel) এবং ভেতরের তরল অংশকে প্লাজমাসল (plasmasol) বলে। প্লাজমাজেলের দানাগুলো সাধারণত স্থির থাকে। কিন্তু প্লাজমাসলে অবস্থিত দানাগুলো সক্রিয় চলন প্রদর্শন করে। প্লাজমাজেল ও প্লাজমাসলের মধ্যকার পার্থক্য ক্ষণস্থায়ী। কারণ এরা সর্বদা একটি অপরটিতে পরিবর্তিত হতে পারে।

কাজ

১. এন্টোপ্লাজম কোষের অঙ্গাণুসমূহকে ধারণ করে।
২. বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজে সহায়তা করে।
৩. প্লাজমাজেল ও প্লাজমাসলের ঘনত্বের পরিবর্তন ঘটিয়ে ক্ষণপদ সৃষ্টিতে সাহায্য করে।



চিত্র ৮.১ : অ্যামিবার আণুবীক্ষণিক গঠন

২। **নিউক্লিয়াস (Nucleus) :** এন্টোপ্লাজমের মাঝখানে যে একটি অস্বচ্ছ ও গোলাকার অংশ দেখা যায় সেটাই হল নিউক্লিয়াস। জীবিত অ্যামিবার দেহে এটি স্পষ্টভাবে দেখা যায় না। অ্যামিবার দেহে একটিমাত্র নিউক্লিয়াস থাকে। নিউক্লিয়াসটি প্রোটিন ও লিপিড নির্মিত নিউক্লিয় আবরণী (Nuclear membrane) দ্বারা আবৃত এবং এর মধ্যে ক্রোমাটিন জালিকা ও নিউক্লিয়াস থাকে। অ্যামিবার নিউক্লিয়াসে নিউক্লিওপ্লাজমের পরিমাণ খুবই কম।

কাজ

১। নিউক্লিয়াস কোষ দেহের কার্যাবলি পরিচালনা করে।

২। নিউক্লিয়াস প্রজননে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু (Cytoplasmic organelles)

(ক) ক্ষণপদ (Pseudopodia) : জীবিত অ্যামিবা দেহের যে কোন অংশ থেকে যে কোন সময় আঙুলের মত অংশ উৎপন্ন হয়। আঙুলের মত এই অভিক্ষেপকে ক্ষণপদ বলে। ক্ষণপদগুলো প্লাজমাপর্দা, এন্টোপ্লাজম ও এন্ডোপ্লাজম নিয়ে গঠিত। এরা অ্যামিবা দেহের অস্থায়ী অঙ্গ এবং প্রয়োজন শেষে এরা বিলীন হয়ে যায়। অগ্রভাগ মোটামুটি গোলাকার এবং ভোঁতা।

কাজ

১। ক্ষণপদ খাদ্য গ্রহণে সাহায্য করে।

২। এরা চলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৩। চলনের সময় ক্ষণপদ অ্যামিবার সম্মুখ দিক নির্দেশ করে।

(খ) গহ্বর (Vacuole) : অ্যামিবার দেহে বিভিন্ন ধরনের গহ্বর থাকে। এসব গহ্বরের উপস্থিতি অ্যামিবার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। গহ্বরগুলোর গঠন আকৃতি অতি সাধারণ। গহ্বরগুলো অ্যামিবার দেহের বিভিন্ন জৈবিক কাজে সহায়তা করে। সাধারণত অ্যামিবার দেহে তিন প্রকার গহ্বর দেখা যায়।

১। সংকোচনশীল গহ্বর (Contractile vacuule) :

অ্যামিবার এন্ডোপ্লাজমে বৃদ্ধবৃদ্ধের মত কতকগুলো গহ্বর দেখা যায়। এ গহ্বরগুলো স্বচ্ছ এবং বর্ধনশীল। জীবিত অ্যামিবার দেহে এরা ধারাবাহিকভাবে সংকুচিত ও প্রসারিত হতে পারে। তাই এর নাম রাখা হয়েছে সংকোচনশীল গহ্বর।

কাজ

১। সংকোচনশীল গহ্বর জলীয় পদার্থ সঞ্চয় করে।

২। অতিরিক্ত পানি ও রচন পদার্থ অপসারণে সহায়তা করে।

৩। শ্বসনের ফলে উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড নিষ্কাশনে সাহায্য করে।

২। খাদ্য গহ্বর (Food Vacuole) : অ্যামিবার দেহে খাদ্যবস্তুকে ঘিরে খাদ্য গহ্বর গঠিত হয়। খাদ্য গহ্বর সংখ্যায় এক বা একাধিক হতে পারে।

এদের আকার, আয়তন ও সংখ্যা খাদ্যবস্তুর আকার, আয়তন ও সংখ্যার ওপর নির্ভর করে।

কাজ

১। খাদ্য গহ্বর খাদ্যবস্তু জমা রাখে।

২। খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে।

৩। অপাচ্য বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনেও সাহায্য করে।

৩। পানি গহ্বর (Water vacuole) : অ্যামিবার দেহের সবচেয়ে ক্ষুদ্র, স্বচ্ছ, গোলাকার, পানিপূর্ণ গহ্বরটি হল পানি গহ্বর। এরা সংখ্যায় এক বা একাধিক হতে পারে। পানি গহ্বর অসংকোচনশীল।

কাজ

পানি গহ্বর পানি ধারণ করে ও দেহের পানির সমতা রক্ষা করে।

অ্যামিবার দেহ অতি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করলে আরও কতকগুলো অঙ্গাণু পরিলক্ষিত হয়।

যথা :

গলজি বডিজ (Golgi bodies) : বিশেষভাবে রং করলে অ্যামিবার এন্ডোপ্লাজমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালিকা (Tubules) এবং ফোসকার (Vesicles) মত কতকগুলো গঠন দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো গলজি বডিজ নামে পরিচিত।

কাজ

১। গলজি দ্রব্য ক্ষরণ ও রেচনে সাহায্য করে।

মাইটোকন্ড্রিয়া (Mitochondria) : সাইটোপ্লাজমের বিভিন্ন স্থানে দণ্ড বা বিন্দুর মত কতকগুলো পদার্থ বেষ্টিত গঠনী দেখতে পাওয়া যায়। এরাই মাইটোকন্ড্রিয়া।

কাজ

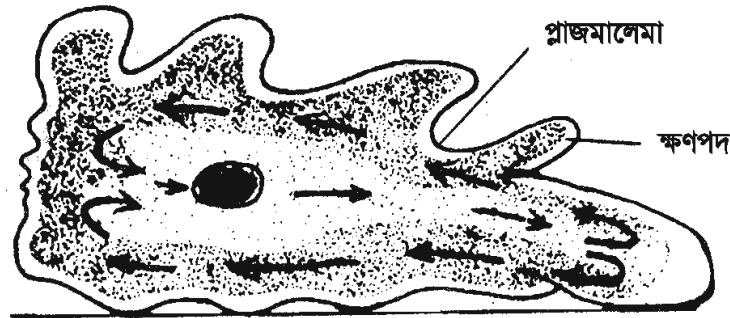
শ্বসন ও শক্তি উৎপাদন এদের প্রধান কাজ।

সঞ্চিত খাদ্য (Reserve food) : অ্যামিবার দেহের এন্ডোপ্লাজম খাদ্যকণা চর্বি ও শর্করারূপে সঞ্চিত থাকে। প্রয়োজনে এ সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্য দেহে পুষ্টি যোগান দেয়।

কেলাস দ্রব্য (Crystals) : অ্যামিবার দেহে বিভিন্ন আকারের কেলাস পদার্থ পাওয়া যায়। ধারণা করা হয় কেলাস পদার্থগুলো বিপাকের ফলে সৃষ্ট বর্জ্য পদার্থ।

চলন (Locomotion) : খাদ্য গ্রহণ, আত্মরক্ষা, অনুকূল পরিবেশের সন্ধানে প্রাণী একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করে। প্রাণীর এরূপ গমন চলন নামে পরিচিত। অ্যামিবা ধীরগতিতে চলাচল করে এবং এর চলন অনিয়মিত। অ্যামিবার প্লাজমালেমা, এন্টোপ্লাজম ও এন্ডোপ্লাজমের সাহায্যে আঙুলের মত অভিক্ষেপ সৃষ্টি করে, যা তার চলনে সাহায্য করে। এইসব অভিক্ষেপকে ক্ষণপদ বা Pseudopodium (বহুবচনে pseudopodia) বলে।

Pseudopodium শব্দের অর্থ হল ‘মেকি বা নকল পা’ (Pseudos শব্দের অর্থ False বা মেকি অথবা নকল এবং Podos শব্দের অর্থ পা) চলনের সময় অ্যামিবা প্রয়োজনমত দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে ক্ষণপদ সৃষ্টি করে, এবং পুনরায় দেহের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। অ্যামিবার এই বিশেষ ধরনের চলনকে অ্যামিবয়েড চলন (Amoeboid locomotion) বলে।



চিত্র ৮.২ : অ্যামিবার চলন

চলনের সময় অ্যামিবার দেহের যে কোন অংশ থেকে ক্ষণপদ বের হয় এবং সেদিকে অগ্রসর হয়। ক্ষণপদ সৃষ্টির সাথে অ্যামিবার দেহের প্রোটোপ্লাজম ক্ষণপদের দিকে প্রবাহিত হয় এবং সে সাথে দেহের অন্যান্য অংশও সেদিকে সরে যায়। এভাবে অ্যামিবা তার লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়। একই সাথে দেহের বিভিন্ন অংশে বা একই দিকে অনেকগুলো ক্ষণপদ

সৃষ্টি হয়। এ কারণে অ্যামিবা একসময়ে যেদিক চলতে পারে ঠিক পরমুহূর্তে অন্যদিকে চলতে পারে। দেহের একপার্শ্বে নতুন ক্ষণপদ সৃষ্টি হলে পুরাতন ক্ষণপদগুলো দেহের ভিতরে বিলীন হয়ে যায়। এভাবে অ্যামিবা গড়িয়ে গড়িয়ে চলে।

পুষ্টি (Nutrition) : শারীরবৃত্তীয় কাজের জন্য শক্তির প্রয়োজন। খাদ্যই এ শক্তির উৎস। পুষ্টি একটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া দ্বারা খাদ্য গ্রহণ, পরিপাক, পরিশোধন, আত্মীকরণ ও বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন ঘটে এবং দেহকোষের পুনর্গঠন ও বৃদ্ধি ঘটে। অ্যামিবা কঠিন ও জটিল জৈব খাদ্য গ্রহণ করে। অ্যামিবার পুষ্টি প্রক্রিয়াকে হলোজয়িক (holozoic) বা হেটেরোট্রফিক (heterotrophic) পুষ্টি বলে।

খাদ্য (Food) : অ্যামিবার ক্ষুদ্র শৈবাল, ব্যাকটেরিয়া, ডায়াটম ও বিভিন্ন অণুজীব খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে।

খাদ্য গ্রহণ পদ্ধতি : অ্যামিবার কোন পৌষ্তিকতন্ত্র নেই। খাদ্য গ্রহণের জন্য কোন মুখ বা অন্য কোন নির্ধারিত অঙ্গ নেই। খাদ্য গ্রহণের সময় অ্যামিবা একটি তলের উপর আটকে থেকে ক্ষণপদের সাহায্যে বিভিন্ন উপায়ে খাদ্য গ্রহণ করে। এরা খাদ্য গ্রহণের সময় জৈব ও অজৈব পদার্থ শনাক্ত করতে পারে। খাদ্য গ্রহণ করতে এদের ২-৩ মিনিট সময় লাগে। অ্যামিবা প্রধানত পাঁচ উপায়ে খাদ্য গ্রহণ করে।

১। সারকামভ্যালেশন (Circumvallation)

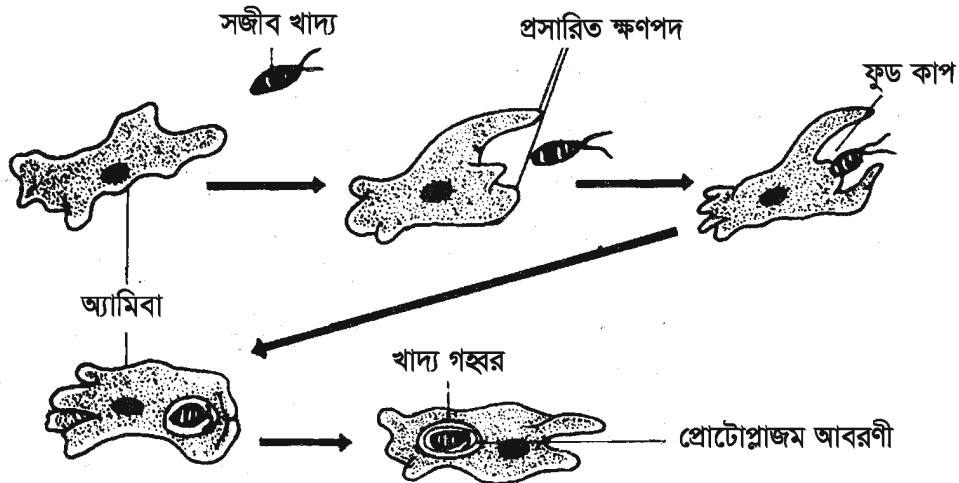
২। সারকামফ্লুয়েন্স (Circumfluence)

৩। ইমপোর্ট (Import)

৪। ইনভ্যাজিনেশন (Invagination)

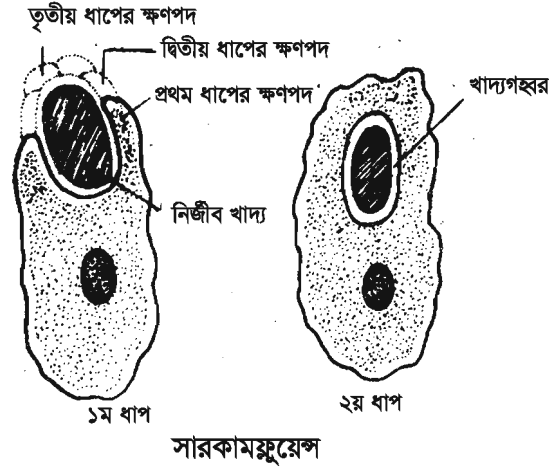
৫। পিনোসাইটোসিস (Pinocytosis)

১। সারকামভ্যালেশন : অ্যামিবা এ পদ্ধতিতে সচল ও কঠিন খাদ্যবস্তু গ্রহণ করে। ক্ষণপদের সাহায্যে খাদ্যদ্রব্যকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ না করে ক্ষণপদের প্রান্তগুলো যুক্ত হয়ে পানিসহ এন্টোপ্লাজমের আবরণী দ্বারা খাদ্য গহ্বর গঠন করে। ক্ষণপদগুলো যখন খাদ্যদ্রব্যকে ঘিরে ফেলে তখন একে একটি পেয়ালার মত দেখায়। একে “ফুড কাপ” বলে। এন্টোপ্লাজমের আবরণী এন্ডোপ্লাজমে পরিণত হয়ে ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে প্রোটোপ্লাজমকে সংরক্ষণ করে।



চিত্র ৮.৩ : সারকামভ্যালেশন পদ্ধতিতে অ্যামিবার খাদ্য গ্রহণ

২। সারকামফ্লুয়েন্স : এ পদ্ধতিতে অ্যামিবা চলৎশক্তিহীন খাদ্যবস্তু গ্রহণ করে। খাদ্যবস্তু অ্যামিবার সংস্পর্শে আসামাত্র ক্ষণপদ প্রসারিত করে ‘ফুড কাপ’ গঠন করে এবং এভাবে আবদ্ধ খাদ্যকে দেহের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে নিয়ে আসে। এভাবে অ্যামিবা খাদ্যবস্তুকে দেহের ভেতরে নিয়ে যায়।



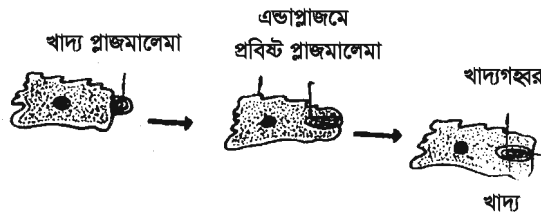
৮.৪ : সারকামফ্লুয়েন্স পদ্ধতিতে অ্যামিবার খাদ্য গ্রহণ।

৩। **ইমপোর্ট** : কোনক্রমে খাদ্যবস্তু দেহের উপর এসে পড়লে অ্যামিবা নিচল থেকে কোন ক্ষণপদ প্রসারিত না করে খাদ্যবস্তুকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে। অতঃপর নিষ্ক্রিয় খাদ্য বস্তুকে দেহাভ্যন্তরে নিয়ে আসে একেই ইমপোর্ট প্রক্রিয়া বলে।



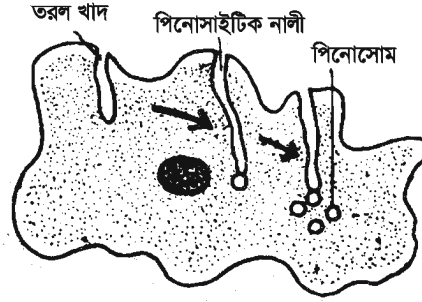
চিত্র ৮.৫ : ইমপোর্ট পদ্ধতিতে অ্যামিবার খাদ্য গ্রহণ

৪। **ইনভ্যাজিনেশন** : অ্যামিবার দেহ কোন খাদ্যবস্তুর সংস্পর্শে আসলে আঠালো রস নিঃসৃত করে এবং দেহের সাথে একে আটকে ফেলে। এ ছাড়া অ্যামিবা দেহ থেকে এক প্রকার বিষাক্ত রস নিঃসৃত করে, যা খাদ্য বস্তুটিকে মেরে ফেলে। খাদ্য সংলগ্ন এন্ডোপ্লাজম একটি নলের আকারে অন্তঃপ্লাজমে প্রবেশ করে। পরে প্লাজমাপর্দা লুপ্ত হয়ে যায় ও একটি খাদ্য গহ্বর তৈরি করে। ইনভ্যাজিনেশন প্রক্রিয়ায় খাদ্যবস্তু গ্রহণের জন্য কোন ক্ষণপদের প্রয়োজন হয় না।



চিত্র : ৮.৬ : ইনভ্যাজিনেশন পদ্ধতিতে অ্যামিবার খাদ্য গ্রহণ

৫। **পিনোসাইটোসিস** : এই প্রক্রিয়া দ্বারা অ্যামিবা তরল খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে। অনেক সময় অ্যামিবার দেহপৃষ্ঠের এক বা একাধিক স্থানের প্লাজমাপর্দা ভাঁজ হয়ে এন্ডোপ্লাজমে প্রবেশ করে, ফলে একটি নালিকার মত অংশের সৃষ্টি হয়। এ নালিকাটিকে পিনোসাইটিক নালী বলে। তরল খাদ্যদ্রব্যসহ নালিকাটি এন্ডোপ্লাজমে পিনোসোম বা ছোট ছোট গহ্বর সৃষ্টি করে এবং পরবর্তীতে এন্ডোপ্লাজমে গৃহীত হয়।



চিত্র ৮.৭ : পিনোসাইটোসিস পদ্ধতি অ্যামিবার খাদ্য গ্রহণ

পরিপাক প্রক্রিয়া (Digestion) : অ্যামিবা যেসব খাদ্যবস্তু গ্রহণ করে তা সরাসরি দেহের সাইটোপ্লাজম শোষণ করতে পারে না। এসব খাদ্যবস্তু বিভিন্ন উৎসেচক বা এনজাইমের সাথে বিক্রিয়া ঘটিয়ে সহজ ও সরল উপাদানে পরিণত হয়ে দেহের গ্রহণ উপযোগী হয়। এটিই খাদ্য পরিপাক প্রক্রিয়া।

অ্যামিবার পরিপাক কার্য দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। যথা— অম্লীয় ও ক্ষারীয়। অ্যামিবার কোন পৌষ্টিক তন্ত্র নেই। খাদ্য গহ্বরের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য পাচিত হয়। অ্যামিবার আকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই খাদ্যদ্রব্যের খাদ্যগহ্বর এন্ডোপ্লাজমায় পৌঁছায়। এন্ডোপ্লাজমের মধ্যে খাদ্যবস্তুর উপর প্রথমে গহ্বরের ভেতরের প্রাচীরের হাইড্রোক্লোরিক এসিড ক্রিয়া করে। হাইড্রোক্লোরিক এসিড দেহের ভেতর গৃহীত বস্তুটিকে মেরে ফেলে, খাদ্যবস্তুর সাথে ক্রিয়া করে, ফলে অম্লীয় দশার সৃষ্টি হয়। পরে সাইটোপ্লাজম থেকে নিঃসৃত ক্ষরণ খাদ্য গহ্বরের অম্লীয় মাধ্যমকে ক্ষারীয় মাধ্যমে পরিণত করে। এ সময় এন্ডোপ্লাজম নিঃসৃত বিভিন্ন প্রকার এনজাইম খাদ্যগহ্বরের প্রবেশ করে এবং খাদ্যের পরিপাক ঘটায়।

খাদ্য পরিপাকে একাধিক এনজাইম বিক্রিয়া করে। অ্যামিবার পরিপাক ঠিক কী কী এনজাইম বিক্রিয়া করে এবং তাদের পর্যায়ক্রম সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে প্রোটিনেজ, লাইপেজ ও কার্বোহাইড্রেজ নামক এনজাইমের উপস্থিতির সম্ভাবনা আছে বলে অনুমান করা হয়। খাদ্য অম্লীয় দশায় থাকা অবস্থায় প্রোটিনেজ নামক এনজাইমটি নিঃসৃত হয়। এটি জটিল প্রোটিনকে সরল পেপটাইডে (Peptide) পরিণত করে।

খাদ্য গহ্বরটি ক্ষারীয় দশা প্রাপ্ত হলে পেপটাইডেজ নামক এনজাইম কার্যকরী হয়। এর ফলে পেপটাইড অ্যামাইনো এসিডে রূপান্তরিত হয়। লাইপেজ খাদ্যের চর্বি অংশকে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারেলে পরিবর্তিত করে। খাদ্যের শর্করা অংশকে অ্যামাইলেজ নামক এনজাইম বিশ্লেষিত করে গ্লুকোজে পরিণত করে। পরিপাক ক্রিয়া যতই অগ্রসর হতে থাকে খাদ্যবস্তুর চেহারা ততই পরিবর্তিত হয়।

শোষণ (Absorption) : এনজাইমের ক্রিয়ার ফলে জটিল খাদ্যবস্তু সরল খাদ্যবস্তুতে পরিণত হয়। খাদ্য গহ্বরস্থিত এইসব সরল খাদ্য উপাদান এন্ডোপ্লাজম দ্বারা শোষিত হয়।

বর্জন (Egestion) : অ্যামিবার এন্ডোপ্লাজমে পরিপাককৃত খাদ্যদ্রব্য শোষিত হওয়ার পর অবশিষ্টাংশ খাদ্য গহ্বরে জমা থাকে। অ্যামিবা যে দিকে ক্ষণপদ প্রসারিত করে খাদ্য গহ্বর তার বিপরীত দিকে কোষ আবরণীর কাছে চলে আসে এবং এক পর্যায়ে আবরণী ভেদ করে দেহের বাইরে নিষ্কাশিত হয়।

শ্বসন (Respiration) : অ্যামিবার দেহে শ্বসন কার্য সম্পাদনের জন্য কোন নির্দিষ্ট অঙ্গ নেই। এরা সবাত শ্বসন প্রক্রিয়ায় শ্বাসকার্য চালায়। নির্দিষ্ট কোন অঙ্গ না থাকায় অ্যামিবা প্লাজমালেমা দিয়ে শ্বসন কাজ চালায়। শ্বসন কার্য মূলত ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ঘটে। অ্যামিবা যে পানিতে বাস করে সে পানিতে যে পরিমাণ অক্সিজেন দ্রবীভূত থাকে তার ঘনত্ব অ্যামিবার সাইটোপ্লাজমের ঘনত্ব অপেক্ষা বেশি থাকে। এ কারণে অ্যামিবার দেহে সহজে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন প্রবেশ করতে পারে। এ প্রক্রিয়ায় শ্বসনের জন্য প্রয়োজনীয় O_2 এর চাহিদা মেটায়।

শ্বসন বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যাপনের মাধ্যমে অ্যামিবার দেহ থেকে নির্গত হয়। অ্যামিবার সাইটোপ্লাজমে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ পানিতে অবস্থিত কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ অপেক্ষা বেশি থাকে বলে এ প্রক্রিয়া সহজভাবে ঘটতে পারে।

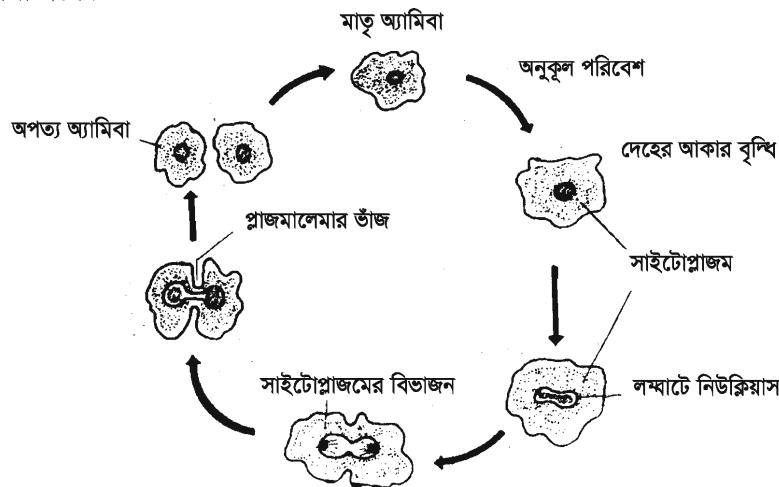
রেচন (Excretion) : যে প্রক্রিয়ায় প্রাণিদেহ থেকে নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ ও নিঃসরণ হয় তাকে রেচন বলে। অ্যামিবার রেচন পদার্থ মূলত অ্যামোনিয়া। এ বর্জ্য পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় ব্যাপন প্রক্রিয়ায় প্লাজমপর্দার মাধ্যমে বাইরে নিষ্কাশিত হয়।

প্রজনন (Reproduction) : প্রজনন জীবের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। যে জৈবনিক প্রক্রিয়ায় জীব তার প্রজাতির বিলুপ্তি রোধে একাকী বা একই প্রজাতির বিপরীত লিঙ্গের জীবের সহায়তায় তার নিজের মত বংশধর উৎপন্ন করে তাকে প্রজনন বলে। অ্যামিবা প্রধানত অযৌন প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি করে। অযৌন বংশ বৃদ্ধি প্রণালি দু'ধরনের। দ্বি-বিভাজন ও স্পোরুলেশন।

১। দ্বি-বিভাজন (Binary fission) : দৈহিক বৃদ্ধি জীবের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। উপযুক্ত পরিবেশ ও খাদ্য পেলে অ্যামিবার দেহের সাইটোপ্লাজমের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং এর আয়তন বাড়তে থাকে। অ্যামিবা দৈহিক বৃদ্ধি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যখন এর সাইটোপ্লাজম সূষ্ঠভাবে বিপাকীয় কার্য সম্পন্ন করতে পারে না। এ সময়ে অ্যামিবা দ্বি-বিভাজন প্রক্রিয়ায় বংশবিস্তার শুরু করে। এ প্রক্রিয়ায় একটি মাতৃ অ্যামিবা বিভাজিত হয়ে দুটি অপত্য অ্যামিবা গঠন করে। প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ :

বিভাজনের শুরুতে অ্যামিবা তার ক্ষণপদ গুটিয়ে ফেলে, তখন দেহটি গোলাকার রূপ ধারণ করে। এর নিউক্লিয়াস পর্দাটি বিলুপ্ত হয়, নিউক্লিয়াসটি বড় ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে নিউক্লিয়াসটি লম্বা আকার ধারণ করে এবং এর মধ্যবর্তী অঞ্চল সরু হয়। এ সময় নিউক্লিয়াসের চারপাশের এন্ডোপ্লাজম কিছুটা আলগা হয়ে পড়ে। নিউক্লিয়াসে অবস্থিত ক্রোমোসোমগুলো অনুদৈর্ঘ্যভাবে বিভাজিত হয়। বিভাজিত দু'প্রস্থ অপত্য ক্রোমোসোম বিপরীত দুটি মেরুর দিকে সরে যায় এবং মধ্যবর্তী অঞ্চল সরু হয়। ফলে নিউক্লিয়াস ডাম্বেল বা মুগুরের মত আকৃতি বিশিষ্ট হয়। পরবর্তীতে নিউক্লিয়াস দুটিকে ঘিরে সাইটোপ্লাজম জমা হয়। প্রায় একই সাথে প্লাজমালেমা ভাঁজ হয়ে ভিতরের দিকে প্রবেশ করে। এরপর নিউক্লিয়াসটি দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এবং প্লাজমালেমার ভাঁজদ্বয় পরস্পরের সাথে মিলিত হয়। ফলে মাতৃ অ্যামিবাটি দুই অপত্য অ্যামিবায় পরিণত হয়। অবশেষে সাইটোপ্লাজম প্রতিটি নিউক্লিয়াসকে ঘিরে ফেলে, এরপর সাইটোপ্লাজমের বাইরে প্লাজমালেমা গঠিত হয়। ফলে মাতৃ অ্যামিবা নতুন দুটি ক্ষুদ্র অ্যামিবায় পরিণত হয়। এই নতুন অপত্য অ্যামিবা স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করে।

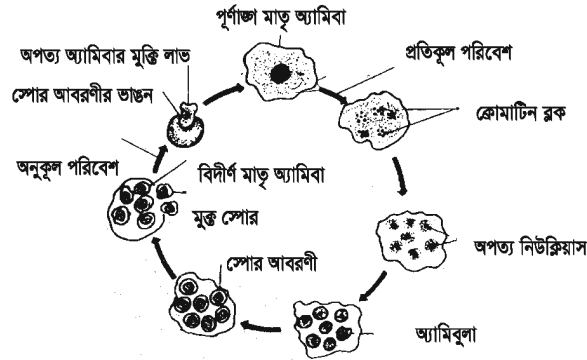
প্রতিকূল পরিবেশে আত্মরক্ষার জন্য অ্যামিবা দেহের চারদিকে একটি প্রাচীর গড়ে তোলে। একে সিস্ট আবরণী বলে। এই অবস্থাকে সিস্টদশা বলে।



চিত্র ৮.৮ : অনুকূল পরিবেশে অ্যামিবার দ্বি-বিভাজন প্রক্রিয়া

২. স্পোরুলেশন (Sporulation) : প্রতিকূল অবস্থায় সিস্টের ভিতরে অ্যামিবার নিউক্লিয়াস বহু বিভাজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বহুখা বিভাজিত হয়ে অসংখ্য স্পোর সৃষ্টি করে। এই প্রক্রিয়াকে স্পোরুলেশন বলে।

এই প্রক্রিয়ায় প্রথমে অ্যামিবা দেহের নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয়ার আবরণী বিলুপ্ত হয় এবং নিউক্লিয়াসটি বার বার বিভাজিত হয়ে অনেকগুলো ক্রোমাটিন খণ্ডে বিভক্ত হয়। এগুলো এন্ডোপ্লাজমের মধ্যে মুক্ত অবস্থায় থাকে। এ ক্রোমাটিন খণ্ডগুলো নিউক্লিয়ার আবরণী দ্বারা আবদ্ধ হয়। পরবর্তীতে এ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলোর চারদিকে সাইটোপ্লাজম বেষ্টিত হয় এবং অবশেষে এর চারদিকে প্লাজমালেমার সৃষ্টি হয়। প্লাজমালেমার বাইরে এরপর স্পোর আবরণী গঠিত হয়। এভাবে একটি অ্যামিবার দেহে শতাধিক স্পোর গঠিত হয়। পরে প্লাজমালেমা ভেদ করে এ স্পোরগুলো বাইরে মুক্ত হয়। অনুকূল পরিবেশ পেলে স্পোর থেকে অপত্য অ্যামিবা বাইরে মুক্ত হয়।

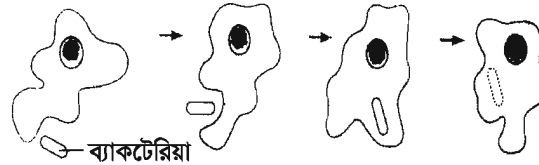


চিত্র ৮.৯ : প্রতিকূল পরিবেশে অ্যামিবার স্পোরুলেশন

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। নিচের প্রবাহ চিত্রটি কী নির্দেশ করে?



- ক. অ্যামিবার খাদ্য গ্রহণ প্রক্রিয়া
- খ. অ্যামিবার চলন প্রক্রিয়া
- গ. শ্বেত রক্ত কণিকার চলন প্রক্রিয়া
- ঘ. লোহিত রক্ত কণিকার জীবাণু ধ্বংস প্রক্রিয়া

২। অ্যামিবার শ্বসনের ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য?

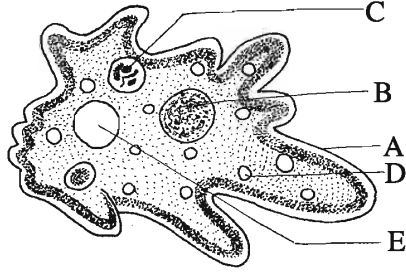
- i. সবাত শ্বসন প্রক্রিয়ায় শ্বাসকার্য চলে
- ii. প্লাজমালেমা শ্বসন অঙ্গরূপে কাজ করে
- iii. শ্বসনকার্য চলে ব্যাপন প্রক্রিয়ায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
- খ. ii ও iii
- গ. i ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

ব

নিচের চিত্র অবলম্বনে ৩নং ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



৩। চিত্রের কোন অংশটি অস্থায়ী?

ক. A

খ. B

গ. C

ঘ. D

৪। চিত্রের E চিহ্নিত অংশটি—

i . সংকুচিত হতে সক্ষম

ii . রেচন পদার্থ অপসারণে সহায়তা করে

iii . খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

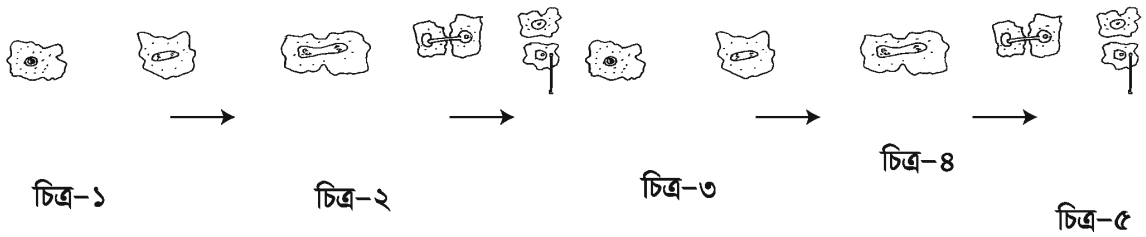
খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। প্রজনন জীবের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন জীব বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রজনন সম্পাদন করে থাকে। অ্যামিবা দ্বি-বিভাজন প্রক্রিয়ায় একটি হতে দুটিতে পরিণত হয়। আবার প্রতিকূল পরিবেশে সিস্ট গঠন করে আত্মরক্ষা করে এবং সিস্টের ভিতর অসংখ্য স্পোর সৃষ্টি হয়। এগুলো অনুকূল পরিবেশে স্বতন্ত্র অ্যামিবারূপে জীবন শুরু করে। নিচে অ্যামিবার বংশবিস্তারের একটি প্রক্রিয়া দেখানো হল।



ক. অ্যামিবা কী?

খ. অ্যামিবার দ্বি-বিভাজন প্রক্রিয়া কোন ধরনের কোষ বিভাজন এবং কেন?

গ. ৫নং চিত্রে সৃষ্ট অ্যামিবার মধ্যে কোনটি মাতা ও কোনটি আপত্য অ্যামিবা তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উপরের তথ্য অনুযায়ী অ্যামিবার মৃত্যু বা চিরকাল বেঁচে থাকা সম্পর্কে তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর।

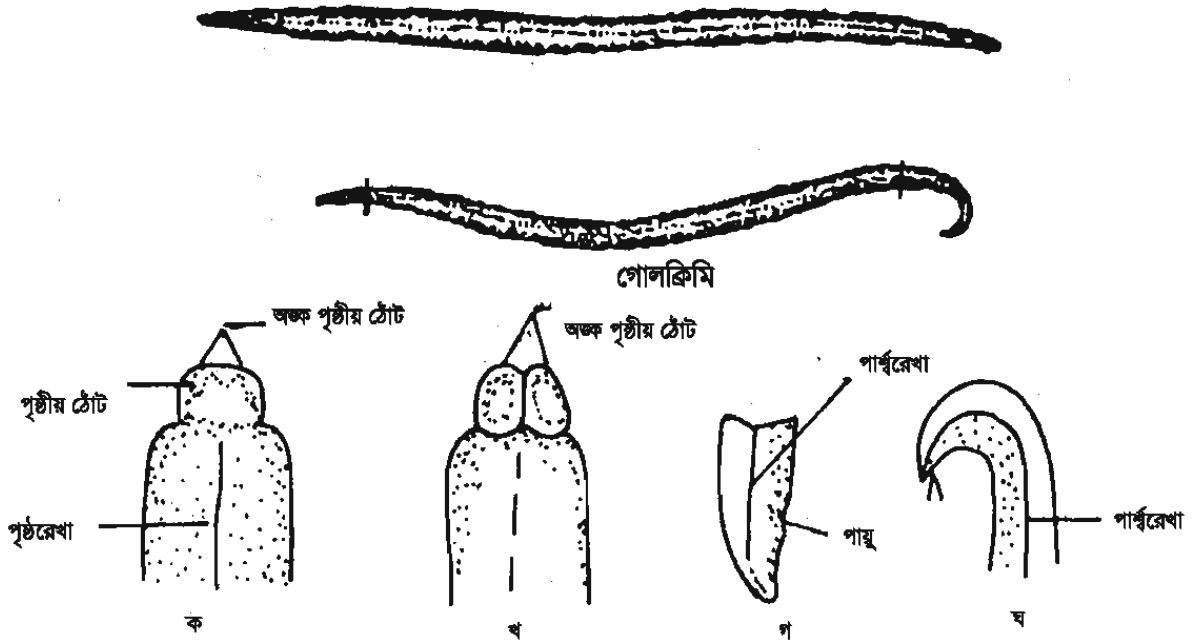
গোলক্রিমি

গোলক্রিমি প্রাণিজগতের নেমাটোডা (Nematoda) পর্বের সদস্য : গোলক্রিমির প্রাদুর্ভাব পৃথিবীব্যাপী। সাধারণভাবে *Ascaris lumbricoides* গোলক্রিমি নামে পরিচিত। এরা মানুষের অন্ত্রে অন্তঃপরজীবীরূপে বাস করে। অন্যান্য ক্রিমির তুলনায় গোলক্রিমি আকারে বড়, দেখতে কেঁচোর মত নলাকার। তাই অনেকে একে কেঁচো ক্রিমিও বলে। বাতাস, পানি, কাঁচা ফলমূল, শাকসবজির সাথে ক্রিমির ডিম মানুষের অন্ত্রে প্রবেশ করে। মানুষ গোলক্রিমির একমাত্র পোষক।

বাসস্থান (Habitat) : পৃথিবীজুড়ে গোলক্রিমি বিস্তৃত। তবে বাংলাদেশ, ভারত, চীন, কোরিয়া, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশে এর প্রাদুর্ভাব বেশি।

বাহ্যিক গঠন (External morphology) : জীবিত গোলক্রিমির স্বাভাবিক রং অনুচ্ছন্ন সাদা। দেখতে কেঁচোর মত নলাকার। ক্রিমির দেহে চারটি লম্বা রেখা দেখা যায়। এদের একটি পৃষ্ঠীয়, একটি অঙ্গীয় এবং দুটি পার্শ্বীয়। স্ত্রী ক্রিমি লম্বায় ২০-২৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে। অপর দিকে পুরুষ ক্রিমি লম্বায় ১৫-২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়।

গোলক্রিমির দেহের অগ্রভাগে মুখ অবস্থিত। মুখে তিনটি ঠোঁট থাকে। ঠোঁটগুলো দাঁত ও প্যাপিলা সমৃদ্ধ। এ তিনটি ঠোঁটের মধ্যে একটি উপরের দিকে ও অন্য দুটি মুখ গহ্বরের দুপার্শ্বে অবস্থিত। দেহের পশ্চাৎভাগের নিচের দিকে পায়ু বা অবসারণী ছিদ্র থাকে। পুরুষ ক্রিমির অবসারণী ছিদ্র পথে জননকোষ বের হয়। পুরুষ ক্রিমির অবসারণী ছিদ্রের পিছন থেকে কাঁটার মত অংশ বের হয়। একে পিনিয়াল সিটি (penial setae) বলে। স্ত্রী ক্রিমির অবসারণী ছিদ্র ও জনন ছিদ্র আলাদা। স্ত্রী ক্রিমির দেহের অগ্রভাগের নিচের দিকে জনন রশ্মি অবস্থিত।



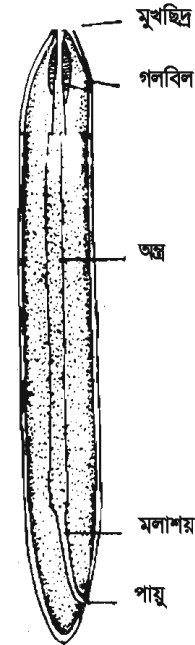
চিত্র : ৮ : ১০ গোলক্রিমির দেহের অগ্রভাগ এবং পুং ও স্ত্রীর পশ্চাৎপ্রান্ত

পুরুষ ও স্ত্রী গোলক্রিমির পার্থক্য

পুরুষ	স্ত্রী
১। পুরুষ ক্রিমি আকারে ছোট	১। স্ত্রী ক্রিমি পুরুষ ক্রিমির চেয়ে আকারে বড়।
২। পুরুষ ক্রিমির পিছনের প্রান্ত ঝুঁচালো ও বাঁকানো।	২। স্ত্রী ক্রিমির লেজের পিছনের প্রান্ত সোজা ও তৌতা।
৩। এদের অবসারণী ছিদ্র ও জনন ছিদ্র অভিন্ন।	৩। এদের অবসারণী ছিদ্র ও জনন ছিদ্র পৃথক।
৪। পুরুষ ক্রিমির অবসারণী ছিদ্রপথে বর্জ্য পদার্থ ও জনন কোষ নিঃসরিত হয়।	৪। স্ত্রী ক্রিমির অবসারণী পথে বর্জ্য পদার্থ ও জনন ছিদ্র পথে জনন কোষ নিঃসরিত হয়।
৫। পুরুষ ক্রিমিতে অবসারণী বা পায়ুর পিছনে কাঁটার মত পিনিয়াল সিটি থাকে।	৫। স্ত্রী ক্রিমিতে পিনিয়াল সিটি থাকে না।

পৌষ্টিকতন্ত্র (Digestive system) :

গোলক্রিমির পৌষ্টিকতন্ত্রের গঠন খুবই সরল প্রকৃতির। মুখছিদ্র, মুখগহ্বর, গলবিল ও অন্ত্র নিয়ে পৌষ্টিকতন্ত্র গঠিত। মুখ দেহের অগ্রভাগে অবস্থিত। মুখছিদ্রটি মুখগহ্বরে উন্মুক্ত হয়। মুখগহ্বরের পেছনে গলবিল অবস্থিত। গলবিল কিছুটা মোটা, পেশিময় ও তিনটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। এই গলবিলের সাহায্যে গোলক্রিমি তার পোষক দেহের অন্ত্র থেকে পরিপাককৃত খাদ্য গ্রহণ করে ও পুষ্টিলাভ করে। গলবিলের পেছনে সরু অন্ত্র অবস্থিত। অন্ত্রটি পেছনের দিকে ক্রমশ সরু হয়ে মলাশয়ে পরিণত হয়। মলাশয়টি অবসারণী ছিদ্রপথে বাইরে উন্মুক্ত হয়। গোলক্রিমির কোন পৌষ্টিক গ্রন্থি নেই। কারণ এরা পোষকের দেহ থেকে পরিপাককৃত খাদ্য শোষণ করে, তাই এদের খাদ্য পরিপাক করার প্রয়োজন হয় না।



চিত্র ৮ : ১১ গোলক্রিমির পৌষ্টিকতন্ত্র

পরজীবী (Parasite) : যেসব জীব অন্য জীবের ভেতর বা বাইরে সবসময় বা সাময়িকভাবে অবস্থান করে এবং পুষ্টির জন্য সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে আশ্রয়দাতা জীবের ওপর নির্ভর করে তাদের পরজীবী বলে। এবং আশ্রয়দাতা জীবকে পরজীবীর পোষক (host) বলে।

পরজীবীর বৈশিষ্ট্য :

- ১। এদের তন্ত্রগুলো সরল প্রকৃতির।
- ২। অন্তঃপরজীবীর বহিরাবরণ দৃঢ় অথচ অর্ধভেদ্য প্রকৃতির।
- ৩। পরজীবীর প্রজনন ক্ষমতা অত্যধিক।

অবস্থানের প্রকৃতি অনুসারে পরজীবী দু প্রকার :

বহিঃপরজীবী ও অন্তঃপরজীবী

১। **বহিঃপরজীবী** : এরা পোষক দেহের বাইরে অবস্থান করে। যেমন- উকুন, জেঁক।

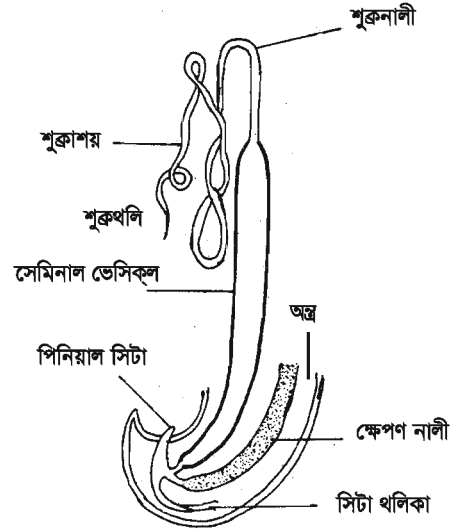
২। **অন্তঃপরজীবী** : এরা পোষক দেহের ভেতরে অবস্থান করে। যেমন- ম্যালেরিয়া জীবাণু, ক্রিমি।

পরজীবী ও পরজীবিতা (Parasite and Parasitism) : আমরা আগেই জেনেছি গোলক্রিমি পোষক দেহের ভেতরে পরজীবী হিসেবে বাস করে এবং পোষকের অন্ত্র থেকে পরিপাককৃত খাদ্যরস গ্রহণ করে পুষ্টি লাভ করে। তাই একে অন্তঃপরজীবী বলে। গোলক্রিমি পোষকের দেহে আশ্রয় গ্রহণ ও পুষ্টির সুবিধা ভোগ করে। ফলে পোষক রক্তাশ্রিত ও অপুষ্টিতে ভোগে। এভাবে পোষক ও পরজীবীর মাঝে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাকে পরজীবিতা বা পরজীবিত্ব বলে।

রেচন তন্ত্র (Excretory system) : রেচন হল দেহ থেকে অপ্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন গঠিত বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন প্রক্রিয়া। গোলক্রিমির রেচন তন্ত্রের গঠন খুবই সরল। দেহের দু দিকে পার্শ্বরেখা বরাবর দুটি দীর্ঘ নালী নিয়ে রেচন তন্ত্র গঠিত। নালী দুটি সম্মুখভাগে মিলিত হয়ে রেচন ছিদ্র বা অবসারণী ছিদ্র পথে বাইরে উন্মুক্ত হয়।

প্রজনন তন্ত্র (Reproductive system) : আমরা আগেই জেনেছি গোলক্রিমি একলিঙ্গ প্রাণী। সাধারণত পুরুষ ক্রিমি স্ত্রী ক্রিমি থেকে আকারে ছোট এবং এর দেহের পশ্চাৎভাগ নিচের দিক বাঁকানো।

পুরুষ প্রজনন তন্ত্র : একটি শূক্রাশয়, শূক্রনালী, শূক্রথলি ও নিষ্ক্ষেপণ নালী নিয়ে পুরুষ প্রজনন তন্ত্র গঠিত। শূক্রাশয় (testis) কুণ্ডলীর মত প্যাঁচানো ও দেহের অনেকটা জায়গা জুড়ে এর অবস্থান। পেছনের দিকে শূক্রাশয় নালী এবং আরও পেছনের মোটা অংশটি শূক্রথলি (Seminal vesicle)। এটা দেহের পিছন দিকে অবস্থিত অবসারণী ছিদ্রে উন্মুক্ত হয়। এখানে একজোড়া পিনিয়াল সিটি থাকে। পুরুষ গোলক্রিমি অবসারণী ছিদ্র পথে শূক্র ত্যাগ করে।



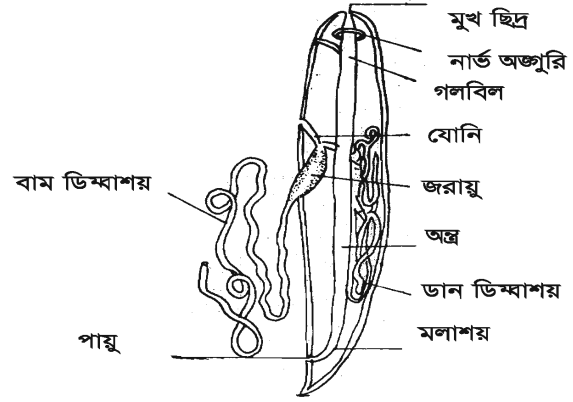
চিত্র : ৮. ১২ গোলক্রিমির পুং জনন তন্ত্র

স্ত্রী প্রজনন তন্ত্র : দুটি ডিম্বাশয়, দুটি জরায়ু ও একটি যোনি নিয়ে স্ত্রী প্রজনন তন্ত্র গঠিত। এ অঙ্গগুলো ক্রিমির দেহের পশ্চাৎভাগে অবস্থিত। ডিম্বাশয় দুটি প্যাঁচানো এবং সরু। ডিম্বাশয়ের পশ্চাৎভাগে ডিম উৎপন্ন হয়। ডিম্বাশয়ের সাথে ডিম্বনালী (oviduct) যুক্ত। ডিম্বাশয়ের উৎপন্ন ডিম এ নালীতে এসে পড়ে। ডিম্বনালীর কিছুটা অংশ স্ফীত হয়ে সেমিন্যাল রিসেপ্টাকুল (Seminal receptacle) গঠন করে। এখানেই শূক্রাণু জমা থাকে। ডিম্বনালী জরায়ুতে এসে মিলিত হয়। দুটি জরায়ু একত্রে মিলিত হয়ে নলাকার যোনি উৎপন্ন করে। যোনি স্ত্রী জনন ছিদ্র (Female genital aperture) পথে আলাদাভাবে বাইরে উন্মুক্ত হয়।

জীবনচক্র (Life cycle) : গোলক্রিমির ডিম্বাণু ও শূক্রাণু জরায়ুর উপরিভাগে নিষিক্ত হয়। নিষেকের পর প্রতিটি ডিম কাইটিন সমৃদ্ধ আবরণ দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। গোলক্রিমির ডিম অতি ক্ষুদ্র ও লম্বাটে। পোষকের মলের সাথে এই ডিম বাইরে বেরিয়ে আসে। খোলসের মধ্যে থাকাকালীন অবস্থায় নিষিক্ত ডিমের ভেতর ভ্রূণ গঠন শুরু হয়। গোলক্রিমির প্রাথমিক লার্ভা পর্যায়কে র্যাবডিটিফর্ম লার্ভা (Rhabditiform larva) বলে।

সংক্রমণ (Infection) : গোলক্রিমির সংক্রমণের জন্য মধ্যবর্তী কোন পোষক প্রয়োজন হয় না। বায়ু, খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে ডিম নতুন পোষক দেহে সরাসরি প্রবেশ করে।

ভ্রূণের নির্গমন (Hatching of embryo) : পোষক দেহে প্রবেশের পর ডিম পাকস্থলি হয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রে পৌঁছানোর সাধারণত দু ঘণ্টার মধ্যে ভ্রূণের নির্গমন ঘটে।



চিত্র : ৮.১৩ গোলক্রিমির স্ত্রী জনন তন্ত্র

পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় রূপান্তর (Transformation to adulthood) : ডিম পোষক দেহের অন্ত্রে প্রবেশের পর পোষকের আন্ত্রিক রসে খোলস বিনষ্ট হয় ও লার্ভা খোলসমুক্ত হয়। লার্ভাগুলো অন্ত্রগাত্র ভেদ করে লসিকা নালী (Lymphatic vessel) বা রক্তের কৈশিক জালিকার মধ্যে প্রবেশ করে। রক্তের মাধ্যমে এরা বিভিন্ন অঙ্গে চলে যায়। এই অবস্থায় লার্ভাগুলো ফুসফুসের ভেতর কিছু সময়ের জন্য অবস্থান করে। লার্ভাগুলো শ্বাসনালী বেয়ে গলবিলে এসে পৌঁছায়। এ সময় পোষকের গলা খুসখুস করে ও কাশি হয়। লার্ভা কাশির সাথে গলায় উঠে আসে। কু অভ্যাসের জন্য ঢোক গিলে ফেললে এরা পুনরায় অন্ত্রে গিয়ে পৌঁছায়। লার্ভা অন্ত্রে শেষবারের মত খোলস ত্যাগ করে। এখানে এদের ভ্রাম্যমাণ জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। অন্ত্রে অবস্থান কালে এরা পোষকের পরিপাককৃত খাদ্যরস গ্রহণ করে পুষ্টিলাভ করে। কিছুদিনের মধ্যেই লার্ভা পূর্ণাঙ্গ ক্রিমিতে পরিণত হয়।

বাংলাদেশে ক্রিমির সংক্রমণ খুবই বেশি। আমাদের দেশের শিশুরাই এর দ্বারা আক্রান্ত হয়। একজন পোষক দেহে এই ক্রিমির ১০০ হতে ৪০০টি পর্যন্ত পাওয়া যায়। শিশুদের দেহে এরা অ্যাসকারিয়াসিস (Ascariasis) নামক রোগ সৃষ্টি করে। ক্রিমির সংক্রমণে দৈহিক অসুস্থতা ও নানারকম উপসর্গ দেখা দেয়। সংক্রমণের মাত্রা বেশি হলে অসুস্থতা মারাত্মক রূপ নেয় ও নিম্নের লক্ষণগুলো চোখে পড়ে।

- ১। শিশুদের পেট বড় হয়ে ফুলে ওঠে।
- ২। অন্ত্রে গোলক্রিমির সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে বমি বমি ভাব ও ক্ষুধামান্দ্য দেখা দেয়। চূড়ান্ত পর্যায়ে বমির সাথে ক্রিমি বেরিয়ে আসতে পারে।
- ৩। বদহজম ও দৈহিক দুর্বলতা দেখা দেয়।
- ৪। অন্ত্রে অল্প ও ক্ষারের ভারসাম্য নষ্ট হয়।
- ৫। গোলক্রিমির আক্রমণে রোগী পেটে ব্যথা অনুভব করে ও রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা : আমরা আগেই জেনেছি যে আমাদের দেশে অধিকাংশ শিশু গোলক্রিমি দ্বারা আক্রান্ত হয়। ফলে এসব শিশু রক্তশূন্যতা ও অপুষ্টিতে ভোগে। গোলক্রিমির আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে হলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

- ১। যেখানে সেখানে মলত্যাগের অভ্যাস পরিহার করা ও পাকা পায়খানা ব্যবহার করা।
- ২। কাঁচা ফলমূল ধুয়ে খাওয়া।
- ৩। হাতের আঙুল পরিষ্কার রাখা, হাতের নখ ছোট রাখা।
- ৪। খাবার গ্রহণের আগে এবং শৌচ কাজ শেষে হাত ভালভাবে ধোয়া।
- ৫। ঠান্ডা ও পচা বাসি খাবার গ্রহণ না করা।
- ৬। দেহে ক্রিমির আক্রমণ অনুভব করলে ওষুধ সেবনের মাধ্যমে ক্রিমি মুক্ত করা।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। পোষক এবং পরজীবীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন বিবৃতিটি সঠিক?

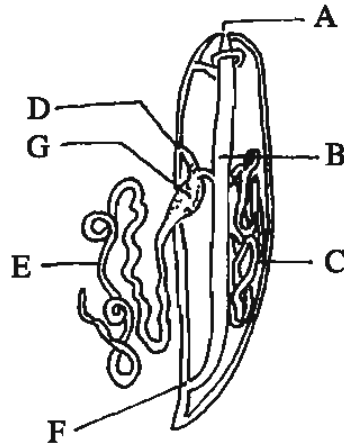
- ক. পোষক পরজীবীর দেহে বসবাস করে
- খ. পোষক পরজীবীকে সম্পূর্ণ খাদ্য সরবরাহ করে
- গ. পরজীবী পোষকের আংশিক উপকার করে
- ঘ. পরজীবী এবং পোষকের জীবনকাল সমান

২। গোলকিমির রেচনতন্ত্রের ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য?

- i. দেহের দু দিকে পার্শ্বরেখা বরাবর রেচননালী অবস্থিত
- ii. দুটি দীর্ঘনালী নিয়েই এ তন্ত্র গঠিত
- iii. নালী দুটি সম্মুখভাগে মিলিত হয়ে রেচন ছিদ্রে উন্মুক্ত

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
- খ. i ও iii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii



উপরের চিত্র অবলম্বনে ৩ নং ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

৩। চিত্রে চিহ্নিত কোন কোন অংশ নিয়ে গোলকিমির স্ত্রীপ্রজনন তন্ত্র গঠিত?

- ক. A, B, C, D
- খ. B, C, D, F
- গ. C, E, F, G
- ঘ. C, D, E, G

৪। জনন কোষ নির্গত হয়—

- i. A চিহ্নিত পথে
- ii. D চিহ্নিত পথে
- iii. F চিহ্নিত পথে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। রিতা ছয় বছরের মেয়ে। তার শরীর দুর্বল, দেহের তুলনায় পেট বড়। প্রায়ই পেটে ব্যথা অনুভব করে। এমতাবস্থায় রিতার বাবা তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ডাক্তার বললেন, গোলক্রিমি নামক অন্তঃপরজীবীর কারণে রিতার অ্যাসকারিওসিস রোগ হয়েছে। তিনি আরও বললেন যে, মানুষ হচ্ছে গোলক্রিমির একমাত্র পোষক এবং এটি বহিঃপরজীবীর চেয়ে বেশি ক্ষতিকর।

ক. গোলক্রিমির অন্য নাম কী?

খ. ‘মানুষ গোলক্রিমির একমাত্র পোষক’—কথাটি ব্যাখ্যা কর।

গ. রিতার দেহে অন্তঃপরজীবীটি কীভাবে বিস্তার লাভ করেছে তা বর্ণনা কর।

ঘ. ‘বহিঃপরজীবীর চেয়ে অন্তঃপরজীবী বেশি ক্ষতিকর’— বিশ্লেষণ কর।

কুনোব্যাঙ

কুনোব্যাঙ (Toad) একটি উভচর প্রাণী। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে এরা জীবনের প্রথম অবস্থায় সাধারণত পানিতে থাকে এবং ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য পরিচালনা করে। পরিণত বয়সে এরা ডাঙায় বাস করে এবং ফুসফুস ও ত্বকের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়। এজন্য এদের উভচর প্রাণী বলা হয়।

কুনোব্যাঙের বৈজ্ঞানিক নাম *Bufo melanostictus* (বুফো মেলানোস্টিক্টাস)

উভচর প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

- ১। শীতল রক্ত বিশিষ্ট প্রাণী।
- ২। এদের ত্বক খসখসে, ত্বকীয় গ্রন্থিগুলো ত্বককে ভেজা রাখে।
- ৩। এদের দু জোড়া পা এবং তিন প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট হৃৎপিণ্ড থাকে।
- ৪। এরা ডিম পাড়ে এবং নিষেকক্রিয়া দেহের বাইরে ঘটে।
- ৫। জীবনচক্রের প্রাথমিক পর্যায়ে সাধারণত ব্যাঙাচি দশা (tadpole larva) দেখা যায়।
- ৬। ব্যাঙাচি অবস্থায় ফুলকা এবং পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় ত্বক ও ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়।
- ৭। এদের সামনের পায়ে ৪টি এবং পিছনের পায়ে ৫টি আঙুল থাকে।

বাসস্থান (Habitat) : ব্যাঙ ছায়াযুক্ত, অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গায়, ঘরের কোণে, ঝোপঝাড়, ইটের স্তূপ অথবা ডোবায় বাস করে। বাংলাদেশে কোলাব্যাঙ বা সোনাব্যাঙ এবং কুনোব্যাঙ বেশি দেখা যায়। তাছাড়া গোছোব্যাঙ নামে আর এক রকম ব্যাঙও দেখা যায়।

স্বভাব (Habit) : কুনোব্যাঙ শীতল রক্ত বিশিষ্ট প্রাণী। দিনের বেলায় অন্ধকারাচ্ছন্ন ও সঁাতসঁতে পরিবেশে লুকিয়ে থাকে। রাতের অন্ধকারে খাবারের খোঁজে বের হয় এবং জীবন্ত কীটপতঙ্গ, কেঁচো, এমনকি শামুক ধরে খায়। আবহাওয়ার তাপমাত্রার সাথে এদের দেহের তাপমাত্রাও তারতম্য ঘটে। তাই এরা শূষ্ক ও রৌদ্রোজ্জ্বল পরিবেশে থাকতে পারে না। এ কারণে, শীতকালে আমরা কুনোব্যাঙের উপস্থিতি খুব একটা দেখি না। কুনোব্যাঙ এ সময়ে মাটির নিচে গর্তে বা গাছের কোটরে নিশ্চল বা নিষ্ক্রিয় জীবন অতিবাহিত করে। এ সময় এরা খাদ্য গ্রহণের জন্য বাইরে আসে না। দেহের সঞ্চিত স্নেহপদার্থ থেকে শক্তি যোগায়। শীতকালে ব্যাঙের এই নিষ্ক্রিয় জীবন যাপনকে শীতনিদ্রা (hibernation) বলে।

গ্রীষ্মের শুরুতে ব্যাঙ গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে। বর্ষাকাল ব্যাঙের প্রজনন ঋতু। পুরুষ ব্যাঙ স্ত্রী ব্যাঙকে যৌন মিলনে আকৃষ্ট করার জন্য ‘ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ঘ্যাং’ শব্দে ডাকতে থাকে। জীবনচক্রের বেশিরভাগ সময়ই এরা স্থলে বাস করে। প্রজননের সময় এদের পানিতে আসতেই হয়।

ডাঙায় বা স্থলভাগে চলার সময় ব্যাঙ লাফিয়ে চলে এবং পানিতে থাকাকালীন সাঁতার কাটে। কুনোব্যাঙের গায়ের রং ধূসর। ফলে ঘরের কোণে, গাছের কোটরে, ইটের স্তূপে সহজে আত্মগোপন করতে পারে।

কুনোব্যাঙের বহিঃঅঙ্গসংস্থান (External morphology of toad) : কুনোব্যাঙ একটি কদাকার প্রাণী। এদের দেহত্বক ধূসর বর্ণের ও আঁচিলযুক্ত। কুনোব্যাঙ লম্বায় ১০ থেকে ১৩ সে. মি. এবং প্রস্থে ৭ সে. মি. হয়। এদের দেহকে লম্বালম্বিভাবে সমান দুটি অংশে বিভক্ত করা যায়। তাই এরা দ্বি-পাক্ষীয় প্রতিসম (bilaterally symmetrical)

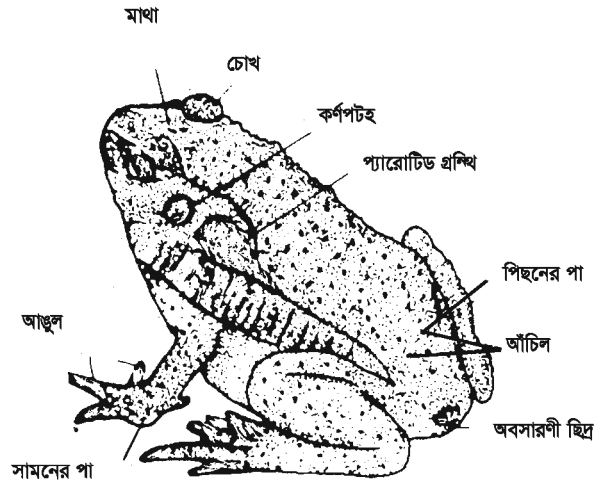
ব্যাঙের দেহ মাথা ও ধড় এ দুটি অংশে ভাগ করা যায়। এদের কোন গ্রীবা বা ঘাড় নেই। একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙের লেজ থাকে না এবং পায়ের আঙুলগুলো নখরবিহীন।

মাথা (Head) : ব্যাঙের মাথার সামনের অংশ ভোঁতা ও পেছনের অংশ চওড়া। মাথার সামনের দিকে আড়াআড়িভাবে চওড়া মুখ আছে। মুখছিদ্রের উপরে ও নিচে দুটি চোয়াল থাকে। চোয়ালে কোন দাঁত নেই। মুখের উপরের দিকে মাথার অগ্রপ্রান্তে পাতলা কপাটিকা যুক্ত দুটি ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্র দুটি ব্যাঙের নাসারন্ধ্র। নাসারন্ধ্রের পশ্চাত্তাণ্ডে দুটি গোল চোখ থাকে। ব্যাঙের চোখে দুটি চোখের পাতা এবং একটি করে স্বচ্ছ পাতলা পর্দা থাকে। উপরের পাতা ও নিচের পাতা ছাড়া পাতলা পর্দাটিকে উপপল্লব বা নিকটিটেটিং মেমব্রেন (Nictitating membrane) বলে। ব্যাঙের চোখের পাতায় কোন লোম নেই, উপপল্লব চোখকে ধূলাবালি থেকে রক্ষা করে ও চোখ ভেজা রাখে।

প্রতিটি চোখের পিছনে গোলাকার, মসৃণ পর্দা থাকে। এদের কর্ণপটহ বলে। কানের পিছনে দু পাশে দুটি গ্রন্থি আছে। এদের প্যারোটাইড গ্রন্থি (Parotid glands) বলে। এ গ্রন্থি থেকে বিষাক্ত রস নিঃসৃত হয়। এ রস ব্যাঙ আত্মরক্ষার কাজে ব্যবহার করে। পুরুষ ব্যাঙের মাথা ও ধড়ের সংযোগস্থলে, মুখগহ্বরের অঙ্গীয় দিকে কালচে বর্ণের একটি থলি থাকে। একে স্বরথলি (vocal sac) বলে। স্বরথলি শব্দ সৃষ্টিতে অংশ নেয়।

ধড় (Trunk) : ব্যাঙের ধড় ছোট, বক্ষ ও উদর পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায় না। মাথা অপেক্ষা ধড় অংশটি বেশ প্রশস্ত ও স্থূল। ধড়ের সামনে ও পিছনে একজোড়া করে পা থাকে। সামনের পা জোড়াকে অগ্রপদ ও পিছনের পা জোড়াকে পশ্চাপদ বলে। পায়ের আঙুলের গোড়াগুলো পরস্পর পাতলা পর্দা দিয়ে আংশিকভাবে যুক্ত থাকে বলে এদের লিপ্তপদ বলে। ব্যাঙের সামনের পায়ে চারটি ও পিছনের পায়ে পাঁচটি নখরবিহীন আঙুল থাকে।

প্রজনন ঋতুতে পুরুষ ব্যাঙের সামনের পায়ের তালুতে এক ধরনের গুটির মত অংশ দেখা যায়। একে ন্যুপসিয়াল প্যাড (Nuptial pad) বলে। ধড়ের শেষ প্রান্তের সামান্য উপরে একটি ছিদ্র থাকে। এ ছিদ্রটি অবসারণী ছিদ্র (Cloacal aperture) নামে পরিচিত। এ ছিদ্রপথে মল, মূত্র ও জনন কোষ দেহের বাইরে নির্গত হয়। ব্যাঙের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য দেখে স্ত্রী ও পুরুষ ব্যাঙ আলাদা করা যায়। অবশ্য প্রজনন ঋতুতে পার্থক্যগুলো প্রকটভাবে ধরা পড়ে।



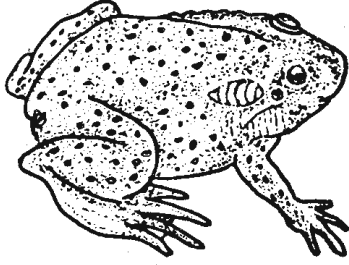
চিত্র :

৮.১৪ কুনোব্যাঙের বাহ্যিক গঠন

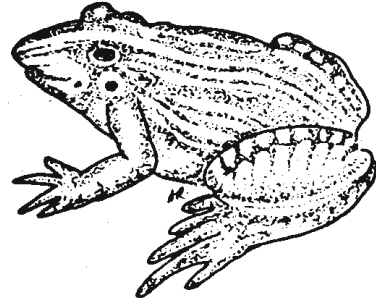
পুরুষ ও স্ত্রী কুনোব্যাঙের তুলনা

পুরুষ কুনোব্যাঙ	স্ত্রী কুনোব্যাঙ
১। পরিণত পুরুষ ব্যাঙ আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট হয়।	১। পরিণত স্ত্রী ব্যাঙ আকারে অপেক্ষাকৃত বড় হয়।
২। পুরুষ ব্যাঙের উদর সরু ও লম্বাটে।	২। প্রজনন ঋতুতে স্ত্রী ব্যাঙের উদর স্ফীত হয়।
৩। পুরুষ ব্যাঙের স্বরথলি থাকে।	৩। স্ত্রী ব্যাঙের স্বরথলি থাকে না।
৪। প্রজনন ঋতুতে পুরুষ ব্যাঙের অগ্রপদের তালুতে ন্যুপসিয়াল প্যাড থাকে।	৪। স্ত্রী ব্যাঙের ন্যুপসিয়াল প্যাড থাকে না।

আমাদের দেশে প্রধান দু প্রকার ব্যাঙ পাওয়া যায়— কুনোব্যাঙ ও কোলাব্যাঙ বা সোনাব্যাঙ। এরা উভয়েই পোকামাকড় ও অন্যান্য ছোট ছোট জীবন্ত জীব খেয়ে থাকে। পোকামাকড় ও অন্যান্য ছোট ছোট জীবদের অনেকেই ফসলের ক্ষতি করে। ব্যাঙ এদের খেয়ে মানুষের উপকার করে। এই দু প্রকার ব্যাঙের মধ্যে বাহ্যিক পার্থক্যগুলো নিচের সারণিতে দেয়া হল।



কুনোব্যাঙ



কোলাব্যাঙ

চিত্র : ৮.১৫ কুনোব্যাঙ ও সোনাব্যাঙ বা কোলাব্যাঙের চিত্র

কুনোব্যাঙ ও কোলাব্যাঙের পার্থক্য	
কুনোব্যাঙ	কোলাব্যাঙ
১। বাড়ির আনাচে কানাচে, সঁাতসেঁতে জায়গায় গাছের কোটরে, ঝোঁপঝাড়, অন্ধকার স্থানে এরা বাস করে। প্রজনন ঋতুতে এরা পানিতে বাস করে।	১। কোলাব্যাঙ জলজ পরিবেশে বাস করে, খাবারের সন্ধানে মাঝে মাঝে জলাশয়ের পাশে ডাঙায় উঠে আসে।
২। দেহত্বকের রং ধূসর।	২। দেহত্বক মসৃণ, সবুজ ও বাদামি ডোরাকাটা দাগযুক্ত।
৩। দেহত্বক খসখসে আঁচিলযুক্ত ও শূষ্ক। তবে ত্বকের গ্রন্থি নিঃসৃত রস ত্বককে সিক্ত রাখে।	৩। দেহত্বক ভেজা এবং মসৃণ। এদের ত্বকে কুনোব্যাঙের মত কোন আঁচিল এবং গ্রন্থি থাকে না।
৪। কানের পিছনে উঁচু প্যারোটাইড গ্রন্থি থাকে।	৪। প্যারোটাইড গ্রন্থি থাকে না।
৫। কুনোব্যাঙের মাথার সম্মুখভাগ ভোঁতা অর্ধবৃত্তাকার।	৫। কোলাব্যাঙের মাথার অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ এবং তেকোণা।
৬। পিছনের পায়ের আঙুলগুলো আংশিক লিপ্ত।	৬। পিছনের পায়ের আঙুলগুলো সম্পূর্ণভাবে লিপ্ত।
৭। পা অপেক্ষাকৃত ছোট এবং লাফগুলো ছোট ছোট।	৭। পা শক্তিশালী, লম্বা লাফ দিতে পারে।
৮। কুনোব্যাঙ আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট।	৮। কোলাব্যাঙ আকারে অপেক্ষাকৃত বড়।
৯। কুনোব্যাঙের চোয়াল দন্তহীন।	৯। কোলাব্যাঙের চোয়ালে দাঁত থাকে।
১০। কুনোব্যাঙ প্রধানত নিশাচর প্রাণী।	১০। কোলাব্যাঙ দিবাচর প্রাণী।

ব্যাঙের কঙ্কালতন্ত্র (Skeletal system)

যে তন্ত্র দেহের কাঠামো দান, নির্দিষ্ট আকৃতি তৈরি ও নরম অঙ্গসমূহকে (যেমন : হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস) সংরক্ষণ করে তাকে কঙ্কালতন্ত্র বা অস্থিতন্ত্র বলে। ব্যাঙের কঙ্কালতন্ত্র প্রধানত অস্থি ও তরুণাস্থি সমন্বয়ে গঠিত। কঙ্কালের হাড়গুলো নানা রকম পেশি ও বন্ধনীর মাধ্যমে একে অন্যের সাথে সংযুক্ত থাকে।

ব্যাঙের কঙ্কালকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা হয় :

অক্ষীয় কঙ্কাল ও উপাঙ্গিক কঙ্কাল

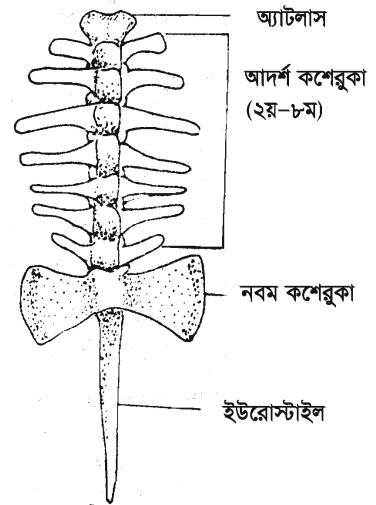
অক্ষীয় কঙ্কাল (Axial skeleton) : অক্ষীয় কঙ্কাল দেহের মধ্যরেখা বরাবর অবস্থিত এবং করোটি ও মেরুদণ্ডের সমন্বয়ে গঠিত। মাথার সম্মুখপ্রান্ত থেকে দেহের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত অক্ষীয় কঙ্কাল বিস্তৃত।

করোটি (Skull) : অক্ষীয় কঙ্কালের যে অংশ মাথার কাঠামো তৈরি করে এবং মস্তিষ্ককে সংরক্ষিত করে রাখে তাকে করোটি বলে। ছোট বড় নানা আকারের অস্থি নিয়ে করোটি গঠিত। এতে করোটিকা, উর্ধ্বচোয়াল, নিম্নচোয়াল, নাসিকা কোটর, চক্ষু কোটর, কর্ণ কোটর এবং হাইঅয়েড যন্ত্র রয়েছে।

করোটির মাঝখানে অস্থিবেষ্টিত যে ছোট গহ্বরে মস্তিষ্ক থাকে তাকে করোটিকা (cranium) বলে। করোটিকার পশ্চাৎভাগে সুমুখা ছিদ্র (foramen magnum) নামে একটি বড় ছিদ্র আছে। এ ছিদ্রের মধ্য দিয়ে সুমুখা কান্ড বা মেরু রজ্জু (spinal cord) বের হয়ে আসে এবং মেরুদণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করে। ব্যাঙের মুখবিবরের মেঝেতে পাতের ন্যায় একটি কোমলাস্থি নির্মিত অংশ থাকে, যা হাইঅয়েড যন্ত্র নামে পরিচিত। উর্ধ্বচোয়াল ও নিম্নচোয়াল মুখছিদ্রকে বেঁচন করে রাখে। উপরের চোয়াল করোটিকার সাথে দৃঢ়ভাবে যুক্ত কিন্তু নিম্নচোয়াল উপরে নিচে ওঠানামা করে। করোটিকার প্রাচীরে কয়েক জোড়া ছিদ্র থাকে। এ ছিদ্রপথে মস্তিষ্ক থেকে করোটিক স্নায়ু (cranial nerves) বাইরে বেরিয়ে আসে।

কঙ্কালের কাজ : কঙ্কাল নিম্নলিখিত কাজ করে।

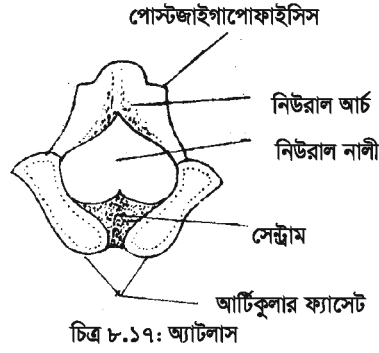
- দেহের কাঠামো ও দৃঢ়তা প্রদান— কঙ্কাল দেহের শক্ত কাঠামো তৈরি করে এবং দেহকে নির্দিষ্ট আকৃতি প্রদান করে।
- নরম অঙ্গসমূহ সংরক্ষণ— হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, মস্তিষ্ক প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ নরম অঙ্গগুলোকে সংরক্ষণ করে।
- পেশি সংযোজনে সহায়তা— পেশি, পেশি বন্ধনী, মেসেন্টারি সংযোজনের জন্য তল গঠন করে, বিভিন্ন অঙ্গকে দেহের নির্দিষ্ট স্থানে আটকে রাখতে সাহায্য করে।
- মেদ সঞ্চয় ও রক্ত কণিকা উৎপাদন— শ্বেত অস্থিমজ্জা মেদ সঞ্চয় করে এবং লোহিত অস্থিমজ্জা রক্ত কণিকা সৃষ্টি করে।
- দেহের ভারবহন ও চলন— কঙ্কাল ও কঙ্কাল পেশির সমন্বয় প্রাণীদের ভারবহনে ও চলনে সাহায্য করে।



চিত্র ৮.১৬ : ব্যাঙের মেরুদণ্ড

মেরুদণ্ড (Vertebral column) : ব্যাঙের মস্তকের পিছন থেকে দেহের শেষপ্রান্ত বরাবর মেরুদণ্ড বিস্তৃত। একে শিরদাঁড়াও বলে। মেরুদণ্ড মেরুরজ্জুকে বেঁচন করে রাখে। ব্যাঙের মেরুদণ্ডটি নয়টি কশেরুকা (Vertebrae) ও একটি লম্বা হাড় নিয়ে গঠিত। এ লম্বা হাড়কে ইউরোস্টাইল (Urostyle) বলে। মেরুদণ্ডের প্রথম ও নবম কশেরুকার গঠন আলাদা। দ্বিতীয় থেকে অষ্টম কশেরুকার গঠন প্রায় একই রকম।

অ্যাটলাস (Atlas) : মেরুদণ্ডের প্রথম কশেরুকাতে অ্যাটলাস বলে। এটা সামনে করোটি ও পিছনে ২য় কশেরুকার সাথে যুক্ত থাকে। অ্যাটলাস দেখতে অনেকটা আর্থির মত, এর কোন ট্রান্সভার্স প্রসেস, নিউরাল স্পাইন ও প্রিজাইগাপোফাইসিস নেই। অ্যাটলাসের নিউরাল নালী আকারে তুলনামূলকভাবে বড়। অ্যাটলাস পোস্টজাইগাপোফাইসিসের সাহায্যে পরবর্তী কশেরুকার সাথে মিলিত হয়।



আদর্শ কশেরুকা : একটি আদর্শ কশেরুকা নিম্নলিখিত অংশ নিয়ে গঠিত। সেন্ট্রাম, নিউরাল ক্যানাল, নিউরাল আর্চ, নিউরাল স্পাইন বা নিউরাল কাঁটা, ট্রান্সভার্স প্রসেস, প্রিজাইগাপোফাইসিস ও পোস্টজাইগাপোফাইসিস।

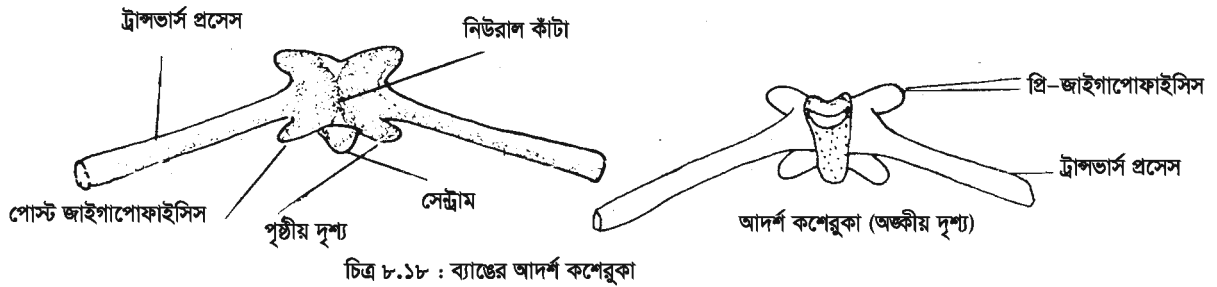
ক) সেন্ট্রাম (Centrum): প্রতিটি কশেরুকার অঙ্গীয়দেশের মাঝখানে এই নিরেট অংশটি অবস্থিত। এর সম্মুখভাগ অবতল ও পেছনের প্রান্তটি উত্তল। এ ধরনের সেন্ট্রামকে প্রোসিলাস (Procoelus) বলে। এ রকম গঠনের কারণে কশেরুকাগুলো সামনে ও পিছনে সহজে আটকাতে পারে।

খ) নিউরাল ক্যানাল (Neural canal) : নিউরাল আর্চ দ্বারা পরিবেষ্টিত গহ্বরটিকে নিউরাল ক্যানাল বলে। এর ভেতর দিয়ে মেরুরজ্জু পেছন দিকে অগ্রসর হয়।

গ) নিউরাল আর্চ (Neural arch) : সেন্ট্রামের পৃষ্ঠদেশের দুই পাশ থেকে উৎপন্ন হাড় দুটি একটি গোলাকার বেফনী সৃষ্টি করে। এ বেফনীটি নিউরাল আর্চ। নিউরাল আর্চ মেরুরজ্জুকে বেফন করে রাখে।

ঘ) নিউরাল স্পাইন বা কাঁটা (Neural spine) : নিউরাল আর্চের পৃষ্ঠীয় দিকে পশ্চাত্মুখী কাঁটার মত গঠনী সৃষ্টি হয়। এই কাঁটার মত অংশকে নিউরাল স্পাইন বলে, মাংসপেশি এই কাঁটার সাথে আটকে থেকে দেহকে দৃঢ়তা দান করে।

ঙ) ট্রান্সভার্স প্রসেস (Transverse process) : প্রতিটি নিউরাল আর্চের পাশ থেকে একটি করে লম্বা হাড় আড়াআড়িভাবে প্রবৃন্দ হয়। এদের ট্রান্সভার্স প্রসেস বলে। বিভিন্ন মাংসপেশি এই প্রসেসগুলোর সাথে যুক্ত থাকে।

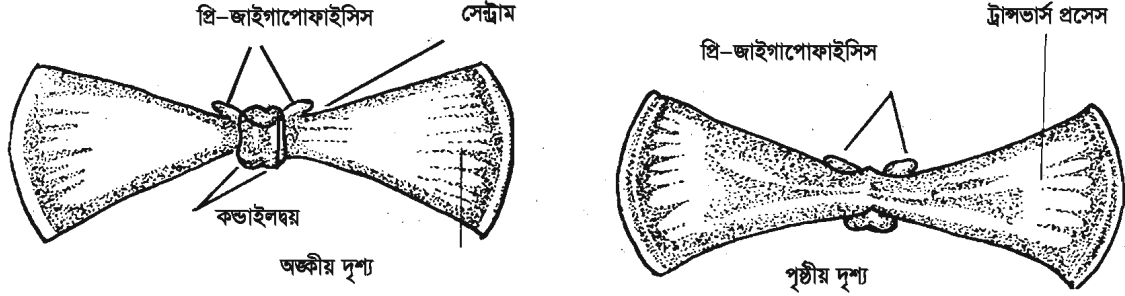


চ) প্রিজাইগাপোফাইসিস (Prezygapophysis) : প্রতিটি নিউরাল আর্চের সামনের দিকে উর্ধ্বমুখী চামচের মত যে স্থূল খাঁজ বের হয় তাদের প্রিজাইগাপোফাইসিস বলে। এরা সামনের কশেরুকার পোস্টজাইগাপোফাইসিস দুটির সাথে আটকে দেহকে দৃঢ়তা দান করে।

পোস্টজাইগাপোফাইসিস (Postzygapophysis) : প্রতিটি নিউরাল আর্চের পিছন দিকে নিম্নমুখী চামচের মত যে দুটি খাঁজ বের হয়ে তাদের পোস্টজাইগাপোফাইসিস বলে। এরা পিছনের কশেরুকার প্রিজাইগাপোফাইসিসের সাথে আটকে থাকে। ফলে কশেরুকাগুলোর সংযুক্তি দৃঢ় হয়।

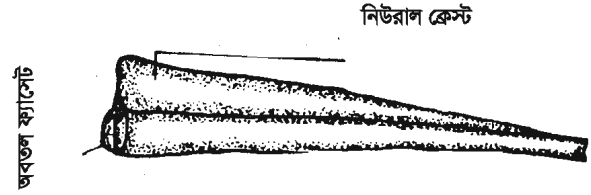
নবম কশেরুকা (Ninth vertebra) : নবম কশেরুকাকে স্যাক্রাল কশেরুকাও বলা হয়। এটি আকারে বড় ও শক্ত। এ কশেরুকার ট্রান্সভার্স-প্রসেস শক্ত, চ্যাপ্টা ও প্রসারিত। নবম কশেরুকার এ বৈশিষ্ট্যের কারণে অন্যান্য কশেরুকা থেকে একে সহজে আলাদা করা যায়। এ কশেরুকার পশ্চাত্ত্রান্ত দুটি উত্তল অংশে রূপান্তরিত হয়েছে। এ অংশ

দুটির সাথে ইউরোস্টাইল আটকে থাকে। আর ট্রান্সভার্স প্রসেস নামক অংশ শ্রোণীচক্রের ইলিয়ামের সাথে যুক্ত হয়ে শ্রোণীচক্রের ভারবহন করে।



চিত্র ৮.১৯ : ব্যাঙের নবম কশেরুকা

ইউরোস্টাইল (Urostyle): ইউরোস্টাইল নবম কশেরুকার পেছনে অবস্থিত একটি লম্বা দণ্ডাকার অস্থি। অনেকগুলো কশেরুকা একত্রিত হয়ে এরূপ আকার গঠন করেছে। এটা মেরুদণ্ডের শেষ প্রান্তে দুটি ইলিয়ামের মাঝে অবস্থিত। এ হাড়টির পৃষ্ঠ দেশে নিউরাল ক্রেস্ট নামে ছুরির ফলার মত বর্ধিত অংশ আছে। ইউরোস্টাইল পিছনের দিকে ক্রমশ সরু হয়ে গেছে। ইউরোস্টাইলের সামনে দুটি অবতল অংশ থাকে, যা নবম কশেরুকার উত্তল অংশের সাথে যুক্ত থাকে। এ অবতল গর্ত ও নিউরাল ক্রেস্টের মাঝে খুব সূক্ষ্ম নিউরাল ক্যানাল আছে।



চিত্র ৮. ২০ : ব্যাঙের ইউরোস্টাইল

মেরুদণ্ডের কাজ :

- ১। মেরুদণ্ড দেহের নির্দিষ্ট আকৃতি দান ও কাঠামো তৈরি করে।
- ২। এটা মেরুরজ্জুকে ঘিরে রাখে ও সংরক্ষণ করে।
- ৩। শ্রোণীচক্রের সাথে আটকে থেকে ব্যাঙের দেহের ভারবহন ও চলাচলে সাহায্য করে।
- ৪। মাংসপেশি কশেরুকার ট্রান্সভার্স প্রসেস ও নিউরাল আর্চের সাথে আবদ্ধ থেকে চলাচল সুগম করে।

উপাঙ্গিক কঙ্কাল (Appendicular skeleton) : ব্যাঙের উপাঙ্গিক কঙ্কাল দু ভাবে বিভক্ত।

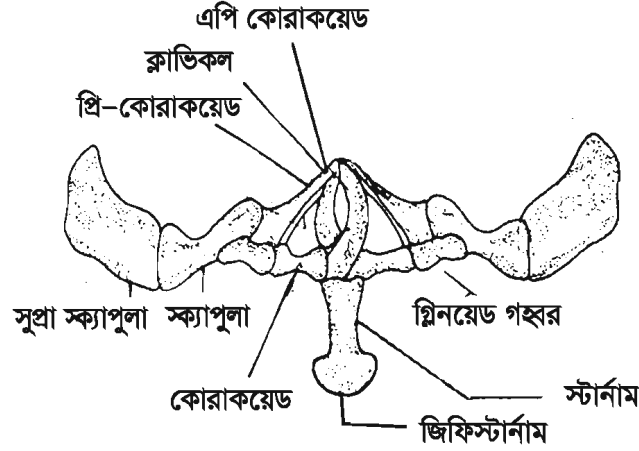
চক্র অঞ্চল (Girdle region) ও বাহু অঞ্চল (Limb region)। দেহে দুটি চক্র রয়েছে। অগ্রবর্তী চক্র বা বক্ষচক্রের সাথে সামনের পা যুক্ত থাকে। অনুরূপভাবে পশ্চাত্বর্তী চক্র বা শ্রোণীচক্রের সাথে পিছনের পা দুটি যুক্ত থাকে।

বক্ষ অস্থিচক্র বা বক্ষচক্র (Pectoral girdle) : ব্যাঙের বক্ষচক্রটি দেহকাণ্ডের অগ্রভাগের অঙ্গীয় অংশ প্রায় বেঁধে রাখে। পৃষ্ঠ দেশের মধ্যরেখা বরাবর ছাড়া দেহের অগ্রবর্তী অংশের প্রায় সবটাই জুড়ে এর অবস্থান। এ অংশটি চামড়া ও পেশি দ্বারা আবৃত থাকে। ব্যাঙের বক্ষচক্রকে সমান দুটি প্রতিসম অংশে ভাগ করা যায়। বক্ষচক্রের প্রতিটি প্রতিসম অংশ অস্থি ও তরুণাস্থি সমন্বয়ে গঠিত। এ চক্রটি মাংসপেশি দ্বারা মেরুদণ্ডের সাথে আটকানো থাকে, ফলে উপযুক্তভাবে অবস্থান করে বিভিন্ন রকম কার্য সম্পাদন করা সহজ হয়।

কাজ :

- ১। বক্ষচক্র অগ্রপদ বা সামনের পা ধারণ করে।
- ২। দেহের নরম অঙ্গ; যেমন, ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ড সংরক্ষণ করে।

আমরা আগেই জেনেছি যে, বক্ষচক্রকে দুটি সমান অংশে ভাগ করা যায়। প্রতিটি অংশ নিম্নলিখিত অংশগুলো নিয়ে গঠিত।



চিত্র ৮. ২১ : ব্যাঙের বক্ষ অস্থিচক্র

১। সুপ্রাস্ক্যাপুলা (Supra-scapula) : এটি প্রশস্ত, পাতের মত তরুণাঙ্ঘি বিশেষ। সুপ্রাস্ক্যাপুলার একপ্রান্ত স্ক্যাপুলার সাথে যুক্ত ও অপর প্রান্ত মুক্ত থাকে। মুক্ত প্রান্তটি মাংসপেশি ও বন্ধনী দিয়ে মেরুদণ্ডের সাথে যুক্ত থাকে।

২। স্ক্যাপুলা (Scapula) : স্ক্যাপুলা একটি সরু, শক্ত ও লম্বা হাড়। এর একপ্রান্ত সুপ্রাস্ক্যাপুলা এবং অপরপ্রান্ত ক্লাভিকল ও কোরাকয়েডের সাথে যুক্ত থাকে।

৩। ক্লাভিকল (Clavicle) : ক্লাভিকল একটি সরু ও লম্বা হাড়। একে কণ্ঠাঙ্ঘি (Collar bone) ও বলে। এ অস্থিটি স্ক্যাপুলার অভ্যন্তরীণ এবং সামনের দিকে অবস্থিত এবং প্রিকোরাকয়েডকে আবৃত করে রাখে। এর একপ্রান্তে স্ক্যাপুলা ও অপরপ্রান্ত গ্লেনয়েড (Glenoid) গহ্বর তৈরিতে অংশ নেয়।

৪। কোরাকয়েড (Coracoid) : এ হাড়টি শক্ত, মোটা ও পুরু। কোরাকয়েডের একপ্রান্ত স্ক্যাপুলার সাথে সংযুক্ত হয়ে গ্লেনয়েড গহ্বর তৈরি করে এবং অন্যপ্রান্ত প্রিকোরাকয়েডের সাথে যুক্ত।

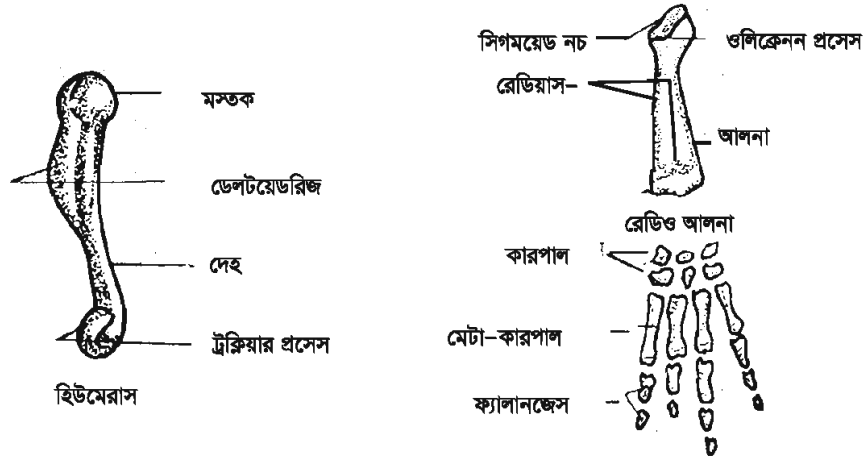
৫। প্রিকোরাকয়েড (Pecoracoid) : এটি একটি লম্বা ও সরু তরুণাঙ্ঘি দিয়ে গঠিত কুঠারের মত অংশ। প্রিকোরাকয়েড ক্লাভিকলের নিচে ও পাশে অবস্থিত এবং ক্লাভিকল দ্বারা আবদ্ধ থাকে।

৬। এপিকোরাকয়েড (Epicoracoid) : এটি একটি বাঁকা তরুণাঙ্ঘি, যার একপ্রান্ত কোরাকয়েড এবং অপরপ্রান্ত প্রিকোরাকয়েডের সাথে যুক্ত।

৭। গ্লেনয়েড গহ্বর (Glenoid cavity) : বক্ষচক্রের প্রতিটি অর্ধাংশে স্ক্যাপুলা, কোরাকয়েড ও প্রি-কোরাকয়েড এর সংযোগ স্থলে একটি করে গহ্বর থাকে। এ গহ্বর গ্লেনয়েড গহ্বর নামে পরিচিত।

৮। স্টার্নাম (Sternum) : দেহের অভ্যন্তরীণ দিকে বক্ষচক্রের কোরাকয়েডের দুটি পিছনের দিকে তরুণাঙ্ঘি নির্মিত একটি বর্ধিত অংশ থাকে, একে স্টার্নাম বলে। কোলাব্যাঙের স্টার্নামের শেষ প্রান্ত গোলাকার, জিকি স্টার্নাম।

অগ্রপদ বা সামনের পা (Fore Limb) : ব্যাঙের সামনের পা ছোট বড় কয়েকটি হাড় নিয়ে গঠিত। নিম্নে হাড়গুলোর বর্ণনা দেওয়া হল।



চিত্র ৮.২২ : ব্যাঙের অগ্রপদের অস্থিসমূহ

১. হিউমেরাস (Humerus) : সামনের পায়ের সবচেয়ে উপরের হাড়কে হিউমেরাস বলে। এটি একটি লম্বা এবং সামান্য বাঁকানো হাড়। হাড়টির উভয় প্রান্তই মোটা। হিউমেরাসের দেহের সম্মুখ দিকে একটি স্ফীত অংশ থাকে। একে ডেলটয়েড রীজ বলে। হাড়টির অগ্রাংশের মাথাটা গোলাকার। এ মাথা দ্বারাই বক্ষচক্রের গ্লেনয়েড গহ্বরের সাথে হাড়টি আবদ্ধ থাকে। হিউমেরাসের অপর প্রান্তে একটি গোলাকার অস্থিপিন্ড থাকে, একে ট্রিক্লিয়ার প্রসেস বলে। এটি পরবর্তী হাড়ের সাথে নিজেকে আটকাতে সাহায্য করে।

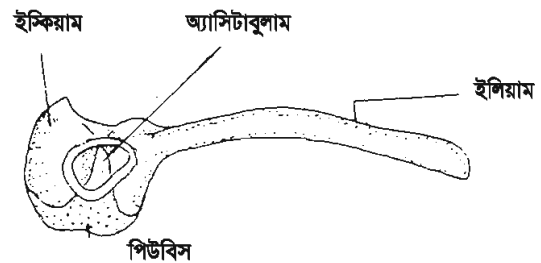
২. রেডিও-আলনা (Radio-ulna) : ব্যাঙের সামনের পায়ের মাঝের হাড় হল রেডিও-আলনা। প্রকৃতপক্ষে রেডিয়াস ও আলনা নামের দুটি হাড় যুক্ত হয়ে এ হাড়টি গঠন করে। দুটি হাড়ের সংযোগস্থলে একটি লম্বা দাগ থাকে। ভেতরের দিকের হাড়টি রেডিয়াস আর বাইরের দিকের হাড়টি আলনা নামে পরিচিত। এই হাড়ের অগ্রভাগে একটি বাঁকা ঝাঁজ থাকে যেখানে হিউমেরাসের ট্রিক্লিয়া যুক্ত হয়। এই ঝাঁজকে সিগময়েড নচ বলে। এছাড়া এর নিকটবর্তী একটি স্ফীত অংশকে ওলিক্রেনন প্রসেস বলে।

৩. কারপাল (Carpal) : কজির ছোট ছোট ছয়টি হাড় নিয়ে কারপাল গঠিত। প্রতিটি সারিতে তিনটি করে মোট ছয়টি হাড় দুই সারিতে সাজানো থাকে। রেডিও-আলনার পশ্চাত্ত প্রান্ত কারপালের সাথে যুক্ত।

৪. মেটাকারপাল (Metacarpal) : সবু চারটি হাড় নিয়ে করতল গঠিত। এ হাড়গুলোকে মেটাকারপাল বলে। এরা অগ্রপদের তালুর ভারবহন করে ও অঙ্গুলিনলক বা ফ্যালান্জেসের সাথে যুক্ত থাকে।

৫. ফ্যালান্জেস (Phalanges) বা অঙ্গুলিনলক : ব্যাঙের সামনের পায়ে চারটি আঙুল থাকে। আঙুলের হাড়গুলোকে অঙ্গুলিনলক বলে। প্রথম ও দ্বিতীয় আঙুল দুটি এবং তৃতীয় ও চতুর্থ আঙুলে তিনটি করে অঙ্গুলিনলক থাকে।

শ্রোণীচক্র (Pelvic girdle) : বক্ষচক্রের মত শ্রোণীচক্রকেও সমান দুটিকে অংশে ভাগ করা যায়। শ্রোণীচক্র পিছনের পা দুটিকে মেরুদণ্ডের সাথে আটকে রাখে এবং দেহের ভারবহন করে। এ চক্র দেখতে ইথরেজি 'V' অক্ষরের মত। শ্রোণীচক্রের প্রতিটি অংশ তিনটি হাড় ও একটি গহ্বর নিয়ে গঠিত।



চিত্র ৮.২৩ : ব্যাঙের শ্রোণীচক্র (পাশ্বীয় দৃশ্য)

১। ইলিয়াম (Ilium) : শ্রেণীচক্রের সবচেয়ে লম্বা, সামান্য বাঁকা ও দণ্ডাকার হাড়ের নাম ইলিয়াম। এর সামনের প্রান্তটি নবম কশেরুকার সাথে আটকানো থাকে।

২। ইস্কিয়াম (Ischium) : এই হাড়টি ইলিয়াম ও পিউবিস এর মাঝে অবস্থিত একটি অর্ধ চন্দ্রাকৃতির হাড়।

৩। পিউবিস (Pubis) : ইলিয়াম ও ইস্কিয়ামের মাঝে অবস্থিত একটি ত্রিকোণাকার তরুণাঙ্গ।

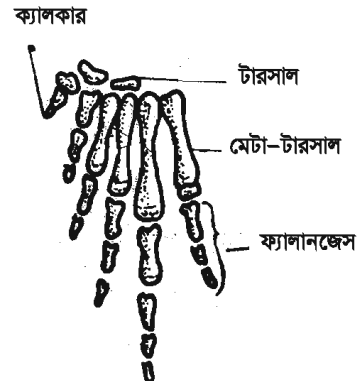
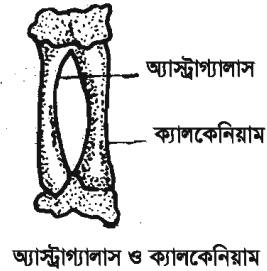
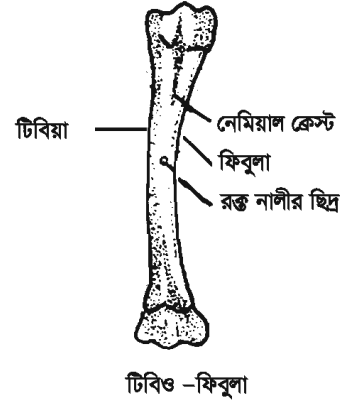
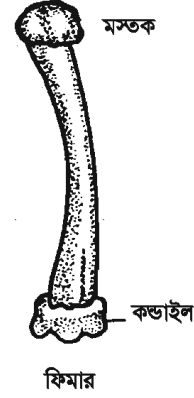
৪। অ্যাসেটাবুলাম (Acetabulum) : তিনটি হাড়ের সংযোগ স্থলে একটি গহ্বর অবস্থিত। এ গহ্বরটিকে অ্যাসেটাবুলাম বলে। অ্যাসেটাবুলামের সাথে পশ্চাৎপদের ফিমার আটকে থাকে।

পশ্চাৎপদ (Hind limb)

১। ফিমার (Femur) বা উর্বাঙ্গি : পশ্চাৎপদের প্রথম একক অস্থির নাম ফিমার বা উর্বাঙ্গি। ফিমারের দু প্রান্ত স্ফীত ও মাঝখানের অংশটি বাঁকা। এটি অগ্রভাগের গোলাকার অংশের সাহায্যে শ্রেণীচক্রের অ্যাসেটাবুলামের সাথে যুক্ত থাকে।

২। টিবিও-ফিবুলা (Tibio-fibula) : জানুতলের হাড়কে টিবিও-ফিবুলা বলে। টিবিয়া এবং ফিবুলা নামের দুটি অস্থির সমন্বয়ে এ যুগ্ম অস্থিটি গঠিত। দেহের ভিতরের দিকে টিবিয়া আর বাইরের দিকে ফিবুলা অবস্থিত। হাড় দুটির সংযোগস্থলে একটি খাঁজ আছে। একে নেমিয়াল ক্রেস্ট (cnemial crest) বলে।

৩। টারসাল (Tarsal) : পায়ের গোড়ালির হাড়গুলোকে টারসাল বলে। এ হাড়গুলো দুটি সারিতে সাজানো থাকে। উপরের সারির হাড় দুটি অ্যাস্ট্রাগ্যুলাস ও ক্যালকেনিয়াম নামে পরিচিত। দুটি হাড়ের প্রান্তভাগ তরুণাঙ্গ দিয়ে যুক্ত এবং এর মাঝখানের অংশটি ফাঁকা থাকে। দ্বিতীয় সারির হাড় দুটি ছোট এবং আকারবিহীন।



চিত্র : ৮.২৪ : পশ্চাৎপদের অস্থিসমূহ

৪। মেটাতারসাল (Metatarsal) : পাঁচটি সরু কাঠির মত হাড় নিয়ে ব্যাঙের পদতল গঠিত। এ হাড়গুলো নিচের দিকে অঙ্গুলিনলক বা ফ্যালানজেসের সাথে যুক্ত থাকে।

৫। ফ্যালানজেস (Phalanges) : ব্যাঙের পিছনের পায়ে পাঁচটি আঙুল আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্গুলিতে দুটি, তৃতীয় ও পঞ্চম অঙ্গুলিতে তিনটি এবং চতুর্থ অঙ্গুলিতে চারটি করে অঙ্গুলিনলক আছে। তাছাড়া পিছনের পায়ের ভিতর দিকে ক্যালকার নামক একটি বর্ধিত অংশ আছে।

পৌষ্টিক তন্ত্র (Digestive system)

ব্যাঙ কীটপতঙ্গ, পোকামাকড়, ইত্যাদি খেয়ে জীবন ধারণ করে। এসব খাদ্যবস্তু সরাসরি দেহের কোষগুলো গ্রহণ করতে পারে না। এজন্য খাদ্যবস্তুর পরিপাক প্রয়োজন। এ কাজটা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য যে তন্ত্র অংশ নেয় তাকে পৌষ্টিক তন্ত্র বলে। অর্থাৎ যে তন্ত্রের সাহায্যে খাদ্যবস্তু গ্রহণ, পরিপাক, পরিপাককৃত খাদ্যরস শোষণ এবং খাদ্যের আপাচ্য অংশ মলরূপে ত্যাগ করা হয়, তাকে পৌষ্টিক তন্ত্র বলে। ব্যাঙের পৌষ্টিক তন্ত্রকে দুটি অংশে ভাগ করা যায় : পৌষ্টিক নালী এবং পৌষ্টিক গ্রন্থি।

ক) পৌষ্টিক নালী (Alimentary canal) : মুখছিদ্র থেকে অবসারণী ছিদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত নালীটিকে পৌষ্টিক নালী বলে। এ নালীটি কোথাও সরু, কোথাও প্রশস্ত আবার কোথাও কুণ্ডলী পাকানো।

মুখছিদ্র (Mouth) : ব্যাঙের দেহের সম্মুখভাগে মুখ বা মুখছিদ্র অবস্থিত। ব্যাঙের মুখছিদ্র বেশ প্রশস্ত ও অর্ধবৃত্তাকার। মুখের উপরে ও নিচে দুটি চোয়াল আছে। ব্যাঙ উপরের চোয়াল নাড়াতে পারে না। কিন্তু নিচের চোয়াল নাড়াতে পারে। চোয়ালগুলো দন্তবিহীন।

মুখ গহ্বর (Buccal cavity) : মুখছিদ্রের পিছনে প্রশস্ত মুখগহ্বর অবস্থিত। এর তলদেশে চওড়া ও মাংসল জিহ্বা থাকে। এর অগ্রভাগ নিম্নচোয়ালের সাথে যুক্ত ও পশ্চাত্তাগ মুক্ত। আঠালো জিহ্বা খাদ্য শিকারের প্রধান অঙ্গ। ব্যাঙ জিহ্বার পশ্চাৎ অংশ উন্টিয়ে মুখের বাইরে নিক্ষেপ করে কীটপতঙ্গ ধরে এবং সরাসরি মুখে ঢুকিয়ে দেয়। অন্তঃনাসারন্ধ্র, ইউস্টেশিয়ান নালীর ছিদ্র ইত্যাদি অঙ্গসমূহ মুখ গহ্বরের মধ্যে অবস্থিত।

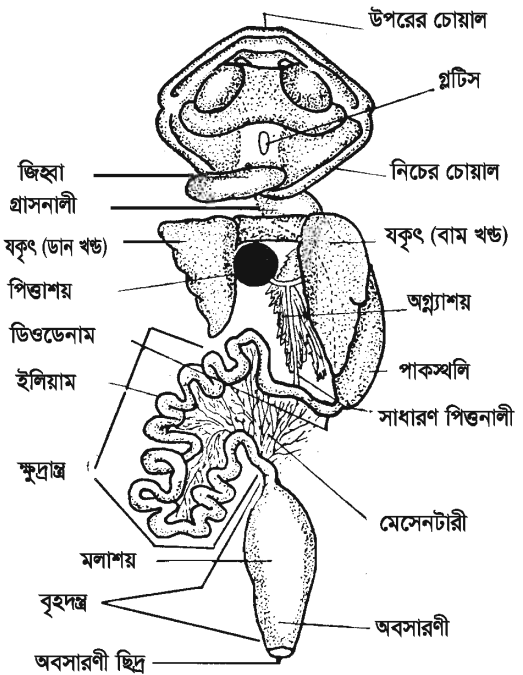
গলবিল (Pharynx) : মুখগহ্বর ও অন্ননালীর মাঝে অবস্থিত স্বল্প বিস্তৃত অংশ গলবিল।

অন্ননালী বা গ্রাসনালী (Oesophagus) : গলবিলের পরবর্তী মোটা, ছোট এবং নলের মত অংশটি হল অন্ননালী। অন্ননালীর মাধ্যমে খাদ্যবস্তু মুখগহ্বর থেকে পাকস্থলিতে পৌঁছায়।

পাকস্থলি (Stomach) : অন্ননালীর পিছনে বাঁকানো থলির মত অংশটি পাকস্থলি। এর প্রাচীর পুরু, পেশিবহুল ও গ্রন্থিযুক্ত। গ্রন্থিগুলো প্রাচীরের ভিতরের গাত্রে থাকে। পাকস্থলি দুটি অংশে বিভক্ত; কার্ডিয়াক ও পাইলোরিক অংশ। অন্ননালী সংলগ্ন অপেক্ষাকৃত মোটা অংশ কার্ডিয়াক আর ক্ষুদ্রান্ত্র সংলগ্ন অংশটি পাইলোরিক অংশ। পাকস্থলি ও ক্ষুদ্রান্ত্রের সংযোগস্থলে একটি গোলাকার মাংসল কপাটিকা থাকে, যা ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্য প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে।

অন্ত্র (Intestine) : পাকস্থলির পর থেকে শুরু করে অবসারণী ছিদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত প্যাঁচানো নালীটি হল অন্ত্র। এ অন্ত্র দুটি অংশে বিভক্ত- ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্র।

ক্ষুদ্রান্ত্র (Small intestine) : পাকস্থলির পরবর্তী অংশ থেকে বৃহদন্ত্র পর্যন্ত সরু, প্যাঁচানো নালী হল ক্ষুদ্রান্ত্র। ক্ষুদ্রান্ত্র দুটি অংশে বিভক্ত- ডিওডেনাম ও ইলিয়াম।



চিত্র : ৮.২৫ ব্যাঙের পৌষ্টিক তন্ত্র

(ক) **ডিওডেনাম (Duodenum)** : ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশ, যা দেখতে অনেকটা ইথেরজি U-এর মত, এ অংশকে ডিওডেনাম বলে। পেরিটোনিয়াম নামক একটি স্ফীত ও পাতলা পর্দা দ্বারা পাকস্থলি ও ডিওডেনাম দেহ গহ্বরে ঝুলে থাকে। যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয়নালী একত্রে ডিওডেনামে উন্মুক্ত হয়।

(খ) **ইলিয়াম (Ilium)** : ডিওডেনামের পরবর্তী অংশ হল ইলিয়াম। এ নালী অপেক্ষাকৃত লম্বা, সরু এবং পঁচানো। এর গায়ের ভিতরের দেয়ালে ভিলাই নামে আঙুলের মত অসংখ্য অভিক্ষেপ থাকে ও ভিলাই গাত্র দ্বারা পাচিত খাদ্যরস শোষিত হয়ে রক্ত প্রবাহে প্রবেশ করে।

বৃহদন্ত্র (Large intestine) : ক্ষুদ্রান্ত্রের পরেই অপেক্ষাকৃত মোটা অংশ হল বৃহদন্ত্র। এটি মলাশয় এবং অবসারণী-এই দুটি অংশে বিভক্ত। মলাশয়ে খাদ্যের অপাচ্য অংশ জমা থাকে। এখানে কোন খাদ্যবস্তু পরিপাক হয় না। কিন্তু পানি, লবণ ও ভিটামিন পরিশোধিত হয়। অবসারণী মলাশয়ের পিছনের অংশ। মূত্রনালী এবং জনননালী পৃথকভাবে অবসারণীতে মুক্ত হয়। মলাশয়ের পর অবসারণী ছিদ্র অবস্থিত। অবসারণী ছিদ্র পথে মল, মূত্র ও জনন কোষ বের হয়।

পৌষ্টিক গ্রন্থি (Digestive glands) : যেসব গ্রন্থি পরিপাকে অংশগ্রহণকারী রস ক্ষরণ করে এবং পরিপাকে সাহায্য করে তাদের পরিপাক গ্রন্থি বলে। ব্যাঙের দেহে দুটি প্রধান পরিপাক গ্রন্থি থাকে, যকৃৎ এবং অগ্ন্যাশয়।

যকৃৎ (Liver) : যকৃত দেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি যা দুটি অংশে বিভক্ত। অংশ দুটি হৃৎপিণ্ডের দুই পাশে অবস্থিত। ডান ও বাম অংশ দুটি মধ্যখন্ডক দ্বারা সংযুক্ত। যকৃৎ চকলেট বা খয়েরি রঙের একটি বৃহদাকার গ্রন্থি। যকৃতের দুটি খন্ডকের মধ্যবর্তী স্থানে পিত্তাশয় বা পিত্তথলি থাকে। যকৃৎ নিঃসৃত পিত্তরস এই থলিতে সঞ্চিত থাকে। যকৃৎ যেসব কাজ করে তা হল :

- (ক) যকৃৎ গ্লাইকোজেন, স্নেহ ও ভিটামিন জাতীয় খাদ্যদ্রব্য সঞ্চয় করে রাখে। এ কারণে একে দেহের সঞ্চয় ঘর বলে।
- (খ) যকৃৎ আমিষ সংশ্লেষণে সহায়তা করে।
- (গ) যকৃতে নাইট্রোজেন ঘটিত রেচন দ্রব্য ইউরিয়ায় রূপান্তরিত হয়।
- (ঘ) যকৃতে লোহিত কণিকা সৃষ্টি হয়।

অগ্ন্যাশয় (Pancreas) : অগ্ন্যাশয় মেরুদণ্ডী প্রাণীর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পৌষ্টিক গ্রন্থি। পাকস্থলি ও ডিওডেনামের মধ্যবর্তী অঞ্চলে চ্যাপ্টা, হালকা হলুদ বর্ণের এবং পাতার ন্যায় এই গ্রন্থিকে অগ্ন্যাশয় বলে। পিত্তাশয় নালী ও অগ্ন্যাশয় নালী একত্রে মিলিত হয়ে যকৃৎ-অগ্ন্যাশয় নালীতে পরিণত হয়ে ডিওডেনামে উন্মুক্ত হয়।

পুষ্টি ও পরিপাক (Nutrition and digestion) : খাদ্য গ্রহণ, খাদ্য পরিপাক, পরিপাককৃত খাদ্যরস শোষণ করা এবং অপাচ্য বস্তু নিষ্কাশন পুষ্টির অন্তর্গত।

ব্যাঙ একটি মাংসাশী প্রাণী। জীবন্ত পোকামাকড়, কেঁচো, শামুক ইত্যাদি ব্যাঙের প্রধান খাদ্য। এরা আঠালো জিহ্বার সাহায্যে পোকামাকড় ধরে এবং গিলে ফেলে। সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীর মত ব্যাঙের খাদ্যে আমিষ, শ্বেতসার, স্নেহ, লবণ, ভিটামিন ও পানির উপাদান হিসেবে থাকে। এ ছয় প্রকার উপাদান পোকামাকড়ের দেহ থেকে পাওয়া যায়। লবণ, ভিটামিন ও পানি পরিপাকের প্রয়োজন হয় না, ব্যাঙের দেহকোষ এই তিনরকম খাদ্যদ্রব্য সরাসরি গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু আমিষ, শ্বেতসার ও স্নেহ জটিল জৈব যৌগ বিধায় জীবকোষ এগুলো সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না। এসব অদ্রবণীয়, জটিল ও অশোষণযোগ্য খাদ্য বস্তু উৎসেচকের (enzyme) উপস্থিতিতে জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে এবং সরল ও শোষণযোগ্য তরল উপাদানে রূপান্তরিত হয়। খাদ্যদ্রব্যের এ পরিবর্তনকে পরিপাক বলে।

খাদ্য গলাধঃকরণের পর মুখ গহ্বরের ভিতর এর কোন রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে না। মুখগহ্বরের প্রাচীর নিঃসৃত মিউকাস খাদ্যবস্তুকে পিচ্ছিল করে। অন্ত্রনালীর মধ্য দিয়ে খাদ্যবস্তু পাকস্থলিতে পৌঁছায়। পাকস্থলিতে খাদ্যবস্তুর পরিপাক শুরু হয়।

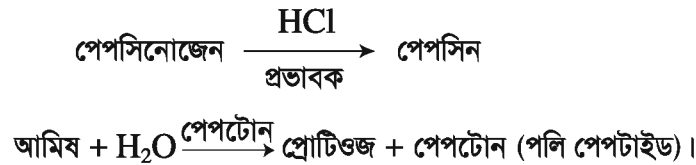
পাকস্থলিতে পরিপাক

পাকস্থলির অন্তঃগাত্র গ্রন্থিযুক্ত। খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলিতে পৌঁছানোর পর এর গাত্র থেকে গ্যাস্ট্রিন নামক একটি হরমোন নিঃসৃত হয়। গ্যাস্ট্রিনের প্রভাবে পাকস্থলি গ্রন্থি থেকে পাচক রস নিঃসৃত হয়। পাচক রসে মিউসিন, হাইড্রোক্লোরিক এসিড ও পেপসিন থাকে। পেপসিন এক প্রকার উৎসেচক।

মিউসিন (Mucin) মিউসিন উৎসেচক নয়। এটা খাদ্য বস্তুকে পিচ্ছিল করে।

হাইড্রোক্লোরিক এসিড : এটি জীবিত খাদ্যকে মেরে ফেলে, জীবাণু ধ্বংস করে এবং পেপসিনকে ক্রিয়াশীল করার জন্য অম্লীয় মাধ্যম সৃষ্টি করে। এই পরিবেশে পেপসিনের ক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়।

পেপসিন (Pepsin) : পাকস্থলি গ্রন্থি থেকে যে নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেন নিঃসৃত হয়, হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl) তাকে সক্রিয় পেপসিনে পরিণত করে। পেপসিন আমিষকে আংশিকভাবে বিপ্লিষ্ট করে প্রোটিনোজ ও পেপটোন নামক পলিপেপটাইডে পরিণত করে।

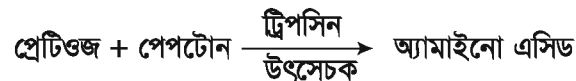


পাকস্থলি অনবরত সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। এর ফলে পাকস্থলিতে খাদ্যবস্তু অর্ধতরল অবস্থায় পরিণত হয়। এ অর্ধপাচিত তরলকে পাকমণ্ড বা কাইম (chyme) বলে।

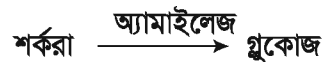
ডিওডেনামে পরিপাক : পাকমণ্ড পাকস্থলি থেকে ডিওডেনামে পৌঁছালে যকৃৎ নিঃসৃত পিত্ত এবং অগ্ন্যাশয় নিঃসৃত রসের সংস্পর্শে আসে। পিত্তরস চর্বি জাতীয় খাদ্যকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় বিপ্লিষ্ট করে এবং উৎসেচকের সাথে বিক্রিয়ার উপযোগী করে। এ ছাড়া খাদ্যের অম্লভাব প্রশমিত করে এবং ক্ষারীয় মাধ্যম আনয়নে সাহায্য করে। পিত্তরসে কোন উৎসেচক থাকে না।

অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত পাচক রসটির নাম অগ্ন্যাশয় রস। এ রসে তিনটি উৎসেচক থাকে। ট্রিপসিন অ্যামাইলেজ ও লাইপেজ।

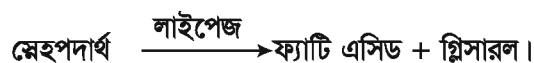
ট্রিপসিন (Trypsin) : ট্রিপসিন প্রোটিনোজ ও পেপটোনকে দ্রবণীয় ও শোষণযোগ্য অ্যামাইনো এসিডে পরিণত করে।



অ্যামাইলেজ (Amylase) : এই উৎসেচক শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয় খাদ্যকে গ্লুকোজে পরিণত করে।



লাইপেজ (Lipase) : এই উৎসেচক স্নেহকণাকে ভেঙে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে পরিণত করে।



ইলিয়ামে পরিপাক : পরিপাককৃত খাদ্যবস্তু ইলিয়ামে পৌঁছালে এর প্রাচীর গাত্র থেকে বিভিন্ন উৎসেচক নিঃসৃত হয়। এদের মধ্যে প্রোটিন বিজারক ট্রিপসিন, শর্করা বিজারক অ্যামাইলেজ, মল্টেজ, সুকরেজ ও ল্যাক্টেজ এবং স্নেহ বিজারক লাইপেজ এনজাইম থাকে। ফলে অবশিষ্ট আমিষ জাতীয় খাদ্য অ্যামাইনো এসিডে, শর্করা জাতীয় খাদ্য মনোস্যাকারাইডে (গ্লুকোজ) এবং স্নেহ জাতীয় খাদ্য গ্লিসারল ও ফ্যাটি এসিডে পরিণত হয়।

পরিশোষণ (Absorption) : পরিপাককৃত তরল ও সরল খাদ্য যথা : গ্লুকোজ ও অ্যামাইনো এসিড ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাইয়ের কৈশিক রক্তনালী দ্বারা শোষিত হয় এবং ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল ভিলাইস্থিত ল্যাকটিয়াল নালী দ্বারা শোষিত হয়ে লসিকা নালীর মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়। পরিশোষিত খাদ্য যকৃৎ পোর্টাল শিরার মাধ্যমে যকৃতে পৌঁছায়। এখানে গ্লুকোজ গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত হয়ে সঞ্চিত থাকে। অতিরিক্ত অ্যামাইনো এসিড ইউরিয়াতে রূপান্তরিত হয়ে বৃক্কের মাধ্যমে বর্জ্য পদার্থ হিসেবে নিষ্কাশিত হয় এবং স্নেহ জাতীয় খাদ্য চর্বি হিসেবে দেহের বিভিন্ন স্থানে জমা থাকে।

পরিচ্যায় (Egestion) : পরিপাককৃত খাদ্য পরিশোষণের পর খাদ্যের অপাচ অংশ ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে বৃহদন্ত্রে পৌঁছে। এখানে পানি ও খনিজ লবণ শোষণের পর অবশিষ্টাংশ মলশয়ে জমা থাকে। পরবর্তীতে মলরূপে অবসারণী ছিদ্র পথে দেহের বাইরে পরিচ্যায়িত হয়।

রক্ত সঞ্চালন তন্ত্র (Circulatory System) : ব্যাঙের জীবন ধারণের জন্য খাদ্য ও অক্সিজেন প্রয়োজন। দেহকোষ সরাসরি গৃহীত খাদ্যবস্তু এবং বায়ু থেকে সরাসরি অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে না। তাই পরিপাককৃত খাদ্যদ্রব্য ও বায়ু থেকে গৃহীত অক্সিজেন প্রতিটি কোষে পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন। অনুরূপভাবে বিপাকের ফলে সৃষ্ট কার্বন ডাইঅক্সাইড ও বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ দেহ থেকে বের করে দেওয়া প্রয়োজন। এ কারণে প্রাণিদেহে একটি সুষ্ঠু পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। রক্ত ও লসিকা ব্যাঙের দেহে পরিবহণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। রক্ত ও লসিকা কোষে অক্সিজেন, হরমোন ও পরিপাককৃত খাদ্য সরবরাহ করে এবং কোষের রেচন পদার্থ দূরীকরণের ব্যবস্থা করে। এই প্রক্রিয়াকে সঞ্চালন বলে।

রক্ত, হৃৎপিণ্ড এবং রক্তবাহী ও লসিকাবাহী নালীসমূহের সমন্বয়ে রক্তসঞ্চালন তন্ত্র গঠিত।

রক্ত : রক্ত এক ধরনের তরল যোজক টিস্যু। ব্যাঙের রক্তের রং লাল। ভ্রূণের মেসোডার্ম জাত কোষস্তর থেকে রক্ত উৎপন্ন হয়। রক্তকে প্রধান দুটি অংশে ভাগ করা হয়— রক্তরস ও রক্তকণিকা।

রক্তরস (Plasma) : রক্তরস রক্তের প্রধান উপাদান। এটি একটি স্রচ্ছ, মৃদু স্ফারীয় তরল এবং হালকা হলুদ বর্ণের। রক্তরসে পানি ছাড়া খাদ্য, হরমোন, খনিজ লবণ, কার্বন ডাইঅক্সাইড, ফাইব্রিনোজেন, বিভিন্ন প্লাজমা প্রোটিন ও গ্যাসীয় রাসায়নিক উপাদান দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। এর মধ্যে রক্তকণিকাগুলো ভাসমান অবস্থায় থাকে। রক্তকণিকা ও অন্যান্য পদার্থ দেহের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে দেওয়া রক্তরসের কাজ।

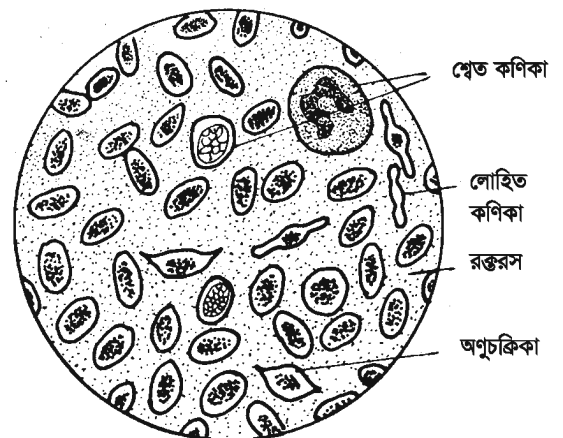
রক্তকণিকা প্রধানত তিন প্রকারের।

১। লোহিত রক্তকণিকা বা এরিথ্রোসাইট (Erythrocyte),

২। শ্বেত রক্তকণিকা বা লিউকোসাইট (Leucocyte)ও

৩। অণুচক্রিকা Platelets বা থ্রম্বোসাইট (Thrombocyte)।

১। লোহিত রক্তকণিকা : ব্যাঙের লোহিত রক্তকণিকা দেখতে ডিম্বাকার, দ্বি-উত্তল ও নিউক্লিয়াস যুক্ত। অস্থিমজ্জা, যকৃৎ ও প্লীহায় লোহিত রক্তকণিকা উৎপন্ন হয়। হিমোগ্লোবিনের উপস্থিতির কারণে রক্ত লাল দেখায়। হিমোগ্লোবিন এক ধরনের লৌহ মিশ্রিত প্রোটিন যৌগ। এটি রক্তের লোহিত কণিকায় থাকে। হিমোগ্লোবিন সহজে অক্সিজেনের সাথে মিলিত হয়ে অক্সিহিমোগ্লোবিন গঠন করে, ঠিক অনুরূপভাবে অক্সিহিমোগ্লোবিন বিজারিত হয়ে হিমোগ্লোবিনে পরিণত হয় এবং কোষে অক্সিজেন সরবরাহ করে।



চিত্র ৮.২৬ তিন প্রকার রক্ত কণিকা

২। **শ্বেত রক্তকণিকা** : শ্বেত রক্তকণিকা আকারে বড়, সংখ্যায় কম, বর্ণহীন এবং নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট। অস্থিমজ্জা, গ্লীহা ও লসিকা গ্রন্থিতে শ্বেত রক্তকণিকা উৎপন্ন হয়। এরা অ্যামিবার মত আকার পরিবর্তন করতে পারে এবং জীবাণু ধ্বংস করে। প্রয়োজনে এরা রক্তনালীর পাতলা আবরণ ভেদ করে বাইরে আসে এবং ক্ষতিকর বস্তু থাকলে তা বিনষ্ট করে। শ্বেত রক্তকণিকা কয়েক ধরনের হয়। যেমন, নিউট্রোফিল, বেসোফিল, ইওসিনোফিল, মনোসাইট, লিম্ফোসাইট।

৩। **অণুচক্রিকা** : রক্তকণিকাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ছোট কণিকা হল অণুচক্রিকা। এ কোষগুলো দেখতে অনেকটা মাকুর মত ও নিউক্লিয়াস যুক্ত। অস্থিমজ্জাতে এ কোষগুলো উৎপন্ন হয়। অণুচক্রিকা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।

রক্তের কাজ :

১। **খাদ্যসার ও পানি সরবরাহ** : রক্তরস পরিপাককৃত খাদ্যরস ও পানি দেহের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করে।

২। **অক্সিজেন সরবরাহ** : রক্ত দেহের প্রতিটি সজীব কোষে অক্সিজেন সরবরাহ করে।

৩। **কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমন** : রক্তরস কোষ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড সংগ্রহ করে তা দেহ থেকে অপসারণের জন্য ফুসফুস ও ত্বকে নিয়ে আসে।

৪। **হরমোন পরিবহণ** : রক্ত হরমোন পরিবহণ করে দেহের প্রয়োজনীয় স্থানে পৌঁছে দেয়।

৫। **বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন** : রক্তরস দেহে উৎপন্ন নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ করে তা দেহের বাইরে অপসারণে সহায়তা করে।

৬। **রোগ জীবাণু ধ্বংস** : দেহে কোন রোগ জীবাণু প্রবেশ করলে শ্বেত রক্তকণিকা তাদের ধ্বংস করে দেহকে সুস্থ থাকতে সাহায্য করে।

৭। **রক্ত জমাট বাঁধা** : দেহের কোন অংশ কেটে গেলে অথবা রক্তনালী ক্ষতিগ্রস্ত হলে অণুচক্রিকা রক্ত জমাট বেঁধে রক্তক্ষরণ বন্ধ করে।

৮। **রূপান্তরে রক্তের ভূমিকা** : ব্যাঙাচির শ্বেত রক্তকণিকা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় লেজের কোষগুলো ভক্ষণ করে রূপান্তরে সাহায্য করে।

হৃৎপিণ্ড (Heart) :

হৃৎপিণ্ড রক্ত সংবহনতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এটি একটি পাম্প বিশেষ। দুটি ফুসফুসের মাঝে এ অঙ্গটি অবস্থিত ও পেরিকার্ডিয়াম নামক পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে। হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর বেশ পুরু ও তিনস্তর বিশিষ্ট। এপিকার্ডিয়াম, মায়োকার্ডিয়াম ও এন্ডোকার্ডিয়াম।

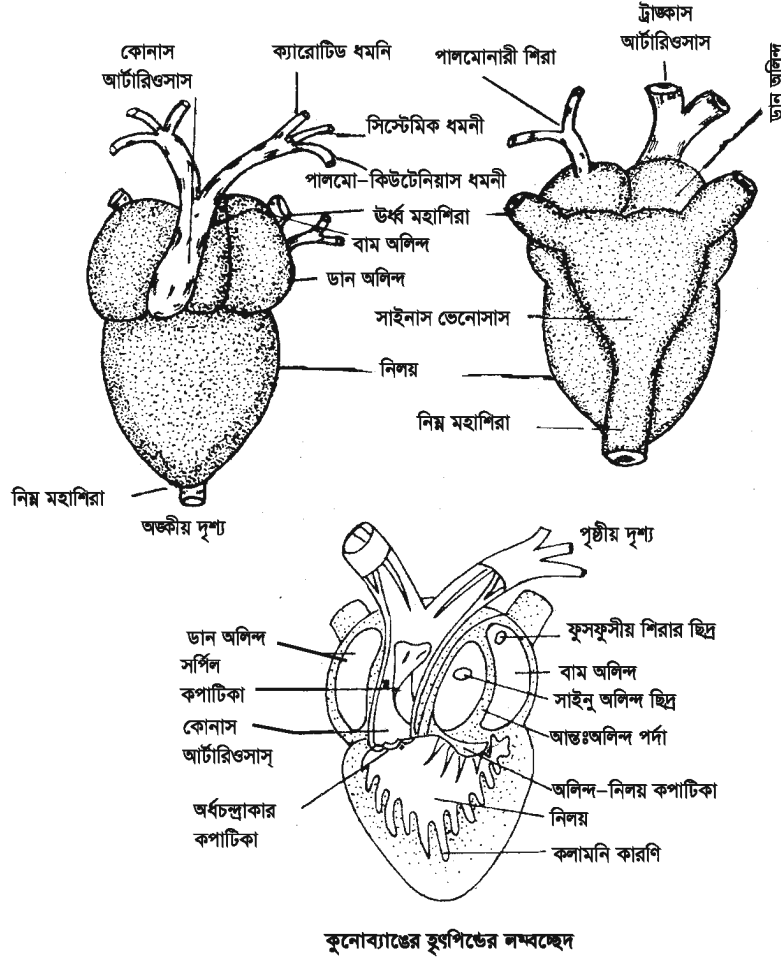
হৃৎপিণ্ডের বাইরের স্তর এপিকার্ডিয়াম, মাঝের মায়োকার্ডিয়াম স্তর হৃদপেশি দ্বারা গঠিত ও বেশ পুরু এবং ভিতরের স্তরটিকে এন্ডোকার্ডিয়াম বলে। ব্যাঙের হৃৎপিণ্ড প্রধান তিনটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। দুটি অলিন্দ ও একটি নিলয়। এ ছাড়া সাইনাস ভেনোসাস ও কোনাস অর্টেরিওসাস নামে দুটি উপপ্রকোষ্ঠ আছে।

অলিন্দ (Auricle) : হৃৎপিণ্ডের উপরের প্রকোষ্ঠ দুটি অলিন্দ। অলিন্দ দুটি একটি পর্দা দ্বারা ডান ও বাম অংশে বিভক্ত থাকে। ডান অলিন্দ বাম অলিন্দ অপেক্ষা বড়। ডান ও বাম অলিন্দ একটি সাধারণ অলিন্দ নিলয় ছিদ্র দ্বারা নিলয়ে উন্মুক্ত হয়।

নিলয় (Ventricle) : ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডে একটি নিলয় থাকে। নিলয়ের প্রাচীর বেশ পুরু এবং ভিতরের দিকে কতকগুলো অনুদৈর্ঘ্য অভিক্ষেপ থাকে। এ অভিক্ষেপগুলো অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্তের মিশ্রণ ঘটতে দেয় না।

সাইনাস ভেনোসাস (Sinus venosus) : অলিন্দের পশ্চাতে অবস্থিত ত্রিকোণাকার প্রকোষ্ঠের নাম সাইনাস ভেনোসাস। দুটি অগ্র মহাশিরা ও একটি পশ্চাৎ মহাশিরা এর মধ্যে প্রবেশ করেছে। সাইনাস ভেনোসাস সাইনোঅরিকুলার ছিদ্র নামে একটি ছিদ্র পথে ডান অলিন্দে উন্মুক্ত হয়। এ ছিদ্রমুখে একজোড়া একমুখী কপাটিকা থাকে।

কোনাস আর্টেরিওসাস (Conus arteriosus) : হৃৎপিণ্ডের নিলয়ের ডান প্রান্ত থেকে বাম অলিন্দ পর্যন্ত বাঁকাভাবে অবস্থিত প্রকোষ্ঠের নাম কোনাস আর্টেরিওসাস। অলিন্দের সামনের দিকে বিভক্ত দুটি অংশকে ট্রাঙ্কাস আর্টেরিওসাস বা অ্যাওর্টা বলে। এখান থেকে তিনটি প্রধান ধমনি বের হয়। কোনাসের ভেতর স্পাইরাল ভালভ নামে একটি সর্পিলাকার কপাটিকা আছে। এ কপাটিকা কোনাস গহ্বরকে বাম ও ডান দুটি অংশে বিভক্ত করে। অক্সিজেনরিক্ত রক্ত বাম উপনালী এবং অক্সিজেনযুক্ত রক্ত ডান উপনালীর ভেতর দিয়ে বিভিন্ন ধমনিতে যায়। এভাবে অক্সিজেন রিক্ত বা কার্বন ডাইঅক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত ও অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ডের মধ্যে পৃথক থাকে।



চিত্র ৭.২৭ : কুনোব্যাক্টের হৃৎপিণ্ড

হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে রক্ত প্রবাহ : সকল স্থলচর প্রাণীদের মত কুনোব্যাক্টের রক্ত সংবহনতন্ত্রেও দ্বি-চক্র সংবহন দেখা যায়। হৃৎপিণ্ডের পর্যায়ক্রমিক সংকোচন ও প্রসারণের ফলে রক্ত প্রবাহিত হয়। দুটি অগ্র মহাশিরা ও একটি পশ্চাৎ মহাশিরা O_2 -রিক্ত রক্ত সাইনাস ভেনোসাসে বয়ে নিয়ে আসে। সাইনো-অরিকুলার ছিদ্রপথে এ রক্ত ডান অলিন্দে প্রবেশ করে। প্রায় একই সাথে বাম অলিন্দ প্রসারিত হয় এবং ফুসফুস থেকে অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত ফুসফুসীয় শিরার মাধ্যমে বাম অলিন্দে প্রবেশ করে। ডান ও বাম অলিন্দ একই সাথে সংকুচিত হয় এবং ডান ও বাম অলিন্দ থেকে O_2 -রিক্ত ও অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত সাধারণ অলিন্দ নিলয় ছিদ্র পথে নিলয় গহ্বরে প্রবেশ করে। পরবর্তীতে নিলয়ের প্রাচীর সংকুচিত হয় এবং নিলয় থেকে রক্ত অর্ধচন্দ্রাকার কপাটিকার নিয়ন্ত্রণে কোনাস আর্টেরিওসাসের গহ্বরে প্রবেশ করে। এরপর অক্সিজেনসমৃদ্ধ এবং O_2 -রিক্ত রক্ত ডান ও বাম অ্যাওর্টা হয়ে যথাক্রমে ক্যারোটিড, সিস্টেমিক ও পালমো-কিউটেনিয়াস ধমনির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়।

রক্তনালী (Blood vessels) : দেহের ভেতর যেসব নালিকার মধ্য দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হয় তাদের রক্তবাহী নালী বা রক্তনালী বলে। এ নালীগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হৃৎপিণ্ডের সাথে যুক্ত। রক্তনালীসমূহকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ধমনি, শিরা ও কৈশিক নালী।

ধমনি : যেসব নালী হৃৎপিণ্ড থেকে অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গে বহন করে নিয়ে যায় তাদের ধমনি বলে।

কৈশিক নালী : হৃৎপিণ্ড থেকে মহাধমনি উৎপন্ন হয় এবং পুনঃপুন বিভাজিত হয়ে সরু শাখা ধমনিতে পরিণত হয়। ধমনিগুলো আরও বিভক্ত হয়ে সূক্ষ্ম জালিকা সৃষ্টি করে এবং পরবর্তীতে সূক্ষ্ম জালিকাগুলো ধমনির কৈশিক নালীর অপর পার্শ্বে মিলিতে হয়ে শিরা তৈরি করে। ধমনি ও শিরা এইসব সূক্ষ্ম জালিকাগুলো দ্বারা সংযুক্ত। ধমনি ও শিরার মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী এই জালিকাগুলো কৈশিক নালী (Capillary tubes) নামে পরিচিত। কৈশিক নালীর প্রাচীর খুব পাতলা। এ প্রাচীর এক স্তরবিশিষ্ট পাতলা এপিথেলিয়াল কোষ দ্বারা তৈরি। ফলে এর গহ্বরের রক্ত এবং কোষের মাঝে খাদ্যরস ও বর্জ্য পদার্থের বিনিময় সহজে ঘটতে পারে।

শিরা : যেসব রক্তনালী দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে রক্ত হৃৎপিণ্ডে বয়ে নিয়ে আসে তাদের শিরা বলে। শিরা প্রধাণত O_2 -রিক্ত রক্ত পরিবহন করে। তবে পালমোনারি বা ফুসফুসীয় শিরা ফুসফুস থেকে অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ডে নিয়ে আসে। কৈশিক নালী থেকে শিরার উৎপত্তি হয়।

নিচের সারণিতে ধমনি ও শিরার মধ্যে প্রধান পার্থক্যসমূহ উল্লেখ করা হল।

ধমনি ও শিরার মধ্যে পার্থক্যসমূহ

	ধমনি	শিরা
১। রক্তের গতি উৎপত্তি	হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের দিকে	দেহ থেকে হৃৎপিণ্ডের দিকে
২। পরিসমাপ্তি	ধমনি কৈশিক নালিকায় গিয়ে শেষ হয়।	শিরা, কৈশিক নালিকা বা জালিকা থেকে উৎপন্ন হয়ে হৃৎপিণ্ডের সাইনাস ভেনোসাসে শেষ হয়।
৩। রক্তের ধরন	ফুসফুসীয় ধমনি ব্যতীত অপর সকল ধমনি অক্সিজেন-সমৃদ্ধ রক্ত পরিবহণ করে।	ফুসফুসীয় শিরা ব্যতীত অন্যান্য শিরা রিক্ত O_2 -রক্ত পরিবহণ করে।
৪। প্রাচীর	প্রাচীর পুরু, শক্ত ও স্থিতিস্থাপক।	প্রাচীর নরম ও পাতলা, স্থিতিস্থাপক নয়।
৫। গহ্বর	গহ্বর ছোট।	গহ্বর বড়।
৬। কপাটিকা	থাকে না।	থাকে।

ধমনিতন্ত্র (Arterial system) : আমরা আগেই জেনেছি যে হৃৎপিণ্ড থেকে যেসব রক্তনালী দেহের বিভিন্ন অঙ্গে রক্ত সরবরাহ করে তাদের ধমনি বলে। ধমনি, শাখা ধমনি ও কৈশিক নালিকা একত্রে ধমনিতন্ত্র গঠন করে।

কোনাস আর্টেরিওসাস নিলয় থেকে উৎপন্ন হয়ে আড়াআড়িভাবে হৃৎপিণ্ডকে অতিক্রম করে। হৃৎপিণ্ডের এ উপপ্রকোষ্ঠটি ধমনিতন্ত্রের মূল বা গোড়া। অলিন্দের শেষ প্রান্তে এসে কোনাস আর্টেরিওসাস ডান ও বাম ট্রান্সভার্স আর্টেরিওসাস বা অ্যাওর্টা নামে বিভক্ত হয়। ট্রান্সভার্স আর্টেরিওসাস থেকে তিনটি প্রধান ধমনির উৎপত্তি হয়। সামনের দিকে ক্যারোটিড আর্চ বা ক্যারোটিড ধমনি, মাঝখানে সিস্টেমিক মহাধমনি, পেছনের দিকে পালমোকেইউটেনিয়াস বা ফুসফুস-ত্বকীয় মহাধমনি।

ক্যারোটাইড আর্চ (Carotid arch) : ট্রাঙ্কাস আর্টেরিওসাস থেকে উৎপন্ন হয়ে এই ধমনি দুভাগে বিভক্ত হয়ে উপরের দিকে উঠে গেছে। উপরে ও নিচের নালীটিকে যথাক্রমে বহিঃক্যারোটাইড ও অন্তঃক্যারোটাইড শাখা বলে। এদের শাখা মুখগহ্বর, জিহ্বা ও করোটির বাইরের দিকে এবং মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ করে।

সিস্টেমিক আর্চ বা মহাধমনি (Systemic arch) : দু পাশের ট্রাঙ্কাস আর্টেরিওসাসের মাঝখান থেকে একটি করে সিস্টেমিক মহাধমনি বের হয়ে বাম ও ডান ফুসফুসের দুদিক ঘিরে হৃৎপিণ্ডের পশ্চাত্তাগে এসে পরস্পরের সাথে মিলিত হয়। এ মিলিত ধমনিটিকে ডর্সাল অ্যাওর্টা বা পৃষ্ঠীয় মহাধমনি বলে। প্রতিটি সিস্টেমিক মহাধমনি থেকে কয়েকটি শাখা ধমনি বের হয়। যথা : ১। ল্যারিঞ্জিয়াল বা স্বরথলীয় ধমনি, ২। করোটি-মেরুদণ্ডীয় ধমনি, ৩। সাবক্লেভিয়ান ধমনি।

১। ল্যারিঞ্জিয়াল বা স্বরথলীয় ধমনি (Laryngeal artery) : এ ধমনি সিস্টেমিক মহাধমনির প্রথম শাখা। এর শাখা-প্রশাখা বিভক্ত হয়ে স্বরযন্ত্রে রক্ত সরবরাহ করে।

২। করোটি-মেরুদণ্ডীয় ধমনি (Occipito-vertebral artery) : এ ধমনি সিস্টেমিক আর্চের মাঝখান থেকে উৎপন্ন হয় এবং পৃষ্ঠ দিকে ধাবিত হয়। ধমনিটির শাখা-প্রশাখা গলবিল, মস্তিষ্কের পশ্চাত্তাগ, মেরুদণ্ড ও মেরুরজ্জুতে রক্ত সরবরাহ করে।

৩। সাবক্লেভিয়ান ধমনি (Subclavian artery) : সিস্টেমিক আর্চের মাঝ বরাবর বাইরের দিক থেকে সাবক্লেভিয়ান ধমনি উৎপন্ন হয়ে স্কল্ধ ও অগ্রপদে রক্ত সরবরাহ করে।

শুধু বামদিকের সিস্টেমিক মহাধমনি থেকে আর একটি শাখা ধমনি বের হয়ে গ্রাসনালীতে রক্ত সরবরাহ করে। একে গ্রাসনালীয় (Oesophageal) ধমনি বলে। ডানদিকের মহাধমনি থেকে এ রকম কোন রক্তনালী উৎপন্ন হয় না।

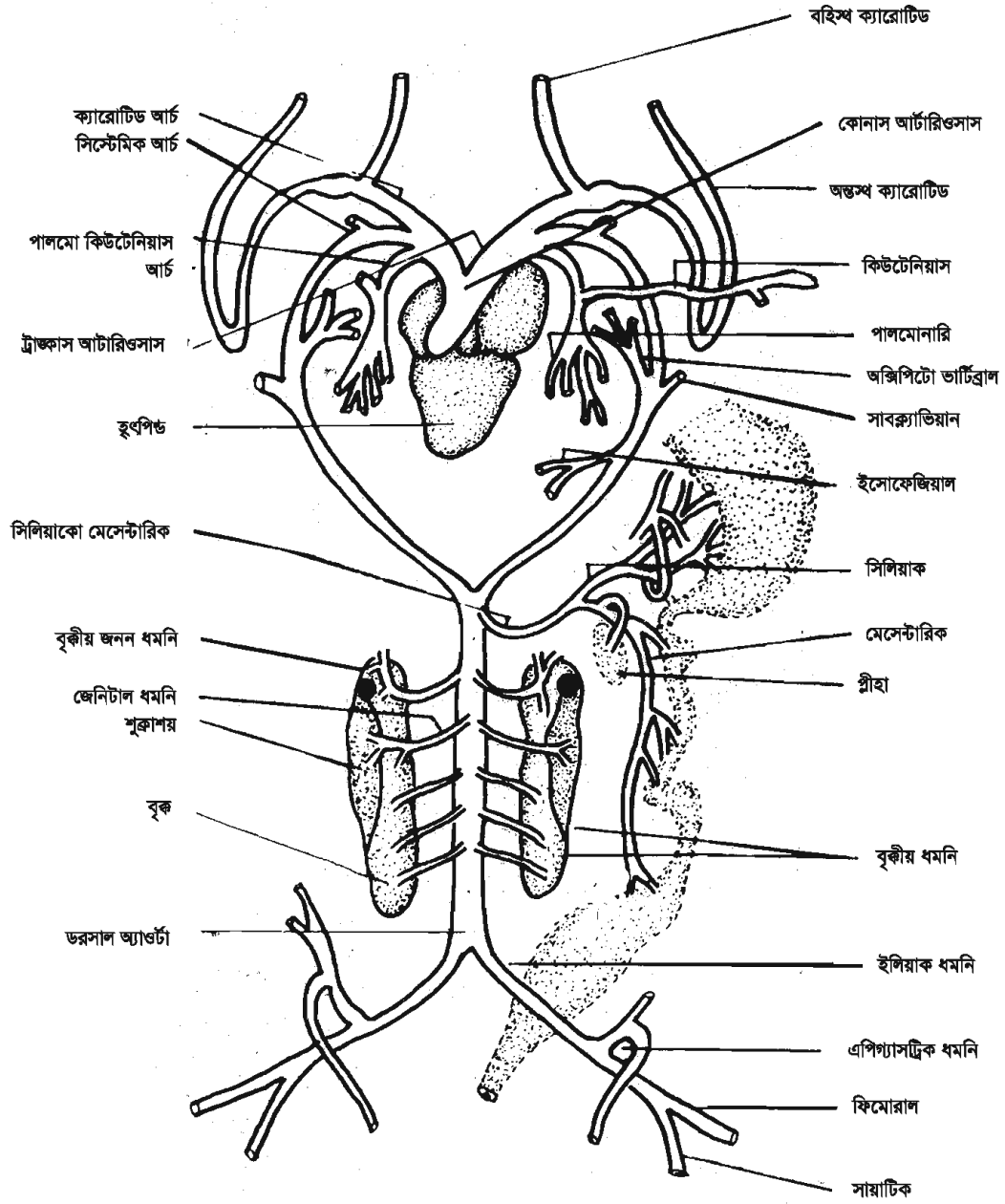
ডর্সাল অ্যাওর্টা (Dorsal aorta) : ডর্সাল অ্যাওর্টা ব্যাণ্ডের মধ্যপৃষ্ঠরেখা বরাবর ধাবিত হয়। এ অ্যাওর্টা থেকে উৎপন্ন শাখা প্রশাখাগুলো পৌষ্টিক নালী ও দেহের পশ্চাৎ অংশে রক্ত সরবরাহ করে। নিম্নলিখিত শাখাসমূহ পৃষ্ঠীয় মহাধমনি বা ডর্সাল অ্যাওর্টা থেকে বের হয়।

১। সিলিয়াকো-মেসেন্টেরিক ধমনি (Coeliaco-mesenteric artery) : ডর্সাল অ্যাওর্টার উৎপত্তিস্থলের খুব কাছাকাছি অংশ থেকে একটি শাখা ধমনি উৎপন্ন হয় এবং অল্প কিছুদূরে অগ্রসর হওয়ার পর দুটি ভাগে বিভক্ত হয়। শাখা ধমনির প্রথমটিকে সিলিয়াক ও দ্বিতীয়টিকে মেসেন্টেরিক বলে। সিলিয়াক ধমনি পাকস্থলি, যকৎ, অগ্ন্যাশয় ও পিত্তথলিতে রক্ত সরবরাহ করে। আর মেসেন্টেরিক ধমনি প্লীহা ও অন্ত্রে রক্ত সরবরাহ করে।

বৃক্কীয় ধমনি (Renal artery) : ডর্সাল অ্যাওর্টা বৃক্কের মাঝামাঝি অঞ্চল অতিক্রম করার সময় চার থেকে পাঁচ জোড়া ধমনি বৃক্কের মধ্যে প্রবেশ করে বৃক্কে রক্ত সরবরাহ করে। এ ধমনিগুলোকে বৃক্কীয় ধমনি বলে।

জনন ধমনি (Genital artery) : বৃক্কীয় ধমনির শাখাগুলো থেকে উৎপন্ন হয়ে কতকগুলো শাখা জনন অঙ্গে প্রবেশ করে। এদের নাম জনন ধমনি। এরা জনন তন্ত্রে রক্ত সরবরাহ করে।

ধড়ের শেষ প্রান্তে ডর্সাল অ্যাওর্টা দু ভাগে বিভক্ত হয়। এদের নাম যথাক্রমে ডান ও বাম ইলিয়াক ধমনি। প্রতিটি ইলিয়াক ধমনি থেকে একটি করে শাখা ধমনি বের হয়। এ ধমনিটি মূত্রথলি ও দেহের অঙ্গীয় দেশে রক্ত সরবরাহ করে। এরপর ইলিয়াক ধমনি দু ভাগে বিভক্ত হয়। এর একটি ‘ফিমোরাল’ নামে জানুতে ও অপরটি ‘সায়্যাটিক’ নামে পায়ের অবশিষ্ট অংশে রক্ত সরবরাহ করে।



চিত্র ৮.২৮ : কুনোব্যাণ্ডের ধমনিতন্ত্র

পালমো-কিউটেনিয়াস ধমনি (Pulmo-cutaneous artery) : ট্রাঙ্কাস আর্টারিওসাস থেকে উৎপন্ন পঁচাত্তম ধমনি হল পালমো কিউটেনিয়াস ধমনি। এর একটি শাখা সরাসরি ফুসফুসে O_2 -রিক্ত রক্ত নিয়ে যায়। একে ফুসফুসীয় ধমনি বলে। অপর শাখাটি রক্ত নিয়ে ত্বকে যায়। একে ত্বকীয় Cutaneous ধমনি বলে। এই ধমনি শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে ত্বকের মধ্যে প্রবেশ করে।

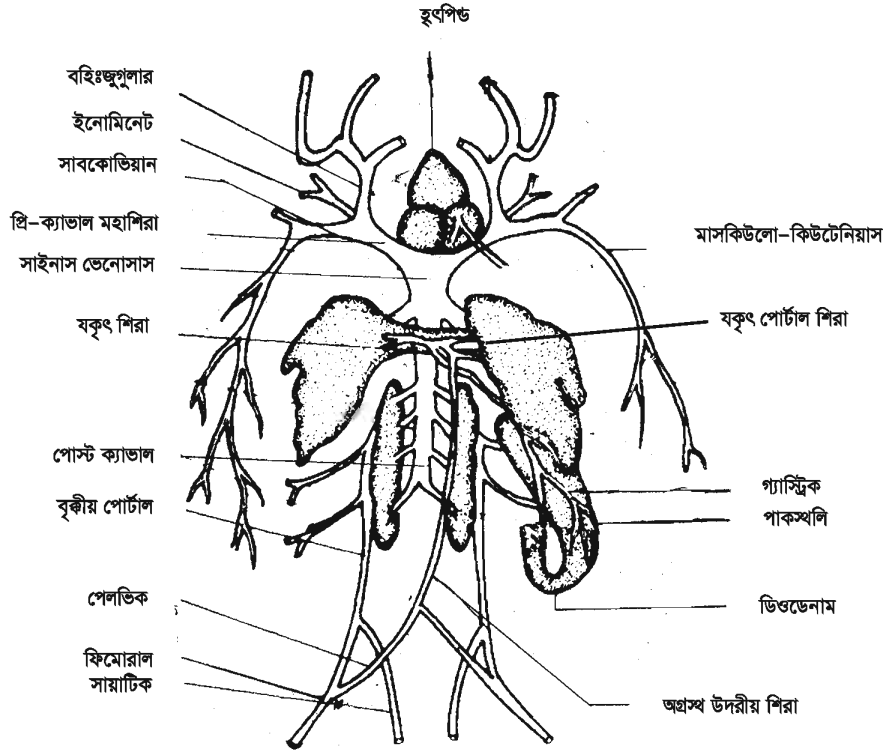
করোনারি সংবহন : হৃৎপিণ্ড ক্রমসংকোচন দ্বারা দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রক্ত সরবরাহ করে। স্বয়ং হৃৎপিণ্ড টিস্যুর খাদ্য ও অক্সিজেন সরবরাহ প্রয়োজন। তাই হৃৎপিণ্ড গায়েও রক্তসংবহন নালী থাকে। হৃৎপিণ্ডের রক্তনালিকাগুলো নিয়ে করোনারি সংবহনতন্ত্র গঠিত হয়।

শিরাতন্ত্র (Venous system) : যেসব রক্তবাহী নালী দেহের বিভিন্ন স্থান থেকে O_2 -রিক্ত রক্ত হৃৎপিণ্ডে পৌঁছে দেয় তাদের শিরা বলে। কৈশিক নালী থেকে শিরার উৎপত্তি। কেবল ফুসফুসীয় বা পালমোনারি শিরা এর ব্যতিক্রম। এ শিরাসমূহ অক্সিজেন-সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ডে পরিবহণ করে। ব্যাঙের সমগ্র শিরাতন্ত্র সাধারণত তিনটি প্রধান শাখায় বিভক্ত। যথা : (ক) পালমোনারি বা ফুসফুসীয় শিরাতন্ত্র, (খ) সিস্টেমিক শিরাতন্ত্র ও (গ) পোর্টাল শিরাতন্ত্র।

(ক) পালমোনারি বা ফুসফুসীয় শিরাতন্ত্র (Pulmonary Venous System) : প্রতিটি ফুসফুস থেকে একটি করে ফুসফুসীয় শিরা Pulmonary vein উৎপন্ন হয়। দুটি ফুসফুসীয় শিরা একত্রিত হয়ে একটি সাধারণ ফুসফুসীয় শিরা গঠন করে এবং পরিশেষে এটি বাম অলিন্দে এসে উন্মুক্ত হয়। এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিরা। কারণ এটি ফুসফুস থেকে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত সরাসরি হৃৎপিণ্ডে পৌঁছায়।

(খ) সিস্টেমিক শিরাতন্ত্র (Systemic Venous System) : যে শিরাগুলো কৈশিক জালক থেকে উৎপন্ন হয়ে সরাসরি O_2 -রিক্ত রক্ত হৃৎপিণ্ডে বয়ে নিয়ে আসে সেগুলো নিয়ে সিস্টেমিক শিরাতন্ত্র গঠিত হয়। তিনটি প্রধান মহাশিরা এবং এদের শাখাসমূহ নিয়ে সিস্টেমিক শিরাতন্ত্র গঠিত। সাইনাস ভেনোসাসের তিন কোণে তিনটি মহাশিরা এসে উন্মুক্ত হয়। দুটি দেহের সম্মুখভাগ (অগ্র মহাশিরা) এবং অপরটি দেহের পশ্চাৎভাগ (পশ্চাৎ মহাশিরা) থেকে O_2 -রিক্ত রক্ত বয়ে নিয়ে আসে। প্রতিটি অগ্র মহাশিরা তিনটি প্রধান শিরা নিয়ে গঠিত। বহিঃজুগুলার, ইনোমিনেট বা অনামিকা, সাবক্লোভিয়ান শিরা।

১। **বহিঃজুগুলার শিরা :** জিহ্বা ও মুখমণ্ডল থেকে O_2 -রিক্ত রক্ত বহনকারী শিরা দুটিকে বহিঃজুগুলার শিরা বলে।



চিত্র ৮.২৯ কুনোব্যাঙের শিরাতন্ত্র

২। **ইনোমিনেট বা অনামিকা শিরা :** এ শিরাটি দুটি শিরার সমন্বয়ে গঠিত। এর শাখাগুলো স্কন্ধ ও চোয়ালের কোণের দিক থেকে O_2 -রিক্ত রক্ত সংগ্রহ করে আনে।

৩। সাবক্লোভিয়ান শিরা : এই শিরা দুটি শিরার সমন্বয়ে গঠিত। এর কাজ অগ্রপদের পেশি ও ত্বক থেকে রক্ত সংগ্রহ করে আনা।

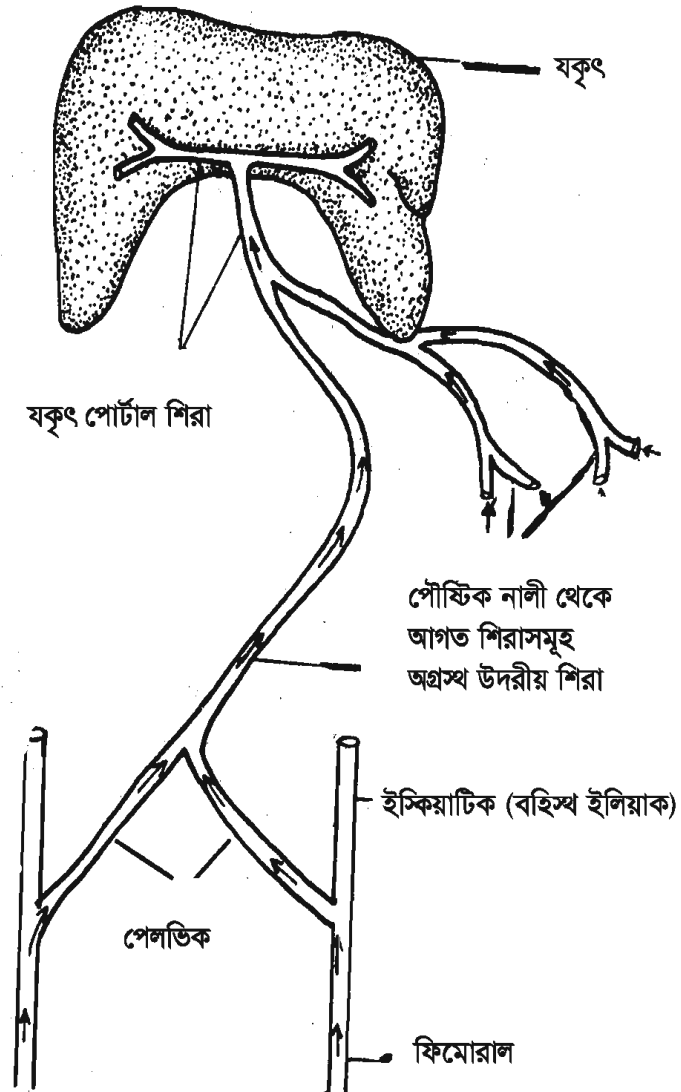
যকৃত শিরা : যকৃতের দুটি খণ্ডাংশ থেকে যকৃৎ শিরা নামে দুটি শিরা বের হয়ে পশ্চাৎদেশীয় মহাশিরা বা পোস্ট ক্যাভাল শিরায় উন্মুক্ত হয়। যকৃৎ থেকে রক্ত সংগ্রহ করাই এদের কাজ।

বৃক্কীয় শিরা : বৃক্ক থেকে চার জোড়া বৃক্কীয় শিরা বের হয় এবং পোস্ট ক্যাভাল শিরা গঠন করে। বৃক্ক থেকে রক্ত সংগ্রহ করা বৃক্কীয় শিরার কাজ।

জনন শিরা : পুরুষ ব্যাণ্ডের শুক্রাশয় থেকে অথবা স্ত্রী ব্যাণ্ডের ডিম্বাশয় থেকে কতকগুলো সূক্ষ্ম শিরা উৎপন্ন হয়ে দু জোড়া বৃক্কীয় শিরার সাথে মিলিত হয়। এগুলো ‘জনন শিরা’ নামে পরিচিত। জনন অঙ্গ থেকে রক্ত সংগ্রহ করা জনন শিরার কাজ।

(ড) পোর্টাল শিরাতন্ত্র (Portal system) : ব্যাণ্ডের দেহে এক ধরনের শিরা আছে যেগুলো কোন অঙ্গের কৈশিক নালী থেকে উৎপন্ন হয়ে সরাসরি হৃৎপিণ্ডে না পৌঁছে পুনরায় অন্য কোন অঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করে এবং কৈশিক নালীতে বিভক্ত হয়। তাদের পোর্টাল শিরা বলে। এরূপ শিরার সমন্বয়ে পোর্টাল শিরাতন্ত্র গঠিত। ব্যাণ্ডের দেহে দু রকম পোর্টাল শিরাতন্ত্র আছে। যথা : (ক) যকৃৎ বা হেপাটিক পোর্টাল তন্ত্র ও বৃক্কীয় বা রেনাল পোর্টাল তন্ত্র।

(ক) হেপাটিক পোর্টাল তন্ত্র (Hepatic Portal system) : এ তন্ত্রটি পাকস্থলি, অন্ত্র, অগ্ন্যাশয়, প্লীহা প্রভৃতি অঙ্গ এবং পশ্চাৎপদ থেকে আগত কয়েকটি শিরা একত্রিত হয়ে গঠিত হয়। ব্যাণ্ডের প্রতি পাশের পিছনের পা থেকে আগত ফিমোরাল শিরা থেকে উৎপন্ন পেলভিক শিরা দুটি মিলিত হয়ে অগ্র উদরীয় বা অ্যান্টেরিওর অ্যাবডোমিনাল শিরা তৈরি হয়। এই শিরা যকৃতের দিকে অগ্রসর হয়। যকৃতের কাছে পৌঁছালে এই শিরার সাথে পৌষ্টিক নালীর বিভিন্ন অঙ্গ থেকে ফিরে আসা শিরাসমূহ মিলিত হয়। এই মিলিত শিরাগুলোকে যকৃৎ পোর্টাল শিরা বলে। যকৃৎ পোর্টাল শিরা এরপর যকৃতের সাথে সংলগ্ন হয়ে আড়াআড়িভাবে প্রবাহিত হয় এবং দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যকৃতের দুটি খণ্ডাংশে প্রবেশ করে কৈশিক নালীতে বিভক্ত হয়।

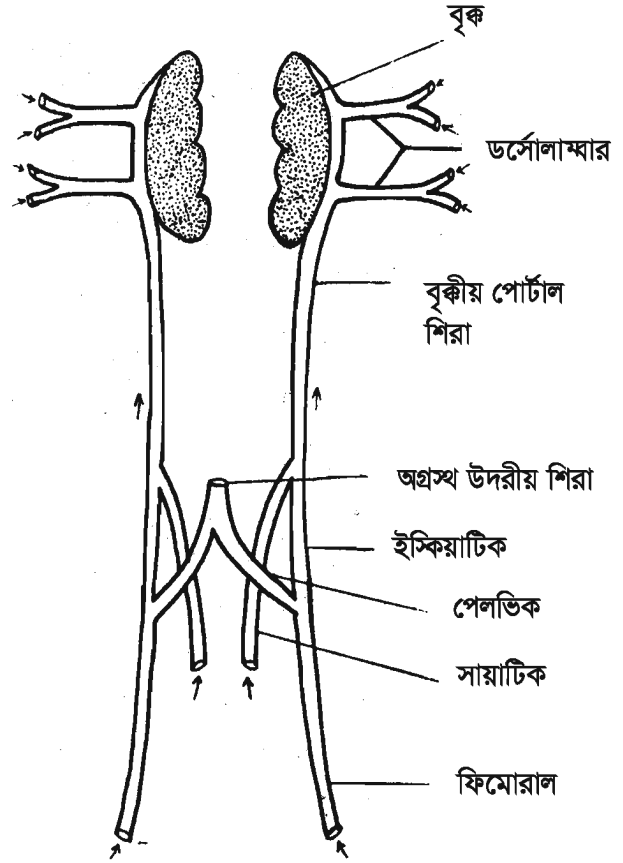


চিত্র ৮.৩০ : ব্যাণ্ডের যকৃৎ পোর্টালতন্ত্র

রেনাল পোর্টালতন্ত্র (Renal Portal System) :

ব্যাঙের দেহের পশ্চাৎপদ থেকে আগত ফিমোরাল ও শ্রোণী অঞ্চল থেকে আগত সায়াটিক শিরা একত্রে মিলিত হয়ে বৃক্কের দিকে অগ্রসর হয়। এ মিলিত শিরাটিকে বৃক্কীয় বা রেনাল পোর্টাল শিরা বলে। বৃক্ক প্রবেশের পূর্বে আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরা এর সাথে এসে মিশে। এদের ডর্সোলাম্বার শিরা বলে। পরবর্তীতে বৃক্কীয় পোর্টাল শিরা বৃক্ক প্রবেশ করে এবং কৈশিক নালীতে বিভক্ত হয়। এর মাধ্যমে সংগৃহীত রক্ত থেকে বৃক্ক রেচন দ্রব্য নিষ্কাশনই এ তন্ত্রের কাজ।

নিচের সারণিতে ব্যাঙের হেপাটিক পোর্টাল ও রেনাল পোর্টাল তন্ত্রের পার্থক্য ও তাৎপর্য উল্লেখ করা হল।



চিত্র ৮.৩১ ব্যাঙের বৃক্কীয় পোর্টাল তন্ত্র

	হেপাটিক পোর্টালতন্ত্র	রেনাল পোর্টালতন্ত্র
উৎপত্তি	পৌষ্টিনালীর বিভিন্ন অংশ, যেমন পাকস্থলি, অন্ত্র, অগ্ন্যাশয়, প্লীহা ইত্যাদি এবং পশ্চাৎপদ অঞ্চল থেকে আগত শিরাসমূহ একত্রিত হয়ে হৃৎপিণ্ডে না গিয়ে যকৃতের অভ্যন্তরে কৈশিক জালিকায় বিভক্ত হয়।	দেহের পশ্চাৎদিকের ফিমোরাল ও সায়াটিক শিরা একত্রিত হয়ে রেনাল পোর্টাল শিরা গঠন করে। এই শিরা হৃৎপিণ্ডে না গিয়ে বৃক্কের অভ্যন্তরে ক্যাপিলারি জালিকায় শাখায়িত হয়।
গন্তব্য	যকৃৎ	বৃক্ক
কাজ	পৌষ্টিকনালীতে পরিশোধিত খাদ্যাংশ যকৃতে পরিবহণ করা। এইসব খাদ্যাংশ যকৃতে যাচাই বাছাই করে দেহের যেখানে প্রয়োজন সেখানে পাঠানো এবং অতিরিক্ত খাদ্য সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা।	এই তন্ত্রের মাধ্যমে বৃক্ক আগত রক্ত থেকে বিপাকীয় বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন ও সেগুলো দেহের বাইরে পরিত্যাগের ব্যবস্থা করা।
তাৎপর্য	পরিশোধিত খাদ্য সারাদেহে অকারণে পরিবাহিত না হয়ে যকৃতে জমা হয় এবং সেখান থেকে প্রয়োজনমত খাদ্যাংশের বিলিভর্টন হয়।	রক্তে পরিবাহিত বর্জ্য পদার্থকে আলাদা করার জন্য হৃৎপিণ্ডে পৌঁছানোর আগেই বৃক্কের ছাঁকন ও পরিশোধনের জন্য আনীত হয়।

শ্বসন তন্ত্র (Respiratory system) : দেহের বিভিন্ন বিপাকীয় কাজের জন্য শক্তি প্রয়োজন। কোষের ভিতরে মাইটোকন্ড্রিয়ার সাহায্যে গ্লুকোজকে জারণ-বিজারণ মাধ্যমে কোষে ব্যবহারযোগ্য শক্তি উৎপন্ন হয়। এই প্রক্রিয়ায় পানি, কার্বন ডাইঅক্সাইড, সাধারণত ATP (অ্যাডেনোসিন ট্রাইফসফেট) ও তাপ উৎপন্ন হয়। কোষ তাপশক্তির ব্যবহার করতে পারে না। ফলে এর অপচয় হয়। ATP প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে কোষে শক্তি জোগান দেয়। মনে রাখা দরকার যে, অধিক তাপে প্রোটোপ্লাজম বিকল হয়ে যায়। তাই কোষস্থ শ্বসন প্রক্রিয়া বিভিন্ন এনজাইম দ্বারা ধাপে ধাপে সম্পন্ন হয়। কোষ মধ্যস্থ শক্তি উৎপাদনের এই প্রক্রিয়াকে অন্তঃশ্বসন বা internal বা cellular respiration বলে। এর জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়।

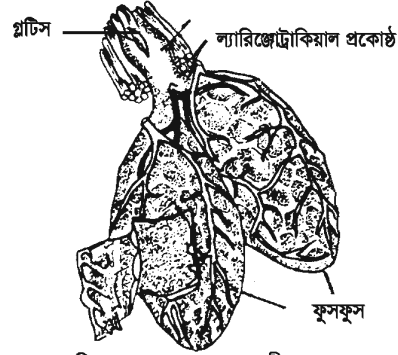
পরিবেশ থেকে অক্সিজেন সংগ্রহ করে তা দেহের প্রতিটি কোষে পৌঁছানোর যে প্রক্রিয়া তাকে বহিঃশ্বসন বা external respiration বলে। এই প্রক্রিয়ায় O₂-সমৃদ্ধ বায়ু দেহ গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড দেহ থেকে পরিত্যক্ত হয়।

কোষীয় শ্বসনের বিপাক সকল জীবে কী উদ্ভিদ কী প্রাণীতে, প্রায় একই রকম। এদের মধ্যে প্রধান বিপাকীয় পথ হচ্ছে ক্রেবস চক্র।

বিভিন্ন পরিবেশে বাস করার জন্য ব্যাঙ একাধিক প্রক্রিয়ায় বহিঃশ্বসন কার্য চালায়। সাধারণত ব্যাঙের বহিঃশ্বসন প্রক্রিয়া চার ধরনের। যথা : (১) ত্বকীয় শ্বসন, (২) মুখ-গলবিলীয় শ্বসন, (৩) ফুসফুসীয় শ্বসন ও (৪) ফুলকা শ্বসন।

১। ত্বকীয় শ্বসন (Cutaneous respiration) :

ত্বকের মাধ্যমে এ শ্বসন কার্য সম্পন্ন হয়। ব্যাঙের ত্বক খুব পাতলা এবং কৈশিক নালী সমৃদ্ধ। ব্যাঙের ত্বকে অধিক সৎখ্যক মিউকাস গ্রন্থি থাকে। এ গ্রন্থি থেকে মিউকাস নিঃসৃত হয়। ফলে ত্বক সিক্ত থাকে। এ কারণে ত্বকের মাধ্যমে সহজেই ব্যাপন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিনিময় ঘটে। ব্যাঙ শীতনিদ্রার সময়ে এভাবে শ্বাসকার্য চালায়।



চিত্র ৮.৩২ : ব্যাঙের ফুসফুসীয় শ্বসনতন্ত্র

২। মুখগলবিলীয় শ্বসন (Bucco-pharyngeal respiration) : ব্যাঙের মুখগহ্বর ও গলবিলের পর্দা অত্যন্ত পাতলা এবং এতে অসংখ্য কৈশিক জালিকা থাকে। মুখগহ্বরে বাতাস প্রবেশ করলে অক্সিজেন ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কৈশিক জালিকার রক্তে প্রবেশ করে। এই অক্সিজেন-সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ড হয়ে দেহের বিভিন্ন অংশে প্রবাহিত হয় এবং এক পর্যায়ে কোষস্থিত খাদ্য জারণে অংশগ্রহণ করে। খাদ্য জারণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যাপনের মাধ্যমে বের করে দেয়। ব্যাঙ সাধারণত বিশ্রামকালে এ ধরনের শ্বসন কার্য চালাতে পারে।

৩। ফুসফুসীয় শ্বসন (Pulmonary respiration) : ফুসফুস ব্যাঙের প্রধান শ্বসন অঙ্গ। ব্যাঙের একজোড়া ফুসফুস আছে। ফুসফুস গোলাপি রঙের একজোড়া ফাঁপা থলি বিশেষ। প্রতিটি ফুসফুস অসংখ্য বেলুনের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের সমন্বয়ে গঠিত। বেলুনের মত প্রতিটি প্রকোষ্ঠকে বায়ুথলি বা অ্যালভিওলাস (alveolus) বলে। এদের প্রাচীর রক্তনালী সমৃদ্ধ। ফুসফুস প্রসারিত হলে বায়ুথলিগুলো বায়ুপূর্ণ হয়ে যায়। বায়ুথলির মাধ্যমে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড-এর আদান প্রদান ঘটে। বায়ুথলিগুলো যে সূক্ষ্ম বায়ু নালিকার সঙ্গে সংযুক্ত থাকে সেগুলোকে ব্রঙ্কিওল বলে। প্রতিটি ফুসফুসের সবগুলো ব্রঙ্কিওল ATP মিলিত হয়ে প্রতিপাশে একটি করে মোট দুটি নলের মত গঠনী সৃষ্টি করে। একে ব্রঙ্কাস (bronchus) বলে। ডান ও বাম ব্রঙ্কাস মিলিত হয়ে একটি ছোট ট্রাকিয়া গঠন করে। ট্রাকিয়া ও ল্যারিংস বা স্বরযন্ত্র মিলিত হয়ে ল্যারিঞ্জোট্রাকিয়াল প্রকোষ্ঠ তৈরি করে। প্রতি পাশের ফুসফুস ল্যারিংস ও গ্রটিসের সাথে যুক্ত হয়ে নাসরন্ধ্র পথে উন্মুক্ত হয়। পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙের সক্রিয় জীবনে ফুসফুসীয় শ্বসন সংঘটিত হয়। ব্যাঙের ফুসফুসীয় শ্বসন প্রক্রিয়া প্রকৃতপক্ষে বহিঃশ্বসন। বহিঃশ্বসন আবার দুটি উপপর্মায়ে বিভক্ত। শ্বাসগ্রহণ বা প্রশ্বাস এবং শ্বাস ত্যাগ বা নিশ্বাস।

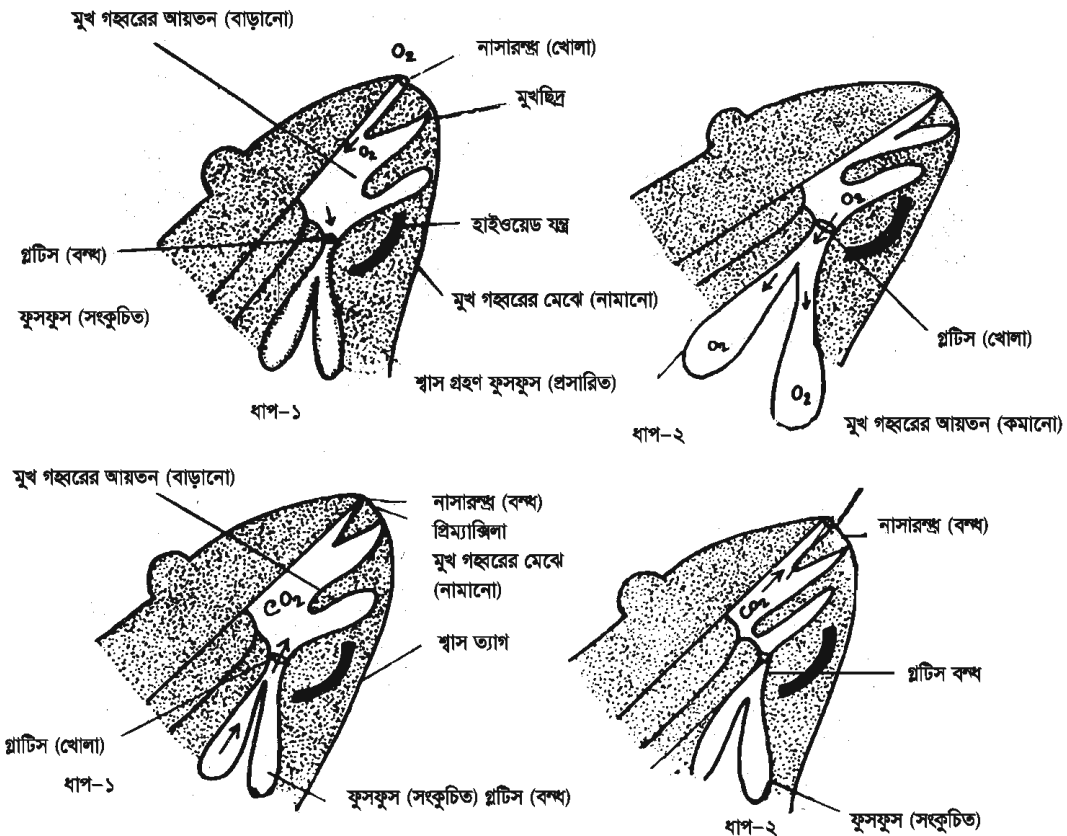
প্রশ্বাস (Inspiration) : এ পর্যায়ে অক্সিজেন সমৃদ্ধ বাতাস পরিবেশ থেকে ফুসফুসে প্রবেশ করে। প্রশ্বাস দুটি ধাপে ঘটে

(ক) প্রথম ধাপ : এ সময় নাসারন্ধ্র খোলা থাকে কিন্তু মুখছিদ্র ও গ্লটিস বন্ধ থাকে। এ সময় ফুসফুসদ্বয় সংকুচিত থাকে এবং মুখগহ্বরার মেঝে নিচু হয়ে যায়। ফলে মুখগহ্বরার আয়তন বৃদ্ধি পায়। এতে বাইরের অক্সিজেন-সমৃদ্ধ বাতাস মুখগহ্বরে প্রবেশ করে। এ সময় মুখগহ্বর ও গলবিলের প্রাচীরে অবস্থিত কৈশিক নালীর রক্তে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিনিময় ঘটে।

(খ) দ্বিতীয় ধাপ : এ পর্যায়ে নাসারন্ধ্রদ্বয় বন্ধ হয়ে যায় এবং মুখ গহ্বরার মেঝে উত্তোলিত হয়। ফলে অক্সিজেন-সমৃদ্ধ বাতাস ট্রাকিয়া ও ব্রঙ্কাসের মাধ্যমে ফুসফুসের অ্যালভিওলাসে প্রবেশ করে। অ্যালভিওলাসের গহ্বর থেকে ব্যাপন পদ্ধতিতে অক্সিজেন অ্যালভিওলাসের গায়ে সংলগ্ন কৈশিক নালীতে প্রবেশ করে এবং একই পদ্ধতিতে কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে।

শ্বাসত্যাগ বা নিশ্বাস (Expiration) : এ পর্যায়ে অ্যালভিওলাস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড দেহের বাইরে বের হয়ে যায়। নিশ্বাস দুটি ধাপে ঘটে।

(ক) প্রথম ধাপ : নিশ্বাসের প্রথম ধাপে ফুসফুসদ্বয় সংকুচিত হয়, বহিঃনাসারন্ধ্র ও মুখছিদ্র বন্ধ থাকে ও মুখগহ্বরার মেঝে নিচু হয়। ফলে মুখগহ্বরার আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং অক্সিজেন রক্ত ও কার্বন ডাইঅক্সাইড পূর্ণ বাতাস মুখগহ্বরে ফিরে আসে।



চিত্র ৮.৩৩ : ব্যাঙের শ্বাসগ্রহণ ও নিশ্বাস ত্যাগের বিভিন্ন পর্যায়

(খ) দ্বিতীয় ধাপ : মুখগহ্বরের মেঝে উন্মোচিত হয় ও মুখগহ্বরের আয়তন কমে যায়। এ সময় গ্লুটিস বন্ধ থাকে ও নাসারন্ধ্র খোলা থাকে। ফলে নাসারন্ধ্র পথে অক্সিজেন রক্ত ও কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত বাতাস বাইরে চলে আসে।

অন্তঃশ্বসন : আমরা আগেই জেনেছি যে অন্তঃশ্বসন মূলত কোষীয় শ্বসন। এ প্রক্রিয়ায় কৈশিক নালীর রক্তের মধ্যে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিনিময় ঘটে এবং কোষীয় পর্যায়ে গ্লুকোজ জারণের মাধ্যমে শক্তি উৎপন্ন হয়।

অক্সিজেন পরিবহণ : ফুসফুসের মধ্যে বাতাস পৌঁছানোর ফলে ফুসফুসের বায়ু অক্সিজেন সমৃদ্ধ হয়। এ বাতাসে যে জলীয় বাষ্প থাকে তা অ্যালভিওলাসের ভেতর দিকে জমা হয়। অক্সিজেন জলীয় কণায় দ্রবীভূত হয়। ফলে অক্সিজেনের ঘনত্ব ও চাপ বেড়ে যায়। কিন্তু অ্যালভিওলাসের প্রাচীর গাত্রের কৈশিক নালীর রক্তে এ সময় অক্সিজেনের ঘনত্ব ও চাপ কম থাকে। ফলে অক্সিজেন ব্যাপন প্রক্রিয়ায় রক্তে প্রবেশ করে। এ সময় অক্সিজেন রক্তের হিমোগ্লোবিনের সাথে একটি অস্থায়ী যৌগ গঠন করে। এ অস্থায়ী যৌগটির নাম অক্সিহিমোগ্লোবিন।

হিমোগ্লোবিন + অক্সিজেন → অক্সিহিমোগ্লোবিন

অক্সিজেন-সমৃদ্ধ এ রক্ত হৃৎপিণ্ড হয়ে দেহকোষে পৌঁছায়। দেহকোষে অক্সিজেনের ঘনত্ব ও চাপ কম থাকে। তাই অক্সিহিমোগ্লোবিন ভেঙে অক্সিজেন ও হিমোগ্লোবিন আলাদা হয়ে যায় এবং কোষের ভিতর প্রবেশ করে। এই অক্সিজেন কোষের সরল শ্বেতসার খাদ্যকে (গ্লুকোজ) জারিত করে শক্তি উৎপন্ন করে।

অক্সিহিমোগ্লোবিন → হিমোগ্লোবিন + অক্সিজেন

গ্লুকোজ জারণ ও শক্তির উৎপাদন : অন্তঃশ্বসনের এ পর্যায়টি দুটি ধাপে ঘটে : (১) গ্লাইকোলাইসিস, (২) ক্রেব্‌স চক্র।

গ্লাইকোলাইসিস (Glycolyses) : এ প্রক্রিয়াটি কোষের সাইটোপ্লাজমে ঘটে। এ পর্যায়ে অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না। এ সময় এক অণু গ্লুকোজ ভেঙে দুই অণু পাইরুভিক এসিডে পরিণত হয়।

১ অণু গ্লুকোজ → ২ অণু পাইরুভিক এসিড।

ক্রেব্‌স চক্র (Krebs cycle) : এ প্রক্রিয়াটি কোষের মাইটোকন্ড্রিয়াতে ঘটে। এ উপপর্যায়ে কয়েকটি নির্দিষ্ট ধাপে এবং নির্দিষ্ট এন্জাইম বা উৎসেচকের উপস্থিতিতে ঘটে। এ পর্যায়ে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে জারণ ঘটে। ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড, পানি ও শক্তি উৎপন্ন হয়।

কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহণ : কার্বন ডাইঅক্সাইড-এর পরিবহণ, অক্সিজেন পরিবহণের ঠিক উল্টো প্রক্রিয়া। অর্থাৎ কার্বন ডাইঅক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত দেহকোষ থেকে শ্বসন অঙ্গের দিকে পরিবাহিত হয়।

কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহণ তিনভাবে ঘটে।

(ক) কার্বনিক এসিডরূপে : কার্বন ডাইঅক্সাইড-এর একাংশ পানির সাথে মিশে কার্বনিক এসিডরূপে পরিবাহিত হয়।

(খ) বাইকার্বনেটরূপে : রক্তরস সোডিয়াম বাইকার্বনেটরূপে এবং লোহিত রক্তকণিকা পটাশিয়াম বাইকার্বনেটরূপে কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহণ করে।

(গ) কার্বামিনো যৌগরূপে : রক্তরস ও লোহিত রক্তকণিকা কার্বামিনো যৌগরূপে কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহণ করে।

৪। ফুলকা শ্বসন (Gill respiration) : ব্যাঙের লার্ভাকে ব্যাঙাচি বলে। ব্যাঙাচি পানিতে বাস করে। এদের ফুসফুস থাকে না। তাই এরা মাছের মত ফুলকার সাহায্যে শ্বসন কার্য চালায়। প্রতিটি ফুলকায় প্রচুর রক্তবাহী নালী থাকে। পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন ফুলকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবাহী নালীর সংস্পর্শে আসে এবং অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিনিময় সহজে সম্পন্ন হয়।

স্নায়ুতন্ত্র (Nervous system) :

ব্যাঙের দেহের বিভিন্ন অঙ্গগুলোকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় সমন্বয় ব্যবস্থার প্রয়োজন। স্নায়ুতন্ত্র ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র নিঃসৃত হরমোন ব্যাঙ ও অন্য প্রাণীদের দেহের সকল কাজ পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও

সমন্বয় সাধন করে। যে তন্ত্রের সাহায্যে প্রাণী উদ্দীপনায় সাড়া দেয়, বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংযোগ রক্ষা করে, বিভিন্ন কার্যাবলির সমন্বয় সাধন করে এবং পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে তাকে স্নায়ুতন্ত্র বলে।

উৎপত্তি, গঠন, বিস্তার ও কাজের ওপর ভিত্তি করে ব্যাঙের স্নায়ুতন্ত্রকে প্রধান তিন ভাগে ভাগ করা যায় :

১। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central nervous system)

২। প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র (Peripheral nervous system)

৩। স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র (Autonomic nervous system)

১। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র : মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড বা মেরুরজ্জু নিয়ে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র গঠিত।

২। প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র : স্নায়ুরজ্জু বা সুষুম্নাকাণ্ডের পার্শ্বদেশ থেকে প্রান্তীয় বা পার্শ্বীয় স্নায়ুতন্ত্র উৎপন্ন হয়। ব্যাঙে দশ জোড়া করোটিক স্নায়ু এবং দশ জোড়া সুষুম্না স্নায়ু নিয়ে এ তন্ত্রটি গঠিত।

৩। স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র : প্রাণিদেহে এক ধরনের স্নায়ু আছে যেগুলো কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা সরাসরি নিয়ন্ত্রিত হয় না। কিন্তু স্বাধীনভাবে বিভিন্ন অঙ্গের কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। এসব স্নায়ুর সমন্বয়ে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র গঠিত। এক জোড়া সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুরজ্জু এবং এদের শাখা-প্রশাখা নিয়ে এ তন্ত্রটি গঠিত।

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের বর্ণনা : মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড নিয়ে ব্যাঙের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র গঠিত। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের যে অংশটি করোটিকার মধ্যে আবদ্ধ থাকে তাকে মস্তিষ্ক বলে। স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে মস্তিষ্কের গুরুত্ব সর্বাধিক।

ব্যাঙের মস্তিষ্ক লম্বাটে, মধ্য ভাগ মোটা ও উভয় প্রান্ত সরু এবং দ্বি-পার্শ্বীয় প্রতিসম। মস্তিষ্ক দুটি আবরণ দিয়ে আবৃত থাকে। বাইরের পুরু, শক্ত, অস্বচ্ছ ও রক্তনালিকা সমৃদ্ধ আবরণটিকে ডুরা মেটের (Dura mater) ও ভিতরের পাতলা আবরণকে পিয়া মেটের (pia mater) বলে। এ আবরণ দুটিকে একত্রে মেনিনজেস বলে। মেনিনজেস মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড বা মেরুরজ্জুকে আবৃত করে রাখে এবং রক্ষা করে।

নিউরন বা স্নায়ুকোষ দ্বারা মস্তিষ্ক গঠিত। একটি নিউরন অন্য একটি নিউরনের সাথে মিলন বন্ধনী বা সিনাপস দ্বারা আবদ্ধ হয়ে স্নায়ুকলা তৈরি করে। মস্তিষ্কের বাইরের দিকের অংশটি ধূসর পদার্থ দ্বারা গঠিত অর্থাৎ স্নায়ু কোষদেহ দিয়ে গঠিত। একে ধূসর পদার্থ বা grey matter বলে। এর ভিতরের দিকের সাদা অংশকে শ্বেতপদার্থ (white matter) বলে। এই অংশ স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে গঠিত।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড নিরেট নয়, ফাঁপা। এর ভিতরের গহ্বরগুলোকে মস্তিষ্কের গহ্বর বা মস্তিষ্কের নিলয় বলে। এরা এক ধরনের রসে পূর্ণ থাকে।

মস্তিষ্কের গঠন :

ব্যাঙের মস্তিষ্ক প্রধানত তিনটি অংশে বিভক্ত : অগ্র মস্তিষ্ক, মধ্য মস্তিষ্ক ও পশ্চাৎ মস্তিষ্ক।

১। অগ্র মস্তিষ্ক : মস্তিষ্কের সবচেয়ে অগ্রবর্তী অংশটি হল অগ্র মস্তিষ্ক। অগ্রমস্তিষ্ক আবার দু ভাগে বিভক্ত : টেলেনসেফালন ও ডায়েনসেফালন।

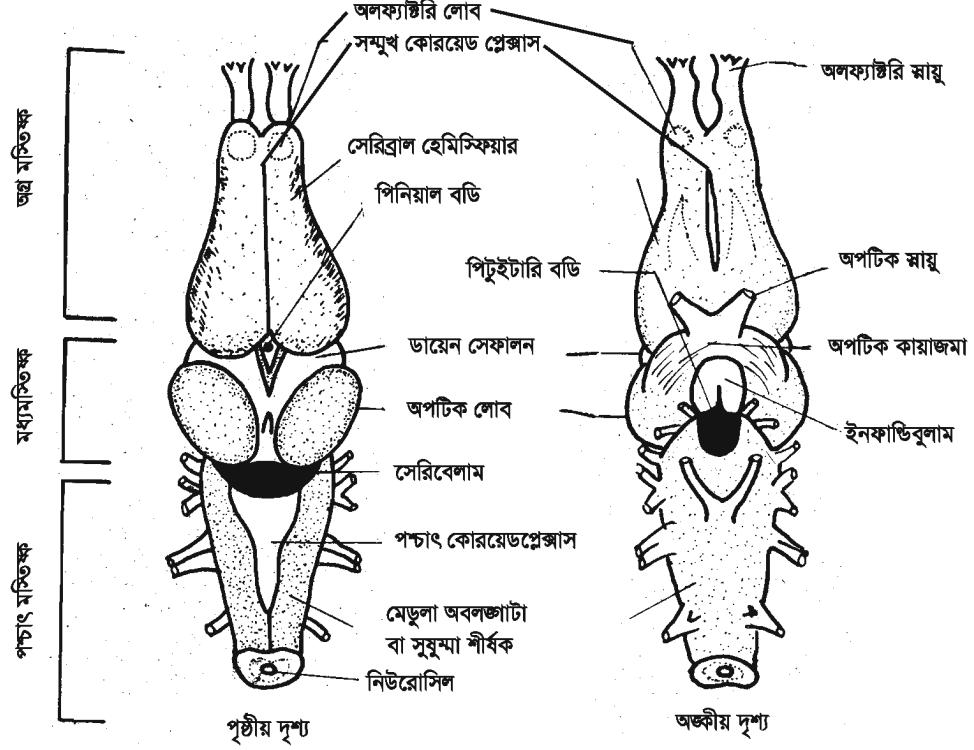
(ক) টেলেনসেফালন : এটি অগ্র মস্তিষ্কের সর্বাপেক্ষা সামনের অঞ্চল, দুটি অংশে বিভক্ত।

(অ) অলফ্যাক্টরি লোব : অগ্র মস্তিষ্কের সম্মুখ থেকে উৎপন্ন এক জোড়া প্রবৃদ্ধিকে অলফ্যাক্টরি লোব বলে। এরাই ব্যাঙের ঘ্রাণকেন্দ্র।

(আ) সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ার : অলফ্যাক্টরি লোবের পিছনে দুটি সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ার থাকে। মাৎসপেশি সংকলন ও বুদ্ধিমত্তা নিয়ন্ত্রণ সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ার –এর কাজ।

(খ) ডায়েনসেফালন : টেলেনসেফালনের পিছনে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত ছোট অঞ্চলটি হল ডায়েনসেফালন। এর পার্শ্বভাগ স্ফীত ও পৃষ্ঠদেশে একটি সরু উঁচু স্থান থাকে। এখানে অবস্থিত পিটুইটারি বডি থেকে হরমোন নিঃসৃত হয়। এ হরমোন বিপাকীয় কাজ, বৃদ্ধি, পূর্ণতা প্রাপ্তি ও জনন কোষের পুষ্টির জন্য সহায়ক।

২। **মধ্য মস্তিষ্ক** : অগ্র ও পশ্চাৎ মস্তিষ্কের মাঝে অবস্থিত মধ্য মস্তিষ্ক। এ অঞ্চলটি অন্যান্য অঞ্চল থেকে অপেক্ষকৃত চওড়া। এ অংশের দুই পাশে একটি করে গোলাকার অংশ থাকে। এদের অপটিক লোব বলে। এরা ব্যাণ্ডের দৃষ্টিকেন্দ্র।

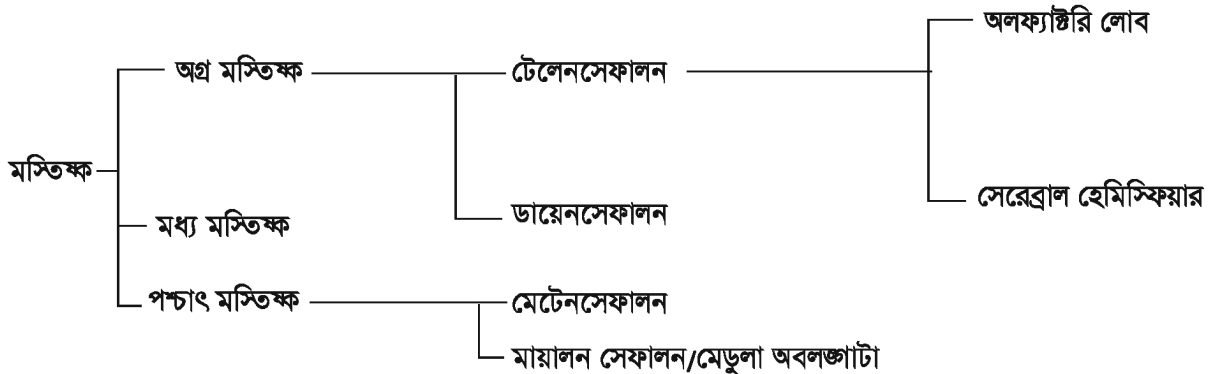


চিত্র ৮.৩৪ : ব্যাণ্ডের মস্তিষ্ক

৩। **পশ্চাৎ মস্তিষ্ক** : মধ্য মস্তিষ্কের পিছনের এ অংশটি সুষুম্নাকাণ্ডের গোড়া পর্যন্ত বিস্তৃত। মস্তিষ্কের এ অঞ্চলটি দুটি অংশে বিভক্ত। (ক) মেটেনসেফালন (খ) মায়ালনসেফালন বা মেডুলা অবলঞ্জাটা।

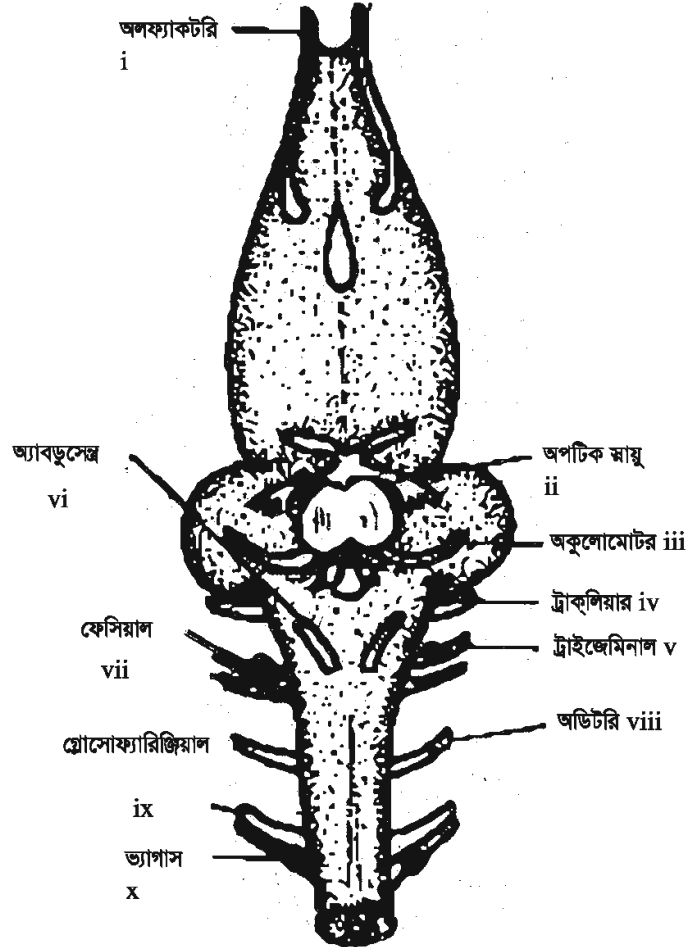
(ক) **মেটেনসেফালন** : অপটিক লোবের ঠিক পিছনের সর্ব অংশটি মেটেনসেফালন। এই অংশ ব্যাণ্ডের ঐচ্ছিক চলন নিয়ন্ত্রণ করে।

নিচের ছকে ব্যাণ্ডের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের বিভাগগুলো উল্লেখ করা হল।



(খ) মায়ালনসেফালন বা মেডুলা অবলজ্জাটা বা সুষুন্না শীর্ষক : মস্তিস্কের সর্বশেষ অংশ যা ক্রমশ সরু হয়ে মেরুরজ্জু বা সুষুন্নাকাণ্ডের সাথে মিলিত হয়। করোটিকার পিছনে একটি ছিদ্র আছে। এ ছিদ্রপথে এটা বের হয়ে মেরুরজ্জুর সাথে মিলিত হয়। মেডুলা মস্তিস্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। শিকার ধরা, শ্বসন, স্বর সৃষ্টি, জিহ্বার দ্বারা খাদ্য গ্রহণ, হৃদস্পন্দন ইত্যাদি শারীরবৃত্তীয় কাজে সহায়তা করে।

করোটিক স্নায়ু : ব্যাঙের মস্তিস্ক থেকে দশ জোড়া স্নায়ু বের হয়ে দেহের প্রান্তীয় অঞ্চলসমূহে যায়। এই স্নায়ুগুলোকে করোটিক স্নায়ু বলে। এই স্নায়ুগুলোর কোনটি দেহের বাইরে থেকে ভিতরের দিকে অনুভূতি বহন করে আনে আবার কোনটি দেহের ভিতর থেকে নির্দেশ বা আজ্ঞা বহন করে সুনির্দিষ্ট অঙ্গে নিয়ে যায়। আবার কোনটি আজ্ঞা ও অনুভূতি বহন উভয় কাজই করে।



চিত্র ৮.৩৫ : ব্যাঙের করোটিক স্নায়ু (অঙ্গকীয়)

কাজের প্রকৃতি অনুসারে প্রান্তীয় স্নায়ুকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : (ক) সংবেদী বা অনুভূতিবাহী স্নায়ু (Sensory nerves), (খ) আজ্ঞাবাহী স্নায়ু (Motor nerves) ও (গ) মিশ্র স্নায়ু (Mixed nerves).

(ক) সংবেদী বা অনুভূতিবাহী স্নায়ু : যেসব স্নায়ু দেহের প্রান্তীয় অঙ্গাদি থেকে অনুভূতি বা উদ্দীপনা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে নিয়ে আসে তাদের অনুভূতিবাহী স্নায়ু বলে। যেমন নাসারন্ধ্রের অলফ্যাকটরি স্নায়ু, চোখের অপটিক স্নায়ু, অন্তঃকর্ণের অডিটরি স্নায়ু।

ব্যাঙের করোটিক স্নায়ুগুলো মস্তিস্ক নির্দিষ্ট স্থান থেকে উৎপন্ন হয়ে করোটিক ছিদ্র পথ দিয়ে বের হয়ে আসে এবং মস্তকের বিভিন্ন অংশের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। দশ জোড়া স্নায়ুর উৎপত্তি, গতিপথ, বিস্তৃতি এবং এদের ধরন ও কাজের সর্ধক্ষিপ্ত তালিকা পাশের সারণিতে দেওয়া হল।

সারণি : ব্যাঙের করোটিক স্নায়ুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

স্নায়ুর নাম	উৎপত্তি	শাখা ও এদের বিস্তৃতি	কাজের ধরন বা প্রকৃতি	কাজ
i. অলফ্যাক্টরি স্নায়ু	অলফ্যাক্টরি লোবের শীর্ষভাগ	নাসারন্ধ্রের প্রাচীর গাত্র	সংবেদী বা অনুভূতিবাহী	স্বাণ সংবেদ বহন
ii. অপটিক স্নায়ু	অপটিক লোব	অক্ষিগোলকের রোটিনা	সংবেদী বা অনুভূতিবাহী	দর্শন কার্যে সহায়তা করা
iii. অকুলোমোটর স্নায়ু	মধ্য মস্তিষ্কের অঙ্গকীয় দেশ	অক্ষিগোলকের চারটি পেশি	মোটর বা আঙ্গাবাহী	চক্ষুপেশির সংকোচন ও প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ করা।
iv. ট্রাকলিয়ার স্নায়ু	অপটিক লোবের পিছন দিক	অক্ষিগোলকের অবলিক পেশি	মোটর বা আঙ্গাবাহী	অক্ষিগোলকের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ করা।
v. ট্রাইজেমিনাল স্নায়ু	সুষুম্না শীর্ষকের পার্শ্ব দেশ বা মেডুলা অবলম্বাটা	১. প্রথম শাখা : চোখের পাতা, নাসারন্ধ্র ও মাথার সামনের অংশ ২. দ্বিতীয় শাখা : মুখের উপরের চোয়াল ও চোখের নিচের পাতা ৩. তৃতীয় শাখা : মুখের নিচের চোয়ালের ত্বক ও মুখ গহ্বরের পেশি	মিশ্র স্নায়ু	১। মাথার উপরে দিকের পেশি সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করা ২। চোয়াল নড়ানো নিয়ন্ত্রণ করা। ৩। জিহ্বা সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করা
vi. অ্যাবডুসেন্স স্নায়ু	সুষুম্না শীর্ষকের পার্শ্ব দেশ	অক্ষিগোলকের পেশি	মোটর বা আঙ্গাবাহী	অক্ষিগোলকের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করা।
vii. ফেসিয়াল স্নায়ু	সুষুম্না শীর্ষকের পার্শ্বদেশ	১. প্রথম শাখা : মুখ গহ্বরের উপরের তালুতে যায়। ২. দ্বিতীয় শাখা : মুখ গহ্বরের তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত	মিশ্র স্নায়ু	স্বাদ গ্রহণ, ঘাড়ের পেশি সঞ্চালন ও চর্বনে সাহায্য করা।
viii. অডিটরি স্নায়ু	সুষুম্না শীর্ষকের পার্শ্বদেশ	অন্তঃকর্ণের বিভিন্ন অংশে	সংবেদী বা অনুভূতিবাহী	শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষা করা।
ix. গ্লোসোফ্যারিঞ্জিয়াল স্নায়ু	সুষুম্না শীর্ষকের পার্শ্বদেশ	জিহ্বার পচাং ভাগ, গলবিলের পেশি	মিশ্র স্নায়ু	স্বাদ গ্রহণ, স্পর্শ অনুভব করা ও জিহ্বার সঞ্চালনে সাহায্য করা।
ভেগাস স্নায়ু	সুষুম্না শীর্ষক পার্শ্বদেশ	১. প্রথম শাখা : গলবিল ও অন্ননালীতে যায়। ২. দ্বিতীয় শাখা : ফুসফুসে যায়। ৩. তৃতীয় শাখা : পাকস্থলিতে যায়। ৪. চতুর্থ শাখা : হৃৎপিণ্ডে যায়।	মিশ্র স্নায়ু	গলবিল অঞ্চলের কার্যক্রম, ফুসফুস, পাকস্থলি ও হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণে সাহায্য করা।

মেরুরজ্জু বা সুষুম্না কাণ্ড (Spinal Cord) : মেরুরজ্জু সুষুম্না শীর্ষকেরই প্রবর্তিত অংশ। এটি কশেরুকার নিউরাল নালীর ভিতর দিয়ে ইউরোস্টাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। মস্তিষ্কের মত মেরুরজ্জুও মেনিনজেস দ্বারা আবৃত। মেরুরজ্জুর ভিতরের দিকে ধূসর পদার্থ এবং বাইরের দিকে শ্বেত পদার্থ থাকে। ব্যাঙের মেরুরজ্জু থেকে দশ জোড়া স্নায়ু বের হয়।

মেরুরজ্জুর কাজ :

১। মেরুরজ্জু থেকে উৎপন্ন স্নায়ু ধারণ করে এবং মস্তিষ্কের তথ্য ও নির্দেশ আদান প্রদান করে।

২। তাৎক্ষণিক কোন কার্য সম্পাদনে সহায়তা দান করে।

রেচনতন্ত্র (Excretory system) : বিপাক ক্রিয়ার ফলে ব্যাঙের দেহে বিভিন্ন প্রকার নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থ উৎপন্ন হয়। এসব পদার্থ দেহের কোন কাজে লাগে না। অথচ বেশিক্ষণ দেহান্তরে থাকলে দেহের ক্ষতিসাধন করে। তাই এদের দেহ থেকে অপসারণ করা একান্ত প্রয়োজন। যে প্রক্রিয়ায় বিপাকের ফলে উৎপন্ন নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থ দেহ থেকে নিষ্কাশিত হয় তাকে রেচন বলে। যে তন্ত্রের মাধ্যমে এই কাজ করা হয় তাকে রেচনতন্ত্র বলে। বৃক রেচনতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। রেচন সম্বন্ধে আলোচনা দু' অংশে করা সুবিধাজনক—রেচনতন্ত্র ও রেচন প্রক্রিয়া।

ব্যাঙের রেচনতন্ত্র নিম্নলিখিত অঙ্গগুলো নিয়ে গঠিত।

(ক) বৃক (Kidney)

(খ) ইউরেটার বা রেচন জনন নালী (Ureter or Urinogenital tube)

(গ) মূত্রাশয় (Urinary bladder)

(ঘ) অবসারণী (Cloaca)

(ঙ) অবসারণী ছিদ্র (Cloacal aperture)

বৃক (Kidney) : উদরীয় অঞ্চলে মেরুদণ্ডের দু' পাশে ব্যাঙের দুট বৃক অবস্থিত। বৃক দেখতে লম্বাটে, গাঢ় লাল বর্ণের এবং অগ্র ও পশ্চাৎভাগ কিছুটা সরু। বৃকের বহিঃভাগ উত্তল ও ঢেউ খেলানো এবং ভিতরের দিকটা মসৃণ। প্রতিটি বৃক পেরিটোনিয়াম নামক পাতলা পর্দা দিয়ে আবৃত থাকে।

কাজ :

১। নাইট্রোজেন ঘটিত রেচন পদার্থ ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনে সহায়তা করা।

২। দেহে পানির সমতা নিয়ন্ত্রণ করা।

বৃকের গঠন :

বৃককে দুটি অংশে বিভক্ত করা যায় :

(i) বৃকীয় প্রাচীর

(ii) বৃকীয় গহ্বর

বৃকীয় প্রাচীর : এটি বৃকের বাইরের অংশ।

এর প্রাচীর দুটি অংশে বিভক্ত।

১। বাইরের দিকের অংশ বা কর্টেজ এবং

২। ভিতরের দিকের অংশ বা মেডুলা। বৃকীয় প্রাচীর বৃকের মধ্যস্থলে একটি গহ্বরকে বেষ্টিত করে রাখে।

(ii) **বৃকীয় গহ্বর :** বৃকীয় গহ্বরটি বৃকীয় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। এ গহ্বরটি থেকে রেচননালী বা ইউরেটার বেরিয়ে আসে।

(অ) বৃক্কের আণুবীক্ষণিক গঠন : ব্যাঙের প্রতিটি বৃক্ক সূক্ষ্ম প্যাঁচানো বৃক্কীয় নালীর সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটি বৃক্কে প্রায় দু হাজার এ রকম প্যাঁচানো আণুবীক্ষণিক নালিকা থাকে। এ নালিকাগুলোকে নেফ্রন বলে। প্রতিটি নেফ্রন দু হাজার অংশে বিভক্ত থাকে।

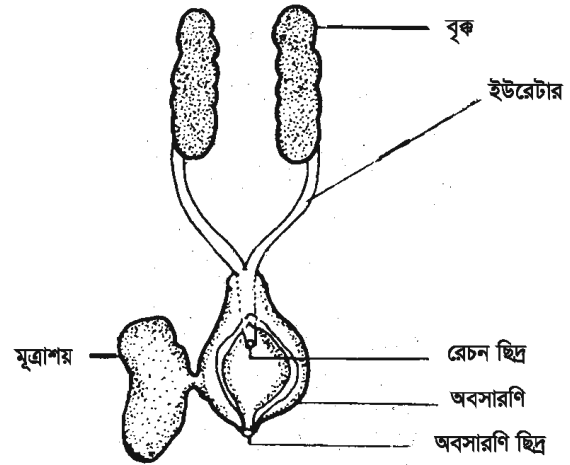
(অ) মালপিজিয়ান বডি বা অঙ্গ এবং

(আ) বৃক্কীয় নালিকা

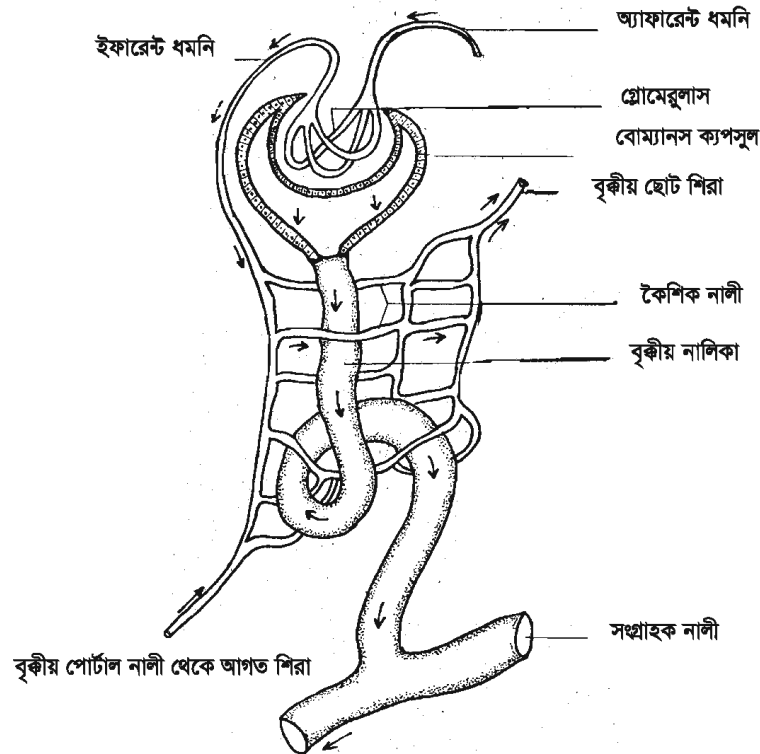
অ. মালপিজিয়ান অঙ্গ : এটি নেফ্রনের সামনের গোলাকার অংশ। এই অঙ্গ আবার দুইটি অংশ নিয়ে গঠিত, বোম্যানস ক্যাপসুল (Bowman's Capsule) ও গ্লোমেৰুলাস (Glomerulus)

(আ) বোম্যানস ক্যাপসুল : প্রতিটি বৃক্কীয় নালীর মুক্তপ্রান্তে বন্ধ পেয়ালার মত একটি অংশ থাকে, একে বোম্যানস ক্যাপসুল বলে। এ পেয়ালার প্রাচীর একটি এপিথেলিয়াল কোষস্তর দিয়ে গঠিত। বৃক্কীয় ধমনির একটি শাখা বোম্যানস ক্যাপসুল গহ্বরে প্রবেশ করে। এই শাখা অ্যাফারেন্ট ধমনি নামে পরিচিত।

বোম্যানস ক্যাপসুলের গহ্বরের ভিতর অ্যাফারেন্ট ধমনি একগুচ্ছ রক্তজাল সৃষ্টি করে। রক্তজালের এ গুচ্ছকে গ্লোমেৰুলাস বলে। এই রক্তজালগুচ্ছ একত্রিত হয়ে



চিত্র ৮.৩৬: রেচনতন্ত্র



চিত্র ৮.৩৭ : নেফ্রনের গঠন ও হাঁকন প্রক্রিয়া

ইফারেন্ট ধমনি গঠন করে। গ্লোমেৰুলাস ও বোম্যানস ক্যাপসুলকে একত্রে মালপিজিয়ান বডি বা অঙ্কা বলে। বৃক্কের এ অংশটি প্রধানত বৃক্কের কর্টেক্স বা প্রাচীরে অবস্থিত।

(আ) বৃক্কীয় নালিকা : বোম্যানস ক্যাপসুল বা আবরকের পেছন দিকের নলের মত নালিকাটিকে বৃক্কীয় নালিকা বলে। এ নালিকাটি কুণ্ডলী আকারে পঁচাচ খেয়ে সংগ্রাহক নালীতে উন্মুক্ত হয়। ইফারেন্ট ধমনি বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে বৃক্কীয় নালিকাকে পৌঁচিয়ে রাখে। সংগ্রাহক নালী পরিশেষে ইউরেটারে উন্মুক্ত হয়।

ইউরেটার : প্রতিটি বৃক্কের বাইরের প্রান্ত থেকে একটি করে সাদা স্থিতিস্থাপক নালী উৎপন্ন হয় এবং দেহের পশ্চাৎ দিকে যায়। এ নালিটি ইউরেটার নামে পরিচিত। দু'পাশের ইউরেটার মিলিত হয়ে একটি সাধারণ রেচন নালী গঠন করে এবং একটি সাধারণ রেচন ছিদ্র দ্বারা অবসারণিতে উন্মুক্ত হয়।

মূত্রথলি (Urinary bladder) : অবসারণীর অঙ্গীয় দেশে যে পাতলা, অসম্পূর্ণভাবে দ্বিখন্ডিত থলি থাকে তাকে মূত্রথলি বলে। সাময়িকভাবে এতে মূত্র জমা থাকে। মূত্রথলি একটি ছিদ্রের মাধ্যমে অবসারণিতে উন্মুক্ত হয়।

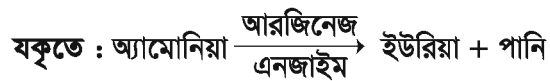
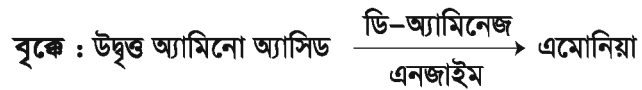
অবসারণি : মলাশয়ের পশ্চাতে অবসারণি অবস্থিত। এটি একটি অপ্রশস্ত গহ্বর। রেচন ছিদ্রের মাধ্যমে মূত্রাশয় অবসারণিতে উন্মুক্ত হয়। এর মাধ্যমে মূত্র অবসারণিছিদ্রের দিকে যায়।

অবসারণি ছিদ্র : দেহ কান্ডের শেষ প্রান্তে অবসারণি ছিদ্র অবস্থিত। এ ছিদ্রের মাধ্যমে মল, মূত্র, শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু বাইরে নির্গত হয়।

রেচন প্রক্রিয়া

আমিষ পরিপাকের ফলে অ্যামিনো এসিড উৎপন্ন হয়। এ অ্যামিনো এসিড বিভিন্ন জৈবিক কার্য সম্পাদনে ব্যবহৃত হয়। অতিরিক্ত ও অব্যবহৃত অ্যামিনো এসিড থেকে ডি-অ্যামিনেজ নামক এনজাইমের প্রভাবে ডি-অ্যামাইনেশন প্রক্রিয়ায় অ্যামিনো এসিড থেকে অ্যামোনিয়া পৃথক হয়। ব্যাঙের দেহের জন্য অ্যামোনিয়া একটি ক্ষতিকর পদার্থ।

এই অ্যামোনিয়া রক্ত দ্বারা বাহিত হয়ে যকৃতে পৌঁছায়। সেখানে আরজিনেজ নামক এনজাইমের প্রভাবে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানির সাথে অ্যামোনিয়া বিক্রিয়া করে এবং ইউরিয়া ও পানি উৎপন্ন করে।



তোমরা আগেই জেনেছ যে বৃক্কীয় ধমনিগুলোর অ্যাফারেন্ট শাখা অসংখ্য সূক্ষ্ম নালীতে বিভক্ত হয়ে গ্লোমেৰুলাস গঠন করে। এই অ্যাফারেন্ট শাখার মাধ্যমে রক্ত গ্লোমেৰুলাসের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। উচ্চ রক্তচাপের কারণে রক্তের ইউরিয়া, গ্লুকোজ ও অন্যান্য পদার্থের দ্রবণ রক্তরস, গ্লোমেৰুলাস ও বোম্যানস ক্যাপসুল সূক্ষ্ম প্রাচীর ভেদ করে বৃক্কীয় নালিকায় প্রবেশ করে। ইফারেন্ট ধমনির মাধ্যমে পরিশোধিত রক্ত বোম্যানস ক্যাপসুল ত্যাগ করে। বৃক্কীয় নালীর প্রাচীরে অবস্থিত কোষগুলো এ নালীর ভিতরের দ্রবণ থেকে পানি, গ্লুকোজ, সোডিয়াম ক্লোরাইড ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদার্থ শোষণ করে। অবশিষ্ট অংশ ইউরিয়াসহ ইউরেটারের মাধ্যমে দেহের বাইরে পরিত্যক্ত হয়।

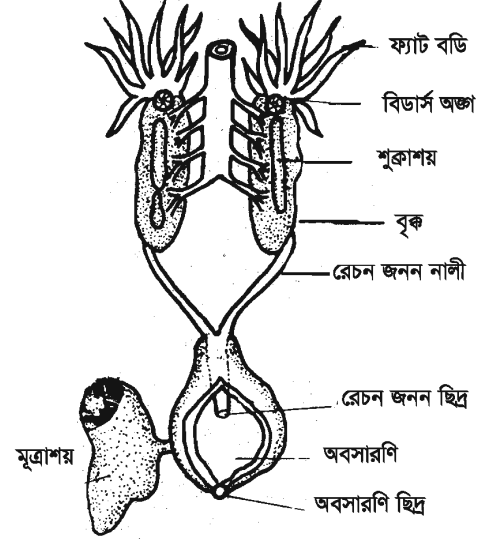
প্রজনন তন্ত্র (Reproductive system) : প্রজনন একটি জৈবনিক কাজ। প্রজাতির ধারা যাতে বিলুপ্ত না হয় সেজন্য প্রজননের প্রয়োজন। এ প্রক্রিয়াটি অযৌন অথবা একই প্রজাতির বিপরীত লিঙ্গের প্রাণীর সহযোগিতায় যৌন পদ্ধতিতে ঘটতে পারে। প্রজননের ফলে যে শিশু জীব উৎপন্ন হয় তারা পূর্ণাঙ্গ হয়ে বংশবৃদ্ধি করার মাধ্যমে প্রজাতির ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখে।

যেসব অঙ্গ প্রত্যক্ষভাবে ব্যাঙের প্রজননে অংশগ্রহণ করে তাদের নিয়ে প্রজনন তন্ত্র গঠিত। ব্যাঙ একলিঙ্গ প্রাণী। পুরুষ জননাজ ও স্ত্রী জননাজ ভিন্ন ভিন্ন দেহে অবস্থিত। নিম্নে পুরুষ ও স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের বর্ণনা দেওয়া হল।

পুরুষ প্রজননতন্ত্র (Male reproductive system) পুরুষ ব্যাঙের যেসব অঙ্গ প্রত্যক্ষভাবে প্রজননে অংশ গ্রহণ করে সেগুলো হল :

১. একজোড়া শুক্রাশয়
২. একজোড়া ভাসা ইফারেনসিয়া (এক বচনে ভাস ইফারেনস)
৩. ভাস ডিফারেনসিয়া বা রেচন জনন নালী
৪. অবসারণি
৫. অবসারণি ছিদ্র।

শুক্রাশয় (Testis): পুরুষ ব্যাঙের উদর গহ্বরের পিঠের দিকে বৃকের গায়ে লম্বা, ঈষৎ হলুদ রঙের দুটি শুক্রাশয় অবস্থিত। কখনো কখনো এরা খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত থাকে। একটি পাতলা পর্দা দ্বারা শুক্রাশয়টি বৃকের সাথে সংযুক্ত থাকে। এর নাম মেসরকিয়াম। প্রতিটি শুক্রাশয় অসংখ্য সেমিনিফেরাস টিউবিউল বা নালিকা দ্বারা গঠিত। এ নালিকাগুলোর অন্তঃপ্রাচীর থেকে শুক্রাণু উৎপন্ন হয়।



চিত্র ৮.৩৮ : পুরুষ প্রজনন তন্ত্র (রেচন জননতন্ত্র)

২. ভাস ইফারেনস (Vas efferens) : শুক্রাশয় থেকে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালী এসে সরাসরি বৃকের সংগ্রাহক নালীর সাথে যুক্ত হয়। এ সূক্ষ্ম নালীগুলোকে ভাসা ইফারেনসিয়া বলে। শুক্রাশয় থেকে শুক্রাণু এ নালীগুলোর ভিতর দিয়ে রেচন জনন-নালীতে প্রবেশ করে।

ভাস ডেফারেনস (Vas deferens) বা রেচন-জনন নালী (Urinogenital duct) : প্রত্যেকটি বৃকের উত্তল প্রান্ত থেকে একটি নালী বের হয়। এটিই পুরুষ ব্যাঙের শুক্রনালী বা ভাস ডেফারেনস। এ নালীর মধ্য দিয়ে মূত্র ও শুক্রাণু উভয়ই পরিবাহিত হয়। তাই একে রেচন-জনন নালীও বলে। প্রতিটি নালী বৃকের নিচে মোটা হয়ে সেমিনাল ভেসিকাল গঠন করে।

অবসারণি (Cloaca) : মলাশয়ের পিছনে যে সাধারণ প্রকোষ্ঠে মলাশয় ও রেচন-জনন নালী উন্মুক্ত হয় তাকে অবসারণি বলে। শুক্রাণু এর মাধ্যমে অবসারণি ছিদ্রের দিকে যেতে পারে।

অবসারণি ছিদ্র (Cloacal aperture) : দেহকাণ্ডের শেষ প্রান্তে অবস্থিত ছিদ্রটিকে অবসারণি ছিদ্র বলে। এই ছিদ্র পথে শুক্রাণু দেহের বাইরে নির্গত হয়।

বিডার্স অঙ্গ (Bidder's organ) : প্রতিটি শুক্রাশয়ের অগ্রাংশে লাল বর্ণের এ অঙ্গটি অবস্থিত। পুরুষ ব্যাঙে এটি একটি নিষ্ক্রিয় অঙ্গ এবং স্ত্রী ব্যাঙে এটি অপরিণত অবস্থায় থাকে। পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী ব্যাঙে এটি লুপ্ত হয়ে যায় এবং পূর্ণাঙ্গ পুরুষ ব্যাঙে আকারে ছোট থাকে। এর কার্যকারিতা সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায়নি।

ফ্যাট বডি (Fat Body) : পুরুষ ও স্ত্রী ব্যাঙের বৃকের অগ্রপ্রান্তের সাথে আঙুলের মত হলুদ বর্ণের কয়েকটি অঙ্গ থাকে। এগুলোতে স্নেহ পদার্থ সঞ্চিত থাকে। একে ফ্যাট বডি বলে। ফ্যাট বডি থেকে জনন কোষসমূহ পুষ্টি গ্রহণ করে এবং ব্যাঙের শীতনিদ্রার সময় পুষ্টি যোগায়।

স্ত্রী প্রজননতন্ত্র (Female reproductive system) : ব্যাঙের স্ত্রী প্রজননতন্ত্র যেসব অঙ্গ নিয়ে গঠিত, সেগুলো হল :

- ১। এক জোড়া ডিম্বাশয়
- ২। এক জোড়া ডিম্বানালী
- ৩। এক জোড়া জরায়ু
- ৪। স্ত্রী জনন ছিদ্র

(১) **ডিম্বাশয় (Ovary)** : স্ত্রী ব্যাঙের দুটি ডিম্বাশয় থাকে। উদর গহ্বরে পিঠের দু পাশে দুটি ডিম্বাশয় অবস্থিত। এদের নির্দিষ্ট কোন আকার নেই, জনন ঋতুতে এরা বড় হয়। ডিম্বাশয়ের মধ্যে বহুসংখ্যক ডিম্বাণু উৎপন্ন হয়। পরিণত ডিম্বাণুগুলো কালো ও গোলাকার হয়। এ সময় ডিম্বাশয় দুটি ফেটে যায় ও ডিম্বাণুগুলো ছড়িয়ে পড়ে।



(২) চিত্র ৮.৩৯ : স্ত্রী-জননতন্ত্র (রেচন জননতন্ত্র)

(২) **ডিম্বানালী (Ovary)** : কুনোব্যাঙের এক জোড়া সরু, সাদা ও প্যাচানো ডিম্বানালী থাকে। প্রতিটি নালীর সম্মুখ প্রান্তে একটি ফানেল থাকে এবং পচাৎ প্রান্তটি প্রসারিত হয়ে জরায়ুতে পরিণত হয়। ফানেলের মাধ্যমে ডিম্বাণু ডিম্বানালীতে প্রবেশ করে।

(৩) **জরায়ু (Uterus)** : প্রতিটি ডিম্বানালীর পচাৎ দিক একটি থলের আকার ধারণ করে। এটিই জরায়ু, এখানে ডিম্বকগুলো সাময়িকভাবে সঞ্চিত থাকে। পরবর্তীতে জরায়ু দুটি একত্রে মিলিত হয়ে অবসারণীতে উন্মুক্ত হয়। স্ত্রী ব্যাঙের মূত্র ও ডিম্বাণু পৃথক পৃথক নালী পথে অপসারণিতে উন্মুক্ত হয়। পরে অবসারণি ছিদ্রের মাধ্যমে দেহ থেকে বের হয়ে যায়।

জীবনচক্র ও রূপান্তর (Life cycle and Metamorphosis) : কুনোব্যাঙের জীবনচক্র বেশ জটিল। বর্ষাকাল ব্যাঙের প্রজনন ঋতু। এ সময় ব্যাঙগুলো খুব সক্রিয় হয়ে ওঠে। পুরুষ ব্যাঙ স্ত্রী ব্যাঙকে আকৃষ্ট করার জন্য ডাকে। একটি পূর্ণাঙ্গ পুরুষ ও স্ত্রী ব্যাঙের মধ্যে যৌন মিলন ঘটে। এ যৌন মিলনকে সজাম বলে। সজামরত অবস্থায় স্ত্রী ব্যাঙ অগভীর পানিতে ডিম ছাড়ে। পুরুষ ব্যাঙ ডিম্বাণুর উপর শূক্রাণু ছেড়ে দেয়। শূক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনের ফলে জাইগোট সৃষ্টি হয়। এই জাইগোট ভ্রূণে পরিণত হয় এবং বিভিন্ন ভ্রূণীয় দশা অতিক্রম করে পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙে পরিণত হয়।

ডিম্বাণু : ব্যাঙের ডিম্বাণুকে অনেকে ডিম বলে। ডিমগুলো দেখতে অনেকটা সরিষার দানার মত এবং খালি চোখে দেখা যায়। ব্যাঙের ডিম গোলাকার। এর এক প্রান্ত কালচে এবং অপরপ্রান্ত সাদাটে রঙের। ডিম্বাণুর কালচে প্রান্তে সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস থাকে এবং সাদাটে অংশে কুসুম থাকে। ব্যাঙের ডিমে কুসুমের পরিমাণ বেশি থাকে। প্রতিটি ডিম পাতলা পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে। যেসব ডিমের একপার্শ্বে কুসুম থাকে তাদের “টেলোলেসিথাল” (Telolecithal) ডিম বলে।

শূক্রাণু : ব্যাঙের শূক্রাণু খালি চোখে দেখা যায় না। শূক্রাণু কোষ তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা : মাথা বা মস্তক, মধ্যাংশ বা গ্রীবা এবং লেজ।

(ক) **মস্তক** : শূক্রাণু মস্তক ডিম্বাকার। এর ভিতর নিউক্লিয়াস থাকে। এতে হ্যাগুয়েড সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে।

(খ) **গ্রীবা বা মধ্যাংশ** : শূক্রাণুর মাথা ও লেজের মধ্যবর্তী ছোট অংশটি হল গ্রীবা। কোষের এ অংশে সেন্ট্রোসোম ও মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে।

(গ) **লেজ** : শূক্রাণুর সরু, লম্বা ও সঞ্চালনশীল অংশটিকে লেজ বলে। শূক্রাণু এ লম্বা সরু লেজের সাহায্যে পানিতে সাঁতার কেটে বেড়ায়।

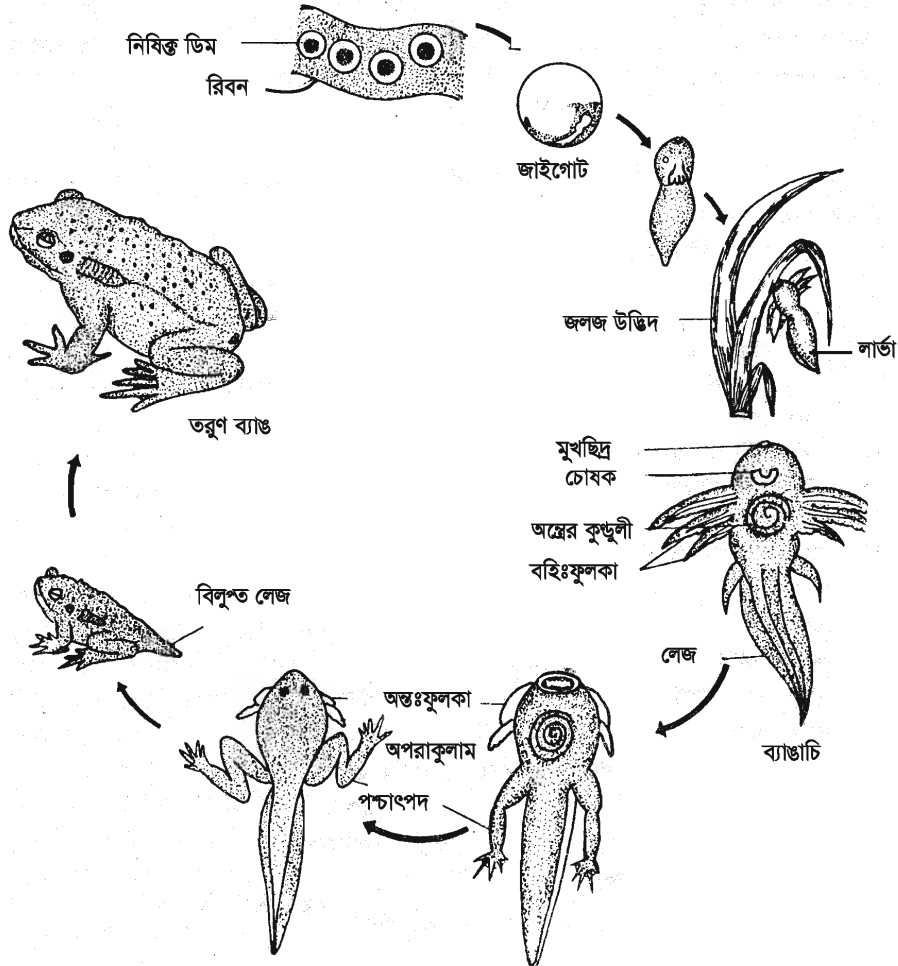
নিষেক ও পরিস্ফুটন : স্ত্রী ব্যাঙের ডিম্বাশয়ে ডিম্বাণু গঠনের পর এগুলো ডিম্বনালী দিয়ে বাইরের দিকে অগ্রসর হয়। এ সময় ডিম্বাণুগুলো অ্যালবুমিন দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে এবং স্বচ্ছ ফিতার মত আকার ধারণ করে। ফিতার মত অংশের ভেতর ডিম্বাণু বা ডিমগুলো পরপর সাজানো থাকে। পানির সংস্পর্শে এ ফিতার মত অংশটি ফুলে ওঠে এবং ডিমসহ পানিতে ভাসতে থাকে। এ অবস্থায় শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন ঘটে। শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর এ মিলনকে নিষেক fertilization বা নিষিক্তকরণ বলে। নিষেক প্রক্রিয়া ব্যাঙের দেহের বাইরে পানিতে ঘটে। এ ধরনের নিষেককে বহিঃনিষেক বলে।

আগেই বলা হয়েছে যে, শুক্রাণুর লেজ থাকে। নিষেকের সময় শুক্রাণুর লেজ খসে পড়ে। ডিম্বাণু শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত হলে জাইগোট সৃষ্টি হয়। নিষেকের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জাইগোটের বিভাজন শুরু হয়। জাইগোট মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে ভ্রূণ সৃষ্টি করে। এ কোষ বিভাজনে প্রথমে ২টি, ৪টি, ৮টি, ১৬ টি এ নিয়মে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে। জাইগোটের এরূপ পরিবর্তনকে ভ্রূণীয় পরিস্ফুরণ বলে। এ সময় ভ্রূণ অনেকগুলো অবস্থা বা পর্যায় অতিক্রম করে ত্রি-স্তর বিশিষ্ট একটি ভ্রূণে পরিণত হয়। এ তিনটি স্তর হল এন্টোডার্ম, মেসোডার্ম ও এন্ডোডার্ম।

১। **এন্টোডার্ম :** ভ্রূণের বাইরের স্তরটাকে এন্টোডার্ম বলে। এটি ত্বক, স্নায়ুতন্ত্র ও সংবেদী অঙ্গসমূহ গঠন করে।

২। **মেসোডার্ম :** ভ্রূণের মধ্য স্তর যোজক টিস্যু, সংবহন টিস্যু, পেশি টিস্যু, যৌন অঙ্গ ইত্যাদি গঠন করে।

৩। **এন্ডোডার্ম :** ভ্রূণের সবচেয়ে ভিতরের স্তরটি হল এন্ডোডার্ম। পৌষ্টিক নালীর আবরণ, যকৃৎ, ফুসফুস অগ্ন্যাশয় ইত্যাদি অঙ্গ গঠনে অংশ নেয়।



চিত্র ৮.৪০ ব্যাঙের জীবনচক্র

নিষেকের দু সপ্তাহের মধ্যে জাইগোট থেকে ভ্রূণ গঠন সম্পন্ন হয় এবং এটি ডিমের আবরণী ভেঙে বেরিয়ে আসে। একে ট্যাডপোল লার্ভা বা ব্যাঙাচি বলে। ব্যাঙাচি দেখতে মাছের পোনার মত। ব্যাঙাচির দেহ তিনটি অংশে বিভক্ত; যথা: গোলাকার মাথা, ছোট্ট সরু দেহকাণ্ড ও চ্যাপ্টা লেজ। ব্যাঙাচির অঙ্কীয় দিকে দেহের দেহকাণ্ড ও লেজের সংযোগ স্থলে অবসারণি ছিদ্র থাকে। ব্যাঙাচির মুখছিদ্র, পা ও চক্ষু কিছুই থাকে না। মুখ ছিদ্রের পরিবর্তে মুখের এক পাশে সাকার বা চোষক থাকে। এ চোষকের সাহায্যে ব্যাঙাচি শেওলা বা অন্য কোন জলজ উদ্ভিদের সাথে নিজেস্ব আটকে রাখে। এ সময় ব্যাঙাচি কোন খাদ্য গ্রহণ করে না; ডিমের কুসুম থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে বেঁচে থাকে। মাথার দুপাশে তিন জোড়া বহিঃফুলকা থাকে যার সাহায্যে ব্যাঙাচি শ্বাসকার্য চালায়। পরবর্তী পর্যায়ে চোষকের জায়গায় মুখ গঠিত হয়। এ সময় ব্যাঙাচি পানিতে সাঁতরে বেড়ায় ও জলজ খাদ্য খেতে শুরু করে। লেজের উপরের দিকে পাখনার মত ভাঁজ সৃষ্টি হয়। বহিঃফুলকা লোপ এবং দেহের ভেতরে অন্তঃফুলকা গঠিত হয়। প্যাচানো পৌষ্টিক নালী দেহের উপর থেকে আবছা দেখা যায়। ইতোমধ্যে মাথার সম্মুখভাগে শক্ত চোয়াল গঠিত হয়। ব্যাঙাচির ফুলকাগুলো মাছের মত কানকুয়া বা কানকো দ্বারা ঢাকা থাকে। পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন ফুলকার সংস্পর্শে আসে এবং শ্বাসকার্য চালায়।

আরও কিছুদিন পর এ ফুলকা দেহভ্যন্তরে বিলীন হয় এবং ফুসফুস গঠিত হয়। ইতোমধ্যে প্রথমে পশ্চাৎপদ পরে অগ্রপদ গঠিত হয়। লেজ ক্রমশ দেহের ভিতর লুপ্ত হয়। পৌষ্টিক নালী আকারে ছোট হয়। মুখের চেয়ালের ধারালো অংশ খসে পড়ে ও মুখছিদ্র প্রস্ফুট হয়। এ সময় ব্যাঙাচি ক্ষুদ্রে ব্যাঙে পরিণত হয় এবং ছোট কীটপতঙ্গ, পোকামাকড় খেয়ে আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে। একসময় ব্যাঙের লেজ সম্পূর্ণ লোপ পায়, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুগঠিত হয়ে শিশু ব্যাঙ পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙে পরিণত হয়। ব্যাঙের জীবনচক্র লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ব্যাঙাচি ও শিশু ব্যাঙের সাথে বহু দৈহিক পার্থক্য রয়েছে। ব্যাঙাচি ক্রমশ ভাবী ব্যাঙে পরিণত হওয়ার সময় এমন কয়েকটা মাধ্যমিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়, যার সাথে পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙের দেহাকৃতির কোন মিল নেই। ব্যাঙের জীবনচক্রের এরূপ পরিবর্তনকে রূপান্তর বলে। ব্যাঙের রূপান্তর থাইরক্সিন নামক হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কুনোব্যাঙের ত্রিকোণাকার তরুণাঙ্ঘি কোনটি?

- ক. ইন্ডিয়াম
গ. পিউবিস

- খ. সুপ্রাস্ক্যাপুলা
ঘ. স্টার্নাম

২। কুনোব্যাঙের দেহে খাদ্য সঞ্চিত থাকে—

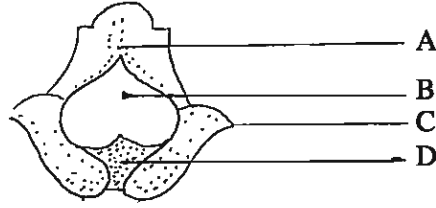
- i. গ্লুকোজ গ্লাইকোজেনরূপে
ii. প্রোটিন অ্যামাইনো এসিডরূপে
iii. স্নেহ চর্বিরূপে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
গ. i ও iii

- খ. i ও ii
ঘ. ii ও iii

নিচের চিত্র অবলম্বনে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



৩। চিত্রের কোন অংশটি আদর্শ কশেরুকার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়?

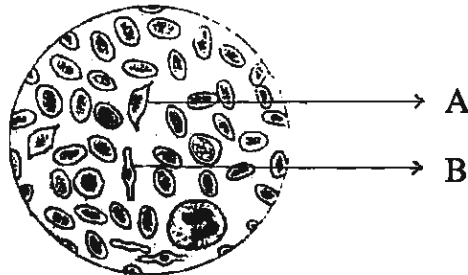
- | | |
|------|------|
| ক. A | খ. B |
| গ. C | ঘ. D |

৪। চিত্রটিতে আদর্শ কশেরুকা অপেক্ষা কয়টি অংশ কম রয়েছে?

- | | |
|--------|--------|
| ক. ১টি | খ. ২টি |
| গ. ৩টি | ঘ. ৪টি |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। এস.এস.সি পরীক্ষার্থী গালিব ব্যবহারিক পরীক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে বাসায় বসে যখন কুনোব্যাঙ ব্যবচ্ছেদ করছিল তখন তার দাদীমা পাশে বসা ছিল। ব্যাঙের লাল রক্ত দেখে দাদীমা তাকে জিজ্ঞেস করল মানুষের প্রয়োজন হলে দেহে ব্যাঙের রক্ত প্রবিষ্ট করানো যাবে কিনা। এ প্রশ্নের জবাবে গালিব বলল না। অধিকন্তু সে বই থেকে নিচের চিত্রটি দেখিয়ে রক্তরস ও রক্তকণিকা সম্পর্কে তাঁকে কিছু ধারণা দিল।



- ক. রক্তরস কী?
- খ. দেহে শ্বেত কণিকার একটি ভূমিকা বর্ণনা কর।
- গ. মানুষের দেহে ব্যাঙের রক্ত প্রবিষ্ট না করানোর ব্যাপারে গালিবের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কী ছিল।
- ঘ. দেহে A ও B চিহ্নিত কণিকার ঘাটতি হলে কী ধরনের সমস্যা হতে পারে তা বিশ্লেষণ কর।

অধ্যায় নয়

উদ্ভিদের জৈবিক কার্যাবলি

উদ্ভিদের পুষ্টি ও পুষ্টি উপাদান

Plant Nutrition And Nutrient Elements

সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে। এ খাদ্য আবার শ্বসন প্রক্রিয়ায় ভেঙে পানি, CO₂ এবং শক্তিতে পরিণত হয়। দেহের বৃদ্ধি ও বিভিন্ন কাজে ঐ শক্তি ব্যয় হয়। কিন্তু কেবল ঐ শর্করা দিয়ে উদ্ভিদের স্বাস্থ্যপ্রদ বৃদ্ধি, শারীরিক পরিপূর্ণতা ও ক্ষয়পূরণ সম্ভব হয় না। এগুলো ছাড়াও বিভিন্ন জৈবিক কাজ স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য উদ্ভিদ পরিবেশ থেকে বিভিন্ন প্রকার অজৈব লবণ পরিশোধন করে থাকে। দেহের স্বাস্থ্যপ্রদ বৃদ্ধি, শারীরিক পরিপূর্ণতা ও ক্ষয়পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ লবণ পরিশোধন প্রক্রিয়াকে বলা হয় পুষ্টি। অর্থাৎ উদ্ভিদের খনিজ পুষ্টি (mineral nutrition)।

পুষ্টি ও তার উপাদান

বিভিন্ন পুষ্টি বিজ্ঞানী প্রমাণ করেছেন যে, উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য ১৬টি অজৈব উপাদান প্রয়োজন। এরা এতই প্রয়োজনীয় যে এদের বলা হয় অত্যাৱশ্যকীয় উপাদান (essential elements)। অত্যাৱশ্যকীয় উপাদানগুলোর বৈশিষ্ট্য হল নিম্নরূপ :

- (১) এরা উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও প্রজননের জন্য প্রয়োজন।
 - (২) এদের যে কোনটির অভাব হলে উদ্ভিদে এর অভাবজনিত লক্ষণ (deficiency symptoms) প্রকাশ পায়।
 - (৩) একটি অত্যাৱশ্যকীয় উপাদানের কাজ অপর একটি দিয়ে সম্পন্ন হয় না।
- উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও শারীরিক পরিপূর্ণতার জন্য কী পরিমাণ অত্যাৱশ্যকীয় উপাদান প্রয়োজন তার ওপর নির্ভর করে পুষ্টি উপাদানগুলো দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে—

১। ম্যাক্রোমৌল (macro nutrient) বা মুখ্য উপাদান : এরা বেশি পরিমাণে লাগে। মুখ্য উপাদান ১০টি, যথা – নাইট্রোজেন (N), পটাশিয়াম (K), ক্যালশিয়াম (Ca), লৌহ (Fe), ম্যাগনেসিয়াম (Mg), কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H), অক্সিজেন (O), ফসফরাস (P) এবং সালফার (S)।

[১০টি নাম সহজে মনে রাখার উপায় নিম্নরূপ : Mg, K, CaFe for Nice CHOPS = অর্থাৎ এমজিকে কাফে ভাল চপের জন্যই। এখানে [Mg (ম্যাগনেসিয়াম), K (পটাশিয়াম) CaFe (ক্যালসিয়াম ও লৌহ), Nice (নাইট্রোজেন), এবং CHOPS= হল কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, ফসফরাস ও সালফার।]

২। মাইক্রোমৌল (micro nutrient) বা অণু উপাদান : এরা অতি অল্প পরিমাণে লাগে। দস্তা (Zn), ম্যাঙ্গানিজ (Mn), মলিবডেনাম (Mo), বোরন (B), তামা (Cu) ক্লোরিন (Cl) এ ছয়টি অণু উপাদান। তবে এ ছাড়াও সোডিয়াম (Na), অ্যালুমিনিয়াম (Al), সিলিকন (Si) এবং কোবাল্ট (Co) এগুলোরও প্রয়োজন হয়।

পুষ্টি উপাদানের উৎস : পুষ্টি উপাদানগুলোর মধ্যে কেবল কার্বন ও অক্সিজেন উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল থেকে গ্রহণ করে। অন্যসব উপাদান মাটি হতে মূলের সাহায্যে শোষণ করে। এ উপাদানগুলো মাটিতে বিভিন্ন লবণ হিসেবে বিরাজ করে। কিন্তু উদ্ভিদ এগুলোকে সরাসরি লবণ হিসেবে শোষণ করতে পারে না। এরা বিভিন্ন আয়ন হিসেবে শোষিত হয়।

উদ্ভিদের পুষ্টিতে বিভিন্ন খনিজ উপাদানের ভূমিকা : উদ্ভিদের পুষ্টিতে বিভিন্ন উপাদানের ভূমিকা বেশ প্রবল। এজন্যই এ উপাদানগুলোকে অত্যাৱশ্যকীয় উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। নাইট্রোজেনের অভাব হলে ক্লোরোফিল সৃষ্টি ব্যাহত হয়, আর ক্লোরোফিল সৃষ্টি বিঘ্নিত হলে খাদ্য প্রস্তুত বাধাপ্রাপ্ত হয়, খাদ্য প্রস্তুত বাধাপ্রাপ্ত হলে শ্বসন প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটে এবং শক্তি নির্গমন হ্রাস পায়। ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরোফিল অণুর একটি উপাদান। কাজেই এর অভাব হলে ক্লোরোফিল অণু সৃষ্টি এবং সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রস্তুত সবই ব্যাহত হবে। উদ্ভিদের বহু জৈবিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় পটাশিয়াম সহায়ক হিসেবে কাজ করে। এজন্যই উদ্ভিদের পুষ্টিতে এর বেশি প্রয়োজন হয়। কোষ

বিভাজনের মাধ্যমে উদ্ভিদের বৃদ্ধিও নিয়ন্ত্রণ করে পটাশিয়াম। ফসফরাস জীবকোষের DNA, RNA, ATP, NADP প্রভৃতির গাঠনিক উপাদান। কাজেই এটি ছাড়া উদ্ভিদের পুষ্টি একেবারেই সম্ভব নয়। পুষ্টিতে এগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্যই আমরা ফসল ফলাতে নাইট্রোজেন (ইউরিয়া), পটাশ (মিউরেট অফ পটাশ), ফসফরাস (ট্রিপল সুপার ফসফেট) প্রভৃতি সার জমিতে ব্যবহার করে থাকি।

পুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত লক্ষণ :

উদ্ভিদে কোন পুষ্টি উপাদানের অভাব হলে বিশেষ লক্ষণের মাধ্যমে উদ্ভিদ তা প্রকাশ করে থাকে। এ লক্ষণগুলোকে বলা হয় অভাবজনিত লক্ষণ বা অভাবজনিত রোগ। এ লক্ষণ দেখে আমরা বুঝতে পারি কোন উদ্ভিদে বা কোন ফসলে কোন উপাদানের অভাব রয়েছে। নিচে কতিপয় উপাদানের অভাবজনিত লক্ষণ উল্লেখ করা হল :

উপাদান	অভাবজনিত লক্ষণ
নাইট্রোজেন (N)	এর অভাব হলে ক্লোরোফিল সৃষ্টিতে বিঘ্ন ঘটে। ফলে পাতাগুলো হলুদ হয়ে যায়। কচি পাতাগুলো শেষে হলুদ হয়। পাতা হলুদ হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয় ক্লোরোসিস। কোষের বৃদ্ধি ও বিভাজন হ্রাস পায়, তাই উদ্ভিদের বৃদ্ধি কমে যায়।
ফসফরাস (P)	এর অভাব হলে পাতা বেগুনি রং ধারণ করে। পাতায় মৃত অঞ্চল সৃষ্টি হয়। মূলের বৃদ্ধি কমে যায়, পাতা, ফুল ও ফল ঝরে যেতে পারে।
পটাশিয়াম (K)	পটাশিয়ামের অভাব হলে পাতার শীর্ষ ও কিনার হলুদ হয় এবং মৃত অঞ্চল (necrotic area) সৃষ্টি হয়।
লৌহ (Fe)	লৌহের অভাব হলে প্রথমে কচি পাতার রং হালকা হয়ে যায়, তবে পাতার সরু শিরার মধ্যবর্তী স্থানেই প্রথম হালকা হয়। কখনো কখনো সম্পূর্ণ পাতা বিবর্ণ হয়ে পড়ে।
ম্যাগনেসিয়াম (Mg)	বয়স্ক পাতা প্রথম হলুদ হয়। পাতার দুটি শিরার মধ্যবর্তী অঞ্চলে হলুদ হয়। পাতায় মৃত অঞ্চলের সৃষ্টি হয়।
বোরন (B)	বোরনের অভাব হলে মূলের বৃদ্ধি কমে যায়, শাখার শীর্ষ মরে যায়, ফুলের কুঁড়ির জন্ম ব্যাহত হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। উদ্ভিদ কোন পুষ্টি উপাদানগুলো সরাসরি বায়ুমণ্ডল থেকে গ্রহণ করে?

ক. N, H

খ. C, O

গ. O, CI

ঘ. C, N

২। উদ্ভিদের খনিজ উপাদানসমূহকে অত্যাৱশ্যকীয় উপাদান বলার কারণ হল এর অভাবে উদ্ভিদের—

i. স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয় না

ii. স্বাভাবিক প্রজনন হয় না

iii. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i, ii ও iii |

৩নং ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর নিচের তথ্য অবলম্বনে দাও।

গনি মিয়া একজন সচেতন চাষী। সে জানে কোন কোন সারের অভাবে ফসলের কী কী ক্ষতি হয়। তাই সে নিয়মিত জমিতে ইউরিয়া, পটাশ ও টিএসপি দিয়ে থাকে এবং ভাল ফসল পায়। এগুলোর অভাবে অভাবজনিত বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পায়।

৩। গনি মিয়ার জমিতে টিএসপি প্রয়োগ করার উদ্দেশ্য হল গাছকে—

- RNA সরবরাহ করা
- $C_6H_{12}O_6$ সরবরাহ করা
- ATP সরবরাহ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৪। গনি মিয়ার জমিতে পটাশ প্রয়োগ না করলে কী লক্ষণ দেখা দিবে?

- গাছের বৃদ্ধি কমে যাবে
- পাতায় মৃত অঞ্চল সৃষ্টি হবে
- ফলন কম হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। লিপিকা তার ফুলের বাগানে নিয়মিত পানি সেচ, আগাছা পরিষ্কার ইত্যাদি করে থাকেন। একদিন তিনি লক্ষ্য করলেন কিছু ফুল গাছের পাতা হলুদ হয়ে গেছে, কিছু পাতা বিবর্ণ হয়ে গেছে এবং কিছু গাছের পাতা, ফুল ও কুঁড়ি ঝরে যাচ্ছে। এর কারণ বুঝতে না পেরে তিনি একজন উদ্যান তত্ত্ববিদের শরণাপন্ন হলেন। উদ্যান তত্ত্ববিদ তাকে বললেন প্রাণীর মত উদ্ভিদেরও সুস্বাদু খনিজ পুষ্টির একান্ত প্রয়োজন। তাই তিনি বাগানে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সরবরাহের পরামর্শ দেন।

- খনিজ পুষ্টি কাকে বলে?
- লিপিকার বাগানের কিছু গাছের পাতা বিবর্ণ হয়ে যাওয়ার কারণ কী?
- লিপিকার বাগানের গাছের পাতা হলুদ হওয়া এবং পাতা, ফুল ও ফল ঝরে যাওয়ার সঠিক ব্যাখ্যা কী হতে পারে?
- উদ্যান তত্ত্ববিদের পরামর্শ অনুযায়ী লিপিকার বাগানের সমস্যা সমাধানের উপায় বিশ্লেষণ কর।

ইমবাইবিশন, অভিস্রবণ, রস উত্তোলন ও প্রস্বেদন

ইমবাইবিশন (IMBIBITION)

এক টুকরা ব্লাটিং পেপার-এর একদিকে পানিতে ধরলে দেখা যাবে ব্লাটিং পেপারটি ধীরে ধীরে পানি শোষণ করে সিক্ত হচ্ছে। নিউজপ্রিন্ট কাগজ দিয়েও আমরা একটা পরীক্ষা করে দেখতে পারি। ইমবাইবিশনও এক ধরনের পানি শোষণ প্রক্রিয়া। কলয়েড জাতীয় শুকনো বা অর্ধ শুকনো পদার্থের তরল পদার্থ শোষণের বিশেষ প্রক্রিয়াকে ইমবাইবিশন বলা হয়। এটাকে আমরা আরও সহজভাবে বলতে পারি- উদ্ভিদ দেহের কোষপ্রাচীর, প্রোটোপ্লাজম ইত্যাদির পানি শোষণ প্রক্রিয়াকে ইমবাইবিশন বলা হয়। অঙ্কুরোদগমের সময় শুকনো বীজ যে পরিমাণ পানি শোষণ করে তার অধিকাংশই ইমবাইবিশন প্রক্রিয়ায় হয়ে থাকে।

যে পদার্থ পানি শোষণ করে তাকে বলা হয় **হাইড্রোফিলিক (পানি প্রিয়) পদার্থ**। হাইড্রোফিলিক পদার্থ পানির অভাব হলে সংকুচিত হয়, আবার পানি পেলে তা শোষণ করে স্ফীত হয়।

দেখা যায় শীতকালে কাঠের দরজা জানালা সংকুচিত হয়ে ফাঁক হয় কিন্তু বর্ষাকালে পানি শোষণ করে স্ফীত হয়; ফলে দরজা-জানালা বন্ধ করতে অসুবিধা হয়। এটা ইমবাইবিশন প্রক্রিয়ার ফল।

ব্যাপন (DIFFUSION)

এক গ্লাস পানিতে এক চামচ চিনি দিলে ক্রমান্বয়ে চিনির দানার অণুগুলো গ্লাসের সমস্ত পানিতে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে গ্লাসের সবটুকু পানিই সমান মিষ্টি হয়। এক গ্লাস পানিতে এক চামচ লবণ মিশালেও দেখা যায় গ্লাসের সমস্ত পানি লবণাক্ত হয়েছে। কয়েকটি পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দানা এক গ্লাস পানিতে ছেড়ে দিয়ে দেখ কি হয়। কিছুক্ষণ পরই দেখা যাবে গ্লাসের সমস্ত পানি বেগুনি রং ধারণ করেছে। গ্লাসের পানিতে একফোঁটা কালি ছেড়ে দিয়েও এ পরীক্ষাটি করতে পার।

আসলে চিনি, লবণ বা পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট-এর একটি দানায় অনেকগুলো অণু এক সাথে জড় হয়ে থাকে। দানাটি গ্লাসের পানিতে ছেড়ে দিলে দানার অণুগুলো পানির অণু দিয়ে আরও জোরালোভাবে আকৃষ্ট হয়। ফলে দানাটি পানিতে সম্পূর্ণ দ্রবীভূত হয় এবং এর অণুগুলো গ্লাসের পানিতে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে। চিনি, লবণ বা পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দানার অণুগুলো ব্যাপন প্রক্রিয়ায় পানিতে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে। একই তাপমাত্রা ও বায়ুমণ্ডলীয় চাপে কোন পদার্থের অধিকতর ঘন স্থান হতে কম ঘন স্থানে বিস্তার লাভ প্রক্রিয়াকে ব্যাপন বলে। ব্যাপন অর্থ হল সবদিকে ছড়িয়ে পড়া বা সর্বত্র ব্যাপ্ত হওয়া।

ব্যাপন চাপ (diffusion pressure) : একই তাপমাত্রা এবং বায়ুমণ্ডলীয় চাপে কোন পদার্থের অধিকতর ঘন স্থান হতে কম ঘন স্থানের দিকে ব্যাপিত হবার যে প্রচ্ছন্ন ক্ষমতা (potential ability) তাকে ব্যাপন চাপ বলা হয়। একটি গ্যাস ভর্তি বেলুনে গ্যাসের ব্যাপন চাপ তার চারপাশের বাতাস থেকে বেশি থাকে তাই বেলুনটি ফেটে গেলে বেলুনের গ্যাস তার ব্যাপন চাপ বেশি থাকার কারণে চারপাশের বাতাসে মিশে যাবে।

ব্যাপনের নিয়ন্ত্রণকারী প্রভাবক

কোন পদার্থের ব্যাপন হার নির্ভর করে তাপমাত্রা, বায়ুমণ্ডলের চাপ, সেই পদার্থের অণুর ঘনত্ব এবং মাধ্যমের ঘনত্বের ওপর।

তাপমাত্রা : তাপমাত্রা বাড়লে সাধারণত ব্যাপন হার বাড়ে।

পদার্থের অণুর ঘনত্ব : যার ব্যাপন ঘটবে সে পদার্থের অণুর ঘনত্ব বেশি থাকলে ব্যাপন হার বেশি হবে, অণুর ঘনত্ব কম হলে ব্যাপন হার কম হবে।

মাধ্যমের ঘনত্ব : পানি, বায়ু ইত্যাদি যে মাধ্যমে ব্যাপন হবে সে মাধ্যমের ঘনত্ব বেশি হলে ব্যাপন হার কম হবে, মাধ্যমের ঘনত্ব কম হলে ব্যাপন হার বাড়বে।

বায়ুমন্ডলের চাপ : বায়ুমন্ডলের চাপ বাড়লে ব্যাপন হার কমবে কিন্তু বায়ুমন্ডলের চাপ কম হলে ব্যাপন হার বাড়বে। সাধারণত একই সময়ে এবং একই স্থানে পরিবেশের তাপমাত্রা ও বায়ুমন্ডলের চাপ সমান থাকে, সেক্ষেত্রে ব্যাপন পদার্থের ঘনত্ব এবং মাধ্যমের ঘনত্বই ব্যাপন নিয়ন্ত্রণকারী প্রভাবক হয়ে দাঁড়ায়। মাধ্যম ও ব্যাপন পদার্থ যদি একই হয় (যেমন বেলুন ভর্তি বাতাস এবং চারপাশের বাতাস) তাহলে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যাপন ঘটেবে যতক্ষণ পর্যন্ত দুটোর ঘনত্ব সমান না হয়।

ঝিল্লীর মধ্য দিয়ে ব্যাপন : দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ একটি ঝিল্লী দিয়ে পৃথক করে রাখলে এদের মধ্যে ব্যাপন ঝিল্লীর প্রকৃতির ওপর নির্ভর করবে। উদ্ভিদে আমরা সচরাচর তিন প্রকার ঝিল্লী দেখতে পাই, যথা :

ভেদ্য ঝিল্লী (permeable membrane) : এ প্রকার ঝিল্লীর মধ্য দিয়ে দ্রাবক ও দ্রব উভয় প্রকার পদার্থের অণুরই ব্যাপন ঘটেতে পারে। কোবের সেলুলোজ নির্মিত প্রাচীর এ প্রকার ঝিল্লী।

বৈষম্যভেদ্য ঝিল্লী (selectively permeable membrane) : এ প্রকার ঝিল্লীর মধ্য দিয়ে কেবল দ্রাবক পদার্থের অণুই ব্যাপিত হয় কিন্তু দ্রব পদার্থের অণু সহজে ব্যাপিত হয় না। কোষ ঝিল্লী একটি বৈষম্যভেদ্য ঝিল্লী।

অভেদ্য ঝিল্লী (impermeable membrane) : এ প্রকার ঝিল্লীর মধ্য দিয়ে দ্রাবক ও দ্রব কোন পদার্থের অণুই ব্যাপিত হতে পারে না। কিউটিন বা সুবেরিনযুক্ত কোষপ্রাচীর অভেদ্য ঝিল্লী।

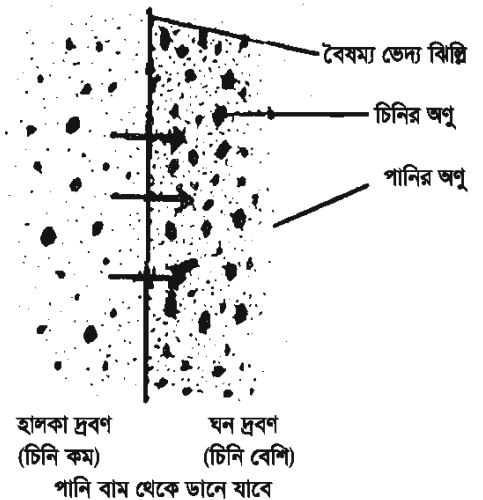
ব্যাপনের গুরুত্ব

উদ্ভিদের জীবনে ব্যাপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সালাকসংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান কার্বন ডাইঅক্সাইড উদ্ভিদ ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বায়ু থেকে গ্রহণ করে। পাতার স্পঞ্জি প্যারেনকাইমা স্তরে এ কাজ হয়। শ্বসনের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেনও ব্যাপন প্রক্রিয়ায় বায়ু থেকে কোষ অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। উদ্ভিদের দেহের অভ্যন্তরে পানি এবং লবণের বিভিন্ন অংশে যাতায়াত ব্যাপন প্রক্রিয়াতে হয়। উদ্ভিদের বায়বীয় অংশ থেকে পানি হারাবার জন্যেও ব্যাপন প্রক্রিয়া দায়ী।

অভিস্রবণ (OSMOSIS)

এক বাটি পানিতে একটি কিসমিস কিছুক্ষণ রেখে দিলে দেখা যাবে কিসমিসটি পানি শোষণ করে ফুলে টসটসে হয়েছে। কিসমিসের বাইরের আবরণটি হল একটি বৈষম্যভেদ্য ঝিল্লী। এ ঝিল্লীর বাইরে আছে বাটির পানি আর ঝিল্লী দিয়ে আবৃত অবস্থায় আছে কিসমিসের মিষ্টি রস। কিসমিসের বাইরে বাটির দ্রবণে পানির পরিমাণ বেশি (আসলে সবটুকুই পানি) কিন্তু কিসমিসের ভিতরের দ্রবণে পানির পরিমাণ খুবই কম। এ অবস্থায় বাটি থেকে পানি কিসমিসের বৈষম্যভেদ্য ঝিল্লী ভেদ করে ভিতরে ঘন দ্রবণে (পানির পরিমাণ এখানে কম) প্রবেশ করছে, ফলে কিসমিসটি ফুলে টসটসে হয়েছে। এটি হয়েছে একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় যাকে বলা হয় অভিস্রবণ বা অসমোসিস। অসমোসিসকে আমরা এভাবে বলতে পারি—“যে প্রক্রিয়ায় একটি বৈষম্যভেদ্য ঝিল্লীর মধ্য দিয়ে হালকা ঘনত্বের দ্রবণ হতে পানি (দ্রাবক) অধিক ঘন দ্রবণের দিকে প্রবাহিত হয় তাকে অভিস্রবণ বলে।” দুটো দ্রবণের ঘনত্ব সমান না হওয়া পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। অভিস্রবণ একটি বিশেষ ধরনের ব্যাপন।

আমরা জ্ঞানি দ্রবণ (Solution) হল দ্রাবক ও দ্রবের মিশ্রণ, যেমন পানি ও চিনির মিশ্রণ একটি দ্রবণ। এখানে পানি হল দ্রাবক (Solvent) চিনি হল দ্রব (Solute), আর মিশ্রণটি হল দ্রবণ (Solution)। অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় কখনো দ্রবের ব্যাপন ঘটে না, ব্যাপন ঘটে কেবলই দ্রাবকের অর্থাৎ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কেবলই পানির ব্যাপন ঘটে।



চিত্র ৯.১: অভিস্রবণ

অভিস্রবণ দু প্রকার

১। **অন্তঃঅভিস্রবণ (endosmosis)** : যে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার পানি (দ্রাবক) কোষের বাইর হতে কোষের ভিতরে প্রবেশ করে তাকে বলা হয় অন্তঃঅভিস্রবণ বা এন্ডোসমোসিস। কোষ রসের ঘনত্ব বাইরের দ্রবণের ঘনত্বের চেয়ে বেশি হলে অন্তঃঅভিস্রবণ হয়। পানিতে কয়েকটি কিসমিস ডুবিয়ে রাখ। দেখবে ভিতরে পানি গিয়ে কিসমিস ফুলে আঙুরের মত টসটসে হয়ে গেছে।

২। **বহিঃঅভিস্রবণ (exosmosis)** : যে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি (দ্রাবক) কোষের ভিতর হতে কোষের বাইরে গমন করে তাকে বলা হয় বহিঃঅভিস্রবণ বা এক্সোসমোসিস। কোষ রসের ঘনত্বের চেয়ে বাইরের দ্রবণের ঘনত্ব বেশি হলে বহিঃঅভিস্রবণ হয়।

লবণের দ্রবণে টসটসে আঙুর ডুবিয়ে রেখে দেখ। আঙুরের ভিতর থেকে পানি বাইরে বের হয়ে আসবে, যার ফলে আঙুর চুপসে যাবে।

অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার শর্তাবলি : নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে অভিস্রবণ প্রক্রিয়া ঘটে :

- ১। দুটি দ্রবণ হতে হবে, একটির ঘনত্ব কম এবং অপরটির ঘনত্ব বেশি
- ২। ভিন্ন ঘনত্বের দুটি দ্রবণ একটি বৈষম্যভেদ্য ঝিল্লী দিয়ে পৃথক থাকতে হবে।
- ৩। দুটি দ্রবণ একই দ্রাবক (পানি) বিশিষ্ট হতে হবে।
- ৪। তাপমাত্রা ও বায়ুমণ্ডলীয় চাপ একই হতে হবে।

অসমোটিক প্রেসার (osmotic pressure=OP) : অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় অধিক ঘনত্বের দ্রবণের দিকে কম ঘনত্বের দ্রবণের দিক হতে পানি প্রবাহ বন্ধ করতে হলে অধিক ঘনত্বের দ্রবণের দিক হতে যে পরিমাণ চাপ প্রয়োগের প্রয়োজন হয় সেই চাপকে অসমোটিক প্রেসার বা অভিস্রবণ চাপ বলে। দুটি দ্রবণের ঘনত্বের পার্থক্য যত বেশি হবে অভিস্রবণ চাপও তত বেশি হবে; দুটি দ্রবণের ঘনত্বের পার্থক্য যত কম হবে, অভিস্রবণ চাপও তত কম হবে, দুটি দ্রবণের ঘনত্ব সমান হলে কোন অভিস্রবণ চাপ থাকবে না এবং কোন প্রকার অভিস্রবণ হবে না।

রসক্ষীতি চাপ বা টারগার প্রেসার (turgor pressure) : অন্তঃঅভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় কোষাভ্যন্তরে পানি প্রবেশের ফলে কোষ স্ফীত হয়। কোষের এই স্ফীতি অবস্থাকে রসক্ষীতি বা টারজিডিটি বলে। এ রসক্ষীতির জন্য কোষের প্রোটোপ্লাজম কর্তৃক কোষপ্রাচীরের উপর যে চাপের সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় রসক্ষীতি চাপ বা টারগার প্রেসার।

অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় একটি পরীক্ষা: কিসমিসকে পানিতে রেখে অভিস্রবণ প্রক্রিয়াটি প্রত্যক্ষ করা যায়। একটি আলু অসমোস্কোপ তৈরি করেও অভিস্রবণের পরীক্ষা করা যায়।

পরীক্ষার উপকরণ : একটি বড় আলু, একটি বাটি, পানি ও চিনির দ্রবণ।

কার্যপদ্ধতি: বাটির অর্ধেক পরিমাণ পানি নেই। আলুটির দু মাথা কেটে নেই এবং এক মাথায় একটি গর্ত করি। এবার চিনির দ্রবণ দিয়ে আলুর গর্তটি অর্ধেক পর্যন্ত ভর্তি করি এবং আলুটিকে বাটির পানিতে রাখি। লক্ষ রাখতে হবে যেন বাটির পানির উপরিতল আলুর মাথা থেকে নিচে থাকে। এ অবস্থায় পরীক্ষণ সেটটিকে কিছুক্ষণ রেখে দেই।

পর্যবেক্ষণ : কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে আলুর গর্তের ভিতরকার দ্রবণের উচ্চতা বেড়েছে।

সিদ্ধান্ত : আলুর চারদিকে ছিল পানি এবং গর্তে ছিল চিনির দ্রবণ। আলুর কোষ প্রাচীর ভেদ্য এবং কোষঝিল্লী বৈষম্যভেদ্য। তাই বাটির পানি কোষপ্রাচীর ও কোষঝিল্লী ভেদ করে গর্তে রাখা ঘন দ্রবণে প্রবেশ করেছে। যেহেতু বাইরে থেকে পানি বৈষম্যভেদ্য ঝিল্লী ভেদ করে অধিক ঘন দ্রবণে প্রবেশ করেছে কাজেই প্রবেশের প্রক্রিয়াটি হল অভিস্রবণ বা অসমোসিস।



উদ্ভিদ জীবনে অভিস্রবণের প্রয়োজনীয়তা : উদ্ভিদের জীবনে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

নিচে এ সম্বন্ধে সর্গক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল :

(১) পানি পরিশোধণ : উদ্ভিদের মূলরোম দিয়ে পানি পরিশোধণ অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় হয়ে থাকে।

(২) পানি চলাচল : উদ্ভিদের অভ্যন্তরে এক কোষ হতে পানি অন্য কোষে এ প্রক্রিয়ায় চলাচল করে।

(৩) পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়া : পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়া অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই অভিস্রবণ প্রক্রিয়া প্রবেশনের হারও নিয়ন্ত্রণ করে।

(৪) কোষের স্ফীতি ও বৃদ্ধি : কোষের স্বাভাবিক স্ফীতি অবস্থা বজায় রাখা এবং বৃদ্ধির জন্য কোষ স্ফীতি আবশ্যিক। অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি গ্রহণ করে কোষ স্ফীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাই কোষের স্বাভাবিক আকার ও আকৃতি ঠিক রাখা এবং কোষের বৃদ্ধিতে অভিস্রবণ প্রক্রিয়া বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

(৫) পানির সমবণ্টন : উদ্ভিদের প্রায় সকল জৈবনিক কাজের জন্য পানি আবশ্যিক। এ কাজগুলো সব জীবিত কোষেই ঘটে। মূল থেকে পাতা পর্যন্ত বিভিন্ন জীবিত কোষে প্রয়োজনীয় পানি পৌঁছান পৌঁছান অভিস্রবণ প্রক্রিয়াই সক্রিয়।

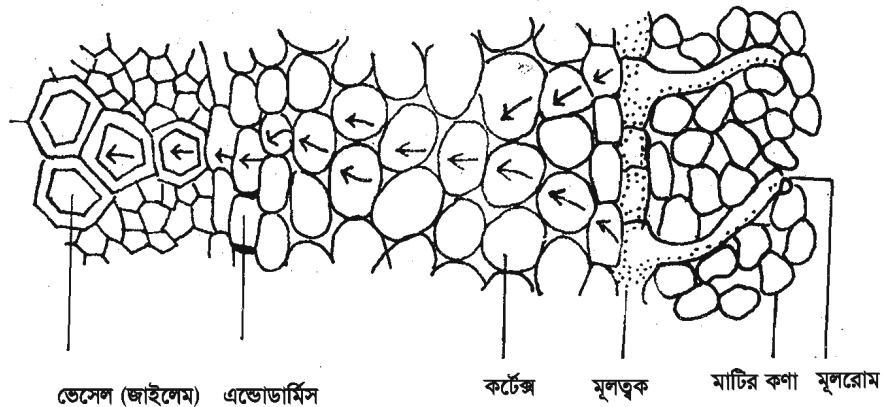
(৬) কোষের দৃঢ়তা প্রদান : নরম কোষগুলো পানি গ্রহণ করে দৃঢ় হয়। কোষ অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি গ্রহণ করে।

(৭) বীজের অঙ্কুরোদগম : বীজ অঙ্কুরোদগমের সাফল্য নির্ভর করে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার ওপর।

উদ্ভিদে পানি ও খনিজ লবণ পরিশোধণ

উদ্ভিদের জন্য পানি এবং লবণ উভয়ই বেশ গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভিদ পানি ও খনিজ লবণ মাটি হতে শোষণ করে নেয়। অতি সৎক্ষেপে উদ্ভিদে পানি ও খনিজ লবণ পরিশোধণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হল :

পানি পরিশোধণ : উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদ তাদের মূলরোমের সাহায্যে মাটি হতে পানি পরিশোধণ করে থাকে। মূলের মূলরোম অঞ্চলই পানি পরিশোধণ অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। এককোষী মূলরোম হল পানি পরিশোধণের জন্য বিশেষভাবে রূপান্তরিত ত্বকীয় কোষ। মূলরোমের প্রাচীর সেলুলোজ দিয়ে গঠিত, তাই এ প্রাচীর পানির জন্য ভেদ্য। কোষপ্রাচীরের নিচে কোষঝিল্লী বৈষম্যভেদ্য ঝিল্লী হিসেবে কাজ করে। মূলরোমের ভিতরে আছে ঘন কোষরস আর বাইরে আছে মাটির কণার ফাঁকে ফাঁকে পানি। তাই অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় মাটির কণার ফাঁকের পানি ভেদ্য কোষপ্রাচীর এবং বৈষম্যভেদ্য কোষঝিল্লী ভেদ করে কোষের ভিতরে প্রবেশ করে। তারপর এ পানি মূলরোম হতে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় কোষ হতে কোষান্তরে (চিত্রে প্রদর্শিত) প্রবেশের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত মূলের জাইলেম টিসুর ভেসেল কোষে প্রবেশ করে। ভেসেলে প্রবেশের পর পানি উদ্ভিদের পাতা পর্যন্ত পৌঁছায়।



চিত্র ৯.৩: মূলরোম দিয়ে মাটি থেকে পানি শোষণ এবং পানির জাইলেম টিসুর ভেসেল কোষে প্রবেশ।

খনিজ লবণ পরিশোধন : মূলের অগ্রভাগের কোষ বিভাজন অঞ্চলই খনিজ লবণ পরিশোধন অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। কিছু লবণ মূলরোম দিয়েও পরিশোধিত হয়। উদ্ভিদ কখনো কঠিন অবস্থায় লবণ পরিশোধন করতে পারে না। মাটির পানিতে লবণগুলো দ্রবীভূত হয়ে ক্যাটায়ন (+) এবং অ্যানায়ন (-) এ বিভক্ত হয় এবং মূল তা আয়ন হিসেবেই শোষণ করে। Na^+ একটি ক্যাটায়ন, Cl^- একটি অ্যানায়ন। K^+ , Ca^{++} এগুলো ক্যাটায়ন; NO_3^{--} , PO_4^{--} , SO_4^{--} গুলো অ্যানায়ন।

পানি ও খনিজ লবণ পরিশোধণে পার্থক্য : পানি পরিশোধিত হয় সরাসরি আর খনিজ লবণ পরিশোধিত হয় আয়ন হিসেবে। পানি পরিশোধিত হয় মূলরোম দিয়ে আর খনিজ লবণ পরিশোধিত হয় মূলের অগ্রভাগের বিভাজন অঞ্চল দিয়ে। পানি শোষিত হয় অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায়, খনিজ লবণের কিছুটা শোষিত হয় ব্যাপন প্রক্রিয়ায়।

রস উত্তোলন (ASCENT OF SAP)

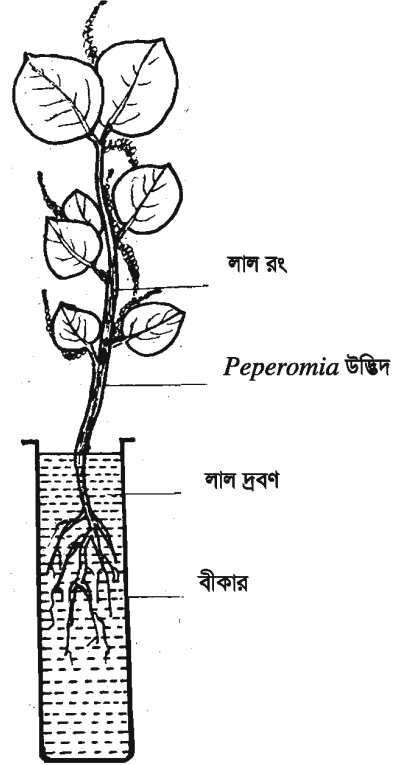
কোষমধ্যস্থ পানি ও পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণকে একত্রে বলা হয় কোষরস বা সাধারণভাবে রস (Sap)। মূলের অগ্রভাগ (ভাজক অঞ্চল এবং মূলরোম অঞ্চল) মাটি হতে পানি ও খনিজ লবণ শোষণ করে থাকে। যে প্রক্রিয়ায় এ রস মূলের শোষণ অঞ্চল হতে উদ্ভিদের পাতা ও অন্যান্য অংশে উঠে আসে তাকে বলা হয় রস উত্তোলন। জাইলেম টিস্যুর ভেসেল ও ট্রাকিড-এর মাধ্যমে এ রস উত্তোলিত হয়।

মাটির কণার ফাঁকে ফাঁকে মূলরোম বিস্তার লাভ করে। আবার মাটির কণার ফাঁকে ফাঁকে কৈশিক পানি থাকে। মূলরোমের অভ্যন্তরে যে কোষরস থাকে তার ঘনত্ব অপেক্ষা মাটির কণার ফাঁকে ফাঁকে যে পানি ও তাতে দ্রবীভূত লবণ থাকে তার ঘনত্ব অনেক কম থাকে। তাই অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। মূলরোমের অভ্যন্তরে পানি প্রবেশ করলে কোষরসের ঘনত্ব তার পার্শ্ববর্তী কোষের কোষরসের ঘনত্ব হতে কমে যায়।

ফলে পানি অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় মূলরোম হতে তার পরবর্তী কোষে প্রবেশ করে। এভাবে এক কোষ হতে অন্য কোষে প্রবেশ করতে করতে পানি শেষ পর্যন্ত মূলের কেন্দ্রের দিকে অবস্থিত এন্ডোডার্মিস পার হয়ে জাইলেম টিস্যুর ভেসেল কোষে প্রবেশ করে। ভেসেল কোষগুলো নলাকার, একটির মাথার আর একটি বসানো, তাই মূল হতে পাতা পর্যন্ত একটি একক নলে পরিণত হয়।

পানির অণু একটির সাথে আর একটি এমনভাবে লেগে থাকে, যাকে বলা হয় সংশক্তি (cohesion)। আবার পানির অণু ভেসেল নলের প্রাচীরের সাথেও সংলগ্ন থাকে, একে বলা হয় সংলগ্নতা (adhesion)। ভেসেলে পানির সংশক্তি ও সংলগ্নতার কারণে এবং পাতায় প্রস্বেদনের টানে মূল হতে পাতা পর্যন্ত পানির ধারা থাকে অবিচ্ছিন্ন। এভাবে পানি ও পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণ মূল হতে শাখা-প্রশাখা, পাতা, ফুল ইত্যাদি বিভিন্ন অঙ্গে পৌঁছে।

আমরা ক্লাসে বা পরীক্ষাগারে একটি সুন্দর পরীক্ষার মাধ্যমে রস উত্তোলনের নমুনা দেখতে পারি। এর জন্য লাগবে মূলসহ একটি তাজা *Peperomia* উদ্ভিদ। উদ্ভিদের কাণ্ড বেশ স্বচ্ছ। একটি বিকারের পানিতে সামান্য স্যাফ্রানিন বিকারে দিয়ে পানিকে লাল করে নাও। এবার গাছটিকে এমনভাবে রং মিশ্রিত পানিতে রাখ; যাতে এর মূলগুলো পানিতে থাকে। কয়েক ঘণ্টা পর লক্ষ করে দেখ লাল রং ধীরে ধীরে কাণ্ডের জাইলেমের মধ্য দিয়ে উপরে উঠে আসতে কাণ্ডের রং লাল হয়ে গেছে।



চিত্র ৯.৪: রস উত্তোলন পরীক্ষা

প্রস্বেদন (Transpiration)

প্রস্বেদন একটি শারীরতাত্ত্বিক (Physiological) প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের বায়বীয় অংশ হতে, বিশেষ করে পাতা থেকে বাষ্পাকারে পানি বের হয়ে যায়। কাজেই বলা যায়, “উদ্ভিদের পাতা ও অন্যান্য বায়বীয় অঙ্গ হতে জলীয় বাষ্প বের হয়ে যাবার প্রক্রিয়াকে বলা হয় প্রস্বেদন।” উদ্ভিদ তার মূল দিয়ে পানি শোষণ করে থাকে এবং এ পানিই কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা, পাতা ও অন্যান্য বায়বীয় অঙ্গে স্থানান্তরিত হয়। কাজেই প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় যে জলীয়বাষ্প বের হয়ে যায় তা আসে পানি থেকে।

প্রস্বেদনের প্রকার

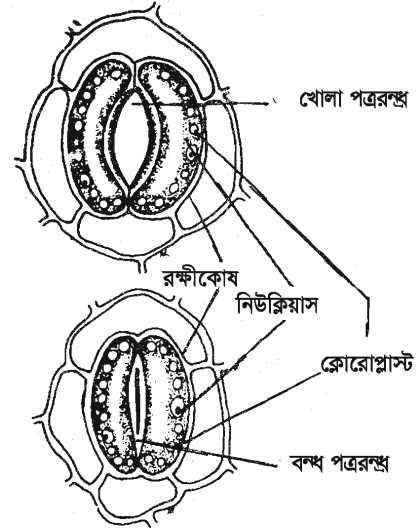
উদ্ভিদের অভ্যন্তরস্থ পানি বাষ্প হয়ে সাধারণত তিনটি পথে বায়ুমণ্ডলে বের হয়। এ তিনটি পথ অনুযায়ী প্রস্বেদনকে তিন প্রকারে বর্ণনা করা হয়।

১। পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন (stomatal transpiration) : পাতায়, কচিকাণ্ডে, ফুলের বৃতি ও পাপড়িতে দুটি রক্ষীকোষ বিশিষ্ট এক প্রকার রন্ধ্র থাকে। এই রন্ধ্রকে বলা হয় স্টোম্যাটা। স্টোম্যাটা উদ্ভিদের অন্যান্য অঙ্গের চেয়ে পাতায় অনেক বেশি পরিমাণে থাকে। তাই স্টোম্যাটার বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে পত্ররন্ধ্র। কোন উদ্ভিদের মোট প্রস্বেদনের প্রায় ৯০-৯৫ ভাগ হয়ে থাকে পত্ররন্ধ্র দিয়ে। পত্ররন্ধ্র দিয়ে যে প্রস্বেদন হয় তাকে বলা হয় পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন।

২। কিউটিকুলার প্রস্বেদন (cuticular transpiration) : কচি কাণ্ড ও পাতায় কিউটিন আস্তরণ থাকে। কিউটিন যুক্ত এ আস্তরণকে বলা হয় কিউটিকল। সাধারণত কিউটিকল ভেদ করে বাষ্প বের হয় না। কিউটিকল যদি পাতলা হয় এবং কোন কারণে পত্ররন্ধ্র যদি বন্ধ থাকে তখন সামান্য পরিমাণ প্রস্বেদন কিউটিকলের আস্তর ভেদ করে হয়ে থাকে। কিউটিকলের মাধ্যমে প্রস্বেদন হয় বলে একে বলা হয় কিউটিকুলার প্রস্বেদন।

৩। লেন্টিকুলার প্রস্বেদন (lenticular transpiration) : উদ্ভিদের পরিণত কাণ্ডে সেকেভারি বৃশ্চির ফলে স্থানে স্থানে ত্বক ফেটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রের সৃষ্টি হয়। এ ছিদ্রকে বলা হয় লেন্টিসেল। কিছুটা প্রস্বেদন লেন্টিসেলগুলোর মাধ্যমে হয়ে থাকে। লেন্টিসেলের মধ্য দিয়ে প্রস্বেদন হয় বলে একে বলা হয় লেন্টিকুলার প্রস্বেদন।

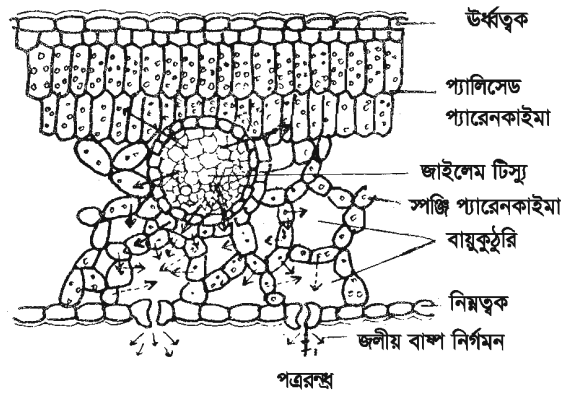
পত্ররন্ধ্র (stomata) : পাতা, কচি কাণ্ড, ফুলের বৃতি, পাপড়ি ইত্যাদি অঙ্গের বহিঃত্বকে পত্ররন্ধ্র থাকে। দুটি রক্ষীকোষ দিয়ে পরিবেষ্টিত সূক্ষ্ম রন্ধ্রকে বলা হয় পত্ররন্ধ্র। রক্ষীকোষের রন্ধ্র সংলগ্ন প্রাচীর পুরু কিন্তু বিপরীত দিকের প্রাচীর পাতলা। কোষে একটি বড় নিউক্লিয়াস এবং অনেক ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। রক্ষীকোষ দুটোর স্ফীতি ও শিথিল অবস্থা পত্ররন্ধ্রের খোলা ও বন্ধ হওয়া নিয়ন্ত্রণ করে। রক্ষীকোষ স্ফীত হলে পত্ররন্ধ্র খুলে যায়, আবার রক্ষীকোষ শিথিল হলে পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়। বিষমপৃষ্ঠ পাতার নিচের পিঠে অধিক পত্ররন্ধ্র থাকে।



চিত্র ৯.৫ : একটি খোলা ও একটি বন্ধ পত্ররন্ধ্রের ছবি

পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন প্রক্রিয়া : পত্ররন্ধ্র থাকে পাতায়, সাধারণত পাতার নিম্নত্বকে। বিষমপৃষ্ঠ পাতার উপরের ত্বকের দিকে থাকে প্যালিসেড প্যারেনকাইমা এবং নিচের ত্বকের দিকে থাকে স্পঞ্জি প্যারেনকাইমা। স্পঞ্জি প্যারেনকাইমাতে প্রচুর বায়ুকুহুরি থাকে। বায়ুকুহুরি বরাবর নিচের ত্বকে থাকে পত্ররন্ধ্র। সাধারণত প্যালিসেড প্যারেনকাইমা এবং স্পঞ্জি প্যারেনকাইমার সংযোগ স্থলে থাকে পরিবহণ টিস্যু অর্থাৎ জাইলেম ও ফ্লোয়েম। মূলরোম মাটি থেকে পানি শোষণ করে এবং জাইলেম টিস্যুর ভেসেল এবং ট্রাকিড দিয়ে মূল থেকে কাণ্ড হয়ে পাতায় পৌঁছায়। পাতায় পৌঁছার পর পানি

জাইলেম টিস্যু থেকে বের হয়ে পাতার সব কোষে ছড়িয়ে পড়ে। স্পঞ্জি প্যারেনকাইমা কোষসমূহের বহিঃপৃষ্ঠ সালোকসংশ্লেষণের প্রয়োজনীয় কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণের জন্য সবসময় ভিজা থাকে। বায়ু কুঠুরির বাতাস স্পঞ্জি প্যারেনকাইমার পানির সংস্পর্শে এসে পানিবাম্প গ্রহণ করে এবং পত্ররন্ধ্রের পশ্চাতের বায়ুকুঠুরিতে জমা হয়। বাষ্প পরে খোলা পত্ররন্ধ্র দিয়ে বায়ুমণ্ডলে বের হয়ে যায়। খোলা পত্ররন্ধ্র দিয়ে বাতাস, O_2 , CO_2 গ্যাসও চলাচল করে। অধিকাংশ উদ্ভিদে দিনের বেলায় পত্ররন্ধ্র খোলা এবং রাতে বন্ধ থাকে। রসালো পাতা বিশিষ্ট উদ্ভিদে (succulent Plant) পত্ররন্ধ্র রাতে খোলা এবং দিনের বেলায় বন্ধ থাকে। দিনের বেলায় সালোকসংশ্লেষণের ফলে রক্ষীকোষের শ্বেতসার দ্রবণীয় গ্লুকোজে পরিণত হয়, ফলে আশপাশের কোষ হতে পানি শোষণ করে রক্ষীকোষ স্ফীত হয় এবং পত্ররন্ধ্র খুলে যায়। রাতে দ্রবণীয় গ্লুকোজ অদ্রবণীয় শ্বেতসারে পরিণত হয়। ফলে রক্ষীকোষ হতে বহিঃঅভিস্রবণের মাধ্যমে পানি আশপাশের কোষে চলে যায় এবং রক্ষীকোষ পানি ছেড়ে শিথিল হয়ে পড়ে। এর ফলে পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়। এ কারণে প্রস্বেদন দিনের বেলায় হয়।



চিত্র ৯.৬ : বিষমপৃষ্ঠ পাতার প্রস্বেদনে জলীয় বাষ্পের নির্গমন পথ

প্রস্বেদনের প্রভাবক

প্রস্বেদন প্রক্রিয়ার প্রভাবকগুলো বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ এ দু ভাগে বিভক্ত

বাহ্যিক প্রভাবক

- ১। আলো : আলো থাকলে সালোকসংশ্লেষণ হয় এবং এর ফলে পত্ররন্ধ্র খুলে যায়। পত্ররন্ধ্র খুলে গেলে প্রস্বেদন হয়। কাজেই আলো প্রস্বেদন প্রক্রিয়ার প্রধান প্রভাবক।
- ২। তাপমাত্রা : তাপমাত্রা বাড়লে পানি দ্রুত বাষ্পে পরিণত হয় আবার বায়ুমণ্ডলে জলীয়বাষ্প ধারণ ক্ষমতাও বেড়ে যায়। তাই তাপমাত্রা প্রস্বেদনের হারকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।
- ৩। আপেক্ষিক আর্দ্রতা : আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম হলে বায়ুর জলীয়বাষ্প ধারণ ক্ষমতা বেশি হয়, তাই প্রস্বেদন হার বৃদ্ধি পায়। আবার আপেক্ষিক আর্দ্রতা বেশি হলে বায়ুর জলীয়বাষ্প ধারণ ক্ষমতা কমে যায়, তাই প্রস্বেদন হার কমে যায়।
- ৪। বায়ুপ্রবাহ : বায়ুপ্রবাহের ফলে গাছের কাছের জলীয়বাষ্প পূর্ণ বায়ু (প্রস্বেদনের ফলে) দূরে সরে যায়, তাই প্রস্বেদন হার বেড়ে যায়।
- ৫। বায়ুমণ্ডলের চাপ : কমচাপে কমতাপেই পানি বাষ্পে পরিণত হয়। তাই চাপ কম হলে প্রস্বেদন হার বাড়বে আবার চাপ বাড়লে প্রস্বেদন হার কমে।

৬। মাটিস্থ পানি : মাটিতে পানির প্রাপ্যতা হ্রাস পেলে প্রস্বেদন হার কিছুটা কম হয়।

অভ্যন্তরীণ প্রভাবক

- ১। মূল-পাতা অনুপাত : পাতার সংখ্যা ও পাতার মোট আয়তনের তুলনায় মূল অঞ্চল (শোষণ অঞ্চল) আনুপাতিক হারে বেশি কম হলে প্রস্বেদন হ্রাস পায়।
- ২। পাতার আয়তন : পাতার আয়তন যত বেশি হবে প্রস্বেদন তত বেশি হবে, আবার পাতার আয়তন যত কম হবে প্রস্বেদন তত কম হবে।
- ৩। পাতার অভ্যন্তরীণ গঠন : পাতার কিউটিকল পাতলা, কোষপ্রাচীর পাতলা, স্পঞ্জি প্যারেনকাইমা অধিক এবং পত্ররশ্মি উন্মুক্ত ও অধিক সংখ্যক হলে প্রস্বেদন অনেক বেশি হবে। অপরপক্ষে পুরু কিউটিকল, পুরু কোষপ্রাচীর, অধিক প্যালিসেড প্যারেনকাইমা, গর্তস্থিত পত্ররশ্মি থাকলে প্রস্বেদন কম হয়।

প্রস্বেদনের গুরুত্ব

প্রস্বেদন প্রক্রিয়া উদ্ভিদের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এর গুরুত্ব সম্বন্ধে নিচে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল :

- ১। পানি ও খাদ্যরস উপরে উঠানো : প্রস্বেদনের ফলে জাইলেম টিস্যুর ভেসেল নালিকার পানি স্তম্ভে যে টান পড়ে (একে প্রস্বেদন টান বলে) তার ফলেই মূল দিয়ে শোষিত পানি ও খাদ্যরস উপরে উঠে আসে।
- ২। পাতায় পানি ও খনিজ লবণ পৌঁছানো : পাতায় পানি ও খনিজ লবণ পৌঁছে প্রস্বেদনের টানে। কাজেই পাতায়, সালোকসংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় পানি, ক্লোরোফিল অণু গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় Mg পৌঁছানোর কাজটিও করে প্রস্বেদন প্রক্রিয়া। কাজেই বলা যায় সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরিতেও প্রস্বেদনের পরোক্ষ ভূমিকা আছে।
- ৩। পাতায় উপযুক্ত তাপ নিয়ন্ত্রণ ও শক্তি নির্গমন : পাতা সূর্য হতে প্রতি মিনিটে প্রচুর শক্তি শোষণ করে। এর মাত্র শতকরা একভাগ বিভিন্ন বিক্রিয়ায় খরচ হয়। বাকি তাপশক্তি প্রস্বেদনের মাধ্যমে বের হয়ে যায়। পাতার তাপমাত্রা স্বাভাবিক পর্যায়ে না থাকলে পাতার সব ধরনের জৈবনিক কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যেত। এটি প্রস্বেদন প্রক্রিয়ার একটি বিশেষ উপকারী দিক।
- ৪। কোষ বিভাজন ও দৈহিক বৃদ্ধি : প্রস্বেদন প্রক্রিয়া পরোক্ষভাবে অভিস্রবণ প্রক্রিয়া চালু রাখে এবং সব কোষকে স্ফীত অবস্থায় রাখে। এর ফলে কোষবিভাজন ও অঙ্গের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়।
- ৫। পাতায় ছত্রাক আক্রমণ রোধ : প্রস্বেদনের ফলে পাতার পৃষ্ঠে কিছু পানিগ্রাহী লবণ জমা হয়। এর ফলে পাতা বিভিন্ন ছত্রাক আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়।
- ৬। সালোকসংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় CO₂ শোষণ : সালোকসংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় CO₂ পাতার স্পঞ্জি মেসোফিল কোষ ব্যাপনের মাধ্যমে বায়ুকুঠুরির বায়ু থেকে গ্রহণ করে। এজন্য স্পঞ্জি মেসোফিল কোষের বহিঃপৃষ্ঠ সবসময় ভেজা থাকতে হয়। এখান থেকে পানি গ্রহণ করে বায়ুকুঠুরির বায়ু পত্ররশ্মির মধ্য দিয়ে বের হয়ে প্রস্বেদন ঘটায়।

অতিমাত্রায় প্রস্বেদনের ফলে গাছে পানির অভাব দেখা দিতে পারে, তাই অতিরিক্ত প্রস্বেদন গাছের জন্য ক্ষতিকর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। উদ্ভিদের রস উত্তোলনের সাথে জড়িত কোনটি?

- | | |
|------------------|-------------|
| ক. জাইলেম ভেসেল | খ. সীত টিউব |
| গ. জাইলেম ফাইবার | ঘ. সঞ্জীকোষ |

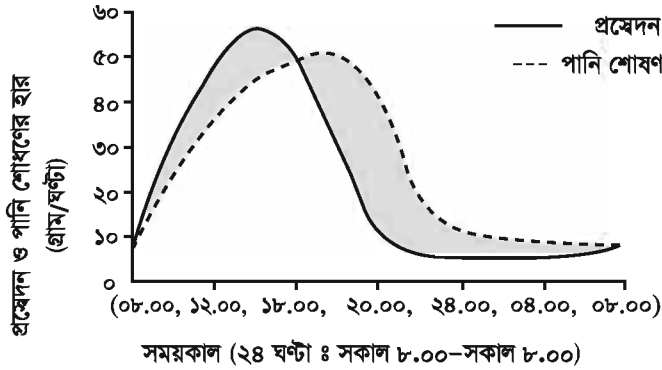
২। অভিস্রবণের জন্য প্রয়োজন

- দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ
- একটি বৈষম্যভেদ্য ঝিল্লি
- একটি অভেদ্য ঝিল্লি

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|-------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. ii ও iii |

নিচের লেখচিত্র অবলম্বনে ৩ এবং ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



লেখচিত্র

লেখচিত্রটি ২৪ ঘণ্টা সময়কালের মধ্যে একটি উদ্ভিদের প্রস্বেদনের হার এবং পানি শোষণ নির্দেশ করছে।

৩। উদ্ভিদের পানি শোষণের হারের চেয়ে প্রস্বেদনের হার কখন বেশি ছিল?

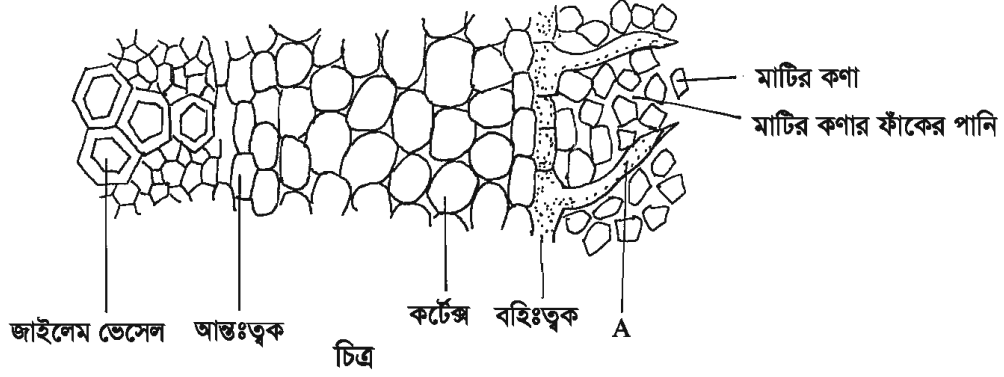
- | | |
|---------------|---------------|
| ক. ০৮.০০ টায় | খ. ১২.০০ টায় |
| গ. ১৬.০০ টায় | ঘ. ২০.০০ টায় |

৪। সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টার মধ্যে প্রস্বেদন হারের পরিবর্তন হয়েছিল খুব সম্ভবত—

- | | |
|---|---|
| ক. উদ্ভিদের পানি শোষণ হার বৃদ্ধির কারণে | খ. উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ হার বৃদ্ধির কারণে |
| গ. বায়ুপ্রবাহ বৃদ্ধির কারণে | ঘ. বায়ুর তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।



- ক. চিত্রে A অংশটির নাম কী?
- খ. অঙ্কিত চিত্র দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?
- গ. শোষিত পানির জাইলেম ভেসেল পর্যন্ত পৌঁছানোর প্রবাহ চিত্র আঁক এবং কারণ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. চিত্র A ক্ষতিগ্রস্ত হলে উদ্ভিদের কী ধরনের সমস্যা হবে বিশ্লেষণ কর।

সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসন

ফটোসিনথেসিস বা সালোকসংশ্লেষণ একটি জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের সবুজ অঙ্গ (বিশেষ করে পাতা) সূর্যালোক হতে শক্তি সংগ্রহ করে এবং ঐ শক্তি কাজে লাগিয়ে পানি ও CO_2 -এর রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে। এ প্রক্রিয়ায় আলোক শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত হয়। সালোকসংশ্লেষণে উদ্ভিদ গ্যাস গ্রহণ করে এবং উপজাত হিসেবে O_2 গ্যাস বের হয়ে আসে। এ প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো হল- (১) আলো, (২) ক্লোরোফিল, (৩) পানি এবং (৪) কার্বন ডাইঅক্সাইড।

উদ্ভিদ কোষের ক্লোরোপ্লাস্টের ভিতরে থাকে ক্লোরোফিল পিগমেন্ট। উদ্ভিদের মূল দিয়ে পানি শোষিত হয় এবং পাতার মেসোফিল টিস্যুর ক্লোরোপ্লাস্টে পৌঁছায়। বায়ুমণ্ডলের CO_2 ব্যাপন প্রক্রিয়ায় মেসোফিল টিস্যুর ক্লোরোপ্লাস্টে পৌঁছায়। নিচের রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়াটি দেখানো যায়।

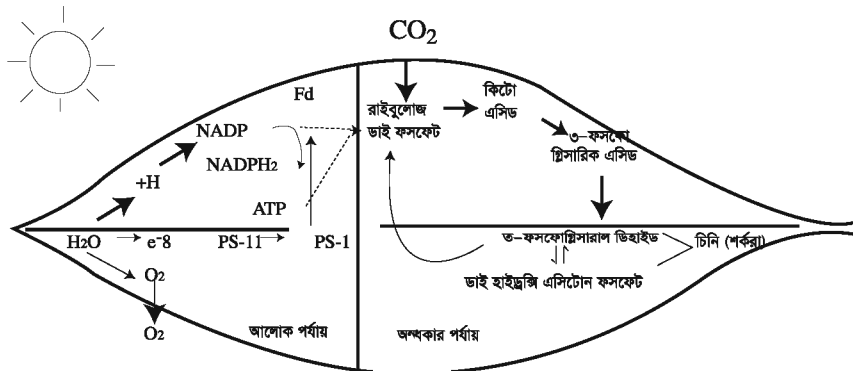


“ সালোকসংশ্লেষণ এমন একটি জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে উদ্ভিদকোষস্থ ক্লোরোপ্লাস্ট সূর্যরশ্মির ফোটন থেকে শোষণকৃত শক্তি কাজে লাগিয়ে বায়ুমণ্ডলস্থিত CO_2 এবং কোষস্থ পানি ও অন্যান্য জৈব রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটিয়ে শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে। ”

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া : সালোকসংশ্লেষণ একটি জটিল এবং দীর্ঘ প্রক্রিয়া। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ব্লাকম্যান এ প্রক্রিয়াকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করেন। পর্যায় দুটি হল-

১। আলোক পর্যায় এবং ২। অন্ধকার পর্যায়। উভয় পর্যায় সম্বন্ধে এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল :

১। আলোক পর্যায় : এ পর্যায়ের জন্য আলো অপরিহার্য। এ পর্যায়ে সূর্যশক্তির সাহায্য নিয়ে পানি ভেঙে অক্সিজেন (O_2), ইলেকট্রন (e^-) এবং হাইড্রোজেন (প্রোটন H^+) এ পরিণত হয়। পানির এরূপ ভাঙনকে বলা হয় ফটোলাইসিস বা পানির সালোক বিভাজন। বিপুল পরিমাণ আলোক শক্তি রাসায়নিক শক্তি হিসেবে ATP (এডিনোসিন ট্রাই ফসফেট) ও NADPH_2 (নিকোটিনামাইড অ্যাডেনিন ডাই নিউক্লিওটাইড হাইড্রোজেন ফসফেট) নামক রাসায়নিক পদার্থে সঞ্চারিত হয়। ATP এবং NADPH_2 কে বলা হয় **আত্তীকরণ শক্তি** (Assimilatory power)। আলোক শক্তি ব্যবহার করে ATP তৈরির এই প্রক্রিয়াকে **ফটোফসফোরাইলেশন** (Photophosphorylation) বলে। ফটোফস ফো রাইলেশন **চক্রীয়** (cyclic) এবং **অচক্রীয়** (noncyclic) এ দুভাবে হতে পারে। দু রকম পিগমেন্ট সিস্টেম (পিগমেন্ট সিস্টেম - ১ এবং পিগমেন্ট সিস্টেম- ২) সালোকসংশ্লেষণ এর আলোক পর্যায় নিয়ন্ত্রণ করে।



চিত্র ৯.৭ : সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত রূপ

২। **অন্ধকার পর্যায় :** এ পর্যায়ে কোন আলোর প্রয়োজন পড়ে না। আলোক পর্যায়ে সৃষ্ট ATP ও NADPH₂ শর্করা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। শর্করা তৈরির প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ –

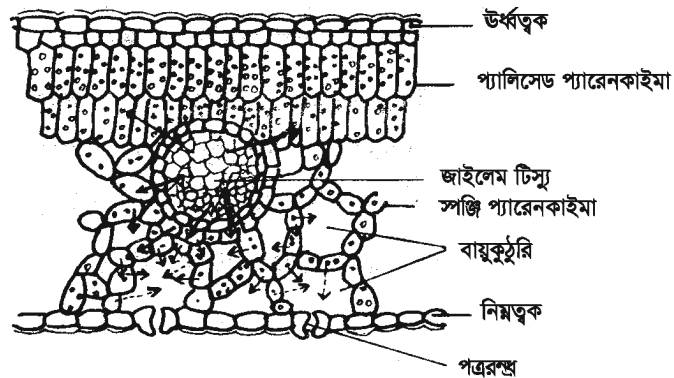
বায়ুমণ্ডলের CO₂ গ্যাস পত্ররন্ধ্রের মধ্যদিয়ে পাতার অভ্যন্তরে তথা কোষে প্রবেশ করে। কোষে অবস্থিত ৫ কার্বন বিশিষ্ট রাইবুলোজ ১,৫ ডাই ফসফেটের সাথে CO₂ গ্যাস যুক্ত হয়ে তৈরি করে ৬-কার্বন বিশিষ্ট অস্থায়ী ক্রিটো এসিড যা ভেঙে গিয়ে তৈরি হয় ৩-কার্বন বিশিষ্ট দুই অণু ফসফোগ্লিসারিক এসিড (প্রথম স্থায়ী পদার্থ)। আলোক পর্যায়ে তৈরি ATP ও NADPH₂ ব্যবহার করে ফসফোগ্লিসারিক এসিড, ৩-ফসফোগ্লিসারালডিহাইড ও ডাইহাইড্রক্সি এসিটোন ফসফেট-এ পরিণত হয়। ক্রমাগত সংঘটিত বিভিন্ন বিক্রিয়ার মাধ্যমে ৩-ফসফোগ্লিসারালডিহাইড ও ডাইহাইড্রক্সি এসিটোন ফসফেট হতে একদিকে শর্করা (সুক্রোজ চিনি) এবং অপরদিকে রাইবুলোজ ১,৫ ডাইফসফেট তৈরি হতে থাকে।

বায়ুমণ্ডলের CO₂ গ্যাস ব্যবহার করে শর্করা তৈরির এ চক্রটি আবিষ্কার করেন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্যালভিন ও ব্যাশাম। তাই এ চক্রটির নাম ক্যালভিন ও ব্যাশাম চক্র। অধিকাংশ উদ্ভিদেই এ প্রক্রিয়ায় শর্করা তৈরি হয়। এ প্রক্রিয়ায় প্রথম তৈরি স্থায়ী পদার্থ ৩-কার্বন বিশিষ্ট বলে এ ধরনের উদ্ভিদকে বলা হয় C₃ উদ্ভিদ।

এছাড়া শর্করা তৈরির আর একটি প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হয়েছে। এটিকে বলা হয় হ্যাচ ও স্ল্যাক-এর গতিপথ। এ প্রক্রিয়ায় প্রথম স্থায়ী পদার্থ হল ৪-কার্বন বিশিষ্ট অক্সালো অ্যাসিটিক এসিড। তাই এ ধরনের উদ্ভিদকে বলা হয় C₄ উদ্ভিদ। আখ, ভুট্টা, মুখা ঘাস এগুলো হল C₄ উদ্ভিদের উদাহরণ। উপরের ক্লাসে এ সম্বন্ধে তোমরা বিস্তারিত জানতে পারবে।

সালোকসংশ্লেষণ অঙ্গ : সালোকসংশ্লেষণ হয় উদ্ভিদের সবুজ অংশে, বিশেষ করে পাতায়। পাতায় বিভিন্ন ধরনের টিস্যু থাকে, যেমন উর্ধ্বত্বক, নিম্নত্বক, ভাস্কুলার টিস্যু এবং মেসোফিল টিস্যু। মেসোফিল টিস্যু আবার দু'ভাগে বিভক্ত। উর্ধ্বত্বকের দিকে অবস্থিত ঘনভাবে সন্নিবেশিত লম্বাকার কোষের প্যালিসেড প্যারেনকাইমা টিস্যু এবং নিম্নত্বকের দিকে ফাঁক ফাঁক ভাবে অবস্থিত স্পঞ্জি প্যারেনকাইমা টিস্যু।

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া সাধারণত পাতার প্যালিসেড প্যারেনকাইমা কোষে হয়ে থাকে। প্যালিসেড প্যারেনকাইমা কোষগুলোতে থাকে অসংখ্য ক্রোরোপ্লাস্ট। এ ক্রোরোপ্লাস্টের অভ্যন্তরে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। চিত্রে বিষমপৃষ্ঠ পাতার একটি প্রস্থচ্ছেদে প্যালিসেড প্যারেনকাইমা কোষের অবস্থান দেখানো হল।



চিত্র ৯.৮ : বিষমপৃষ্ঠ পাতার প্রস্থচ্ছেদে প্যালিসেড প্যারেনকাইমা টিস্যু

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার প্রভাবক

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার প্রভাবকগুলো বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ এ দু'ভাগে বিভক্ত।

বাহ্যিক প্রভাবক

১। **সূর্যালোক :** সালোকসংশ্লেষণ- এর জন্য সূর্যালোক অপরিহার্য। সূর্যালোকের শক্তি ব্যবহার করেই উচ্চশক্তি সম্পন্ন

ATP ও NADPH₂ তৈরি হয়, যা অন্ধকার পর্যায়ে কার্বন বিজারণে সাহায্য করে। অতি তীব্র আলো সালোকসংশ্লেষণের হার কমিয়ে দেয়।

২। কার্বন ডাইঅক্সাইড : কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়া শর্করা প্রস্তুত সম্ভব নয়। তাই CO₂ এর পরিমাণ বায়ুতে কমে গেলে (বায়ুতে শতকরা ০.০৩ ভাগ CO₂ থাকে) সালোকসংশ্লেষণ হার কমে যায়। আবার বায়ুতে CO₂ এর পরিমাণ শতকরা এক ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা গেলে সালোকসংশ্লেষণ হার বেড়ে যাবে।

৩। পানি : পানি একদিকে পত্ররশ্মির রক্ষীকোষকে স্ফীত করে এবং পত্ররশ্মি খুলে যায়, ফলে CO₂ গ্যাস পাতার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। অপরদিকে পানি এ প্রক্রিয়ার আলোক পর্যায়ে একটি প্রয়োজনীয় কাঁচামাল হিসেবে অংশগ্রহণ করে। কাজেই পানির পরিমাণ কমে গেলে সালোকসংশ্লেষণের হার কমে যায়।

৪। তাপ : ০° সে. তাপমাত্রার কাছাকাছি এবং ৪৫° সে. তাপমাত্রার উপর সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া বৃদ্ধি হয়ে যায়। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার জন্য সুবিধাজনক তাপমাত্রা হল ২২° সে.-৩৫° সে.। তাপমাত্রা ২২° সে. এর কম বা ৩৫° সে. এর বেশি হলে সালোকসংশ্লেষণের হার কমে যায়।

৫। অক্সিজেন : বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের ঘনত্ব বেড়ে গেলে সালোকসংশ্লেষণের হার কমে যায়।

অভ্যন্তরীণ প্রভাবক

১। ক্লোরোফিল : ক্লোরোফিল সালোকসংশ্লেষণের একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। পাতায় ক্লোরোফিলের সংখ্যা ও ক্লোরোফিল-এর পরিমাণের ওপর সালোকসংশ্লেষণ সরাসরি নির্ভরশীল।

২। পাতার বয়স ও সংখ্যা : একেবারে কচি পাতা এবং বৃদ্ধ পাতায় সালোকসংশ্লেষণ কম হয়। মাঝারি বয়সের পাতায় সালোকসংশ্লেষণ বেশি হয়। পাতার সংখ্যা বেশি হলে সালোকসংশ্লেষণ বেশি হয়।

৩। পাতায় শর্করার পরিমাণ : পাতার অভ্যন্তরে শর্করার পরিমাণ বেড়ে গেলে সালোকসংশ্লেষণের হার কমে যায়।

৪। পটাশিয়াম : পটাশিয়ামের অভাব দেখা দিলে সালোকসংশ্লেষণ হার কমে যায়।

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার গুরুত্ব :

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। এ সম্বন্ধে সর্বাঙ্গীণ আলোচনা করা হল :

১। উদ্ভিদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত : বাঁচতে হলে খাদ্যের প্রয়োজন। সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রস্তুত করে থাকে। সবুজ উদ্ভিদ যদি খাদ্য প্রস্তুত করতে না পারত তবে পৃথিবীতে কোন উদ্ভিদই বাঁচতে পারত না।

২। প্রাণিকুলের জন্য খাদ্য সরবরাহ : একমাত্র সবুজ উদ্ভিদই সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে। কোন প্রাণীই, এমনকি মানুষও তার নিজের খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না। আমরা খাদ্য হিসেবে ভাত, রুটি, ফলমূল, মাছ, মাংস, দুধ ইত্যাদি যা-ই গ্রহণ করি না কেন তার সবই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সবুজ উদ্ভিদ থেকে পেয়ে থাকি। কাজেই খাদ্যের জন্য সমগ্র প্রাণিকুল সবুজ উদ্ভিদের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল, আর সবুজ উদ্ভিদ এ খাদ্য প্রস্তুত করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায়। কাজেই বলা যায়, পৃথিবীর সকল উদ্ভিদ ও প্রাণীর খাদ্য প্রস্তুত হয় সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে।

৩। শক্তির উৎস : আমাদের কাজকর্ম, চলাফেরা প্রভৃতি কাজে প্রচুর শক্তি ব্যয় হয়। এ শক্তির উৎস হল খাদ্য। খাদ্য প্রস্তুত করে সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায়। খাদ্যে শক্তি আসে সূর্য থেকে। সূর্যের আলোর শক্তি সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত খাদ্য রাসায়নিক শক্তি হিসেবে আটকা পড়ে। শ্বসন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি সজীব কোষে খাদ্য ভেঙে শক্তি উৎপন্ন হয়। আমাদের সকল শক্তির উৎস হল খাদ্য এবং খাদ্যের শক্তির উৎস হল সূর্য। কাজেই সূর্যই সকল শক্তির উৎস। উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে বিপাকীয় ক্রিয়ায় যে শক্তির প্রয়োজন হয় তাও আসে খাদ্য থেকেই।

৪। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় : পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায়, বিশেষ করে O₂ ও CO₂ এর অনুপাত রক্ষায় সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। বায়ুতে অক্সিজেন গ্যাসের পরিমাণ ২০.৯৪৬ ভাগ এবং

কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ ০.০৩৩ ভাগ। বায়ুতে O_2 ও CO_2 গ্যাসের এটা হল স্বাভাবিক পরিমাণ। পৃথিবীতে উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও জীবনযাপনের জন্য বায়ুতে এ দুটি গ্যাসের পরিমাণ স্বাভাবিক পর্যায়ে থাকতে হবে। এ পরিমাণের তারতম্য ঘটলে বায়ুমণ্ডল জীবজগতের জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠবে।

আমরা জানি সব জীবই (উদ্ভিদ ও প্রাণী) শ্বসন ক্রিয়া চলে থাকে। শ্বসন ক্রিয়ায় O_2 গ্যাস গ্রহণ করা হয় এবং CO_2 গ্যাস ত্যাগ করা হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণী শ্বসন ক্রিয়ায় ক্রমাগত O_2 গ্যাস গ্রহণ ও CO_2 গ্যাস ত্যাগ করলে বায়ুমণ্ডলে O_2 গ্যাসের স্বল্পতা ও CO_2 গ্যাসের আধিক্য সৃষ্টি হবার কথা। কিন্তু সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় CO_2 গ্যাস গ্রহণ করে এবং O_2 গ্যাস বায়ুমণ্ডলে ত্যাগ করে বলে এখনও বায়ুমণ্ডলে O_2 ও CO_2 গ্যাসের সঠিক অনুপাত রক্ষিত হচ্ছে। অধিক হারে বন-জঙ্গল ধ্বংস করার ফলে বায়ুমণ্ডলে এ দুটি গ্যাসের অনুপাত নষ্ট হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, কাজেই আমাদেরকে অবশ্যই অধিক হারে গাছপালা লাগাতে হবে।

৫। মানব সভ্যতায় সালোকসংশ্লেষণের অবদান : সবুজ উদ্ভিদে সালোকসংশ্লেষণ হয় বলেই মানুষ বেঁচে আছে। কিন্তু এই বেঁচে থাকার বাইরেও মানব সভ্যতায় সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার অবদান অসীম। কয়লা, পেট্রোল, রেয়ন, সেলোফেন, কাগজ, রাবার, ওষুধ পণ্য সবই সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ফল।

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার কয়েকটি প্রয়োজনীয় পরীক্ষণ

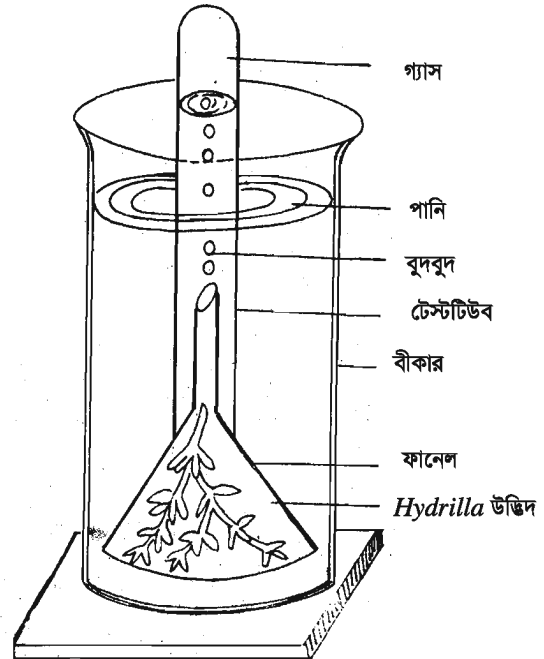
১। সালোকসংশ্লেষণের ফলে অক্সিজেন নির্গত হয় পরীক্ষার মাধ্যমে তার প্রমাণ :

পরীক্ষার উপকরণ : একটি কাচের বীকার, *Hydrilla* উদ্ভিদ, একটি ফানেল, একটি টেস্টটিউব, পানি, শিখাহীন জ্বলন্ত কাঠি।

কার্যপদ্ধতি : *Hydrilla* নামক জলজ উদ্ভিদকে বীকারে রেখে একটি ফানেল দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। *Hydrilla* উদ্ভিদকে এমনভাবে স্থাপন করতে হবে, যেন এর কাটা কাণ্ড ফানেলের নলের দিকে থাকে। এবার বীকারে এমন পরিমাণ পানি ঢালতে হবে যাতে করে ফানেলে নলটি পানিতে ডুবে থাকে। এবার একটি টেস্টটিউব সম্পূর্ণ পানি ভর্তি করে ফানেলের নলের উপর উপড় করে রাখতে হবে। এ অবস্থায় পরীক্ষণ সেটটিকে সূর্যালোকে (অথবা পরীক্ষাগারে বৈদ্যুতিক বাস্তু জ্বালিয়ে) রাখতে হবে।

পর্যবেক্ষণ : কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে *Hydrilla* উদ্ভিদ হতে বুদবুদ আকারে গ্যাস বের হচ্ছে এবং টেস্টটিউবে জমা হচ্ছে। কিছু গ্যাস জমা হলে টেস্টটিউবটি সাবধানে উঠিয়ে আনতে হবে এবং একটি শিখাহীন জ্বলন্ত কাঠি টিউবটি সোজা করে তার মাথায় ধরতে হবে। দেখা যাবে কাঠিটি দপ করে জ্বলে উঠেছে।

সিদ্ধান্ত : যেহেতু গ্যাসটি শিখাহীন কাঠিটিকে জ্বলতে সাহায্য করেছে সেহেতু গ্যাসটি অক্সিজেন, কারণ অক্সিজেন নিজে জ্বলে না, অন্যকে জ্বলতে সাহায্য করে।



চিত্র ৯.১০ : সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় O_2 নির্গত হয় তার পরীক্ষা

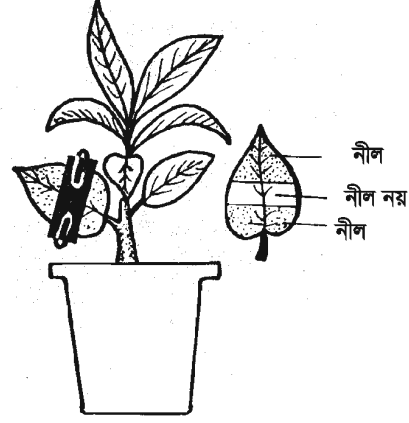
২। ক্লোরোফিল ছাড়া সালোকসংশ্লেষণ হয় না, তার প্রমাণ

পরীক্ষার উপকরণ : পাতাবাহার উদ্ভিদের নানা বর্ণের পাতা, এলকোহল, আয়োডিন দ্রবণ, বীকার।

কার্যপদ্ধতি : দুপুরের দিকে পাতাবাহার উদ্ভিদের একটি বাহারি পাতা এনে এর সবুজ অংশটুকু চিহ্নিত করতে হবে, পরে এলকোহলে সিদ্ধ করে আয়োডিন দ্রবণে ডুবাতে হবে।

পর্যবেক্ষণ : আয়োডিন দ্রবণে ডুবানোর পর দেখা যাবে পাতার কেবল সবুজ অংশই নীল (গাঢ় বেগুনি বা কালো) হয়েছে।

সিদ্ধান্ত : ক্লোরোফিল থাকায় কেবল সবুজ অংশই সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে শর্করা প্রস্তুত করেছে। ক্লোরোফিল না থাকায় কমলা, হলুদ অংশে শর্করা প্রস্তুত হয়নি। সবুজ অংশে শর্করা ছিল বলেই আয়োডিন দ্রবণে ঐ অংশ নীল (গাঢ় বেগুনি বা কালো) হয়েছে।



চিত্র ৯.১১ : সালোকসংশ্লেষণ-এর জন্য আলো প্রয়োজন তার পরীক্ষা

৩। সালোকসংশ্লেষণের জন্য আলো প্রয়োজন-পরীক্ষার মাধ্যমে তার প্রমাণ

পরীক্ষার উপকরণ : টবে লাগানো সবুজ পাতা বিশিষ্ট একটি গাছ, কালো কাগজ, এলকোহল, আয়োডিন দ্রবণ, ক্লিপ। (পরীক্ষার আগে গাছটিকে অনেকক্ষণ অন্ধকারে রাখতে হবে।)

কার্যপদ্ধতি : একটি পাতার একাংশের উভয় দিক কালো কাগজ দিয়ে আবৃত করে ক্লিপ দিয়ে আটকিয়ে দেই যেন ঐ অংশে সূর্যালোক প্রবেশ করতে না পারে। এরপর গাছসহ টবটিকে সূর্যালোকে রেখে দেই। এক ঘণ্টা পর পাতাটিকে ছিড়ে এনে এলকোহলে সিদ্ধ করি যাতে করে ক্লোরোফিল মুক্ত হয়। এবার সিদ্ধ পাতাটিকে আয়োডিন দ্রবণে ডুবাই।

পর্যবেক্ষণ : আয়োডিন দ্রবণ থেকে উঠিয়ে আনলে দেখা যাবে কালো কাগজ দিয়ে আবৃত অংশ ছাড়া বাকি সবটুকু অংশই নীল (গাঢ় বেগুনি বা কালো) বর্ণের হয়েছে।

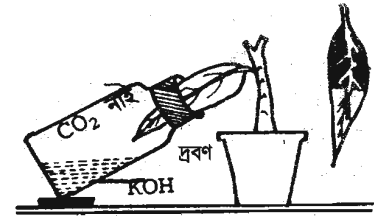
সিদ্ধান্ত : শ্বেতসার ও আয়োডিন দ্রবণ বিক্রিয়া করে শ্বেতসার নীল (গাঢ় বেগুনি বা কালো) বর্ণের হয়। কালো কাগজ দিয়ে আবৃত অংশে সূর্যালোক পৌঁছাতে পারেনি, তাই ঐ অংশে সালোকসংশ্লেষণ হয়নি, অর্থাৎ শ্বেতসার প্রস্তুত হয়নি। শ্বেতসার প্রস্তুত হয়নি বলে ঐ অংশ আয়োডিন দ্রবণে বিক্রিয়া করে নীল (গাঢ় বেগুনি বা কালো) হয়নি। এতে প্রমাণিত হয় সালোকসংশ্লেষণ তথা শ্বেতসার প্রস্তুতের জন্য সূর্যালোক অপরিহার্য।

৪। CO₂ গ্যাস ছাড়া সালোকসংশ্লেষণ হতে পারে না তার প্রমাণ

পরীক্ষার উপকরণ : টবে লাগানো একটি গাছ, বড় মুখওয়ালা কাচের বোতল, দু ভাগ করা একটি ছিপি, কস্টিক পটাশ দ্রবণ, এলকোহল, আয়োডিন দ্রবণ, ভেসেলিন।

কার্যপদ্ধতি : টবের গাছটি ৪৮ ঘণ্টা অন্ধকারে থাকতে হবে যাতে করে পাতায় কোন শ্বেতসার (স্টার্চ) না থাকে। বড় মুখওয়ালা বোতলের

$\frac{1}{8}$ ভাগ কস্টিক পটাশ দ্রবণ দিয়ে ভরতে হবে। এবার টবটিকে অন্ধকার থেকে বের করে এনে এর একটি পাতার অর্ধেকটা দ্বিখন্ডিত ছিপির মধ্য দিয়ে বোতলে প্রবেশ করাতে হবে এবং ছিপিকে ভালভাবে আটকিয়ে দিতে হবে। লক্ষণ রাখতে হবে পাতার কিছুটা যেন বোতলের ভেতরে এবং কিছুটা যেন বোতলের বাইরে থাকে। ভেসেলিন দিয়ে বোতলটিকে বায়ুরোধক করতে হবে যেন বাইর থেকে বায়ু প্রবেশ করতে না পারে। বোতলের ভিতরে বায়ুতে যে CO₂ ছিল কস্টিক পটাশ দ্রবণ (KOH) তা শোষণ করে নিবে। এবার পরীক্ষণটিকে সূর্যালোকে রেখে দিতে হবে। $\frac{3}{4}$ ঘণ্টা পর ঐ পাতাটিকে এনে এলকোহলে সিদ্ধ করে আয়োডিন দ্রবণে ডুবাতে হবে।



চিত্র ৯.১২ : CO₂ গ্যাস ছাড়া সালোকসংশ্লেষণ হয় না তার পরীক্ষা

পর্যবেক্ষণ : আয়োডিন দ্রবণ থেকে উঠিয়ে আনলে দেখা যাবে পাতার যে অংশ ছিপির বাইরে ছিল সেই অংশ নীল (গাঢ় নীল বা কালো) বর্ণ ধারণ করেছে, বাকি অংশ হলদে বা পিঁজাল বর্ণ ধারণ করেছে।

সিদ্ধান্ত : ছিপির বাইরের অংশ CO_2 গ্রহণ করতে পেরেছে তাই সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শর্করা প্রস্তুত করেছে। আয়োডিন দ্রবণে শর্করা নীল বর্ণ ধারণ করে। বোতলের ভিতরের অংশ শর্করা প্রস্তুত হয়নি। কারণ বোতলের ভিতরে CO_2 ছিল না (কস্টিক পটাশ দ্রবণ তা শোষণ করে নিয়েছিল)। এতে প্রমাণিত হয় সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার জন্য CO_2 আবশ্যিক। ছিপির ভিতরের অংশ আলো ও CO_2 কোনটিই পায়নি, তাই এই অংশেও সালোকসংশ্লেষণ হয়নি।

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় O_2 নির্গমন : সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় আলোক পর্যায়ে অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন অংশে পানি ভেঙে O_2 নির্গত হয়। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় যদি বায়ুমণ্ডলে O_2 নির্গত না হত, তাহলে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের দারুণ অভাব দেখা দিত। এর পরিণামে সমস্ত জীবকুল বিলীন হয়ে যেতো, কারণ অক্সিজেনের অভাবে আমাদের শ্বসন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।

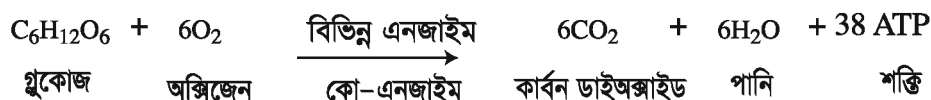
সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শর্করা উৎপাদন : সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শর্করা (কার্বোহাইড্রেট) উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদ তার নিজের প্রয়োজন মেটানোর পর অতিরিক্ত শর্করা বিভিন্ন অঙ্গে জমা করে, যেমন- ধান, গম, ভুট্টা, যব, বার্লি, আলু, মিষ্টিআলু, ইক্ষু ইত্যাদি। এগুলোই আমরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকি। সবুজ উদ্ভিদ যদি সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শর্করা প্রস্তুত না করত তাহলে খাদ্যের অভাবে মানুষসহ সমগ্র প্রাণিকুল ধ্বংস হয়ে যেত।

সূর্যের আলো না থাকলে কী হত? : পৃথিবীতে যদি সূর্যের আলো না থাকত, তাহলে সালোকসংশ্লেষণ হত না। সালোকসংশ্লেষণ না হলে কোন প্রকার খাদ্য প্রস্তুত হত না। খাদ্য না হলে পৃথিবীতে কোন শক্তির আগমন ঘটত না। পৃথিবী হয়ে পড়ত নিচল। সূর্যালোক না হলে কোন জীবেরই অস্তিত্ব থাকত না।

শ্বসন (Respiration)

জীব হলেই (উদ্ভিদ বা প্রাণী) তার জৈবিক কাজ থাকবে। দেহের অভ্যন্তরে বা দেহের বাইরে, যে কোন ধরনের কাজের জন্য চাই শক্তি। এ শক্তির প্রধান উৎস হল সূর্য। সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সৌরশক্তিকে ধরে রাখে শর্করা জাতীয় (এবং অন্যান্য) খাদ্যরূপে। ঐ খাদ্যদ্রব্য জীবকোষের অভ্যন্তরে ক্রমান্বয়ে জারিত (Oxidised) হয়ে শক্তি নির্গত করতে থাকে এবং এ শক্তি দিয়েই জীবের সব ধরনের কাজকর্ম ও ক্রিয়া-বিক্রিয়া পরিচালিত হয়। জৈব পদার্থগুলোকে (Organic compounds) জারিত করতে অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় এবং এ জারণের ফলে দেহাভ্যন্তরে CO_2 গ্যাস সৃষ্টি হয়। কাজেই দেখা যায় বায়ুমণ্ডল হতে গৃহীত অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে জৈব পদার্থগুলো জারিত হয় এবং এ জারণের ফলে শক্তি ও CO_2 গ্যাস নির্গত হয়। জীবদেহ শক্তি ব্যবহার করে কিন্তু CO_2 গ্যাস বায়ুমণ্ডলে ত্যাগ করে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রতিটি সজীব কোষেই এ প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। অক্সিজেন সহযোগে খাদ্যদ্রব্য জারিত হয়ে শক্তি ও CO_2 উৎপন্ন করার এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় শ্বসন বা রেস্পিরেশন (Respiration)।

শ্বসন প্রক্রিয়ায় শর্করা, আমিষ, চর্বি, জৈব এসিড ইত্যাদি জারিত হয়ে শক্তি উৎপন্ন হয়। এসব বস্তুকে শ্বসনিক বস্তু বলা হয়। সজীব কোষের সাইটোপ্লাজম ও মাইটোকন্ড্রিয়াতে শ্বসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। শ্বসন ক্রিয়ার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই, দিবারাত্রি ২৪ ঘণ্টাই এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। যদিও উদ্ভিদ দেহে সকল সজীব কোষেই শ্বসন ক্রিয়া চলে, তবুও বর্ধিষ্ণু অঞ্চলে (ফুল ও পাতার কুঁড়ি, অঙ্কুরিত বীজ, মূল ও কাণ্ডের অগ্রভাগ) শ্বসন ক্রিয়ার হার অনেক বেশি। নিম্নলিখিত রাসায়নিক সংকেতের সাহায্যে শ্বসন ক্রিয়া বুঝানো হয়।



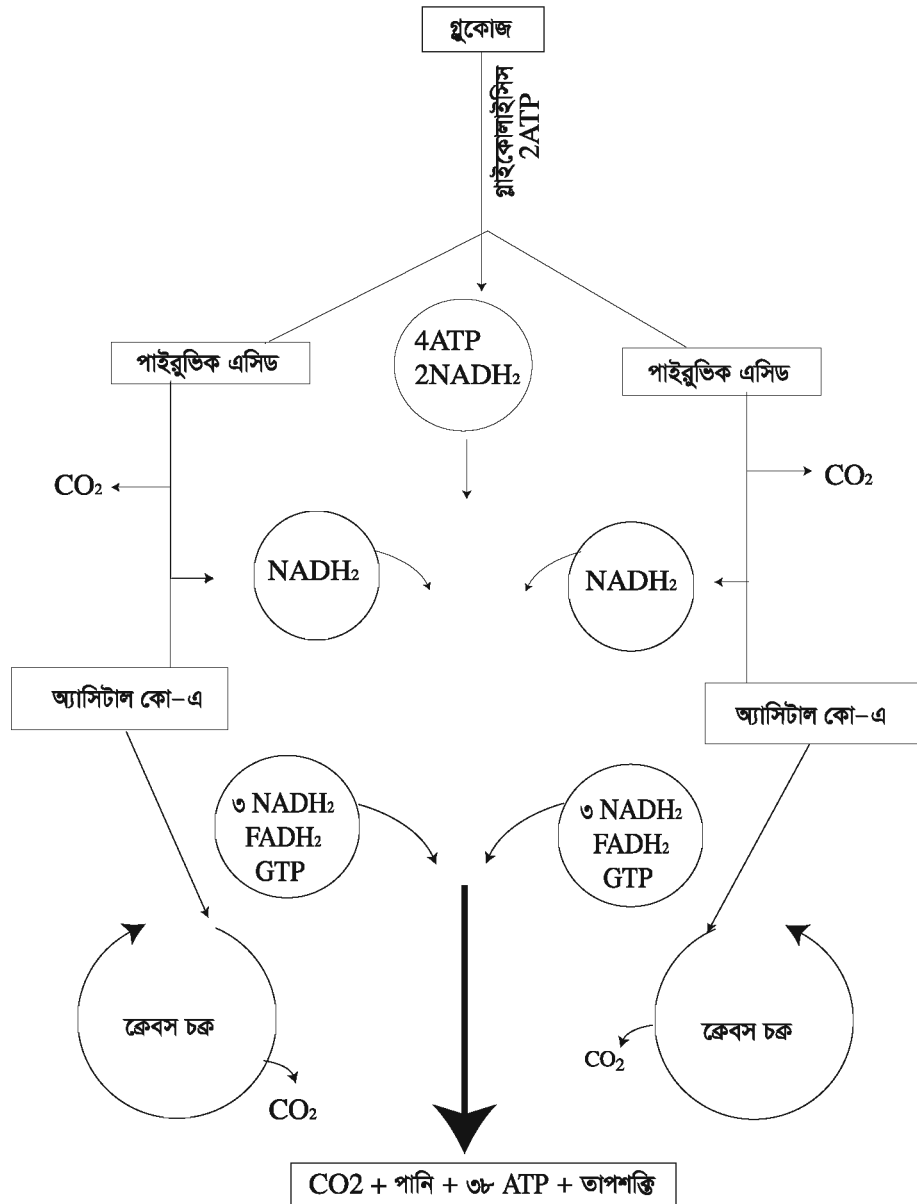
শ্বসনের প্রকারভেদ

শ্বসন দু প্রকার। যথা : ১। সবাত শ্বসন এবং ২। অবাত শ্বসন। যে শ্বসন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেনের অংশগ্রহণ অপরিহার্য তা হল সবাত শ্বসন। যে শ্বসন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না তা হল অবাত শ্বসন। সকল উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদে

সবাত শ্বসন হয়। কেবলমাত্র কতিপয় নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদে (কতিপয় ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক) অবাত শ্বসন হয়। নিচে এ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

১। সবাত শ্বসন বা (Aerobic respiration) অ্যারোবিক রেস্পিরেশন : সবাত শ্বসনই হল উদ্ভিদ ও প্রাণীর যান্ত্রিক শ্বসন প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় শর্করা ভেঙে কার্বন ডাইঅক্সাইড, পানি ও শক্তি উৎপন্ন হয়। সবাত শ্বসন প্রক্রিয়া সাধারণত চারটি ধাপে সম্পন্ন করা হয়। ধাপগুলো নিম্নরূপ :

ধাপ-১ : গ্লাইকোলাইসিস : এ ধাপে এক অণু ৬-কার্বন বিশিষ্ট গ্লুকোজ ৯টি পর্যায়ক্রমিক বিক্রিয়া শেষে ৩-কার্বন বিশিষ্ট দুই অণু পাইরুভিক এসিড উৎপন্ন করে। এ ধাপে চার অণু ATP (দুই অণু খরচ হয়ে যায়) এবং দুই অণু NADH₂ উৎপন্ন হয়।



চিত্র ৯.১৩ : শ্বসন প্রক্রিয়া

ধাপ-২ : অ্যাসিটাইল কো-এ সৃষ্টি : গ্লাইকোলাইসিস পর্যায়ে সৃষ্ট প্রতি অণু পাইরুভিক এসিড ৪টি পর্যায়ক্রমিক বিক্রিয়া শেষে ২ কার্বন বিশিষ্ট অ্যাসিটাইল কো-এ, এক অণু CO_2 এবং এক অণু NADH_2 উৎপন্ন করে। [দুই অণু পাইরুভিক এসিড হতে দুই অণু অ্যাসিটাইল কো-এ, দুই অণু CO_2 এবং দুই অণু NADH_2 উৎপন্ন হয়।]

ধাপ - ৩ : ক্রেবস চক্র : প্রতি অণু অ্যাসিটাইল কো-এ ক্রেবস চক্রে প্রবেশ করে এবং ১০টি পর্যায়ক্রমিক বিক্রিয়া শেষে দুই অণু CO_2 , তিন অণু NADH_2 , এক অণু FADH_2 এবং এক অণু $\text{GTP} (= \text{ATP})$ উৎপন্ন করে। দুই অণু অ্যাসিটাইল কো-এ হতে চার অণু CO_2 , ৬ অণু NADH_2 , দুই অণু FADH_2 এবং দুই অণু $\text{ATP} (= \text{GTP})$ উৎপন্ন হয়।

ধাপ - ৪ : ইলেকট্রন প্রবাহতন্ত্র : প্রথম তিন ধাপে উৎপন্ন NADH_2 , FADH_2 জারিত হয়ে ATP ও পানি উৎপন্ন করে।

সবাত শ্বসন প্রক্রিয়ায় এক অণু গ্লুকোজ সম্পূর্ণরূপে জারিত হয়ে সর্বমোট ছয় অণু CO_2 , ছয় অণু পানি এবং ৩৮টি ATP (৬৮৬ কিলোক্যালরি শক্তি) উৎপন্ন করে। প্রথম দুই ধাপ কোষের সাইটোপ্লাজমে সম্পন্ন হয়, পরের ধাপ মাইটোকন্ড্রিয়াতে সম্পন্ন হয়। শ্বসনের প্রতিটি বিক্রিয়া বিশেষ বিশেষ এনজাইম এর সাহায্যে সম্পন্ন হয়।

২। অবাত শ্বসন বা (Anaerobic respiration) অ্যানেরোবিক রেস্পিরেশন : অবাত শ্বসনে অক্সিজেনের প্রয়োজন পড়ে না। দুটি ধাপে অবাত শ্বসন সম্পন্ন হয়। ধাপ দুটি হল-

ধাপ-১ : গ্লাইকোলাইসিস : এ ধাপে এক অণু গ্লুকোজ থেকে দুই অণু পাইরুভিক এসিড, চার অণু ATP (এর মধ্যে দুই অণু খরচ হয়ে যায়), দুই অণু NADH_2 উৎপন্ন হয়।

ধাপ -২ : এ পর্যায়ে প্রতি অণু পাইরুভিক এসিড হতে এক অণু ইথানল (এলকোহল) এবং এক অণু CO_2 সৃষ্টি হয়। অথবা প্রতি অণু পাইরুভিক এসিড হতে কেবলমাত্র এক অণু ল্যাকটিক এসিড সৃষ্টি হয়।

সবাত শ্বসনের গুরুত্ব

১। এ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট শক্তি দিয়ে জীবের সব ধরনের ক্রিয়া-বিক্রিয়া ও কাজকর্ম পরিচালিত হয়।

২। এ প্রক্রিয়ায় পরিত্যক্ত CO_2 প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয় এবং শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত হয়।

৩। এ প্রক্রিয়া উদ্ভিদে খনিজ লবণ পরিশোধণে সাহায্য করে, যা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদ বৃদ্ধি ও অন্যান্য জৈবিক প্রক্রিয়া চালু রাখে।

৪। শ্বসন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন জৈব এসিড সৃষ্টি হয় যা অন্যান্য জৈবিক কার্যক্রমের জন্য আবশ্যিক। শ্বসনিক শক্তি কোষ বিভাজনেও সহায়তা করে।

অবাত শ্বসনের গুরুত্ব

১। কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া অক্সিজেনের উপস্থিতিতে বাঁচতে পারে না। এদের শক্তি উৎপাদনের একমাত্র উপায় হল অবাত শ্বসন।

২। এ প্রক্রিয়া ইথানল এলকোহল তৈরি করে, যা বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

৩। ল্যাকটিক এসিড ফার্মেন্টেশনে দরকার হয়।

শ্বসন প্রক্রিয়ার প্রভাবক

শ্বসন প্রক্রিয়ার প্রভাবকগুলো বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দু'রকম হতে পারে।

(ক) বাহ্যিক প্রভাবক

১। তাপমাত্রা : 20° সে. এর নিচে এবং 85° সে. এর উপরে তাপমাত্রায় শ্বসন হার কমে যায়। শ্বসনের জন্য উত্তম তাপমাত্রা 20° সে. - 85° সে.।

২। অক্সিজেন : অক্সিজেনের পরিমাণ কম হলে সবাত শ্বসন হার কমে যায়।

৩। পানি : পরিমিত পানি সরবরাহ শ্বসন-ক্রিয়াকে স্বাভাবিক রাখে। পানির অভাব হলে শ্বসন হার কমে যায়।

৪। আলো : আলোতে পত্ররন্ধ্র খোলা থাকে, তাই দিনের বেলায় শ্বসন হার অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে।

৫। কার্বন ডাইঅক্সাইড : বায়ুতে CO₂ এর পরিমাণ বেড়ে গেলে শ্বসন হার ক্রিষ্ণু কমে যায়।

(খ) অভ্যন্তরীণ প্রভাবক

১। খাদ্যদ্রব্য : শ্বসন প্রক্রিয়ায় খাদ্যদ্রব্য ভেঙে শক্তি, পানি ও CO₂ নির্গত করে, তাই কোষে খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ ও ধরন শ্বসন হার নিয়ন্ত্রণ করে।

২। কোষের বয়স : অল্প বয়সের কোষে বিশেষ করে ভাজক কোষে (প্রোটোপ্লাজম অধিক থাকে বলে) শ্বসন বেশি হয়।

৩। উৎসেচক : শ্বসন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন বিক্রিয়ায় বিভিন্ন ধরনের উৎসেচকের প্রয়োজন হয়। এদের উপস্থিতির ওপরই সম্পূর্ণ শ্বসন প্রক্রিয়াটি নির্ভরশীল।

৪। অজৈব লবণ : কোষে অজৈব লবণের পরিমাণ বেশি থাকলে শ্বসন হার বেড়ে যায়।

সবাত ও অবাত শ্বসনের প্রধান চারটি পার্থক্য

বৈশিষ্ট্য	সবাত শ্বসন	অবাত শ্বসন
১। অক্সিজেন	১। অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়।	১। অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না।
২। পাইরুভিক এসিডের জারণ।	২। পাইরুভিক এসিড সম্পূর্ণরূপে জারিত হয়।	২। পাইরুভিক এসিড আংশিক জারিত হয়।
৩। ATP উৎপাদন	৩। এক অণু গ্লুকোজ হতে ৩৮টি ATP উৎপন্ন হয়।	৩। এক অণু গ্লুকোজ হতে ২টি ATP উৎপন্ন হয়।
৪। উৎপন্ন দ্রব্য	৪। প্রতি অণু গ্লুকোজ হতে ছয় অণু CO ₂ এবং ছয় অণু পানি পাওয়া যায়।	৪। প্রতি অণু গ্লুকোজ হতে দুই অণু ইথানল এবং দুই অণু CO ₂ অথবা কেবল দুই অণু ল্যাকটিক এসিড উৎপন্ন হয়। কোন পানি উৎপন্ন হয় না।

শ্বসন প্রক্রিয়ায় তাপ নির্গত হয়, পরীক্ষার মাধ্যমে তার প্রমাণ

উপকরণ : একটি থার্মোফ্লাস্ক, কিছু অজ্জুরিত ছোলাবীজ, থার্মোমিটার।

কার্যপদ্ধতি : থার্মোফ্লাস্কে কিছু অজ্জুরিত ছোলাবীজ রেখে ছিপি দিয়ে এর মুখ ভালভাবে বন্ধ করি। এবার ছিপির মধ্য দিয়ে একটি থার্মোমিটার প্রবেশ করাই যেন এর বাত্বটি ছোলা বীজগুলোর মাঝে থাকে। থার্মোমিটারে পারদের রিডিং লিখে রাখি।

পর্যবেক্ষণ : কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে থার্মোমিটারে পারদ কিছুটা উপরে উঠেছে।

সিদ্ধান্ত : পারদ উপরে উঠার অর্থই হল তাপ বেড়ে যাওয়া এবং এ তাপ অঙ্কুরিত ছোলাবীজের শ্বসনের ফলেই হয়েছে।

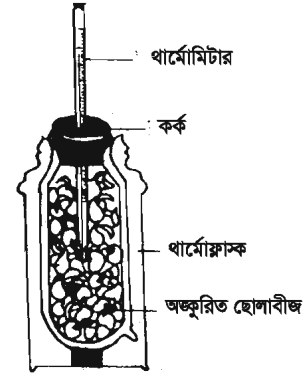
অবাত শ্বসনের পরীক্ষা

উপকরণ : একটি ছোট বীকার, একটি টেস্টটিউব, ক্ল্যাম্পসহ একটি স্ট্যান্ড, পারদ, কিছু সিক্ত ছোলা বীজ, কস্টিক পটাশ টুকরা, একটি চিমটা।

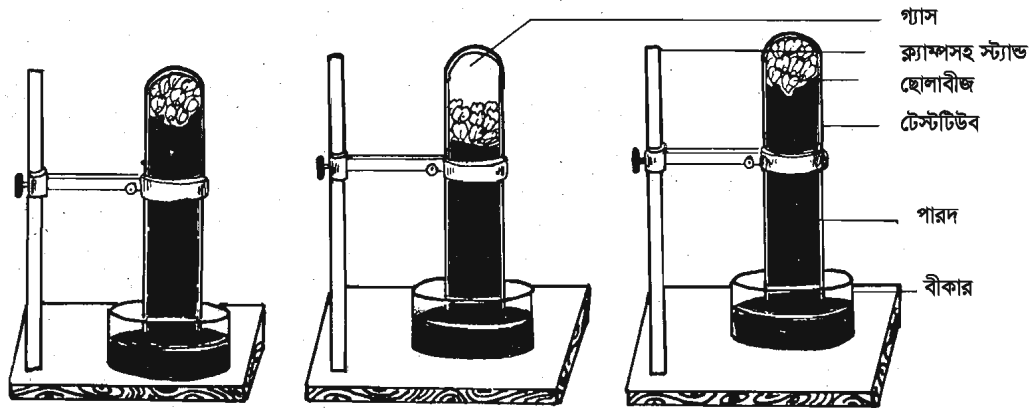
কার্যপদ্ধতি : বীকারটি অর্ধেক পরিমাণ পারদ পূর্ণ করতে হবে

এবং টেস্টটিউবটি সম্পূর্ণভাবে পারদপূর্ণ করে বুড়ো আঙুল দিয়ে এর মুখ চেপে ধরে উপুড় করে বীকারে স্থাপন করতে হবে। এবার স্ট্যান্ডের সাথে ক্ল্যাম্প দিয়ে টেস্টটিউবকে এমনভাবে আটকাতে হবে যেন টিউবের মুখটি বীকারে পারদের মধ্যে থাকে কিন্তু তলদেশ স্পর্শ না করে। এবার অঙ্কুরিত হচ্ছে এ ধরনের ছোলাবীজ একটি একটি করে চিমটা দিয়ে টেস্ট টিউবের ভিতরে প্রবেশ করাতে হবে। বীজগুলো পারদের চেয়ে হালকা বলে টেস্টটিউবের উপর মাথায় উঠে যাবে। এবার পরীক্ষা সেটিটি পর্যবেক্ষণের জন্য রেখে দিতে হবে।

পর্যবেক্ষণ : কয়েক ঘণ্টা পর দেখা যাবে অঙ্কুরিত ছোলাবীজ থেকে নির্গত গ্যাসের চাপে টেস্টটিউবে পারদের তল অনেকটা নিচে নেমে এসেছে। এবার কস্টিক পটাশ টুকরোটি চিমটা দিয়ে টেস্টটিউবের ভিতরে ঢুকিয়ে দেই। দেখা যাবে কস্টিক পটাশ গ্যাসটি শোষণ করে নিয়েছে এবং টেস্টটিউব পুনরায় পারদ দিয়ে ভর্তি হয়েছে।



চিত্র ৯.১৪ : অবাত শ্বসন-এ তাপ নির্গমনের পরীক্ষা



চিত্র ৯.১৫: অবাত শ্বসনের পরীক্ষা

সিদ্ধান্ত : গ্যাসটি কস্টিক পটাশ কতৃক শোষিত হয়েছে, তাই গ্যাসটি ছিল CO_2 এবং এ গ্যাস নির্গত হয়েছিল ছোলাবীজের শ্বসন ক্রিয়ার ফলে। পারদের মাঝে বাতাস থাকতে পারে না, ছোলাবীজগুলো ছিল পারদের মাঝে, কাজেই ছোলাবীজের শ্বসন ছিল অবাত শ্বসন অর্থাৎ অবাত শ্বসনে অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। জনৈক জীববিজ্ঞান শিক্ষক সালোকসংশ্লেষণ পাঠ দানের অংশ হিসেবে একদিন রৌদ্র উজ্জ্বল দুপুরে তার দশম শ্রেণীর ছাত্রদের নিয়ে বিদ্যালয়ের পুকুর পাড়ে গেলেন। তিনি পাড়ের কাছে পানিতে নিমজ্জিত শৈবালের (স্পাইরোগাইরা) ওপর জমে থাকা বুদবুদ দেখিয়ে সেগুলো সৃষ্টির কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। বিভিন্ন ছাত্র তখন বিভিন্ন উত্তর দিল। সকল ছাত্রকে আসল বিষয়টি অবগত করানোর জন্য তিনি কিছু শৈবাল নিয়ে এলেন। অতঃপর পরীক্ষাগারের বারান্দায় পর্যাপ্ত আলোতে ছাত্রদের নিয়ে শৈবালের ওপর একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করেন এবং বিষয়টি নিশ্চিত হন।

ক. সালোকসংশ্লেষণ কাকে বলে?

খ. শৈবালের ওপর পরীক্ষাটি পর্যাপ্ত আলোতে করা হয়েছিল কেন?

গ. উল্লিখিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাটির বর্ণনাসহ শৈবাল থেকে বুদবুদ ওঠার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জীবজগতের কল্যাণে শৈবাল থেকে বুদবুদ ওঠার অবদান বিশ্লেষণ কর।

উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পরিবর্ধন

আমরা জানি বীজ থেকে চারা হয়, চারা থেকে বড় গাছ হয়। গাছে ফুল ও ফল হয়। এসব উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পরিবর্ধনের ফল। বীজের মধ্যে ভ্রূণ থাকে। ভ্রূণের বৃদ্ধিই বীজের অঙ্কুরোদগম। কাজেই ভ্রূণের বৃদ্ধি না হলে কোন বীজেরই অঙ্কুরোদগম হবে না। অঙ্কুরোদগম না হলে চারা হবে না। চারা গাছের বৃদ্ধি না হলে বড় গাছ হবে না। গাছ বড় না হলে আমরা ফুল, ফল, বীজ, কাঠ, ফসল, কিংবা বনাঞ্চল কিছুই পাব না। কাজেই উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পরিবর্ধন প্রয়োজন উদ্ভিদের নিজের জন্য, যাতে এরা পুনরায় বীজ উৎপাদন করে বংশরক্ষা ও বংশবৃদ্ধি করতে পারে। আবার উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পরিবর্ধন মানুষসহ সকল প্রাণীর জন্য অত্যাবশ্যক। কারণ উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পরিবর্ধন না হলে আমরা খাবার, ওষুধ, বস্ত্র, পানীয় কিছুই পাব না, পাব না গৃহ নির্মাণের উপকরণ ও বাঁচার মত পরিবেশ। বৃদ্ধি সকল জীবের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। বৃদ্ধি বলতে কোন উদ্ভিদ বা উদ্ভিদাঙ্গের আকার, আকৃতি, ওজন ও পরিমাপের স্থায়ী বৃদ্ধিকে বুঝায়।

বৃদ্ধি অঞ্চল : উদ্ভিদের আদর্শ বর্ধিষ্ণু অঞ্চল হল মূল এবং কাণ্ডের শীর্ষ। মূল ও কাণ্ডের শীর্ষে থাকে শীর্ষস্থ ভাজক টিস্যু (apical meristem)। এ অঞ্চলকে প্রাথমিক ভাজক টিস্যু অঞ্চল বা প্রাথমিক বৃদ্ধি অঞ্চলও বলা হয়ে থাকে।

দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি : শীর্ষস্থ ভাজক টিস্যুর কোষগুলো ক্রমাগত বিভক্তির মাধ্যমে নতুন কোষ সৃষ্টি করে, নতুন কোষগুলো পরে আয়তনে বৃদ্ধি পায়। এভাবে নতুন কোষ সৃষ্টি এবং সৃষ্ট কোষগুলোর আয়তনে বৃদ্ধির মাধ্যমে মূল ও কাণ্ডের অগ্রভাগ ক্রমাগত দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি পেতে থাকে। কাণ্ডের শীর্ষে কচিপাতা এবং মুকুল সৃষ্টিও এ টিস্যুর কাজ।

মূলের অগ্রভাগে থাকে একটি আবরণের ন্যায় অংশ, যাকে বলে মূলস্ত্রাণ (root cap)। মূলস্ত্রাণ অঞ্চলের পিছনে থাকে কোষবিভাজন অঞ্চল। এই অঞ্চলের কোষগুলো দ্রুত বিভাজিত হয়ে অনেক নতুন কোষ সৃষ্টি করে। কোষবিভাজন অঞ্চলের পিছনে থাকে কোষ দীর্ঘায়তকরণ অঞ্চল। এ অঞ্চলে কোষগুলো আকার ও আয়তনে, বিশেষ করে লম্বায় বৃদ্ধি পায়, তাই মূলের দৈর্ঘ্য বেড়ে যায়। কোষ দীর্ঘায়তকরণ অঞ্চলের পিছনে থাকে কোষ পরিণতকরণ অঞ্চল। এ অঞ্চলে কোষগুলো আকার ও আয়তনে বিশেষ করে লম্বায় বৃদ্ধি পায়, এ অঞ্চলের কোষগুলো পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং বিভিন্ন আকার আকৃতি লাভ করে।

কাণ্ডের শীর্ষে থাকে একটি মুকুল যাকে বলা হয় শীর্ষমুকুল বা অগ্রমুকুল। অগ্রমুকুলের কোষগুলো ভাজক কোষ। কাজেই এটি হল কোষ বিভাজন অঞ্চল, কারণ এই কোষগুলো দ্রুত বিভাজিত হয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এ অঞ্চলের পিছনে আছে কোষ দীর্ঘায়তকরণ অঞ্চল, কারণ এ অঞ্চলে কোষগুলো দ্রুত লম্বায় বৃদ্ধি পায়। এ অঞ্চলের পিছনে থাকে কোষ পরিণতকরণ অঞ্চল, কারণ এ অঞ্চলে কোষগুলো পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় এবং বিভিন্ন আকার আকৃতি লাভ করে।

পরিণত কাণ্ড ও মূলের পার্শ্ববৃদ্ধি : একটি আম গাছের এক মাসের চারার মূল বা কাণ্ড যতটুকু মোটা থাকে, এক বছর পর সেটা আরও বেশি মোটা হয়। এভাবে বয়স বাড়ার সাথে সাথে এর বেড় বাড়তেই থাকে। পরিণত কাণ্ডের পার্শ্ববৃদ্ধির মাধ্যমে মূল ও কাণ্ডের বেড় বৃদ্ধি পায়। সাধারণত নগ্নবীজী উদ্ভিদ এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদেই পার্শ্ববৃদ্ধি ঘটে থাকে। তাই পৃথিবীতে যত মোটা মোটা গাছ আছে তা সবই নগ্নবীজী উদ্ভিদ অথবা দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ। *Cycas* ও *Pinus* নগ্নবীজী উদ্ভিদের উদাহরণ। আম, জাম, লিচু, শাল, গর্জন, সুন্দরী, সেগুন, গামারী, কড়ই এগুলো হল দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ।

কীভাবে পার্শ্ববৃদ্ধি ঘটে : মূল ও কাণ্ডের পার্শ্ববৃদ্ধি হয় এদের সেকেন্ডারি বৃদ্ধির মাধ্যমে। মূল ও কাণ্ডের কেন্দ্র চক্রের বা স্টিলির ভেতরে এবং বাইরে সেকেন্ডারি বৃদ্ধি হয়। প্রথমে কেন্দ্র চক্রের ভেতরে ভাস্কুলার বাউল অঞ্চলে একটি

ক্যাম্বিয়াম বলয় (Cambium ring) সৃষ্টি হয়। এ ক্যাম্বিয়াম বলয় কেন্দ্রের দিকে সেকেন্ডারি জাইলেম এবং পরিধির দিকে সেকেন্ডারি ফ্লোয়েম টিস্যু সৃষ্টি করে। ক্যাম্বিয়াম বলয় থেকে যতই সেকেন্ডারি জাইলেম ও সেকেন্ডারি ফ্লোয়েম সৃষ্টি হতে থাকে মূল বা কাণ্ড ততই মোটা হতে থাকে। কেন্দ্রচক্রের বাইরেও সেকেন্ডারি বৃদ্ধি হয়ে থাকে।

শীর্ষ প্রকটতা (apical dominance) : আমরা জেনেছি যে কাণ্ডের অগ্রভাগই হল আদর্শ বৃদ্ধি অঞ্চল। অগ্রভাগের বৃদ্ধি কালে কচিপাতা এবং এদের কক্ষে কখনো কক্ষমুকুলও সৃষ্টি হয়। সবসময়ই কক্ষমুকুলের বৃদ্ধির হার অগ্রমুকুলের বৃদ্ধির চেয়ে কম থাকে। অগ্রমুকুল কেটে নিলে দেখা যায় কক্ষমুকুলগুলোর বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। নিচ থেকে মুকুল সৃষ্টি ও এদের ভাল বৃদ্ধির জন্য অনেক সময় অগ্রমুকুল কেটে দেয়া হয়। চা গাছের অগ্রমুকুল কেটে দিলে নিচ থেকে অনেক কক্ষমুকুল সৃষ্টি হয়। এভাবেই বৃক্ষজাতীয় চা-গাছকে বাগানে গুল্ম জাতীয় করে রাখা হয় এবং চা-এর কুঁড়ি তথা ফলন বাড়ানো হয়। অগ্রমুকুলের প্রভাবে সাধারণত কক্ষমুকুল সৃষ্টি হয় না, অথবা হলেও কক্ষমুকুল থেকে শীর্ষ মুকুলের বৃদ্ধি সবসময়ই প্রকট থাকে। কাণ্ডের শীর্ষভাগের বৃদ্ধির এ প্রকটতাকেই শীর্ষপ্রকটতা বলে।

অক্সিন নামক বৃদ্ধিকারক রাসায়নিক পদার্থ কাণ্ডশীর্ষেই অধিক থাকে, তাই সেখানে বৃদ্ধির হারও বেশি থাকে। শীর্ষমুকুল কেটে দিলে তখন অক্সিন নিচে প্রবাহিত হয়, তাই কক্ষমুকুল সৃষ্টি হয় বা কক্ষমুকুলের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়।

উদ্ভিদের শীর্ষপ্রকটতা তোমরা খুব সহজেই পরীক্ষা করে দেখতে পার। টবে মরিচ কিংবা পাতাবাহারের চারা থাকলে তার আগা বা শীর্ষমুকুল কেটে দাও। দেখবে কাণ্ডের পার্শ্বমুকুলগুলো তখন শাখা-প্রশাখায় পরিণত হবে। শীর্ষমুকুল কেটে না দিলে এত বেশি শাখা-প্রশাখা হত না।

বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক পদার্থ (growth regulators) : কিছু কিছু জৈব রাসায়নিক পদার্থ আছে যা সামান্য পরিমাণে বিদ্যমান থেকেই উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। এ পদার্থগুলো উদ্ভিদ দেহেই সৃষ্টি হয়। উদ্ভিদের বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করে বলে এদের বলা হয় বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক পদার্থ। অনেক পূর্বে এদেরকে বলা হত হরমোন। উদ্ভিদ দেহে সৃষ্টি হয় বলে পরবর্তীতে এদের ফাইটোহরমোন নামে অভিহিত করা হয়। ফাইটো-অর্থ উদ্ভিদ।

বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক পদার্থগুলোকে প্রধানত দু ভাগে ভাগ করা হয় যথা ১। **বৃদ্ধিবর্ধক** এবং ২। **বৃদ্ধিরোধক**। বৃদ্ধিবর্ধক পদার্থ হল অক্সিন (Auxin), জিব্বেরেলিন (Gibberellin), সাইটোকাইনি (Cytokinin), ফ্লাওয়ারিং হরমোন। বৃদ্ধিরোধক পদার্থ হল- ডরমিন (Dormin) বা অ্যাবসিসিক এসিড।

অক্সিনের প্রভাব : (১) অক্সিন কোষের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে। (২) শীর্ষ প্রকটতা সৃষ্টি করে। (৩) মূল সৃষ্টির সূচনা করে। (৪) বীজহীন ফল সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

অক্সিনের ব্যবহার : (১) বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য অক্সিন ব্যবহার করা হয়। (২) অক্সিন ব্যবহার করলে তাড়াতাড়ি মূল সৃষ্টি হয় বলে আম, লিচু, পেয়ারা এসব গাছের কলম তৈরিতে অক্সিন ব্যবহার করা হয়। (৩) গাছ থেকে কচি ফল ঝরে গেলে তা রোধ করার জন্য অক্সিন ব্যবহার করা হয়। (৪) বীজহীন ফল সৃষ্টিতে, পুষ্পায়নে, টিস্যু কালচার এবং আগাছা দমনেও অক্সিন ব্যবহার করা হয়।

জিব্বেরেলিনের প্রভাব : (১) জিব্বেরেলিন কাণ্ডের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে। (২) বীজের ও কুঁড়ির সুপ্ততা ভঙ্গ করে। (৩) উদ্ভিদে ফুল ফোটাতে সহায়তা করে।

ব্যবহার : বীজহীন ফল সৃষ্টি করতে, গাছে ফলের সংখ্যা বাড়াতে, খাট কাণ্ডকে লম্বা করতে, বীজের অঙ্কুরোদগমের হার বাড়াতে জিব্বেরেলিন ব্যবহার করা হয়।

সাইটোকাইনিনের প্রভাব : সাইটোকাইনিন কোষ বিভাজনের হার ত্বরান্বিত করে।

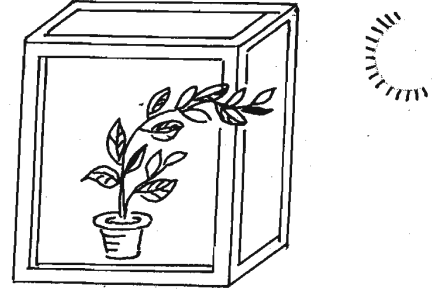
সাইটোকাইনিনের ব্যবহার : (১) বীজহীন ফল সৃষ্টিতে ও (২) টিস্যু কালচারে ব্যবহার করা হয়।

অ্যাবসিসিক এসিড : এ এসিডের প্রভাবে পাতা ঝরে যায়, কুঁড়ি ঝরে যায়, কুঁড়ির বৃদ্ধি রহিত হয়ে যায়।

দিকমুখিতা (TROPISM)

একটি বট গাছের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এর শাখা-প্রশাখাগুলো ক্রমশ আলোর দিকে বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু এর স্তম্ভমূলগুলো শাখা থেকে বের হয়ে ক্রমশ মাটির দিকে বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটি ছোলাবীজকে ভেজা মাটিতে ফেলে রাখলে কয়েকদিনের মধ্যেই এর অঙ্কুরোদগম হবে। দেখা যাবে এর ভূগমূল ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে মাটির ভিতরে প্রবেশ করছে এবং ভূগমূল ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে মাটির উল্টো দিকে প্রসারিত হচ্ছে। উদ্ভিদাজের বিশেষ দিকে যেমন— আলোর দিকে, মাটির দিকে, পানির দিকে বৃদ্ধি পাওয়াকে দিকমুখিতা (tropism) বলা হয়। এ দিকমুখিতা আলো, মাটি, পানি ইত্যাদি উদ্ভেজক উপাদানের দিকে হতে পারে আবার তার বিপরীত দিকেও হতে পারে। উদ্ভেজক উপাদানের উৎসের দিকে উদ্ভিদাজের দিকমুখিতাকে বলা হয় ধনাত্মক দিকমুখিতা (positive tropism)। অপর পক্ষে উদ্ভেজক উপাদানের উৎসের বিপরীত দিকে উদ্ভিদাজের দিকমুখিতাকে বলা হয় ঋণাত্মক দিকমুখিতা (negative tropism)। এখানে আলো, ভূমি, পানি ও রাসায়নিক দিকমুখিতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল।

(ক) আলোক দিকমুখিতা (phototropism) : উদ্ভিদের কাণ্ড ও তার শাখা-প্রশাখা সবসময় আলোর দিকে প্রসারিত হয় কিন্তু মূল ও তার শাখা-প্রশাখা আলোর বিপরীত দিকে প্রসারিত হয়। কাণ্ডের আলোর দিকে প্রসারণ হল ধনাত্মক আলোক দিকমুখিতা এবং মূলের আলোর বিপরীত দিকে গমন হল ঋণাত্মক আলোক দিকমুখিতা।



চিত্র ৯. ১৬ : আলোক দিকমুখিতার পরীক্ষা

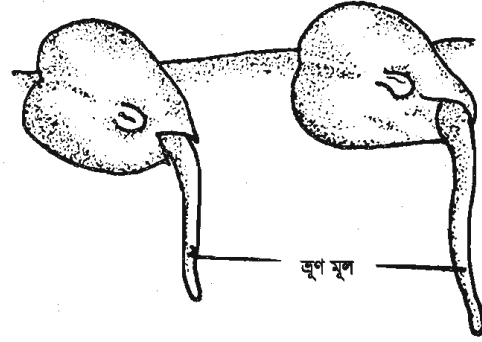
ছোলা বা মরিচ গাছের চারার সাহায্যে আলোক দিকমুখিতা পরীক্ষা করা যায়। ছিপিসহ একটি কাচের বোতল নিই। বোতলটি পানি ভর্তি করি। ছিপির মধ্য দিয়ে চারা গাছটি ঢুকাই যেন কাণ্ডটি ছিপির বাইরে থাকে এবং মূলটি ছিপির নিচে বোতলের পানিতে থাকে। একদিক হতে আলো পায় এমন জায়গায় বোতলটি রেখে দেই। একদিন পর দেখবো কাণ্ডের মাথাটি আলোর দিকে সরে এসেছে কিন্তু মূলের মাথাটি আলোর উল্টোদিকে সরে গিয়েছে।

একটি ছোট ছিদ্রযুক্ত কাঠের বাস্তের ভিতরে টবে লাগান একটি চারাগাছ রেখেও আলোক দিকমুখিতা পরীক্ষা করা যায়। গাছের পাতা সূর্যের আলো থেকে শক্তি গ্রহণ করে খাদ্য তৈরি করে। আর এ তৈরি খাদ্যের ওপর উদ্ভিদকুল ও প্রাণিকুল নির্ভরশীল। কাজেই আলোর দিকে কাণ্ডের গমন ও প্রসারণ বেশ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কাণ্ডই পাতা ধারণ করে।

(খ) ভূদিকমুখিতা (geotropism) : উদ্ভিদের মূলের চলন হয় ভূমির দিকে এবং কাণ্ডের চলন হয় ভূমির বিপরীত দিকে। ভূমির দিকে গমন হল ধনাত্মক ভূদিকমুখিতা আর ভূমির বিপরীত দিকে কাণ্ডের গমন হল ঋণাত্মক ভূদিকমুখিতা।

একটি অঙ্কুরিত ছোলা বীজকে মাটি ভর্তি টবে রাখি এবং টবটিকে একটি বন্ধ ঘরে রাখি যেন কোন দিক থেকে আলো না আসে। একদিন পর দেখা যাবে অঙ্কুরিত ছোলা বীজের মূলটি বেঁকে মাটিতে প্রবেশ করেছে এবং কাণ্ডটি বেঁকে মাটির বিপরীত দিকে উঠে এসেছে।

মাটিতেই গাছের জন্য অধিকাংশ খাদ্য থাকে। এ খাদ্য মূল শোষণ করে নেয়। কাজেই মাটির দিকে মূলের গমন বেশ গুরুত্বপূর্ণ।



চিত্র ৯.১৭ : মূলের ভূদিকমুখিতা

(গ) পানি দিকমুখিতা (hydrotropism) : উদ্ভিদের মূলের চলন ঘটে পানি অভিমুখী এবং কাণ্ডের প্রসারণ হয় পানি বিমুখী। মূলের পানির দিকে গমন হল ধনাত্মক পানি দিকমুখিতা আর কাণ্ডের পানির বিপরীত দিকে প্রসারণ হল ঋণাত্মক পানি দিকমুখিতা।

(ঘ) রাসায়নিক দিকমুখিতা (chemotropism) : মাটিতে যেদিকে জৈব সার বেশি থাকে গাছের মূল ও তার শাখা-প্রশাখা ঐ দিকেই বেশি প্রসারিত হয়। রাসায়নিক পদার্থের দিকে মূলের এ গমন হল রাসায়নিক দিকমুখিতা।

উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও ফলনে আলো ও শৈত্যের প্রভাব

(EFFECT OF LIGHT AND TEMPERATURE ON PLANT GROWTH AND YIELD)

আম, জাম, বরই এসব ফলের গাছ আমরা সবাই চিনি। বাংলাদেশের প্রায় প্রতি বাড়িতেই এসব ফলের গাছ লাগানো হয়। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে সব ফল গাছে একই সময়ে ফুল ধরে না। আমগাছে মুকুল আসে শীতকালে এবং ফল পাকে গ্রীষ্মকালে কিন্তু বরই (কুল) গাছে ফুল আসে শরৎকালে, ফল পাকে শীতকালে। আর একটি উদাহরণ দেয়া যাক। শিম একটি শীতকালীন সবজি। বলতে গেলে গ্রামবাংলার প্রায় সব বাড়িতেই শিম লাগান হয়। বর্ষাকালে এর বীজ লাগানো হয় এবং শীত এলে এতে ফুল ফোটে। শীত কেটে গেলে ফুল ফোটা বন্ধ হয়ে যায় এবং সারাবছর পর পুনরায় শীত এলে এদের ফুল ফোটে।

আমরা জানি বাংলাদেশে শীতকালে দিনের দৈর্ঘ্য থাকে কম (রাত্রিকাল দীর্ঘ) এবং গ্রীষ্ম-বর্ষাতে দিনের দৈর্ঘ্য থাকে বেশি (রাত্রিকাল সংক্ষিপ্ত)। শিম গাছে ফুল ফোটাতে হলে সংক্ষিপ্ত দিবালোক দরকার। তাই শীতকালে এতে ফুল ফোটে। গ্রীষ্মকালে দিবালোক দীর্ঘ থাকে বলে শিম গাছে ফুল ফোটে না। কাজেই দেখা যায় দীর্ঘ দিবালোকে শিম গাছের দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে এবং সংক্ষিপ্ত দিবালোকে শিম গাছে ফুল ধরে অর্থাৎ ফলন আসে। এ থেকে বুঝা যায় উদ্ভিদের (শিমগাছ একটি উদাহরণ মাত্র) বৃদ্ধি ও ফলনে আলোর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।

উদ্ভিদের ফুল ধারণের ওপর দিবালোকের দৈর্ঘ্যের এই প্রভাবকে বলা হয় ফটোপেরিওডিজম (Photoperiodism)। ১৯২০ সালে গার্নার ও এলার্ড (Garner & Allard) নামক দু জন বিজ্ঞানী তামাকের মেরিল্যান্ড ম্যামথ (Maryland Mammoth) প্রকরণের উপর প্রথম দিনরাত্রির দৈর্ঘ্যের প্রভাব লক্ষ করেন। ফুল ধারণের জন্য দিবালোকের দৈর্ঘ্যের প্রভাব এর ওপর নির্ভর করে গার্নার ও এলার্ড ফুলধারী উদ্ভিদকে তিন ভাগে ভাগ করেন।

১। ছোটদিনের উদ্ভিদ (Short-day plants) : দিনের দৈর্ঘ্য ছোট হলে এ জাতীয় উদ্ভিদের ফুল ফোটে। শিম, ডালিয়া, তামাক, চন্দ্রমল্লিকা ছোটদিনের উদ্ভিদ। এদের দীর্ঘরাত্রির উদ্ভিদও বলা যেতে পারে। রোপা আমন ছোটদিনের উদ্ভিদ। তবে বিভিন্ন প্রকরণে এর বিভিন্নতা দেখা যেতে পারে। পাটের দুটো প্রজাতিই ছোটদিনের উদ্ভিদ। ১০-১২ ঘণ্টার ফটোপিরিয়ড এ ৩০ দিনেই ফুল প্রদান করে। ফটোপিরিয়ড $12\frac{1}{2}$ ঘণ্টার বেশি হলে ফুল আসা বিলম্ব হয়।

২। বড়দিনের উদ্ভিদ (Long-day plants) : দিনের দৈর্ঘ্য বড় হলে এ জাতীয় উদ্ভিদে ফুল ফোটে। ঝিঙা, লেটুস, পালংশাক বড়দিনের উদ্ভিদ। এদের ছোটরাত্রির উদ্ভিদও বলা যেতে পারে।

৩। নিরপেক্ষ দিনের উদ্ভিদ (Day-neutral plants) : দিনের আলোর সময়সীমার ওপর এ জাতীয় উদ্ভিদের ফুল ধারণ নির্ভর করে না। প্রয়োজনীয় দৈনিক বৃন্দ্বি হলেই এদের ফুল ধরে। নিরপেক্ষ দিনের উদ্ভিদকে শীত-গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই জন্মানো যায় এবং এরা উভয় ঋতুতেই ফুল ও ফল প্রদান করে। সূর্যমুখী এমন একটি উদ্ভিদ। আউশ ধান সাধারণত নিরপেক্ষ দিনের উদ্ভিদ।

ফটোপিরিয়ডিক উত্তেজনা গ্রহণ করে উদ্ভিদের পাতা।

ফটোপিরিয়ডিজমের গুরুত্ব : সব উদ্ভিদ যদি ছোটদিনের হত অথবা সব উদ্ভিদ যদি বড়দিনের হত তাহলে আমরা বছরের একটি মাত্র সময় ফসল পেতাম। এতে ফসল সারাবছর সঞ্চারের অসুবিধা হত, আবার বছরের একসময় এসে দেশে ফলমূলের বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হত। প্রকৃতিতে ছোটদিনের উদ্ভিদ, বড়দিনের উদ্ভিদ এবং নিরপেক্ষ দিনের উদ্ভিদ থাকায় আমরা বছরের সবসময়ই কোন-না-কোন ফসল, শাকসবজি, ফলমূল পেয়ে থাকি।

আলোর মত তাপ এবং শৈত্যেরও উদ্ভিদের বৃন্দ্বি ও ফুল ধারণের ওপর প্রভাব রয়েছে। দেখা গেছে অনেক উদ্ভিদের অঙ্কুরিত বীজকে শৈত্য প্রদান করলে এদের ফুল ধারণের সময় এগিয়ে আসে। শৈত্য প্রদান করে উদ্ভিদে ফুল ধারণকে ত্বরান্বিত করার প্রক্রিয়াকে ভার্নালাইজেশন (vernalization) বলা হয়।

১৯২০ সালে রাশিয়ান বিজ্ঞানী টি. ডি. লাইসেনকো (T.D. Lysenko) শৈত্য প্রদান করে ফুল ধারণ ত্বরান্বিত করার এই প্রক্রিয়াটি উদ্ভাবন করেন এবং নাম দেন জেরোভাইজেশন (Jarovization)। পরে জেরোভাইজেশনকে ল্যাটিন ভাষায় ভার্নালাইজেশন নাম দেওয়া হয়।

অঙ্কুরিত বীজ বা ছোট চারাগাছকে শৈত্য প্রদান করে ভার্নালাইজেশন করা হয়। এদের কয়েকদিন কম তাপমাত্রায় (সাধারণত ১৩°-১৫° সেলসিয়াস) রাখলেই শৈত্য প্রদান করা হয়। ভূগম্বুল বা চারাগাছের শীর্ষস্থ ভাজক কোষগুলোই ভার্নালাইজেশন এর উত্তেজনা গ্রহণ করে।

ভার্নালাইজেশনের গুরুত্ব : রাশিয়ায় ভার্নালাইজেশন পদ্ধতি প্রয়োগ করে দ্বিবর্ষিক গমকে বর্ষজীবী গমে পরিণত করা হয়েছে। আমাদের দেশে প্রতি বছর বন্যায় অনেক ধান নষ্ট হয়ে যায়। ভার্নালাইজেশন পদ্ধতি প্রয়োগ করে যদি ধানে ফুল ধারণ ক্ষমতা ৫-১০ দিন এগিয়ে আনা যায় তাহলে হয়তো বন্যার কবল থেকে কোটি কোটি টাকার ধান রক্ষা করা যাবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। আগাছা দমনে কোনটি ব্যবহার করা হয়?

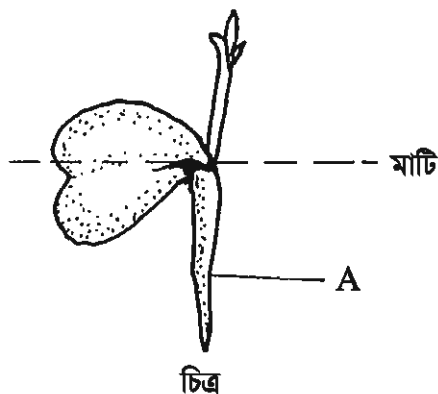
ক. অক্সিন

গ. সাইটোকাইনিন

খ. জিবেরেলিন

ঘ. অ্যাবসিসিক এসিড

২।



চিত্রের A চিহ্নিত অংশটির ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য?

i. ধনাত্মক ভূদিকমুখিতা

ii. ধনাত্মক আলোক দিকমুখিতা

iii. ধনাত্মক পানি দিকমুখিতা

নিচের কোনটি সঠিক?

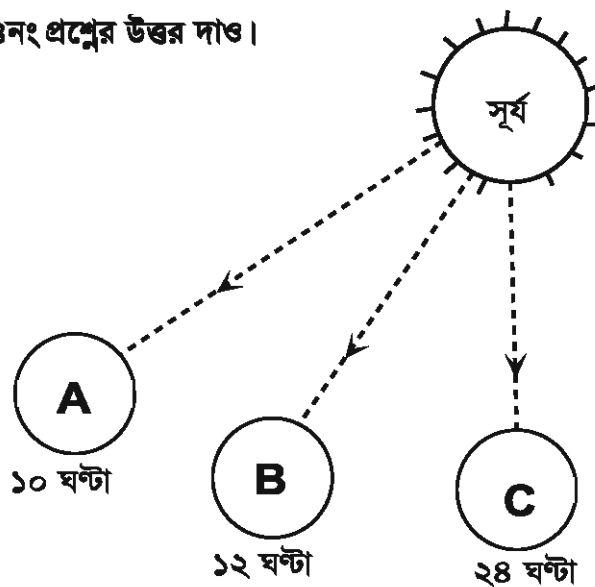
ক. i

গ. i ও ii

খ. iii

ঘ. i ও iii

নিচের চিত্রের আলোকে ৩নং ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



চিত্র : দিবালোকের দৈর্ঘ্য

৩। A, B ও C চিহ্নিত পরিস্থিতিতে কোন উদ্ভিদ ফুল ও ফল প্রদান করে?

- | | |
|----------|--------------|
| ক. তামাক | খ. পালংশাক |
| গ. শিম | ঘ. সূর্যমুখী |

৪। A চিহ্নিত সময়কালে ঝিঙা চাষ করলে কী ঘটবে?

- ঝিঙা গাছ দ্রুত বৃদ্ধি পাবে
- ঝিঙার উৎপাদন হ্রাস পাবে
- আর্থিক ক্ষতি হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। হিলমুন তার আজিনার এক কোণে কয়েকটি লাউয়ের চারা রোপণ করেন এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখেন। তিনি লক্ষ করলেন চারাগুলো দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, তবে পার্শ্বের চেয়ে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি বেশি ঘটছে। কিছুদিন পর তিনি গাছগুলোকে মাচায় উঠিয়ে তাদের অগ্রমুকুল কেটে দিলেন।

- অগ্রমুকুল কী?
- লাউগাছের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির তুলনায় পার্শ্ববৃদ্ধি কম হয় কেন?
- হিলমুন লাউগাছের অগ্রমুকুল কেটে দিলেন কেন তা ব্যাখ্যা কর।
- হিলমুনের লাউ গাছের মত অন্যান্য গাছেরও অগ্রমুকুল কেটে ফেলা কতটুকু যুক্তিযুক্ত উদাহরণসহ বিশ্লেষণ কর।

অধ্যায় দশ

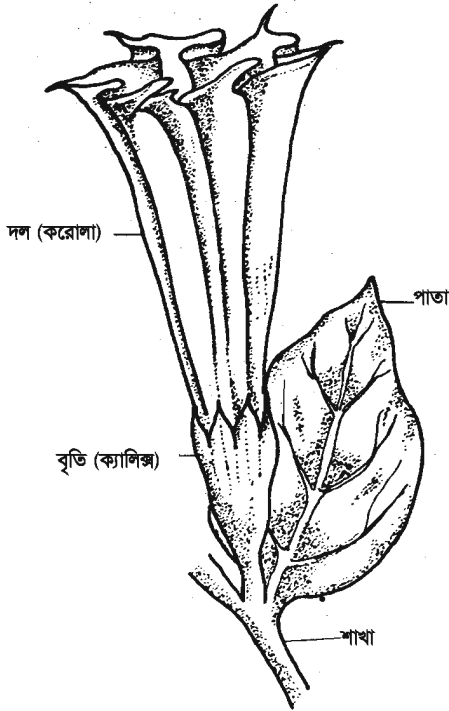
ফুল

প্রকৃতির সবচেয়ে সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর সৃষ্টি হল ফুল। আমরা সবাই ফুল ভালোবাসি। বৃক্ষভরা লাল শিমুল, পলাশ, মাদার বা কৃষ্ণচূড়া, মাঠভরা হলুদ সরিষা, ঝিলেভরা বেগুনি কলমী, ঝোপভরা নীল অপরাজিতা, বাগান ভরা গোলাপ, জবা, গন্ধরাজ, কামিনী, শেফালী, বকুল সবই আমাদের প্রিয়।

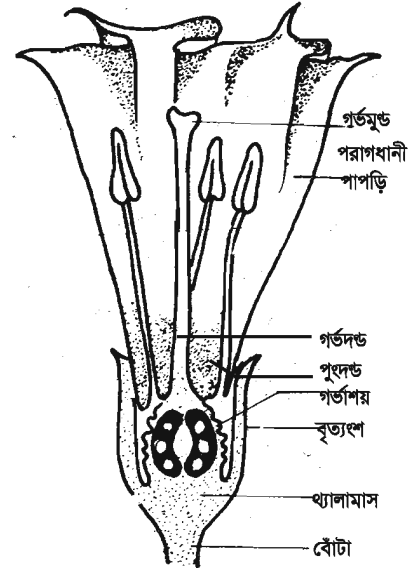
আমাদের চারপাশে এত যে ফুল এরা সব কী একই রকম? না, একটু ভালভাবে লক্ষ করলেই দেখা যাবে সব ফুল একই রকম নয়। এরা কোনটি লাল, কোনটি হলুদ, কোনটি নীল, কোনটি বা সাদা। আবার এদের কোনটির আছে তীব্র গন্ধ (হাসনাহেনা), কোনটির আছে মৃদুগন্ধ (রজনীগন্ধা, চাঁপা, গন্ধরাজ) আবার কোনটির মোটেই গন্ধ নেই (জবা)। এদের মধ্যে রং এবং গন্ধের যেমন পার্থক্য আছে, তেমনি গঠনগত পার্থক্যও আছে বেশ।

একটি ফুলের বিভিন্ন অংশ (Different Parts of a Flower)

একটি ফুলের বিভিন্ন অংশ থাকে। এর বিভিন্ন অংশের কাজ বিভিন্ন রকম। যে কোন একটি ফুল হাতে নিয়ে আমরা এর বিভিন্ন অংশ দেখতে পারি। একটি ধূতুরা ফুল নিয়ে তাতে কী কী অংশ আছে দেখি। ধূতুরা ফুলের বাইরে থেকে ভিতরের দিকের অংশগুলো হল :



চিত্র ১০.১ ফুলসহ একটি শাখা



পুষ্পের লম্বচ্ছেদ

চিত্র ১০.২ ধূতুরা ফুলের বিভিন্ন অংশ

১। ফুলের গোড়ায় একটি সরু সবুজ বোঁটা আছে। বোঁটার মাথাটা অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। এ প্রশস্ত অংশেই ফুলের অন্যান্য অংশ বিন্যস্ত থাকে। এ অংশকে **পুষ্পপত্রাধার** বা **থ্যালামাস (thalamus)** বলা হয়। সব ফুলেই থ্যালামাস থাকে, কিন্তু সব ফুলে বোঁটা থাকে না। বোঁটা থাকলে ফুলকে **সবৃন্তক ফুল** বলে (যেমন— ধুতুরা, জবা), বোঁটা না থাকলে ফুলকে **অবৃন্তক ফুল** (যেমন— কচু, রজনীগন্ধা) বলে।

কাজ : ফুলের অন্যান্য অংশ ধারণ করা; অবৃন্তক ফুলকে কাণ্ডের সাথে সংযুক্ত রাখা।

২। ফুলের বাইরে গোড়ার দিকে একটি সবুজ নলাকার অংশ দেখা যায়। এ নলের মাথা পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত। এ থেকে বোঝা যায় পাঁচটি খণ্ড মিলে এ নলাটি গঠন করেছে। ফুলের বাইরের দিকের এ সবুজ স্তবকটি হল **ক্যালিক্স (calyx)** বা **বৃত্তি**। যে পাঁচটি খণ্ড নিয়ে ক্যালিক্স গঠিত হয়েছে এর প্রতিটি খণ্ডকে বলা হয় **সেপাল (sepal)** বা **বৃত্যংশ**। বৃত্যংশগুলো পরস্পর সংযুক্ত থাকতে পারে (ধুতুরা), আবার পৃথকও থাকতে পারে (সরিষা)। জবা ফুলে বৃত্তির বাইরে বৃত্তির মত আর একটি স্তবক আছে। এ স্তবককে বলা হয় **এপিক্যালিক্স (epicalyx)** বা **উপবৃত্তি**।

কাজ : ফুলের অন্যান্য অংশকে মুকুলাবস্থায় বাইরের প্রতিকূল অবস্থা হতে রক্ষা করা বৃত্তির প্রধান কাজ।

৩। বৃত্তির পর ভিতরের দিকে লম্বা ফানেলের মত যে অংশটি আছে তা হল **করোলা (corolla)** বা **দলমণ্ডল**। পাঁচটি পেটাল (petal) তথা পাপড়ি মিলিতভাবে এ দলমণ্ডল গঠন করেছে। সাধারণত দলমণ্ডল যে কোন ফুলের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ। পাপড়িগুলো মিলিতভাবে অবস্থান করতে পারে (ধুতুরা) অথবা পরস্পর পৃথক থাকতে পারে (সরিষা)।

কাজ : পরাগায়নের জন্য পতঙ্গকে আকৃষ্ট করা এবং ভিতরের অন্যান্য স্তবককে রক্ষা করা দলমণ্ডলের প্রধান কাজ।

৪। দলমণ্ডলের ভিতরে গোড়ার দিকে সংযুক্ত পাঁচটি দণ্ডাকৃতির অঙ্গ আছে। প্রতিটি অঙ্গকে বলা হয় **স্ট্যামেন (stamen)** বা **পুংকেশর**। প্রতিটি পুংকেশর আবার দুটি অংশে বিভক্ত, গোড়ার সরু দণ্ডাকার অংশ হল **ফিলামেন্ট (filament)** বা **পুংদণ্ড** এবং মাথার স্ফীত অংশ হল **অ্যান্থার (anther)** বা **পরাগধানী**। পরাগধানীর ভেতরে **পোলেন গ্রেন (Pollen grain)** বা **পরাগরেণু** থাকে। একটি ফুলের সকল পুংকেশর মিলিতভাবে যে স্তবক গঠন করে তাকে বলা হয় **অ্যান্ড্রোসিয়াম (androecium)** বা **পুংস্তবক**।

কাজ : পরাগরেণু সৃষ্টি করাই পুংস্তবকের প্রধান কাজ।

৫। ফুলের কেন্দ্রে অবস্থিত অঙ্গটিকে **কার্পেল (carpel)** বা **গর্ভপত্র** বলা হয়। গর্ভপত্রের গোড়ার স্ফীত অংশ **ওভারি (ovary)** বা **গর্ভাশয়**, মধ্যখানের সরু দণ্ডাকার অংশ **স্টাইল (style)** বা **গর্ভদণ্ড** এবং একেবারে শীর্ষের দ্বিখন্ডিত অংশটি **স্টিগমা (stigma)** বা **গর্ভমুণ্ড**। গর্ভাশয়ের অভ্যন্তরে ডিম্বক থাকে। ডিম্বক পরে বীজে পরিণত হয়। ধুতুরা ফুলে দুটি গর্ভপত্র একত্রে সংযুক্ত অবস্থায় আছে। এক বা একাধিক গর্ভপত্র ফুলের যে স্তবক সৃষ্টি করে তাকে বলা হয় **গাইনোসিয়াম (gynoecium)** বা **স্ত্রীস্তবক**। গর্ভাশয়টি সাধারণত ফলে পরিণত হয়। জবা ফুলে পাঁচটি গর্ভপত্র মিলিতভাবে স্ত্রীস্তবক সৃষ্টি করেছে।

কাজ : ফল ও বীজ তৈরি করাই স্ত্রীস্তবকের কাজ।

উপরের আলোচনা হতে বোঝা যায় ধুতুরা ফুলে প্রধান পাঁচটি অংশ আছে। যথা : ১। থ্যালামাস বা পুষ্পপত্রাধার, ২। ক্যালিক্স বা বৃত্তি, ৩। করোলা বা দলমণ্ডল, ৪। অ্যান্ড্রোসিয়াম বা পুংস্তবক এবং ৫। গাইনোসিয়াম বা স্ত্রীস্তবক। এর মধ্যে থ্যালামাস হল একটি অক্ষ (axis) যার গায়ে বাকি চারটি স্তবক সজ্জিত থাকে।

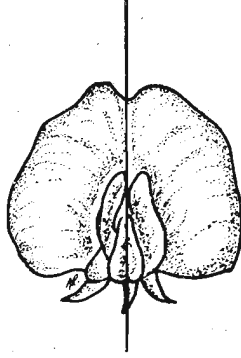
ধুতুরা ফুলে পাঁচটি অংশ আছে। কোন কোন ফুলে দু-একটি অংশ কম থাকতে পারে। যে ফুলে পাঁচটি অংশ আছে তাকে **আদর্শ ফুল** বলা যায়।

ফুলের কাজ : ফল ও বীজ উৎপাদনের মাধ্যমে উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি করাই ফুলের প্রধান কাজ। ফুলের পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবক বীজ উৎপাদনে সরাসরি অংশগ্রহণ করে বলে এদের বলা হয় **জনন স্তবক** বা **অত্যাৱশ্যকীয় স্তবক**। বৃত্তি ও দলকে বলা হয় **সাহায্যকারী স্তবক**।

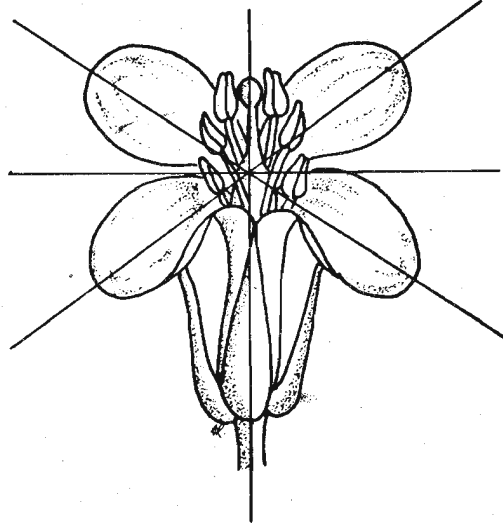
বিভিন্ন প্রকার ফুল (Different Kinds of Flower)

আমাদের চারপাশের বিভিন্ন ফুল নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে সব ফুল একই রকম নয়। রং ও গন্ধের মত এদের মধ্যে গঠনগত পার্থক্যও আছে প্রচুর। নিচে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

(ক) **পূর্ণতা অনুসারে :** ১। **সম্পূর্ণ ফুল (complete flower) :** যে ফুলে পাঁচটি অংশ আছে তাকে বলা হয় **সম্পূর্ণ ফুল**। ধুতুরা, জবা ফুল এগুলো সম্পূর্ণ ফুল।



একপ্রতিসম, অসমাজ



বহুপ্রতিসম, সমপূর্ণ, উভলিঙ্গ, সমাজ

চিত্র ১০. ৩ : একপ্রতিসম ও বহুপ্রতিসম ফুল

২। **অসম্পূর্ণ ফুল (incomplete flower)** : যে ফুলে পাঁচটি অংশ নেই তাকে বলা হয় অসম্পূর্ণ ফুল। লাউ, কুমড়া, শসা, ঝিঙা ইত্যাদি অসম্পূর্ণ ফুল। এসব ফুলে পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবক এর যে কোন একটি অনুপস্থিত থাকে।

(খ) **লিঙ্গানুসারে :**

১। **উভলিঙ্গ ফুল (bisexual flower)** : যে ফুলে পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবক উভয়ই আছে তাকে বলা হয় উভলিঙ্গ ফুল। ধুতুরা, জবা, সরিষা এগুলো উভলিঙ্গ ফুল।

২। **একলিঙ্গ ফুল (unisexual flower)** : যে ফুলে পুংস্তবক এবং স্ত্রীস্তবক এর যে কোন একটি থাকে তাকে বলা হয় একলিঙ্গ ফুল। যে ফুলে কেবল স্ত্রীস্তবক আছে তাকে বলা হয় স্ত্রী ফুল, আর যে ফুলে কেবল পুংস্তবক আছে তাকে বলা হয় পুরুষ ফুল। লাউ, কুমড়া, ঝিঙা এসব উদ্ভিদে একই গাছে স্ত্রী ফুল ও পুরুষ ফুল জন্মে থাকে।

(গ) **অঙ্গের সমতা অনুসারে :**

১। **সমাজ ফুল (regular flower)** : যে ফুলের প্রতিটি স্তবকের সদস্যগুলো আকার-আকৃতিগত দিক দিয়ে একই রকম হয় তাকে বলা হয় সমাজ ফুল। ধুতুরা, সরিষা, জবা ইত্যাদি সমাজ ফুল।

২। **অসমাজ ফুল (irregular flower)** : যে ফুলের যে কোন স্তবকের (বিশেষ করে বৃতি ও দল) সদস্যগুলো আকার ও আকৃতিগত দিক দিয়ে ভিন্ন রকম হয় তাকে বলা হয় অসমাজ ফুল। মটর, অপরাঞ্জিতা, শিম ইত্যাদি অসমাজ ফুল।

(ঘ) **প্রতিসমতা অনুসারে :**

১। **প্রতিসম ফুল (symmetric flower)** : যে ফুলকে তার কেন্দ্র দিয়ে খাড়াভাবে এক বা একাধিকবার সমান দুই অংশে ভাগ করা যায় তাহল প্রতিসম ফুল। প্রতিসম ফুল আবার দু প্রকার—

(i) **একপ্রতিসম (zygomorphic)** : যে ফুলকে তার কেন্দ্র দিয়ে খাড়াভাবে মাত্র একটি তলে সমান দু অংশে ভাগ করা যায় তাকে বলা হয় একপ্রতিসম ফুল। মটর, শিম, অপরাঞ্জিত ইত্যাদি একপ্রতিসম ফুল।

(ii) **বহুপ্রতিসম (actinomorphic)** : যে ফুলকে তার কেন্দ্র দিয়ে একাধিক তলে সমান দু খণ্ডে ভাগ করা যায় তাহল বহুপ্রতিসম ফুল। ধুতুরা, জবা, সরিষা হল বহুপ্রতিসম ফুল।

২। **অপ্রতিসম ফুল (asymmetric flower)** : যে ফুলকে কোন তলেই সমান দুভাবে ভাগ করা যায় না তাহল অপ্রতিসম ফুল। কলাবতী অপ্রতিসম ফুল।

(ঙ) **ব্র্যাক্ট-এর উপস্থিতি অনুসারে :**

১। **ব্র্যাক্টযুক্ত ফুল (bracteate flower)** : যে ফুলের গোড়ায় ব্র্যাক্ট থাকে তাকে বলা হয় ব্র্যাক্টযুক্ত ফুল। অতসী ব্র্যাক্টযুক্ত ফুল।

২। **ব্র্যাক্টিবিহীন ফুল (ebracteate flower)** : যে ফুলের গোড়ায় কোন ব্র্যাক্টি থাকে না সে ফুলকে বলা হয় ব্র্যাক্টিবিহীন ফুল। সরিষা ফুলে ব্র্যাক্টি থাকে না।

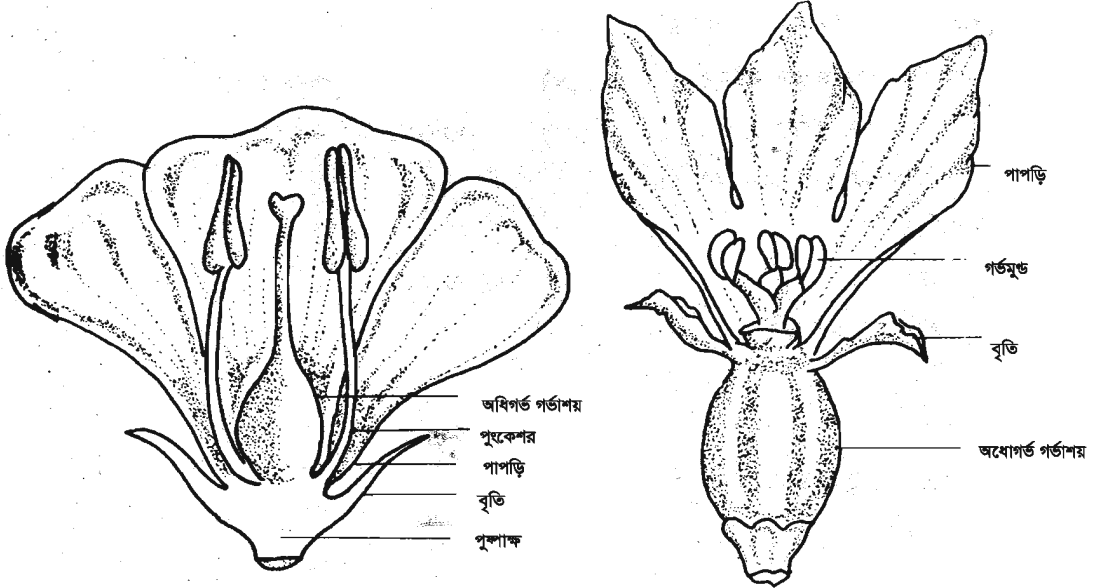
ব্র্যাক্টি হল ক্ষুদ্রাকৃতির পাতা বা পাতার মত অঙ্গ যার কক্ষে ফুল জন্মে থাকে।

(চ) গর্ভাশয়ের অবস্থান অনুসারে

১। **হাইপোগাইনাস ফুল (hypogynous flower)** : যে ফুলে বৃতি, দল ও পুষ্পতবক গর্ভাশয়ের নিচে অবস্থিত তাকে বলা হয় হাইপোগাইনাস ফুল। ধুতুরা, জবা, সরিষা, বেগুন, মরিচ এদের ফুল হাইপোগাইনাস।

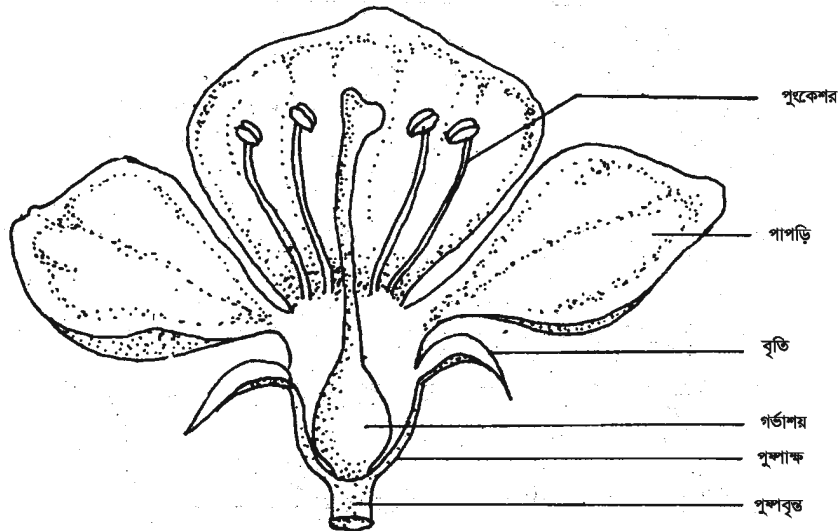
২। **এপিগাইনাস ফুল (epigynous flower)** : যে ফুলে বৃতি, দল ও পুষ্পতবক গর্ভাশয়ের উপরে অবস্থিত তাকে বলা হয় এপিগাইনাস ফুল। লাউ, কুমড়া, ঝিঙা এদের ফুল এপিগাইনাস।

৩। **পেরিগাইনাস ফুল (perigynous flower)** : যে ফুলে বৃতি, দল ও পুষ্পতবক গর্ভাশয়ের কটিদেশে (কোমর) অর্থাৎ গর্ভাশয়কে ঘিরে অবস্থিত তাকে বলা হয় পেরিগাইনাস ফুল। পেরিগাইনাস ফুলের পুষ্পাঙ্ক পেয়ালাকৃতির হয় এবং গর্ভাশয় পেয়ালার খাঁজের মধ্যে থাকে। যেমন গোলাপ।



চিত্র ১০. ৪ : হাইপোগাইনাস ফুল

চিত্র ১০. ৫ : এপিগাইনাস ফুল

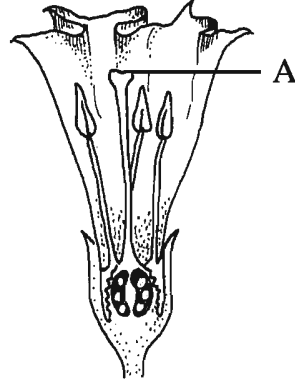


চিত্র ১০. ৬ : পেরিগাইনাস ফুল

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। চিত্রের A অংশটির কাজ কী?



চিত্র

- ক. নিষেকে সাহায্য করা
গ. ফল উৎপাদন করা

- খ. কীটপতঙ্গকে আকৃষ্ট করা
ঘ. বীজ উৎপাদন করা

২। জবা হচ্ছে একটি—

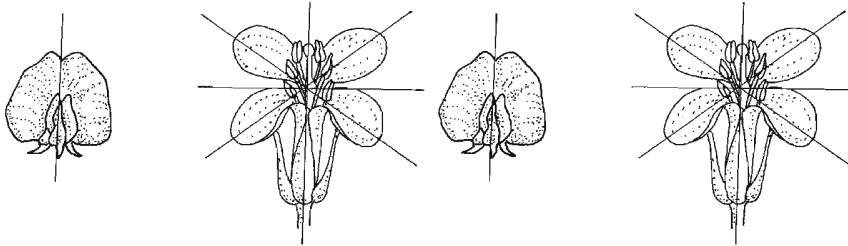
- i. হাইপোগাইনাস ফুল
ii. বহুপ্রতিসম ফুল
iii. একলিঙ্গ ফুল

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
গ. i ও iii

- খ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের চিত্রের আলোকে ৩নং ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



চিত্র-A

চিত্র-B

৩। A এর ক্ষেত্রে কোন কথাটি প্রযোজ্য?

- i. এক প্রতিসম ও অসমাজ্য
- ii. এক প্রতিসম ও সমাজ্য
- iii. মটর ও শিম জাতীয় ফুল

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
- খ. i ও iii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

৪। B নং চিত্রের ফুলটি—

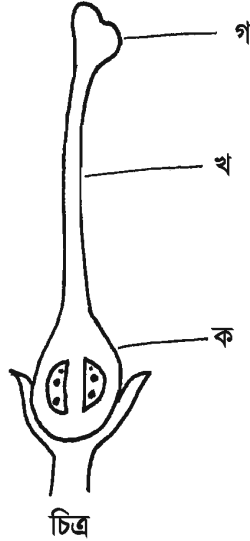
- i. বহুপ্রতিসম ও সমাজ্য
- ii. সম্পূর্ণ ও উভলিঙ্গ
- iii. জবা ও সরিষা জাতীয় ফুল

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
- খ. ii ও iii
- গ. i ও ii
- ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।



- ক. চিত্রের গ অংশটির নাম কী?
- খ. ক চিহ্নিত স্থানটির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
- গ. প্রদত্ত চিত্রটি ব্যবহার করে একটি সম্পূর্ণ ফুল আঁক এবং বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।
- ঘ. সাইকাস উদ্ভিদের স্ত্রীরেণু পত্রের সাথে প্রদর্শিত চিত্রটির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বর্ণনা কর।

অধ্যায় এগার

পরাগায়ন, নিষেক, ফল ও বীজের বিস্তরণ

পরাগায়ন

ফুলের প্রতিটি উর্বর পুংকেশরের মাথায় একটি পরাগধানী থাকে। পরাগধানীর ভিতরে পরাগরেণু (Pollen grain) উৎপন্ন হয়। একসময় পরাগধানী ফেটে যায় এবং পরাগরেণু কীটপতঙ্গ, বাতাস বা অন্য কোন বাহকের মাধ্যমে ফুলের (একই ফুলের বা একই গাছের অন্য একটি ফুলের অথবা একই প্রজাতির অন্য একটি গাছের কোন একটি ফুলের) গর্ভমুণ্ডের সাথে লেগে যায়। পরাগধানী হতে পরাগরেণু স্থানান্তরিত হয়ে ফুলের গর্ভমুণ্ডে পতিত হওয়াকে পলিনেশন (pollination) বা পরাগায়ন বলে।

পরাগায়ন দু প্রকার : ১। স্ব-পরাগায়ন (self pollination) ও ২। পর-পরাগায়ন (cross pollination)

১। স্ব-পরাগায়ন (self-pollination) : পরাগধানী হতে পরাগরেণু স্থানান্তরিত হয়ে একই ফুলের গর্ভমুণ্ডে অথবা একই গাছের অন্য একটি ফুলের গর্ভমুণ্ডে পতিত হওয়াকে স্ব-পরাগায়ন বলে। স্ব-পরাগায়নে দুটি ফুলের জিনোটাইপ (জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী বস্তুর সমষ্টি) একই রকম থাকে। প্রকৃতিতে অল্পসংখ্যক উদ্ভিদেই স্ব-পরাগায়ন ঘটে। শিম, টমোটো, কালশিরা ইত্যাদি উদ্ভিদে স্ব-পরাগায়ন ঘটে।



চিত্র ১১.১ : স্ব-পরাগায়ন ও পর-পরাগায়ন

২। পর-পরাগায়ন (cross-pollination) : পরাগধানী হতে পরাগরেণু স্থানান্তরিত হয়ে একই প্রজাতির অন্য একটি গাছের ফুলের গর্ভমুণ্ডে পতিত হওয়াকে পর-পরাগায়ন বলে। পর-পরাগায়নে দুটি ফুলের জিনোটাইপ কিছুটা ভিন্নতর থাকে। প্রকৃতিতে অধিক সংখ্যক উদ্ভিদেই পর-পরাগায়ন ঘটে। ধান, গম, ভুট্টা, সরিষা, শিমুল, মাদার, আম ইত্যাদি উদ্ভিদে পর-পরাগায়ন ঘটে।

স্ব-পরাগায়নের গুরুত্ব : একই জিনোটাইপ সম্পন্ন দুটি ফুলের মধ্যে স্ব-পরাগায়ন ঘটে তাই এর ফলে যে বীজ উৎপন্ন হয় তাতে জিনোটাইপের কোন পরিবর্তন হয় না। কাজেই ঐ বীজ থেকে যে গাছ হয় তার বৈশিষ্ট্য হুবহু মাতৃ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ থাকে। এভাবে বংশানুক্রমে বৈশিষ্ট্য একই রকম থাকে অর্থাৎ প্রজাতির বিশুদ্ধতা রক্ষিত হয়। এটাই স্ব-পরাগায়নের সবচেয়ে বড় গুরুত্ব।

স্ব-পরাগায়নের সুবিধা বা উপকারিতা

- ১। পরাগায়ন অনেকটা নিশ্চিত।
- ২। পরাগরেণু নষ্ট হয় খুবই কম।
- ৩। প্রজাতির বিশুদ্ধতা রক্ষিত হয়।
- ৪। বাহকের ওপর কম নির্ভরশীল।

স্ব-পরাগায়নের অসুবিধা বা অপকারিতা

- ১। বংশ পরম্পরায় কোন নতুন গুণের বিকাশ ঘটে না।
- ২। কম সহনশীল ও কম জীবনী শক্তিসম্পন্ন বীজের সৃষ্টি হয়।
- ৩। নতুন বংশধরদের অভিযোজন ক্ষমতা কমে যায়।
- ৪। কোন একসময় প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটতে পারে।

পর-পরাগায়নের গুরুত্ব

ভিন্নতর জিনোটাইপ সম্পন্ন দুটি ফুলের মধ্যে পর-পরাগায়ন ঘটে। তাই এর ফলে যে বীজ উৎপন্ন হয় তাতে জিনোটাইপের পরিবর্তন হয়। কাজেই এ বীজ থেকে যে নতুন গাছ সৃষ্টি হয় তার বৈশিষ্ট্য হুবহু মাতৃ উদ্ভিদের অনুরূপ হয় না। এর ফলে বংশধরদের মাঝে নতুন প্রকরণ এমনকি নতুন প্রজাতিও সৃষ্টি হতে পারে। জীনের সখমিশ্রণের ফলে অধিক গাছপালার অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তাই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটান সম্ভাবনা থাকে না।

পর-পরাগায়নের সুবিধা বা উপকারিতা

- ১। নতুন চরিত্রের সখমিশ্রণ হয়।
- ২। নতুন প্রকরণ সৃষ্টি হতে পারে।
- ৩। বীজ অধিক জীবনীশক্তিসম্পন্ন ও অধিক সহনশীল হয়।
- ৪। নতুন বংশধরদের অভিযোজন ক্ষমতা বেড়ে যায়।

পর-পরাগায়নের অসুবিধা বা অপকারিতা

- ১। পরাগায়ন বাহকের ওপর নির্ভরশীল।
- ২। পরাগায়ন অনেকটা অনিশ্চিত।
- ৩। অনেক পরাগরেণু নষ্ট হয়।
- ৪। প্রজাতির বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়।

স্ব-পরাগায়ন ও পর-পরাগায়নের মধ্যে পার্থক্য

স্ব-পরাগায়ন	পর-পরাগায়ন
১। একই ফুলের মধ্যে বা একই উদ্ভিদের দুটি ফুলের মধ্যে সংঘটিত হয়।	১। একই প্রজাতির দুটি ভিন্ন উদ্ভিদের ফুলের মধ্যে সংঘটিত হয়।
২। সাধারণত ফুল ফোটার আগেই পরাগায়ন ঘটে।	২। ফুল ফোটার পর পরাগায়ন ঘটে।
৩। কাছাকাছি একই প্রজাতির অন্য উদ্ভিদের প্রয়োজন হয় না।	৩। কাছাকাছি একই প্রজাতির অন্য উদ্ভিদের প্রয়োজন হয়।
৪। বাহকের ওপর কম নির্ভরশীল।	৪। বাহকের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।
৫। প্রজাতির বিশুদ্ধতা রক্ষিত হয়।	৫। প্রজাতির বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়।
৬। নতুন প্রকরণ সৃষ্টি হয় না।	৬। নতুন প্রকরণ সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে।

পরাগায়নের মাধ্যম বা বাহক

পরাগায়ন, বিশেষ করে পর-পরাগায়ন, পতঙ্গ, বায়ু, প্রাণী এবং পানি- এ চারটি বাহকের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। নিচে এ সম্বন্ধে সর্বাঙ্গীণ আলোচনা করা হল।

১। পতঙ্গের মাধ্যমে পরাগায়ন : অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পতঙ্গ মধু আহরণ কালে এক ফুলের পরাগরেণু অন্য ফুলে স্থানান্তর করে পরাগায়ন ঘটিয়ে থাকে। পতঙ্গের মাধ্যমে যে ফুলের পরাগায়ন ঘটে তাদের পতঙ্গপরাগী ফুল (entomophilous flower) বলে। সরিষা, তুলসি, অর্কিড, গোলাপ, কুমড়া-এরা পতঙ্গপরাগী ফুল।

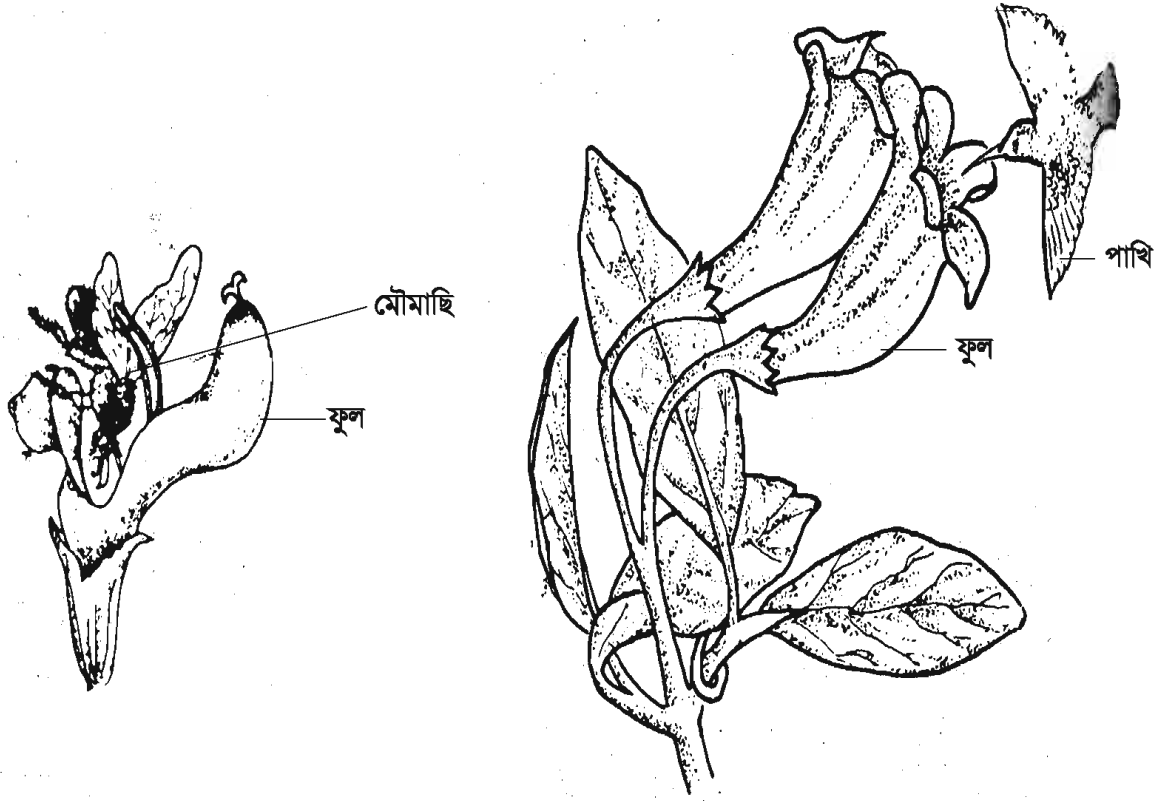
পতঙ্গপরাগী ফুলের বৈশিষ্ট্য

- ১। ফুল উজ্জ্বল বর্ণের হয়।
- ২। অধিকাংশ ফুলে সুগন্ধ থাকে।
- ৩। ফুলের গোড়ায় মধু থাকে।
- ৪। পরাগরেণু আঠালো হয়।
- ৫। গর্ভমুন্ড আঠালো হয়।

২। বায়ুর মাধ্যমে পরাগায়ন : অনেক উদ্ভিদের পরাগায়ন বায়ুর সাহায্যে সংঘটিত হয়। যে ফুলের পরাগায়ন বায়ুর সাহায্যে হয় তাকে বায়ুপরাগী ফুল (anemophilous flower) বলে। ধান, গম, ভুট্টা, ইক্ষু, তাল ইত্যাদি বায়ুপরাগী ফুল।

বায়ুপরাগী ফুলের বৈশিষ্ট্য :

- ১। ফুল সাধারণত অনাকর্ষণীয় ও অনুজ্জ্বল বর্ণের হয়।
 - ২। ফুলে সাধারণত মিষ্টি গন্ধ, মধু ইত্যাদি থাকে না।
 - ৩। পরাগরেণু খুব হালকা ও সংখ্যায় অনেক উৎপন্ন হয়।
 - ৪। গর্ভমুন্ড সাধারণত পক্ষল, বৃহৎ ও আঠালো হয় যাতে বাতাসে ভেসে আসা পরাগরেণু সহজেই আটকে যেতে পারে।
- পাতার সাহায্যে : পাথরকুচি গাছের প্রজনন এর পাতার মাধ্যমে হয়ে থাকে। পাতা মাটিতে ফেলে রাখলে এর কিনারের



চিত্র ১১.২ : পতঙ্গপরাগী ফুল

চিত্র ১১.৩: প্রাণিপরাগী ফুল

৩। প্রাণীর মাধ্যমে পরাগায়ন : অনেক ফুলের পরাগায়ন পাখি, বাদুড়, শামুক ইত্যাদি প্রাণীর মাধ্যমে সংঘটিত হয়। যে ফুলের পরাগায়ন প্রাণীর মাধ্যমে হয় তাদের প্রাণিপরাগী ফুল (zoophilous flower) বলে। মাদার, শিমুল, কদম হল প্রাণিপরাগী ফুল।

প্রাণিপরাগী ফুলের বৈশিষ্ট্য :

- ১। ফুল সাধারণত বড় হয়।
- ২। উজ্জ্বল বর্ণের হয়।

৪। পানির মাধ্যমে পরাগায়ন : অনেক জলজ উদ্ভিদের পরাগায়ন পানির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। পানির মাধ্যমে পরাগায়ন সম্পন্ন হলে তাকে পানিপরাগী ফুল (hydrophilous flower) বলে। পাতা শেওলা, ঝাউঝাউ উদ্ভিদের পরাগায়ন পানির মাধ্যমে হয়।

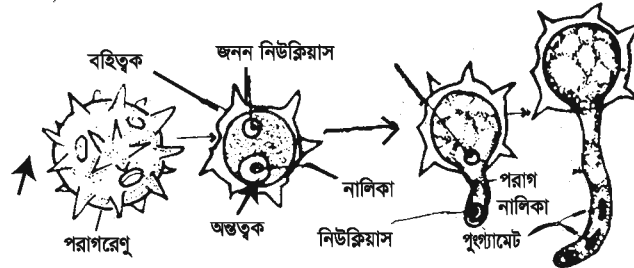
পানিপরাগী ফুলের বৈশিষ্ট্য :

- ১। পুষ্প সাধারণত একলিঙ্গ।
- ২। পানির নিচে এদের জন্ম।
- ৩। স্ত্রী ফুল একক এবং লম্বা বোঁটায়ুক্ত।
- ৪। পুরুষ ফুল হাল্কা, পানির উপর ভেসে ভেসে স্থানান্তরিত হয়।

নিষেক

আমরা জানি ফুলের গর্ভাশয়ের ভিতরে ডিম্বক নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গ থাকে। এই ডিম্বকগুলো পরে বীজ-এ পরিণত হয়। আমরা আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল ইত্যাদি ফলে যে বীজ দেখতে পাই, তা ডিম্বকেরই পরিণত রূপ। ডিম্বক যখন ধীরে ধীরে বীজে পরিণত হয়, ঠিক একই সময়ে ফুলের গর্ভাশয়টিও ধীরে ধীরে ফল-এ পরিণত হয়। নিষেকের ফলেই ডিম্বকগুলো বীজে পরিণত হয়। সাধারণত নিষেক ছাড়া কোন ডিম্বক বীজে পরিণত হতে পারে না। আবার নিষেকের কারণেই গর্ভাশয়টি ফলে পরিণত হয়। নিষেকের জন্য পুংজনন কোষ ও স্ত্রীজনন কোষ সৃষ্টি হতে হয়। পুষ্পক উদ্ভিদে পুংজনন কোষ ও স্ত্রীজনন কোষের মিলনকেই নিষেক বলে।

পুংজনন কোষ সৃষ্টি (formation of male gamete) : পরাগধানীর অভ্যন্তরে থাকে পরাগ মাতৃকোষ (Pollen mother cell)। মিয়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে প্রতিটি পরাগ মাতৃকোষ হতে চারটি পরাগরেণু উৎপন্ন হয়। প্রতিটি পরাগরেণুর দুটি আবরণ থাকে, বাইরের আবরণকে বলা হয় এক্সাইন (exine) এবং ভেতরের আবরণকে বলা হয় ইন্টাইন (intine)। এক্সাইন আবরণে জার্মপোর (germpore) নামক ছিদ্র থাকে। পরাগরেণুর নিউক্লিয়াসটি মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে টিউব নিউক্লিয়াস (tube nucleus) এবং জেনারেটিভ নিউক্লিয়াস (generative nucleus) সৃষ্টি করে। সাধারণত এ দুই নিউক্লিয়াস অবস্থায় পরাগায়ন ঘটে।



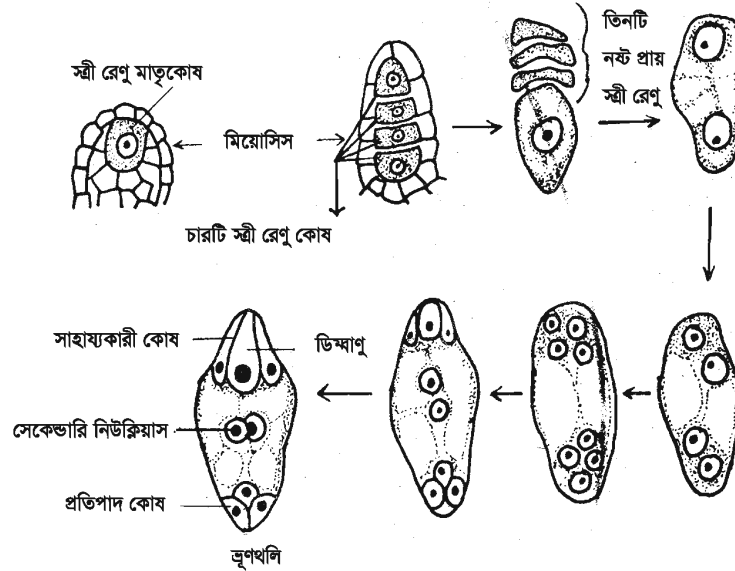
চিত্র ১১.৪ : পুংগ্যামেট সৃষ্টির বিভিন্ন ধাপ

পরাগায়নের ফলে পরাগরেণুটি গর্ভমুণ্ডের সাথে লেগে যায় এবং পরাগরেণু হতে একটি পরাগ নালিকা (Pollen tube) সৃষ্টি হয়। নালিকাটি গর্ভমুণ্ডের ভিতর দিয়ে ক্রমশ গর্ভাশয়ের দিকে বাড়তে থাকে। পরাগ নালিকার ভেতরে প্রথমে টিউব নিউক্লিয়াস ও পরে জেনারেটিভ নিউক্লিয়াসে প্রবেশ করে। জেনারেটিভ নিউক্লিয়াসটি মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে দুটি পুংজনন কোষ তথা শুক্রাণু সৃষ্টি করে। পুংজনন কোষটি হ্যাণ্ডয়েড।

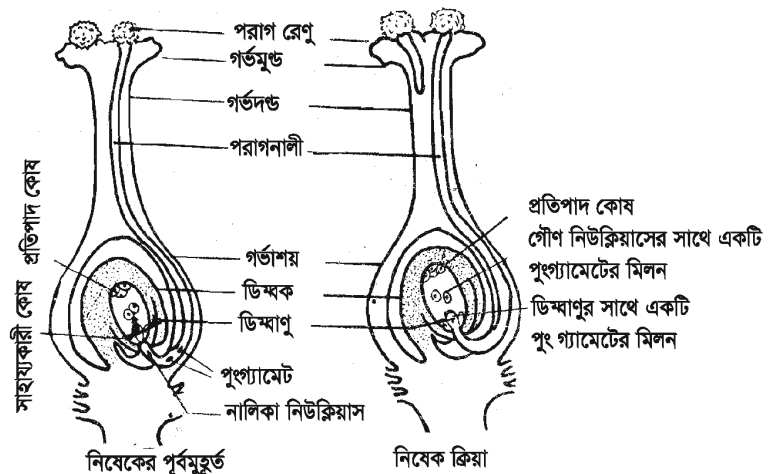
স্ত্রীজনন কোষ সৃষ্টি (formation of female gamete) : ফুলের গর্ভাশয়ের অভ্যন্তরে ডিম্বক থাকে। ডিম্বকের অভ্যন্তরে একটি স্ত্রীজনন মাতৃকোষ (Megaspore mother cell) সৃষ্টি হয়। এ কোষটি মিয়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে চারটি হ্যাণ্ডয়েড স্ত্রীরেণু কোষ সৃষ্টি করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চারটি কোষের মধ্যে তিনটি নষ্ট হয়ে যায় এবং একটি বড় হয়। জীবিত বড় কোষটি নিউক্লিয়াস মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে প্রথম একটি থেকে দুটি, পরে দুটি থেকে চারটি এবং শেষে চারটি থেকে আটটি নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। এ আটটি নিউক্লিয়াস একটি থলির ন্যায় অঙ্গের দুই মেরুতে অবস্থান করে। থলির সেকেন্ডারি থলির ন্যায় এ অঙ্গকে ভ্রূণথলি (embryo sac) বলে। ভ্রূণথলির দুই মেরু

হতে একটি করে নিউক্লিয়াস থলির মাঝখানে চলে আসে এবং পরস্পর মিলিত হয়ে একটি একক সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস (secondary nucleus) উৎপন্ন করে। ডিম্বক রন্ধ্রের দিকে অবস্থিত মেদুর তিনটি নিউক্লিয়াসকে একত্রে বলা হয় ডিম্বাণু যন্ত্র (egg apparatus)। ডিম্বাণু যন্ত্রের তিনটি নিউক্লিয়াসের মাঝখানেরটি অপেক্ষাকৃত বড় এবং এটি হল ডিম্বাণু বা এগ (egg or ovum)। ডিম্বাণুর দু পাশের দুটি হল সিনারজিড (Synergid)। ডিম্বাণুই হল স্ত্রীজনন কোষ বা স্ত্রীগ্যামেট। ভ্রূণথলির অপর তিনটি নিউক্লিয়াসকে বলা হয় প্রতিপাদ নিউক্লিয়াস। ডিম্বাণু হ্যাণ্ড্রেড।

স্ত্রীজনন কোষ ও পুংজনন কোষের মিলন : পরাগ নালিকাটি গর্ভদণ্ডের ভিতর দিয়ে ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ডিম্বকের ভ্রূণথলিতে পৌঁছায়। ভ্রূণথলিতে পৌঁছানোর পর নালিকার অগ্রভাগ ফেটে যায় এবং পুংজনন কোষ দুটি যুক্ত হয়। একটি পুংজনন কোষ (শুক্রাণু) স্ত্রীজনন কোষের সাথে (ডিম্বাণুর সাথে) মিলিত হয়ে নিষেক সম্পন্ন করে। অপর পুংজনন কোষটি সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হয়, এ মিলনকে ত্রিমিলন (triple fusion) বলে। এ পদ্ধতিকে দ্বিনিষেক (double fertilization) বলা হয়।



চিত্র ১১. ৫ : স্ত্রীগ্যামেট সৃষ্টির বিভিন্ন ধাপ



চিত্র ১১.৬ : গুস্তবীজী উদ্ভিদে নিষেকক্রিয়া

নিষেক প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ : উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় নিষেক প্রক্রিয়ার ধাপ তিনটি, যথা— ১। পুংজনন কোষ সৃষ্টি, ২। স্ত্রীজনন কোষ সৃষ্টি এবং ৩। পুং ও স্ত্রীজনন কোষের মিলন।

ভ্রূণ সৃষ্টি (development of embryo) : নিষেকের পর ভ্রূণ সৃষ্টি হয়। স্ত্রী ও পুংজনন কোষের মিলনের ফলে সৃষ্টি হয় ডিপলয়েড জাইগোট। একে নিষিক্ত ডিম্বাণুও বলা যায়। জাইগোট কোষটি কিছু সময় (ঘণ্টা, দিন, মাস ও হতে পারে) বিশ্রাম অবস্থায় থাকে। বিশ্রাম অবস্থা শেষ হলে কোষটি প্রথমে আড়াআড়িভাবে বিভক্ত হয়ে দ্বিকোষী প্রাথমিক ভ্রূণ (pro-embryo) গঠন করে। দ্বিকোষী প্রাথমিক ভ্রূণটি পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে বিভিন্নভাবে বিভাজিত হয়ে একটি ভ্রূণে পরিণত হয়। একটি ভ্রূণে থাকে বীজপত্র (cotyledon) এবং ভ্রূণাক্ষ (axis)। ভ্রূণাক্ষের উপরের অংশ হল ভ্রূণমুকুল (plumule) এবং নিম্নাংশ হল ভ্রূণমূল (radicle)। একবীজপত্রী উদ্ভিদের ভ্রূণে একটি বীজপত্র থাকে (নারিকেল, ধান, গম, কচু ইত্যাদি) এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের ভ্রূণে দুটি বীজপত্র থাকে (আম, শিম, ছোলা, মটর ইত্যাদি)।

সস্যের উৎপত্তি (development of endosperm) : সস্য বা শাঁস হল বীজের একটি অত্যাবশ্যক অবয়ব। বৃন্দ্রিত ভ্রূণের খাদ্য এ সস্যে প্রথম জমা হয় এবং সস্য হতেই ভ্রূণ খাদ্য আহরণ করে। ভ্রূণথলির সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে একটি পুংজনন কোষের মিলনের মাধ্যমে যে ট্রিপ্লয়েড (triploid) কোষ গঠিত হয়, তাই হল সস্যের প্রথম কোষ। এ ট্রিপ্লয়েড কোষটি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে পরিপূর্ণ সস্য গঠন করে। সস্য ট্রিপ্লয়েড অর্থাৎ তিনটি নিউক্লিয়াস যুক্ত হয়ে এটি গঠিত হয়।

অনেক উদ্ভিদে পরিণত বীজে সস্যটিসু বিদ্যমান। অঙ্কুরোদগম কালে ভ্রূণ সস্যটিসু হতে খাদ্য গ্রহণ করে। এ ধরনের বীজকে সস্যলবীজ (endospermic seed) বলে, যেমন— ধান, গম, রেড়ি। আবার অনেক উদ্ভিদে সস্যটিসু শোষিত হয়ে বীজপত্রে জমা হয় এবং বীজের অঙ্কুরোদগম কালে খরচ হয়। এ ধরনের বীজকে অসস্যলবীজ (non-endospermic seed) বলে। ছোলা, মটর, আম এ ধরনের বীজ।

নিষেকের পর গর্ভাশয় পরিণত হয়ে ফলের সৃষ্টি করে এবং ডিম্বক পরিণত হয়ে বীজের উৎপত্তি করে। ডিম্বাশয়ের কোন অংশ হতে ফলের কোন অংশ এবং ডিম্বকের কোন অংশ হতে বীজের কোন অংশ সৃষ্টি হয় তা নিচে দেখানো হল।

ডিম্বাশয় থেকে ফলের উৎপত্তি		ডিম্বক থেকে বীজ-এর উৎপত্তি	
১। ডিম্বাশয় (গর্ভাশয়)	১। ফল	১। ডিম্বক	১। বীজ
২। ডিম্বাশয় ত্বক	২। ফলত্বক	২। ডিম্বক ত্বক	২। বীজ ত্বক
৩। ডিম্বক	৩। বীজ	৩। ডিম্বাণু	৩। ভ্রূণ
		৪। সস্যকোষ	৪। সস্য
		৫। ডিম্বক রন্ধ্র	৫। বীজ রন্ধ্র
		৬। ডিম্বক নাড়ী	৬। বীজের বোঁটা

নিষেকের তাৎপর্য

নিষেকের ফলে ফলের গর্ভাশয় ফলে পরিণত হয় এবং ডিম্বকসমূহ বীজ-এ পরিণত হয়। বীজ উদ্ভিদের বংশরক্ষা করে এবং বংশবৃদ্ধি করে। বীজের সৃষ্টি না হলে হয়ত উদ্ভিদকুল বিলীন হয়ে যেত। অন্যভাবে বলা যায় নিষেক না ঘটলে উদ্ভিদকুল বিলীন হয়ে যেত। আবার উদ্ভিদের ফল এবং বীজ খেয়ে প্রাণিকুল, বিশেষ করে মানবজাতি বেঁচে আছে। নিষেক না ঘটলে ফল এবং বীজের সৃষ্টি হত না। ফলে খাদ্যের অভাবে প্রাণিকুল বিশেষ করে মানবজাতি ধ্বংস হয়ে যেত। কাজেই নিষেক ক্রিয়ার তাৎপর্য অপরিসীম।

ফল ও বীজের বিস্তরণ

একটি গাছে সাধারণত অসংখ্য ফল ও বীজ সৃষ্টি হয়। কোন কোন ফল মানুষ নিজের স্বার্থেই বহন করে এখানে-ওখানে নিয়ে যায়, যেমন লিচু, আম, কাঁঠাল। কোন কোন গাছের ফল ও বীজ গাছের নিচেই পড়ে থাকে। আবার কোন কোন গাছের ফল বা বীজ বিভিন্ন বাহকের মাধ্যমে মাতৃউদ্ভিদ হতে অনেক দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। ফল ও বীজ এদের উৎপাদনকারী গাছ হতে বিভিন্ন উপায়ে দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়াকে বিস্তরণ (dispersal) বলা হয়। সাধারণত নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াগুলোর মাধ্যমে ফল ও বীজের বিস্তরণ ঘটে থাকে। এ সম্বন্ধে এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

১। বাতাসে উড়ে বিস্তরণ : অনেক গাছের ফল ও বীজ বাতাসে উড়ে দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। এ ধরনের ফল বা বীজগুলো সাধারণত হালকা, ক্ষুদ্র এবং নানা প্রকার উপাঙ্গা বিশিষ্ট হয়। ফলে এদের সহজেই বাতাস এখানে-ওখানে নিয়ে যেতে পারে। শালের ফলে পাখনা থাকে, সূর্যমুখী ফলে প্যাপাস থাকে, ছাগলবটির ফলে সূত্রময় লম্বা গর্ভদণ্ড থাকে, মেহগনি ও সজিনা বীজে চ্যাপ্টা উপাঙ্গা থাকে, আকন্দ ও ছাতিমের বীজ আঁশযুক্ত থাকে। তাই এদের ফল বা বীজ সহজেই বাতাসে উড়ে দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়তে পারে। ছাতিম ও আকন্দের বীজকে আমরা প্রায়ই বাতাসে ভেসে যেতে দেখি।

২। পানিতে ভেসে বিস্তরণ : শাপলা, পদ্ম এমনকি নারিকেলও পানিতে ভেসে ভেসে দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। এদের ফল বা বীজগুলো সাধারণত তন্তুময়স্তর বা স্পঞ্জিটিস্যু দিয়ে আবৃত থাকে। তাই সহজেই পানিতে ভেসে বেড়াতে পারে।

৩। স্ফুটন কক্ষনের সাহায্যে বিস্তরণ : কিছু কিছু ফল আছে যা ফেটে যাবার সময় কাঁপনের সৃষ্টি হয়। সে কাঁপনের ফলে বীজগুলো বেশ দূরে ছড়িয়ে পড়ে। রেড়ি, দোপাটি, মটরশুঁটি এ জাতীয় ফল।

৪। প্রাণীর গায়ে লেগে বিস্তরণ : কিছু কিছু উদ্ভিদের ফল প্রাণীর গায়ে লেগে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। প্রেম কাঁটা, আপাং (এদের গায়ে কাঁটা থাকে), পুনর্নভা, চিতা (এদের গায়ে আঠালো গ্রন্থি থাকে), খাগড়া (এর গায়ে আঁটা থাকে), ইত্যাদি ফল বিভিন্ন পশুর গায়ে, এমনকি মানুষের কাপড়ে লেগে স্থানান্তরিত হয়।

৫। পাখির সাহায্যে বিস্তরণ : কিছু কিছু ফল পাখি ঠোঁটে করে অনেক দূরে নিয়ে যায়। লিচু এ জাতীয় ফল। কিছু কিছু ফল পাখি খেয়ে থাকে কিন্তু এদের বীজ হজম হয় না। এসব বীজ মলের সাথে বেরিয়ে আসে এবং তা হতে চারা হয়। খেজুর, পেয়ারা, তেঁতুল, বট এ জাতীয় ফল।

এ ছাড়া মানুষ ইচ্ছে করেই অনেক ফল ও বীজ একস্থান থেকে অন্যস্থানে, এমনকি একদেশে থেকে অন্যদেশে নিয়ে যায়।

ফল ও বীজ বিস্তরণের গুরুত্ব

অনুকূল পরিবেশ না পেলে বীজের অঙ্কুরোদগম হয় না। আবার অনুকূল পরিবেশ না পেলে চারাগাছও বড় হতে পারে না। কোন গাছের সবগুলো ফল বা বীজ যদি ঐ গাছের নিচেই পড়ে তাহলে প্রয়োজনীয় জায়গা, পানি ও আলো-বাতাসের অভাবে এদের অধিকাংশই অঙ্কুরিত হবে না। যে কটি বীজ অঙ্কুরিত হয়ে চারায় পরিণত হবে গাছের ছায়ার কারণে এদেরও অনেকগুলো মরে যাবে। বাকি যে কটি টিকে থাকবে সেগুলোও ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যাবে। কাজেই গাছপালার অস্তিত্ব রক্ষা ও বংশবৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ পাবার জন্যই এদের ফল ও বীজের বিস্তরণ প্রয়োজন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বিস্তরণের জন্য সূর্যমুখী ফুলে কোনটি থাকে?

ক. পাখনা

খ. প্যাপাস

গ. কাঁটা

ঘ. আঁঠা

২। কোনটি ডিপ্লয়েড?

i. ডিম্বক

ii. ভ্রূণ

iii. বীজ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

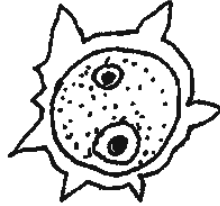
গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

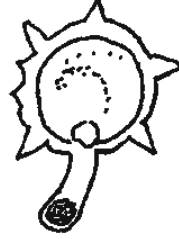
নিচের চিত্র অবলম্বনে ৩নং ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



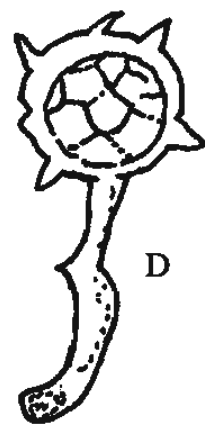
A



B



C



D

চিত্রে পুঙ্জনন কোষ সৃষ্টির বিভিন্ন ধাপ দেখানো হল।

৩। চিত্রে পরাগায়ন ঘটান ধাপ কোনটি?

ক. A

খ. B

গ. C

ঘ. D

৪। কোন উদ্ভিটি সঠিক?

ক. ধাপ A মাইটোসিসের ফলে সৃষ্ট হয়েছে

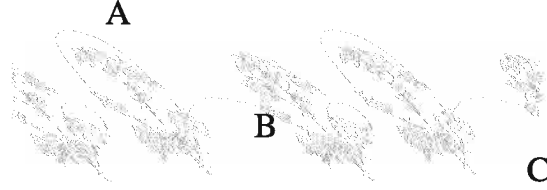
খ. ধাপ B মিয়োসিসের ফলে সৃষ্ট হয়েছে

গ. ধাপ C হচ্ছে ডিপ্লয়েড দশা

ঘ. ধাপ D হচ্ছে ট্রিপ্লয়েড দশা

সৃজনশীল প্রশ্ন

- ১। পরাগায়ন সপুষ্পক উদ্ভিদের যৌনজনন সম্পাদনের প্রাথমিক প্রক্রিয়া। নিচের চিত্রে দুটি ফুলের মধ্যে পরাগরেণু স্থানান্তরিত হওয়ার বিষয়টি তীর চিহ্ন দিয়ে দেখানো হল।



চিত্র-১

চিত্র-২

- ক. ফুলের পরাগরেণু কোথায় থাকে?
- খ. ২নং চিত্রের ফুলগুলো কোন লিঙ্গের এবং কেন?
- গ. সার্থক পরাগায়নের জন্য A অপেক্ষা C অধিকতর সুবিধাজনক কেন তা ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. চিত্রে B ও C চিহ্ন দ্বারা নির্দেশিত পরাগায়নের ফলে তাদের পরবর্তী বংশধরে কী ধরনের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা বিশ্লেষণ কর।

অধ্যায় বার

উদ্ভিদের প্রজনন

একটি কাঁঠাল গাছ লাগাতে হলে আমরা প্রথমে একটি কাঁঠালের বীজ লাগিয়ে থাকি। কারণ কাঁঠালের বীজ থেকেই কাঁঠাল গাছের জন্ম হয়। এমনিভাবে জামের বীজ থেকে পাই জাম গাছ, নারিকেল থেকে পাই নারিকেল গাছ, পাটের বীজ থেকে পাট গাছ, ধান থেকে পাই ধান গাছ আবার কখনো কখনো গাছের ডাল কেটে কলম দিয়ে তা থেকেও নতুন গাছ জন্মাতে পারি। একটি গাছের তারই অনুরূপ আর একটি গাছ জন্ম দেয়ার এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় প্রজনন (reproduction)। প্রজনন জীবের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

প্রজননের প্রকারভেদ

আমরা বীজ থেকেও নতুন গাছ জন্মাতে পারি, আবার গাছের কোন অঙ্গ থেকেও নতুন গাছ জন্মাতে পারি। কাজেই প্রজননের প্রক্রিয়া একরকম নয়। নিচে বিভিন্ন প্রকার প্রজনন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

১। যৌন প্রজনন (sexual reproduction) : নিম্নে অধ্যায়ে আমরা জেনেছি পুংজনন কোষ ও স্ত্রীজনন কোষের মিলনের ফলে সৃষ্টি হয় বীজ। বীজ হল যৌন মিলনের ফল। কাজেই বীজের মাধ্যমে যে প্রজনন হয় তা হল যৌন প্রজনন। ধান, গম, ভুট্টা, জাম, কাঁঠাল এসব গাছ আমরা বীজ থেকে পেয়ে থাকি।

২। অযৌন প্রজনন (asexual reproduction) : বীজ ছাড়া গাছের অন্য যে কোন অঙ্গের মাধ্যমে যে প্রজনন হয় তা হল অযৌন প্রজনন। অযৌন প্রজনন আবার দু'রকম হতে পারে, যথা— (ক) অযৌন অণুবীজের (Spore) মাধ্যমে এবং (খ) দেহ অঙ্গের মাধ্যমে। শৈবাল, ছত্রাক, মস, ফার্ন প্রভৃতি উদ্ভিদে অণুবীজের (Spore) মাধ্যমে প্রজনন হয়ে থাকে।

(৩) অঙ্গজ প্রজনন (vegetative reproduction) : দেহ অঙ্গের মাধ্যমে যে প্রজনন হয় তাকে সাধারণত অঙ্গজ প্রজনন বলা হয়। গাছের মূল, কাণ্ড, পাতা প্রভৃতি অঙ্গের মাধ্যমে অঙ্গজ প্রজনন হয়ে থাকে। অঙ্গজ প্রজনন আবার দু'প্রকার, যথা— ১। স্বাভাবিক (natural or normal) এবং ২। কৃত্রিম (artificial)।

স্বাভাবিক অঙ্গজ প্রজনন : একটি আলু বা একটি মিষ্টি আলু, কাঁকরোর একটি মূল অথবা মাদার গাছের একটি ডাল উপযুক্ত পরিবেশে লাগিয়ে দিলে তা থেকে স্বাভাবিকভাবেই নতুন গাছের জন্ম হয়। আম গাছের একটি ডাল কেটে লাগিয়ে দিলে তা থেকে কখনো নতুন গাছের জন্ম হয় না; ডালটি মরে যায়। গাছের কোন অঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই নতুন গাছের জন্ম দিলে তাকে বলা হয় স্বাভাবিক অঙ্গজ প্রজনন। স্বাভাবিক অঙ্গজ প্রজনন নিম্নরূপে হতে পারে।

মূলের সাহায্যে : মিষ্টি আলু (এটি আসলে রূপান্তরিত মূল), ডালিয়া, কাঁকরোল, পটল এগুলো মূলের সাহায্যে প্রজনন করে থাকে।

কাণ্ডের সাহায্যে : আদা, হলুদ, সটি, আলু, ওলকচু, পিঁয়াজ (এগুলো রূপান্তরিত কাণ্ড) কাণ্ডের সাহায্যে প্রজনন করে থাকে। কলা, পুদিনা, আনারস, চন্দ্রমল্লিকা সাকারের সাহায্যে প্রজনন করে থাকে। সজিনা, মাদার, ছাতিম, জিঙ্গা ইত্যাদি গাছের ডাল থেকেই নতুন গাছ জন্মে থাকে। কচি বাঁশের কাণ্ড থেকেও নতুন গাছ পাওয়া যায়।

পাতার সাহায্যে : পাথরকুচি গাছের প্রজনন এর পাতার মাধ্যমে হয়ে থাকে। পাতা মাটিতে ফেলে রাখলে এর কিনারের প্রতি খাঁজ থেকে একটি করে মুকুল বের হয় এবং নতুন গাছে পরিণত হয়।

কৃত্রিম অঙ্গজ প্রজনন : আমের ডাল কেটে লাগালে তা থেকে নতুন গাছের সৃষ্টি হয় না। ডালটি শুকিয়ে যায়। কিন্তু গুটি কলম করে লাগালে তা একটি নতুন গাছে পরিণত হয়। মানুষ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম উপায়ে এ ধরনের প্রজনন করে থাকে। কাটিং, লেয়ারিং, বাডিং, গ্রাফটিং ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ে কৃত্রিম প্রজনন করা হয়। আম, লিচু, বরই এসব গাছ থেকে কৃত্রিম উপায়ে অঙ্গজ প্রজনন করা যায়।

অঙ্গজ প্রজননের সুবিধা :

১। নতুন গাছের ফুল ও ফলে মাতৃগাছের গুণাগুণ বজায় থাকে।

২। তাড়াতাড়ি ফুল ও ফল ধরে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। আনারসের বংশবৃদ্ধি হয় কোনটির মাধ্যমে?

ক. মূল

খ. কান্ড

গ. সাকার

ঘ. পাতা

২। কোনটিতে বীজের মাধ্যমে প্রজনন ঘটে?

i. জবা

ii. একাশিয়া

iii. ধূতরা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. i ও ii

ঘ. ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদের আলোকে ৩ নং ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মিসেস ইতিকনা চৌধুরী তার এক প্রতিবেশীর সজিনা গাছ থেকে একটি ডাল কেটে এনে নিজের জমিতে রোপণ করেন এবং এক বছর পরেই গাছটিতে সজিনা ধরল।

৩। এ ক্ষেত্রে গাছটির –

i. অযৌন প্রজনন ঘটেছে

ii. অঙ্গজ প্রজনন ঘটেছে

iii. কৃত্রিম অঙ্গজ প্রজনন ঘটেছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. i ও ii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৪। সজিনা গাছটির ডাল কেটে এনে লাগানোর পিছনে মিসেস চৌধুরীর কী উদ্দেশ্য ছিল?

ক. ভাল জাতের সজিনা পাওয়া

খ. দ্রুত সজিনা পাওয়া

গ. সজিনা কেনার খরচ কমানো

ঘ. আত্মীয়স্বজনকে সজিনা বিলানো

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। ধান, গম, সরিষা প্রভৃতি শস্য জাতীয় উদ্ভিদ সাধারণত যৌন প্রজননের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে এবং এটাই যথার্থ পদ্ধতি। অপরদিকে লিচু, মেহগনি, আম, কাঁঠাল প্রভৃতি কাষ্টল উদ্ভিদে যৌন, অযৌন বা উভয় পদ্ধতিই দেখা যায়। মি. হাকিম মেহগনির বাগান করতে গিয়ে যৌন পদ্ধতি এবং লিচুর বাগান করতে গিয়ে অযৌন পদ্ধতি অনুসরণ করেন।

ক. প্রজনন কী?

খ. হাকিম সাহেব মেহগনির বাগান করতে যৌন জনন পদ্ধতি অনুসরণ করলেন কেন?

গ. হাকিম সাহেবের লিচুর বাগান করার অযৌন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘শস্য জাতীয় উদ্ভিদে যৌন প্রজননই যথার্থ পদ্ধতি’- উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

অধ্যায় তের

জীব ও পরিবেশ

আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তা নিয়েই আমাদের পরিবেশ। পরিবেশকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়— জড় পরিবেশ ও জীব পরিবেশ। জীব ও জড় পরিবেশের সম্বন্ধ নিবিড়। জড় পরিবেশের মূল উপাদান হচ্ছে মাটি, পানি ও বায়ু। এ উপাদানগুলো জীবের আহার ও আশ্রয় যুগিয়ে থাকে।

পরিবেশ আমাদের জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। বেঁচে থাকার সবরকম উপাদান আমরা পরিবেশ থেকে পাই। বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন জীব বেড়ে ওঠে। যেমন নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর প্রভৃতি জলচর প্রাণীর প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম কিন্তু এ পরিবেশে স্থলচর প্রাণীরা বেঁচে থাকতে পারে না। মরুভূমিতে পানির অভাব, তাই সেখানে উদ্ভিদের সংখ্যা কম। এ পরিবেশে উদ্ভিদ বিশেষ দেখা যায় না। জলজ প্রাণী বা উদ্ভিদ এ পরিবেশে দুষ্প্রাপ্য।

আমরা লক্ষ করলে দেখতে পাই যে সুন্দরবনে লবণাক্ত মাটিতে যেসব উদ্ভিদ বা প্রাণী বাস করে, সিলেটের বা পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমিতে সেসব প্রাণী বা উদ্ভিদ দেখা যায় না। এ থেকে বোঝা যায় যে, কোন একটি নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশে যেসব জীব জন্মায় বা বাস করে তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে। এ রকম বিভিন্ন জীবের (উদ্ভিদ ও প্রাণীর) সমষ্টি নিয়ে গড়ে ওঠে এক একটি জীব সম্প্রদায় (Biotic Community)। প্রায় প্রতিটি জীব সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীব রয়েছে। এরা একে অন্যের সহযোগিতায় দলবদ্ধ ভাবে বেঁচে থাকে। কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের জলবায়ু কেমন হবে তা নির্ভর করে ঐ অঞ্চলের ভূপৃষ্ঠের অবস্থান এবং এর ভূপ্রকৃতির ওপর। ঐ অঞ্চলের জলবায়ুর প্রভাবে সেখানকার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্প্রদায় গড়ে ওঠে।

তাছাড়া সে অঞ্চলের প্রাণীরাও সেখানকার গাছপালার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এভাবেই একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের পরিবেশ ও জীবন সম্প্রদায়ের মাঝে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বেঁচে থাকার জন্য জীব সম্প্রদায় ও জড় পরিবেশ একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল।

তোমরা আগেই জেনেছ যে উদ্ভিদ ও প্রাণীর আকৃতি ও প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে তার পরিবেশের ওপর। পৃথিবীর সব অঞ্চল এক রকম নয়। সুন্দরবনে সুন্দরী, গরান ও গেওয়া গাছ পাওয়া যায়। এ বনের নদীতে রয়েছে কুমির, ডাঙায় রয়েছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার ও চিত্রল হরিণ। লক্ষ করলে দেখা যায় যে সিলেট ও মধুপুর বনে এসব প্রাণী বা উদ্ভিদ পাওয়া যায় না। কেন এমন হয়, আমাদের মনে এমন কিছু প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। এসবই ঘটে পরিবেশের বৈচিত্র্যের কারণে।

জীব পরিবেশ থেকে বিভিন্ন উপাদান গ্রহণ করে তা আবার সম্পূর্ণভাবে পরিবেশে ফিরিয়ে দেয়। পরিবেশে জড় ও জীব উপাদানের কোন একটার অভাব ঘটলে তার ওপর যেসব উদ্ভিদ ও প্রাণী নির্ভর করে তাদের বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। উদ্ভিদ উর্বর মাটি থেকে তার খাদ্যরস শোষণ করে। প্রাণী আবার উদ্ভিদ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে। এই পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে উদ্ভিদ ও প্রাণী বেড়ে ওঠে।

অধিক জনসংখ্যার চাপে নিত্যনতুন জনপদ, শিল্প-কারখানা গড়ে উঠছে। এর ফলে সনাতন চাষযোগ্য জমি এবং বনভূমির পরিমাণ কমছে। শব্দ, কলকারখানার বর্জ্য ও ধোঁয়া, আবর্জনা ও পচা গন্ধ পরিবেশকে দূষিত করছে। এভাবে পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাণী যে কেবল একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল তা নয়। এরা পরিবেশের মূল উপাদান মাটি, পানি বায়ু ও গাছপালার ওপরও নির্ভর করে। এজন্য জীবকে জড় পরিবেশ থেকে কখনো পৃথক করা যায় না। বেঁচে থাকার তাগিদে কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের জীব সম্প্রদায় ও জড় পরিবেশের মাঝে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জীব সম্প্রদায়ের সাথে পরিবেশের অন্তঃসম্পর্কই হল বাস্তুসংস্থান (Ecology)।

বাস্তুসংস্থানের উপাদান:

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, বাস্তুসংস্থানের দুটি উপাদান রয়েছে। জীব সম্প্রদায় এর একটি, অন্যটি জড় পরিবেশ। জড় পরিবেশই জীব সম্প্রদায়কে ধারণ করে রাখে। কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের নির্দিষ্ট পরিবেশে সজীব এবং নির্জীব উপাদানের সম্পর্ক ও পারস্পরিক ক্রিয়াকে বাস্তুতন্ত্র (Eco-system) বলে।

নির্জীব বা জড় উপাদান : (Non-living components)

আমরা আগেই জেনেছি জড় উপাদান জৈব উপাদানগুলোকে প্রভাবিত করে। অজৈব, জৈব ও ভৌত উপাদান জড় উপাদানের অন্তর্ভুক্ত।

১। অজৈব উপাদান (Inorganic components) : মাটি, পানি ও খনিজ লবণ হচ্ছে বাস্তুসংস্থানের অজৈব উপাদান। এ ছাড়াও রয়েছে O_2 (অক্সিজেন), N_2 (নাইট্রোজেন), CO_2 (কার্বন ডাইঅক্সাইড) প্রভৃতি বায়বীয় পদার্থ। এসব অজৈব উপাদান উদ্ভিদের পুষ্টির এবং জীবের শ্বসনের জন্য প্রয়োজনীয়।

২। জৈব উপাদান (Organic components): উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃতদেহের পচা অংশই হল জৈব উপাদান। উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃতদেহ পচে ইউরিয়া ও হিউমাস তৈরি হয়। এগুলো মাটির জৈব উপাদান। মৃতজীবী ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া মরা উদ্ভিদ ও প্রাণীর ওপর বিক্রিয়া ঘটিয়ে জৈব উপাদানে পরিণত করে। এ জৈব উপাদানের কিছুটা অংশ অজৈব লবণে পরিণত হয়। সবুজ উদ্ভিদ পুষ্টির জন্য এ অজৈব লবণ গ্রহণ করে। এবার তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কীভাবে জৈব উপাদান জীব ও জড় উপাদানের সাথে যোগসূত্র রক্ষা করে।

৩। ভৌত উপাদান : (Physical components)

একটি পরিবেশ ভৌত অবস্থার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। এ অবস্থাগুলো হল:

(ক) জলবায়ু (Climate) : কোন নির্দিষ্ট পরিবেশে বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, উষ্ণতা, আর্দ্রতা, সূর্যের আলোর পরিমাণ, তুষারপাত প্রভৃতির উপর জলবায়ু নির্ভর করে।

(খ) মাটির বৈশিষ্ট্য (Soil factor) : যে কোন স্থানের মাটির বৈশিষ্ট্য ও অবস্থা সেখানে বসবাসরত উদ্ভিদ ও প্রাণীকে প্রভাবিত করে।

(গ) মাটির গঠন (Soil composition) : মাটিতে বালু, কাদা এবং পলির পরিমাণ মাটির গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ করে। মাটির গুণই সেখানকার উদ্ভিদ ও প্রাণীর ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

(ঘ) হিউমাস ও খনিজ লবণ (Humus and mineral salt) : হিউমাস হল উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর পচা সার। হিউমাসে অধিক পরিমাণে খনিজ লবণ থাকে। উদ্ভিদ মূলরোমের সাহায্যে এ খনিজ লবণ শোষণ করে। এ খনিজ লবণ উদ্ভিদের পুষ্টির জন্য প্রয়োজন।

(ঙ) মাটিতে অবস্থিত পানির প্রকৃতি (Soil water condition) : মাটিতে পানির পরিমাণ, পানির স্তরের উপস্থিতি, উদ্ভূত পানি নিষ্কাশন ও পানির কৈশিকতা প্রভৃতির ওপর প্রাণী ও উদ্ভিদ জীবন নির্ভর করে।

(চ) ভূপ্রাকৃতিক কারণ (Topographic factor) : কোন নির্দিষ্ট স্থানের ভূপ্রকৃতি সেখানকার উদ্ভিদ ও প্রাণীর ওপর প্রভাব ফেলে।

আবহাওয়া, মাটি সংক্রান্ত কারণ এবং ভূপ্রাকৃতিক কারণ বাস্তুসংস্থানের নির্জীব উপাদান। শক্তির মূল উৎস হচ্ছে সূর্য। সবুজ উদ্ভিদ সবুজ কণিকা বা ক্লোরোপ্লাস্টের সাহায্যে সৌরশক্তিকে জৈব পদার্থে রূপান্তর করে স্থিতিশক্তি (Potential energy) হিসেবে নিজ দেহে আবদ্ধ রাখে। পরোক্ষভাবে এ সৌরশক্তি সব জীব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবাহিত হয়। এভাবে পৃথিবীতে প্রাণপ্রবাহ ও শক্তিপ্রবাহ অব্যাহত থাকে।

সজীব উপাদান (Living components) :

প্রতিটি জীবই বাস্তুসংস্থানের উপাদান। বাস্তুসংস্থানে জড় ও জীব উপাদান একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। একের অনুপস্থিতিতে অন্যের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়। উদ্ভিদের প্রকৃতি বাস্তুসংস্থানের প্রাণীর বৈশিষ্ট্যের ওপর প্রভাব ফেলে। দৈহিক বৃদ্ধি, প্রজনন ও বেঁচে থাকার জন্য প্রতিটি জীবই খাদ্যগ্রহণ করে। সকল জীব খাদ্য থেকে শক্তি লাভ করে। আমরা আগেই জেনেছি জীব সম্প্রদায়ের মাঝে যে শক্তি প্রবাহিত হয় তার মূল উৎস সূর্য।

খাদ্যশৃঙ্খল (Food chain)

আমরা জানি একমাত্র সবুজ উদ্ভিদ সৌরশক্তিকে ব্যবহার করে নিজ খাদ্য তৈরি করে। সবুজ উদ্ভিদ নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে, তাই এদের স্বভোজী বলে। সবুজ উদ্ভিদ সূর্যালোকের উপস্থিতিতে অজৈব বস্তু (কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি) বিক্রিয়া ঘটিয়ে খাদ্য প্রস্তুত করে। উদ্ভিদদেহ সৌরশক্তিকে স্থিতিশক্তিরূপে সঞ্চয় করে রাখে। উদ্ভিদ যে খাদ্য তৈরি করে তার সামান্য অংশই নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করে এবং অতিরিক্ত অংশ নিজদেহে জমা রাখে। তৃণভোজী প্রাণীরা উদ্ভিদের এ সঞ্চয়িত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে। তৃণভোজী প্রাণীদের আবার মাংসাশী প্রাণীরা ভক্ষণ করে। এদের খাদক বলে। উদ্ভিদ, তৃণভোজী, মাংসাশী প্রভৃতি সব ধরনের জীবকে পচনকারী জীব (ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক) বা বিয়োজকগুলো (decomposers) খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে হিউমাসে রূপান্তরিত করে। মাটির অজৈব বস্তুগুলো থেকে সৌরশক্তির সাহায্যে সবুজ উদ্ভিদ পুনরায় খাদ্য প্রস্তুত করে। এ থেকে আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারি যে, উদ্ভিদ থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে বিভিন্ন প্রকার প্রাণী ও বিয়োজক জীবের মাধ্যমে খাদ্যবস্তু স্থানান্তরিত হয় এবং পুনরায় সবুজ উদ্ভিদে ফিরে আসে। এরূপ চক্রাকার স্থানান্তর হওয়া এবং খাদ্য খাদকের সম্পর্কে খাদ্যশৃঙ্খল বলে। উৎপাদক ও বিভিন্ন স্তরের খাদকের ওপর নির্ভর করে নিচে কয়েকটি খাদ্যশৃঙ্খলের উদাহরণ দেওয়া হল।

উৎপাদক	প্রথম স্তরের খাদক	দ্বিতীয় স্তরের খাদক	তৃতীয় স্তরের খাদক	সর্বোচ্চ খাদক
১। স্থলজ বাস্তুসংস্থানে				
স্থলজ উদ্ভিদ	মানুষ			
ঘাস	গরু, ছাগল, ভেড়া	মানুষ		
শস্য	ইঁদুর	সাপ	ঈগল	
ঘাস	কীটপতঙ্গ	ব্যাঙ	সাপ	ময়ূর

২। জলজ বাস্তুসংস্থানে				
জলজ উদ্ভিদ	জলজ কীটপতঙ্গ	ছোট মাছ		
শেওলা	অ্যামিবা	হাইড্রা	ছোট মাছ	বড় মাছ
ফাইটোপ্ল্যাংকটন	জুয়োপ্ল্যাংকটন	তিমি		

উপরের উদাহরণগুলো লক্ষ্য করলে আমরা বুঝতে পারি যে, কীভাবে উৎপাদকের ওপর ভিত্তি করে খাদ্য বিভিন্ন স্তরের খাদক ও খাদ্যশৃঙ্খলের অন্যান্য পর্যায় তৈরি করে। একটি খাদ্যশৃঙ্খলে একটি উৎপাদক ও তিন চারটি খাদক থাকে। সর্বোচ্চ খাদককে সাধারণত অন্য কোন প্রাণী খায় না। রোগ-ব্যাদি, স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক কারণে সর্বোচ্চ খাদকের মৃত্যু ঘটে।

একটি বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যশৃঙ্খল থাকতে পারে। প্রকৃতিতে মূলত দু'প্রকার খাদ্যশৃঙ্খল দেখা যায়।

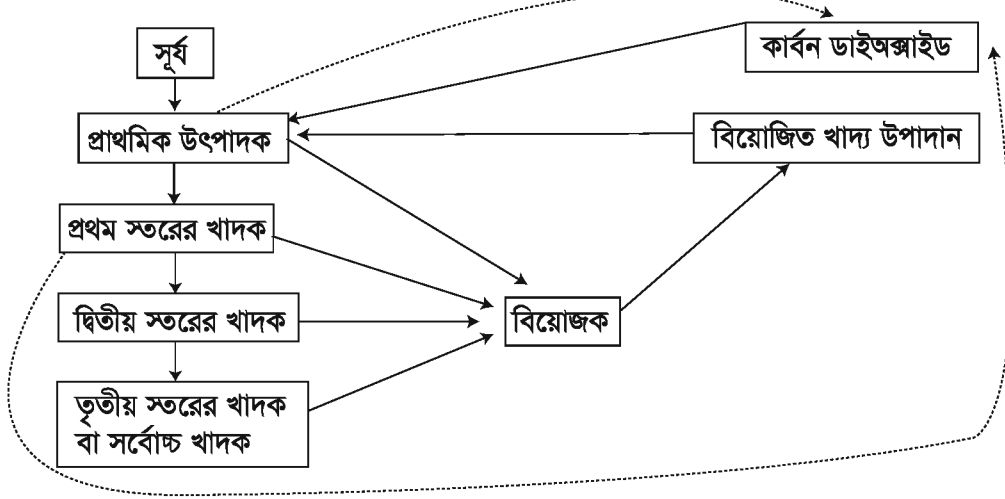
- ১। চারণ খাদ্যশৃঙ্খল (Grazing food chain) বা পরভোজী খাদ্য শৃঙ্খল (Predator food chain)
- ২। মৃতজীবী খাদ্যশৃঙ্খল (Saprophytic food chain বা Detritus food chain)

১। পরভোজী বা চারণ খাদ্যশৃঙ্খল: যে খাদ্যশৃঙ্খল উদ্ভিদ থেকে শুরু করে তৃণভোজী এবং পর্যায়ক্রমে ক্ষুদ্র মাংসাশী থেকে বৃহৎ মাংসাশী জীবে চালিত হয় তাকে পরভোজী চারণ খাদ্যশৃঙ্খল বলে। যেমন: হরিণ ঘাস খায়— বাঘ হরিণকে খায় (এটি একটি পরভোজী বা চারণ খাদ্যশৃঙ্খল।)

২। মৃতজীবী বা ডেট্রিটাস খাদ্যশৃঙ্খল : বিভিন্ন অণুজীব বা ছত্রাক, উদ্ভিদ ও প্রাণীদের মৃতদেহ বিশ্লিষ্ট করে বিভিন্ন জৈব যৌগে পরিণত করে। এসব বিশ্লিষ্টকারী জীবকে বিয়োজক বলে। এসব বিশ্লিষ্ট যৌগ কোন কোন প্রাণী খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং পরে বিয়োজকরা অন্যান্য প্রাণীর খাদ্যে পরিণত হয়। যেমন,

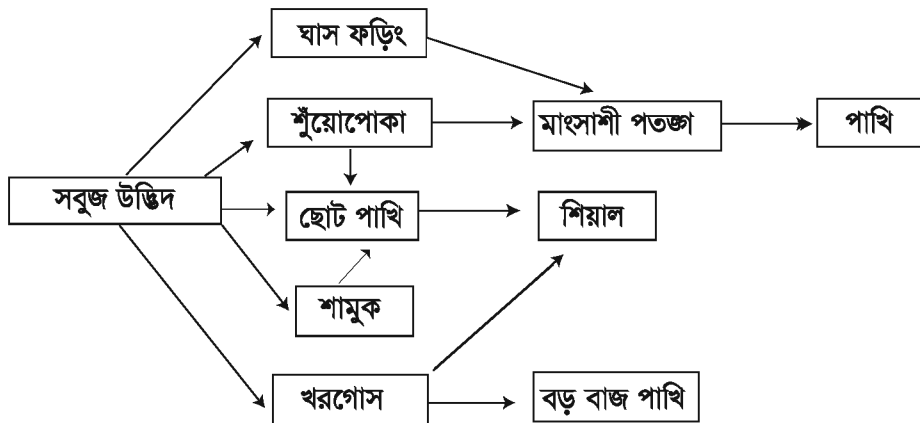
মৃতজীব → বিয়োজক → অ্যামিবা → হাইড্রা → জুয়োগ্লাঙ্কটন → মাছ।

খাদ্য জাল (Food web) : আমরা আগেই জেনেছি প্রকৃতিতে কোন খাদ্যশৃঙ্খল বিচ্ছিন্নভাবে থাকে না। একটি খাদ্যশৃঙ্খলের সাথে অন্যান্য খাদ্যশৃঙ্খল সম্পর্কযুক্ত।



চিত্র ১৩.১ : খাদ্য জাল প্রবাহ

যখন একটি বাস্তুতন্ত্রে একাধিক খাদ্যশৃঙ্খল পরিলক্ষিত হয় তখন ঐ পরিবেশের খাদ্যশৃঙ্খল খুবই জটিল আকার ধারণ করে এবং এরূপ ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যশৃঙ্খলের সদস্যরা পরস্পরের সাথে আন্তঃসম্পর্কযুক্ত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন প্রজাতি দ্বারা আন্তঃসম্পর্কযুক্ত একাধিক খাদ্যশৃঙ্খলের সুসংবন্ধ বিন্যাসকে একত্রে খাদ্য জাল বলে।



চিত্র ১৩.২ : খাদ্য জাল

খাদ্যশৃঙ্খল ও খাদ্য জালের বিভিন্ন স্তর বা ধাপগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে দেয়া হল।

১। উৎপাদক (Producer) : সৌরশক্তি বাস্তুসংস্থানের সকল শক্তির মূল উৎস। সবুজ উদ্ভিদ সূর্যালোকের উপস্থিতিতে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানির সাথে বিক্রিয়া করে শর্করা তৈরি করে এবং উপজাত হিসেবে অক্সিজেন

উৎপন্ন হয়। এভাবে সৌরশক্তি রাসায়নিক যৌগ বা খাদ্যের মধ্যে সঞ্চিত হয়। যেসব জীব এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পন্ন করে তাদের **উৎপাদক** বলে। সবুজ উদ্ভিদ বাস্তুসংস্থানের প্রধান উৎপাদক। উৎপাদকগুলো স্বভোজী। পুষ্টির জন্য এদের অন্য কোন জীবের ওপর নির্ভর করতে হয় না।

২। খাদক বা ভক্ষক (Consumer) : যেসব জীব সবুজ উদ্ভিদের মত সৌরশক্তি ব্যবহার করে নিজের খাদ্য তৈরি করতে পারে না এবং অন্য জীবকে ভক্ষণ করে পুষ্টির প্রয়োজন মেটায় তাদের খাদক বা ভক্ষক বলে। জীবজগতের বেশির ভাগ খাদকই হল প্রাণী। যেমন : শালিক পাখি কীটপতঙ্গ খায়, সিংহ হরিণ খায়; বাঘ মানুষ খায়। এখানে শালিক, সিংহ এবং হরিণ খাদক। খাদক জীবগুলো খাদ্যের জন্য বা পুষ্টির জন্য অন্য জীবের ওপর নির্ভর করে বলে এদের পরভোজী বলে। খাদক প্রাণীগুলোর তিনটি স্তরভেদ আছে। যেমন : প্রথম স্তরের খাদক, দ্বিতীয় স্তরের খাদক, তৃতীয় স্তরের খাদক।

(ক) প্রথম স্তরের খাদক (Primary consumer) : তৃণভোজী প্রাণীদের প্রাথমিক স্তরের খাদক বলে। জুয়োগ্রাফিকটন, বিভিন্ন ধরনের কীটপতঙ্গ, ছাগল, গরু প্রভৃতি তৃণভোজী প্রাণী খাদ্যের জন্য প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল।

(খ) দ্বিতীয় স্তরের খাদক (Secondary consumer) : যে সব প্রাণী প্রথম স্তরের খাদক খেয়ে বেঁচে থাকে তাদের দ্বিতীয় স্তরের খাদক বলে। যেমন : ব্যাঙ পতঙ্গ খায়, বাঘ, শিয়াল প্রভৃতি প্রাণী তৃণভোজী প্রাণীদের খায়।

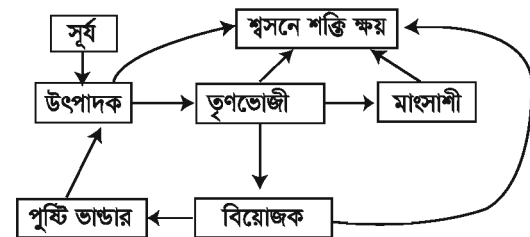
(গ) তৃতীয় স্তর বা সর্বোচ্চ খাদক (Tertiary consumer) : দ্বিতীয় স্তরের খাদকদের খেয়ে যারা বেঁচে থাকে তারা তৃতীয় স্তরের খাদক। যেমন : শকুন, বাজপাখি, কুমির, হাঙর তৃতীয় স্তরের খাদক। কারণ এরা দ্বিতীয় স্তরের খাদক খেয়ে বেঁচে থাকে।

অনেক প্রাণী আছে যারা একাধিক স্তরের খাদক যেমন : ময়ূর যখন উদ্ভিদকে খাদ্য হিসেবে খায় তখন সে প্রথম স্তরের খাদক, আবার যখন ছোট পোকামাকড় খায় তখন সে তৃতীয় স্তরের খাদক। এ ধরনের প্রাণীদের সর্বভুক (Omnivorous) বলে। মানুষও এ রকম বিভিন্ন স্তরের খাদ্য খেয়ে বেঁচে থাকে।

৩। বিয়োজক (Decomposer) : বাস্তুসংস্থানে আর এক প্রকার পরভোজী জীব আছে যাদের সমষ্টিগতভাবে বিয়োজক বলে। বিয়োজক জীবগুলো প্রধানত ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক। পচনকারী বিয়োজকদের দেহ থেকে ক্ষরিত এনজাইম দিয়ে মৃত প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহ পচে নষ্ট হয়ে যায় বা বিয়োজিত হয় এবং অপেক্ষাকৃত সরল রাসায়নিক যৌগে পরিণত হয়। এ সরল রাসায়নিক যৌগগুলো পুষ্টি দ্রব্য হিসেবে ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক শোষণ করে পুষ্টি লাভ করে। এ ছাড়া বিয়োজকরা বাস্তুসংস্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে তা হল জৈব বস্তুকে অজৈব বস্তুতে রূপান্তরিত করা। ঐ অজৈব উপাদানগুলো সবুজ উদ্ভিদ গ্রহণ করে খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে।

বাস্তুসংস্থানে পুষ্টি প্রবাহ (Nutrient flow in Ecosystem) : লক্ষ করলে দেখা যায়, যে উদ্ভিদ অজৈব বস্তু গ্রহণ করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রস্তুত করে। উদ্ভিদ যে খাদ্য তৈরি করে তার সামান্য অংশই নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করে এবং অবশিষ্টাংশ দেহে জমা রাখে। তৃণভোজী প্রাণীগুলো এদের খায় এবং পর্যায়ক্রমে মাংসাশী প্রাণীগুলো তৃণভোজীদের ভক্ষণ করে। উদ্ভিদ, তৃণভোজী প্রাণী, মাংসাশী প্রাণী প্রভৃতি সমস্ত প্রকার জীবকে বিয়োজকগুলো খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে অজৈব বস্তুতে রূপান্তরিত করে। অজৈব বস্তু থেকে সৌরশক্তির সাহায্যে সবুজ উদ্ভিদ পুনরায় খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে।

উৎপাদক বা সবুজ উদ্ভিদ, তৃণভোজী এবং মাংসাশী তিন প্রকার জীবের স্তর থেকে শক্তি ও পুষ্টি বিয়োজকে স্থানান্তরিত হয়। খাদ্যশৃঙ্খলের প্রত্যেক ধাপে ক্রমান্বয়ে শক্তি হ্রাস পায়, বিয়োজকগুলো মৃত জীবদেরকে বিনষ্ট করে। ফলে অজৈব পুষ্টি দ্রব্যগুলো পরিবেশে মুক্ত হয়ে পুষ্টিভান্ডারে সঞ্চিত হয়। পুষ্টিভান্ডার থেকে সবুজ উদ্ভিদ পুনরায় অজৈব পুষ্টি দ্রব্য পায়। এরূপ পুষ্টি দ্রব্যের চক্রাকারে প্রবাহিত হওয়ার পদ্ধতিকে **পুষ্টিপ্রবাহ** বলে। খাদ্যশৃঙ্খল এবং পুষ্টি প্রবাহ বাস্তুসংস্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।



চিত্র ১৩.৩ : পুষ্টিদ্রব্য প্রবাহ এবং শক্তি প্রবাহের সংক্ষিপ্ত চিত্র

বাস্তুসংস্থানে শক্তি প্রবাহ : সবুজ উদ্ভিদ প্রাথমিক খাদ্য উৎপাদক। সবুজ উদ্ভিদ সৌরশক্তি ব্যবহার করে শক্তি উৎপাদন করে। সবুজ উদ্ভিদ সৌরশক্তিকে স্থিতিশক্তিরূপে ধরে রাখে। সেখান থেকে শক্তি তৃণভোজী প্রাণী, তৃণভোজী প্রাণী থেকে মাংসাশী প্রাণীতে রাসায়নিক যৌগরূপে প্রবাহিত হয়। উৎপাদক থেকে মাংসাশী প্রাণী পর্যন্ত প্রবাহিত হওয়ার পথে প্রত্যেকটি ধাপে শক্তি ব্যয় হয়। উৎপাদক, তৃণভোজী ও মাংসাশী প্রাণী থেকে বিয়োজকে শক্তি স্থানান্তরিত হওয়ার সময় প্রায় সমস্ত শক্তিই বিনষ্ট হয়। সে কারণে বিয়োজক থেকে অজৈব পুষ্টিভান্ডারে পুষ্টি দ্রব্য প্রবাহিত হওয়ার সময় কোন শক্তি স্থানান্তরিত হয় না। পুষ্টিভান্ডার থেকে অজৈব পুষ্টি দ্রব্য পুনরায় উৎপাদকে স্থানান্তরিত হয়। এ থেকে বোঝা যায় যে বাস্তুসংস্থানে পুষ্টি দ্রব্য চক্রাকারে প্রবাহিত হয়। কিন্তু প্রবাহ একমুখী, চক্রাকার নয়।

বিয়োজন ও শক্তির স্থানান্তর (Decomposition and transformation of energy) : আমরা জানি যে জীবের যে কয়টি শারীরবৃত্তিক প্রক্রিয়া রয়েছে রেকন তার একটি। প্রাণী তার দেহের নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ রেকন প্রক্রিয়ায় বের করে দেয়। এতে করে দেহ থেকে কিছু পরিমাণ রেকনজনিত শক্তি ব্যয় হয়। এ ছাড়া জীব তার অন্যান্য জৈবনিক কার্যক্রমের জন্যও শক্তি হারায়। মৃত্যুর মাধ্যমে জীবের জীবনচক্রের পরিসমাপ্তি ঘটে ও শক্তির অপচয় হয়। এ শক্তিকে বিনষ্ট শক্তি বলে। বিয়োজক জীবগুলো বিভিন্ন স্তরের মৃতদেহ ও রেকন পদার্থ থেকে প্রয়োজনীয় শক্তি আহরণ করে। এভাবে শক্তির স্থানান্তর ঘটে ও খাদ্যশৃঙ্খল কার্যকর থাকে।

নিচে কয়েকটি খাদ্যচক্রের উদাহরণ দেওয়া হল, যার সাথে মানুষ জড়িত এবং সবগুলোতেই মানুষ এর শেষ স্তর। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এ খাদ্যশৃঙ্খলের কোনটি খুব ছোট আবার কোনটি বেশ বড়।

যেমন—

ঘাস, ধান → গবাদি পশু → মানুষ
 শেওলা → জলজ কীটপতঙ্গ → মাছ → মানুষ
 শেওলা → জলজ কীটপতঙ্গ → ছোট মাছ → বড় মাছ → মানুষ
 ধান → মানুষ

জীবদেহ শ্বসন ও অন্যান্য জৈবনিক কাজে প্রচুর শক্তি ব্যয় করে। খাদ্যশৃঙ্খল ছোট হলে শক্তি কম ব্যয় হয় আর খাদ্য চক্র বড় হলে শক্তি বেশি ব্যয় হয়। এ নিয়ম থেকে বোঝা যায় যে উৎপাদক থেকে যতই উপরের স্তরের দিকে শক্তির স্থানান্তর হয় শক্তির পরিমাণ আনুপাতিক হারে ততই কমতে থাকে।

প্রধান প্রধান বাস্তুসংস্থান

পরিবেশ অনুযায়ী বাস্তুসংস্থানকে প্রধান দু ভাগে ভাগ করা যায় (১) স্থলজ বাস্তুসংস্থান (Terrestrial Ecosystem) ও (২) জলজ বাস্তুসংস্থান (Aquatic Ecosystem)।

যে কোন স্থানের পরিবেশ নির্ভর করে ঐ স্থানের ভূপ্রকৃতি, আবহাওয়া ও জলবায়ুর ওপর। কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের প্রাণী বা উদ্ভিদ কেমন হয় তা একদিকে নির্ভর করে সেখানকার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য যেমন—মাটির প্রকৃতি, নদ—নদী, মরুভূমি, পাহাড়—পর্বত ও আবহাওয়ার ওপর।

১। স্থলজ বাস্তুসংস্থান

ভূপৃষ্ঠে বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, বায়ু প্রবাহ ইত্যাদির তারতম্যের জন্য পৃথিবীতে স্থলজ বাস্তুসংস্থান বহু ধরনের হয়। কৃষিভূমি, তৃণভূমি, মরুভূমি এবং বনাঞ্চলের বাস্তুসংস্থানের মধ্যে পার্থক্য অনেক। তাছাড়া পর্বত, পাহাড় ও সমতল ভূমির এবং শীতপ্রধান, গ্রীষ্মপ্রধান ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের বাস্তুসংস্থান বিভিন্ন। এখানে সবগুলো স্থলজ বাস্তুসংস্থানের আলোচনা সম্ভব নয় বলে আমাদের পরিচিত মাত্র দুটি সম্বন্ধে সর্থাঙ্কিত আলোচনা করা হল।

ক) ধানক্ষেতের বাস্তুসংস্থান : জমির সুচারু পরিচর্যা, যেমন চাষ, সার প্রয়োগ, পানি সেচ ইত্যাদির জন্য মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। ধানক্ষেতের প্রধান উদ্ভিদ হচ্ছে ধান গাছ। এ ছাড়া ঘাস এবং অনেক আগাছা জন্মায়। এরাই এই বাস্তুসংস্থানের উৎপাদক। নানা রকম কীটপতঙ্গ ধানগাছ আক্রান্ত করে। এরা এখানকার প্রথম স্তরের খাদক। ব্যাঙ ও বিভিন্ন পাখি কীটপতঙ্গ খায়। সাপ ব্যাঙ খায়, শিকারী পাখিরা ছোট পাখিদের খায়। এসব প্রাণী মারা গেলে শবভুক

পোকামাকড় (পিপড়া, মাছির লার্ভা) ও পাখি (কাক, শকুন) তাদের খায়। এ ছাড়া বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহ বিগলিত করে এদের দেহের জৈব যৌগগুলোকে মুক্ত করে। এভাবে গড়ে ওঠে ধানক্ষেতের বাস্তুসংস্থান। এদের বিশ্লেষণ নিচের চিত্র পাওয়া যায়।

উৎপাদক : ধানগাছ, ঘাস ও আগাছা।

প্রথম স্তরের খাদক : পোকামাকড়, গরু, ছাগল।

দ্বিতীয় স্তরের খাদক : ব্যাঙ, পোকাখেকো পাখি, মানুষ (গরু, ছাগল খায়)।

তৃতীয় স্তরের খাদক : সাপ, শিকারী পাখি।

বিয়োজক : ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, শব্দুক প্রাণী (কাক, শকুন, শিয়াল)।

খ) বনাঞ্চলের বাস্তুসংস্থান : বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের বনাঞ্চলের বাস্তুসংস্থান প্রায় একই রকম। তবে খাদ্য শৃঙ্খলের বিভিন্ন স্তরের জীবগুলো এক এক অঞ্চলে এক এক রকম হবে।

উৎপাদক : বনের গাছপালা, তৃণ গুল্ম।

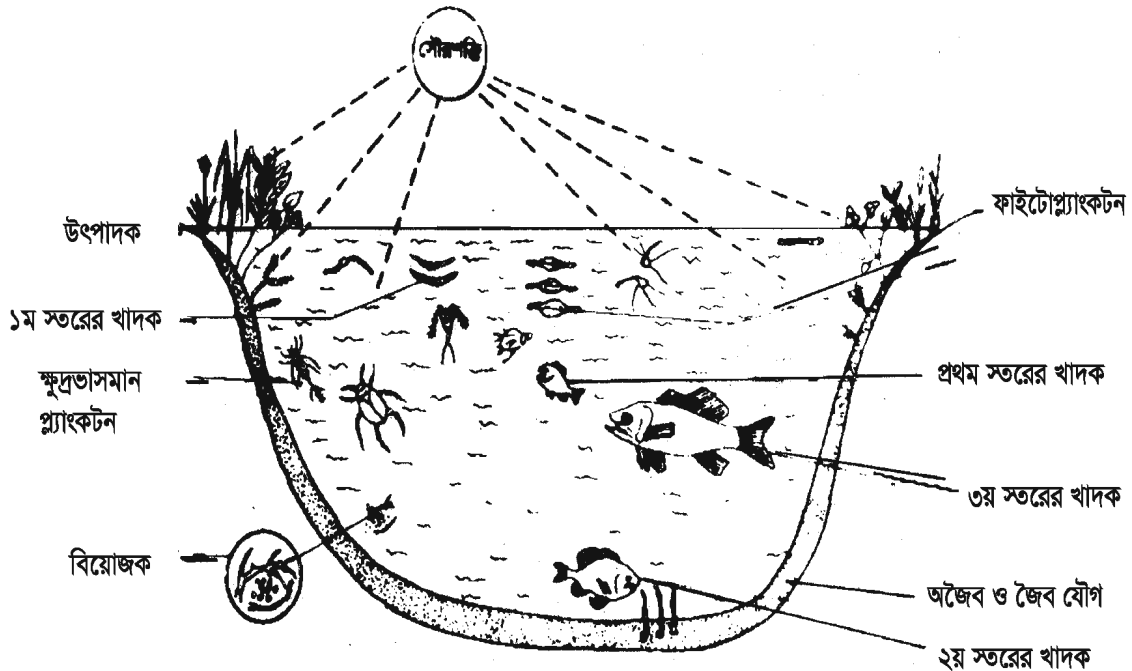
প্রথম স্তরের খাদক : পোকামাকড়, হরিণ, বানর (সর্বভুক), সজারু, হাতি, বাদুড়।

দ্বিতীয় স্তরের খাদক : ব্যাঙ, তক্ষক, ফড়িং, বাদুড়, বিভিন্ন পাখি, বাঘ।

তৃতীয় স্তরের খাদক : সাপ, বেজি, চিল।

বিয়োজক : ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, শব্দুক পোকামাকড়, পাখি ও বন্য পশু।

২। জলজ বাস্তুসংস্থান : জলজ বাস্তুসংস্থানকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা : (ক) স্রোতহীন জলাশয়, যেমন-পুকুরের বাস্তুসংস্থান, (খ) স্রোতস্বিনী নদীর বাস্তুসংস্থান, (গ) সমুদ্রের বাস্তুসংস্থান।



চিত্র ১৩.৪ : একটি পুকুরের বাস্তুসংস্থান

পুকুরের বাস্তুসংস্থান : একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসবাসকারী জীবসম্প্রদায়ের বিভিন্ন সদস্যদের সঙ্গে ঐ স্থানের জড় উপাদানগুলোর আদান-প্রদানের মাধ্যমে যে অনুকূল বসবাস নীতি গড়ে ওঠে তাকে বাস্তুসংস্থান বলে। প্রতিটি বাস্তুসংস্থানের মধ্যে প্রতিটি জীবের একটি নির্দিষ্ট বাসস্থান ও একটি নির্দিষ্ট জীবনধারা আছে। বাস্তুসংস্থানের এটি একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য।

পুকুর স্বয়ংসম্পূর্ণ বাস্তুসংস্থানের একটি আদর্শ উদাহরণ। এতে পুকুরে বসবাসরত জীব ও জড় পদার্থের নিবিড় সম্পর্ক ভালভাবে বোঝা যায়। জড় বা নির্জীব উপাদানগুলো হল বিভিন্ন প্রকার জৈব ও অজৈব পদার্থ, পানি, সূর্যালোক, কার্বন ডাইঅক্সাইড, অক্সিজেন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, হিউমিক এসিড ইত্যাদি। সজীব উপাদানগুলোর মধ্যে আছে উৎপাদক, প্রথম স্তরের খাদক, দ্বিতীয় স্তরের খাদক, তৃতীয় স্তরের খাদক ও নানা রকম বিয়োজক।

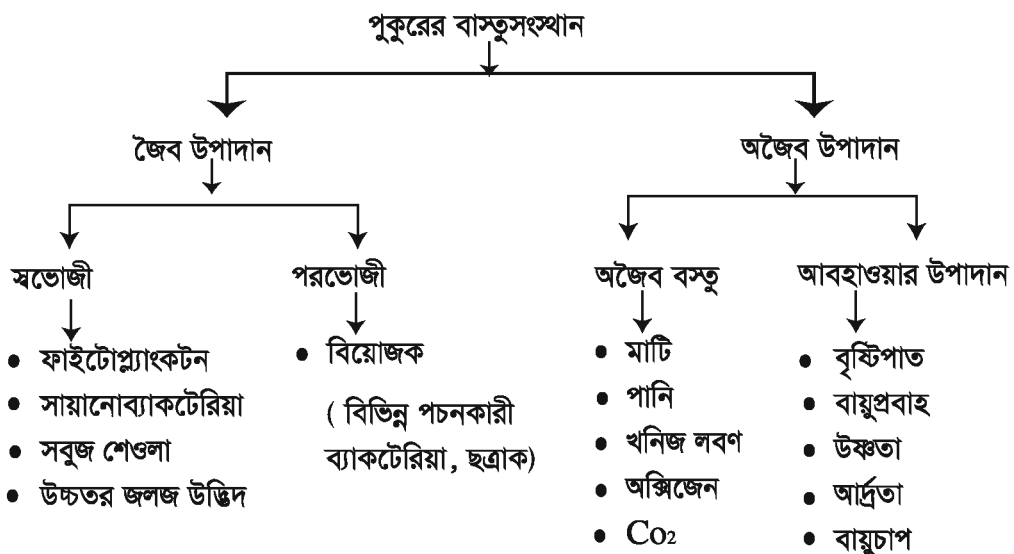
উৎপাদক : উৎপাদক হচ্ছে পুকুরে বসবাসকারী সালোকসংশ্লেষণকারী বিভিন্ন প্রকার শেওলা ও অগভীর পানির উদ্ভিদ। পানিতে ভাসমান জীবদের প্ল্যাংকটন (Plankton) বলে। প্ল্যাংকটন জাতীয় ক্ষুদে উদ্ভিদকে বলে ফাইটোপ্ল্যাংকটন (Phytoplankton) বা উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন। সবুজ জলজ শেওলা ও অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় নিজের খাদ্য তৈরি করে বেঁচে থাকতে পারে, তাই এদের উৎপাদক বলে।

প্রথম স্তরের খাদক : বিভিন্ন প্রকার ভাসমান ক্ষুদে পোকা, মশার শূককীট, আগুবীক্ষণিক প্রাণী, জুরোপ্ল্যাংকটন প্রভৃতি প্রথম স্তরের খাদক। ভাসমান ক্ষুদ্র প্রাণীদের জুরোপ্ল্যাংকটন বলে। এ খাদকগুলো নিজেরা খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না এবং সরাসরি উৎপাদককে ভক্ষণ করে বেঁচে থাকে।

দ্বিতীয় স্তরের খাদক : ছোট ছোট মাছ, কিছু জলজ পতঙ্গ, চিংড়ি, ব্যাঙ প্রভৃতি দ্বিতীয় স্তরের খাদক। এরা নিজে খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না এবং উৎপাদককেও খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে না। এরা প্রথম স্তরের খাদকদের ভক্ষণ করে বেঁচে থাকে।

তৃতীয় স্তরের খাদক : ছোট মাছ, চিংড়ি এককথায় যারা দ্বিতীয় স্তরের খাদককে ভক্ষণ করে তাদের তৃতীয় স্তরের খাদক বলে। শোল, বোয়াল, ভেটকি প্রভৃতি বড় মাছ, বক ও গাংচিল হচ্ছে তৃতীয় স্তর বা সর্বোচ্চ খাদক।

বিয়োজক : পুকুরের পানিতে বিভিন্ন ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া মৃতজীবী হিসেবে বাস করে, এদের বিয়োজক বলে। এ বিয়োজকগুলো পানিতে ভাসমান বা পানির তলায় কাদার মধ্যে বাস করে। এরা জীবিত বা মৃত প্রাণীদের আক্রমণ করে ও পচনে সাহায্য করে, ফলে উৎপাদকের ব্যবহার উপযোগী জৈব ও অজৈব রাসায়নিক পদার্থ পুনরায় সৃষ্টি হয়। এসব বিয়োজিত উপাদানগুলো আবার পুকুরের উৎপাদক সম্প্রদায় ব্যবহার করে। প্রবাহ চিত্রের সাহায্যে পুকুরের বাস্তুসংস্থানের উপাদানগুলো সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।



(খ) নদীর বাস্তুসংস্থান :

পুকুর হল স্থির জলাশয়। নদ-নদীর পানি স্রোতস্থিনী। এ কারণে নদীর পরিবেশ ও জীব সম্প্রদায়ের মধ্যে পুকুরের জীব সম্প্রদায় থেকে বেশে বিভিন্নতা দেখা যায়। নদীতে বিভিন্ন রকমের শেওলা দেখা যায়। ইলিশ, পাঙ্গাস, চিতল, বোয়াল প্রভৃতি মাছ নদীতে বাস করে। এ সকল মাছের দেহ পার্শ্বীয়ভাবে চ্যাপ্টা। মাছের দেহের এরূপ আকারের কারণে এরা বেশি স্রোতে অনায়সে চলাচলের উপযোগী। নদীর কিনারায় অথবা যেখানে পানির স্রোত কম সেখানে পুকুরের মত জীব সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। নদীর বাস্তুসংস্থানে খাদ্যশৃঙ্খলের পরিধি ছোট। যেমন : শেওলা → ইলিশ → বোয়াল।

(গ) সমুদ্রের বাস্তুসংস্থান

সমুদ্রের পানি লবণাক্ত। সমুদ্রের পানিতে প্রচুর ফাইটোপ্ল্যাংকটন ও জুয়োপ্ল্যাংকটন থাকে। প্রবাল, চিথড়ি, তারামাছ, শঙ্খ, নানা জাতের ছোট ও বড় মাছ, কচ্ছপ, শুমুক, হাঙর, তিমি প্রভৃতি সমুদ্রে বাস করে। ফাইটোপ্ল্যাংকটন এবং সাগর শৈবাল সমুদ্রের লবণাক্ত পরিবেশের একমাত্র উৎপাদক। চিথড়ি, ঝিনুক, জুয়োপ্ল্যাংকটন এবং ছোট মাছ হচ্ছে প্রথম স্তরের খাদক। হাঙর ও বিভিন্ন রাক্ষুসে মাছ হচ্ছে তৃতীয় স্তরের খাদক। সাধারণত ছোট মাছ তৃণভোজী। তারামাছ, চিথড়ি, শঙ্খ আবর্জনাভুক প্রাণী। ইলিশের মত তিমিরেরও খাদ্যশৃঙ্খলের পরিধি বেশ ছোট, যেমন- প্ল্যাংকটন → তিমি, প্ল্যাংকটন → ছোট ঝিনুক → তিমি।

বাস্তুসংস্থান একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ একক : প্রতিটি বাস্তুসংস্থান মোটামুটিভাবে স্বনিয়ন্ত্রিত। প্রকৃতিতে নির্দিষ্ট কোন জীব বেশি বাড়তে পারে না। জীবেরা পরস্পর পরস্পরের কাছে খাদ্য-খাদক শৃঙ্খলে বাঁধা। সহজে এর কোন একটি অংশ একেবারে নির্মূল হতে পারে না। সবসময় বিভিন্ন স্তরের জীব-সম্প্রদায়ের সংখ্যার অনুপাত মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে।

পরিবেশে নানা রকম পরিবর্তন ঘটলেও বহুদিন পর্যন্ত প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় থাকে। কোন কারণে যদি একটি অঞ্চলে নির্দিষ্ট কোন প্রাণীর সংখ্যা বেড়ে যায় তাহলে ঐ বাস্তুসংস্থানের অন্যান্য জীবের সংখ্যা এমনভাবে পরিবর্তিত হবে যাতে অন্যান্য জীবের সংখ্যার ভারসাম্য বজায় থাকে। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা করলে সহজে বোঝা যাবে। ধার যাক আমাদের আলোচিত বনভূমিতে বাঘ, হরিণ, গরু, শূয়ার প্রভৃতি বাস করে। হরিণ ও শূয়ার বাঘের খাদ্য। হরিণ ও শূয়ার সংখ্যা বেড়ে গেলে বাঘ প্রচুর খাদ্য পাবে, ফলে বাঘের সংখ্যা বাড়বে। আবার বাঘের সংখ্যা বাড়লে অধিক সংখ্যায় হরিণ, শূয়ার মারা পড়বে। ফলে হরিণ ও শূয়ার সংখ্যা কমে যাবে। হরিণ ও শূয়ার সংখ্যা কমে গেলে বাঘের খাদ্যাভাব দেখা দেবে, বাঘের সংখ্যা হ্রাস পাবে। অপরদিকে বাঘের সংখ্যা হ্রাস পেলে হরিণ ও শূয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এভাবে হ্রাসবৃদ্ধির ফলে একটি এলাকার বাস্তুসংস্থানে বিভিন্ন জীবের সংখ্যা আপনাআপনি নিয়ন্ত্রিত হয়।

পরিবেশের ভারসাম্য সংরক্ষণে মানুষের দায়িত্ব

বাস্তুসংস্থানের উৎপাদক থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ খাদক পর্যন্ত উৎপাদক এবং বিভিন্ন স্তরের খাদকের মধ্যে একটি সংখ্যার অনুপাত বজায় থাকে। এতে বাস্তুসংস্থানের বিভিন্ন পদার্থ সুন্দরভাবে চালা থাকে। একে পরিবেশের ভারসাম্য বলে। বাস্তুতন্ত্রে অজৈব ও জৈব উপাদানগুলোর সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। বাস্তুতন্ত্রের উপাদানগুলো পরস্পর পরস্পরের সাথে ভারসাম্য বজায় রেখে চলে। কিন্তু বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যথা- ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, খরা প্রভৃতি কারণে মাঝে মাঝে এ ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। এ ছাড়া মানুষ আপন সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের যথেষ্ট ব্যবহার করে। এতে করে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের বিঘ্ন ঘটছে। এজন্য প্রাচীনকালের পরিবেশের সাথে বর্তমান পরিবেশের অনেক তারতম্য লক্ষ করা যায়।

মানবগোষ্ঠী বর্তমানে দুটি সমস্যার সম্মুখীন। প্রথম সমস্যাটি হল অধিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্য সমস্যা। দ্বিতীয়টি হল প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ। পরিবেশ সংরক্ষণ প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা করার অন্যতম প্রধান উপায়। এতে পরিবেশের উপাদানগুলোর ক্ষতিসাধন রোধ করা যায়।

জলাবায়ু, সৌরশক্তি, খনিজ দ্রব্য, মাটি, গাছপালা, বন্যপ্রাণী প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রাকৃতিকভাবে এদের অপচয় বা ক্ষয় খুবই সামান্য এবং পরিবেশে সবসময় এগুলোর পরিমাণের সমতা বজায় থাকে। কিন্তু মাটি, স্বাদুপানি, বনজঙ্গল, বন্যপ্রাণী প্রকৃতির ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ। ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে এ সম্পদগুলোর পরিমাণ কমে যায়। ক্ষয়িষ্ণু সম্পদগুলোর ব্যবহার একেবারে বন্ধ করা সংরক্ষণের উদ্দেশ্য নয় এবং তা সম্ভবও নয়। বাস্তুসংস্থানের জ্ঞানের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বাদুপানি, মাটি, বন ও বন্যপ্রাণী প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করা যায়। প্রাকৃতিক সম্পদের সুচিন্তিত ব্যবহার সর্বপ্রকার অপচয় ও যথেষ্ট ব্যবহার বন্ধ করা এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে পুরাতন অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সংরক্ষণের মূল কথা।

অনুশীলনী

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১। নিচের কোন খাদ্যশৃঙ্খলটি মানুষকে সবচেয়ে কম শক্তি সরবরাহ করবে?

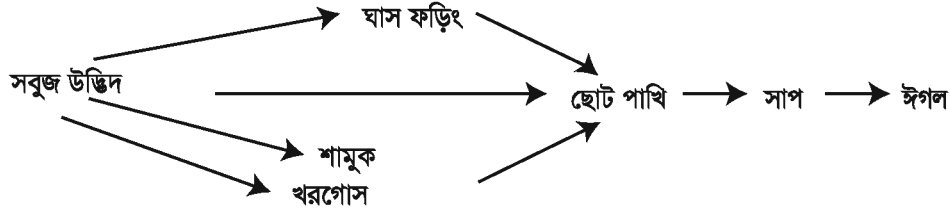
- ক. ভাসমান উদ্ভিদ → ভাসমান প্রাণী → ছোট মাছ → বড় মাছ → মানুষ
 খ. ভাসমান উদ্ভিদ → ভাসমান প্রাণী → ছোট মাছ → মানুষ
 গ. ভাসমান উদ্ভিদ → বড় মাছ → মানুষ
 ঘ. ধান গাছ → ছাগল → মানুষ

২। বাস্তুসংস্থানে বিয়োজকের ভূমিকার ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য কোনটি?

- i. মৃতদেহ বিয়োজিত করে সরল রাসায়নিক যৌগে পরিণত করে
 ii. মৃতদেহ থেকে উৎপন্ন যৌগগুলোকে পুষ্টি হিসেবে গ্রহণ করে
 iii. জৈব বস্তুকে অজৈব বস্তুতে রূপান্তরিত করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
 গ. i ও iii
 খ. iii
 ঘ. i, ii ও iii



উপরের চিত্র অবলম্বনে ৩নং ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

৩। চিত্রে কয়টি খাদ্যশৃঙ্খল রয়েছে?

- ক. ১ টি
 গ. ৩ টি
 খ. ২ টি
 ঘ. ৪ টি

৪। দ্বিতীয় স্তরের খাদক কোনটি?

- ক. ছোট পাখি
 গ. ঘাস ফড়িং
 খ. শামুক
 ঘ. খরগোস

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। গ্রীষ্মের ছুটিতে তৃণা তার মামার বাড়িতে বেড়াতে গেল। সে পুকুরে গোসল করতে গিয়ে দেখল পুকুরের পানি বেশ সবুজ এবং পানিতে পুঁটি, তেলাপিয়া, শোল ও কিছু জলজ পোকা ভেসে বেড়াচ্ছে। পুকুরপাড়ের একটি গাছে কয়েকটি বক ও মাছরাঙা দেখতে পেল। সে এসব জীবের সহাবস্থানের উপায় মামার নিকট জানতে চাইলে মামা তা ব্যাখ্যা করলেন।

- ক. জলজ বাস্তুসংস্থান কাকে বলে?
 খ. পুকুরটি বিভিন্ন জীব ব্যবহার করে ২টি খাদ্যশৃঙ্খল তৈরি কর।
 গ. বাস্তুসংস্থানটির বিভিন্ন জীবের মধ্যে শক্তির প্রবাহ ব্যাখ্যা কর।
 ঘ. পুকুরের পানিতে জলজ উদ্ভিদ হ্রাস পেতে থাকলে পুকুরের বাস্তুতন্ত্রের কী পরিণতি ঘটতে পারে তা বিশ্লেষণ কর।

অধ্যায় চৌদ্দ

পরিবেশ দূষণ ও পরিবেশ সংরক্ষণ

পরিবেশ নিয়ে আজকাল যত চিন্তা ভাবনা হচ্ছে অন্য কোন সময়ে তা হয়নি। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান যেমন— মাটি, পানি, বায়ু, গাছপালা, পশুপাখি ইত্যাদির সংরক্ষণ এবং দীর্ঘকালীন রক্ষণাবেক্ষণ এখন আমাদের চিন্তার প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ এখন বুঝতে পেরেছে যে প্রকৃতিকে জয় করার চেষ্টা না করে প্রকৃতির সাথে যথাসম্ভব খাপ খাইয়ে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা শ্রেয়।

মাটি দূষণ

মাটি বলতে আমার বুঝি পৃথিবীর উপরিভাগের স্তর যা নরম এবং নানা ধরনের জৈব ও অজৈব পদার্থের মিশ্রণে গঠিত। মাটির উপরে আমরা বসবাস করি। মাটি থেকে আমাদের জীবন ধারণের নানা রকম প্রয়োজনীয় উপাদান গ্রহণ করি। উদ্ভিদ ও প্রাণী মরে গেলে এগুলো আবার মাটিতে ফিরে যায়। এভাবে মাটির বিভিন্ন উপাদান আমরা ঘুরে ঘুরে বার বার ব্যবহার করতে পারি। তাই বলা যায় মাটির সাথে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। মাটি দূষিত হলে আমাদের জীবনযাত্রায় মারাত্মক প্রভাব ফেলবে।



মাটি থেকে জৈব ও অজৈব উপাদান উদ্ভিদ গ্রহণ করে

চিত্র ১৪ .১: জৈব ও অজৈব উপাদানের চক্র

মাটি নানাভাবে দূষিত হয়। বন্যা, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি প্রাকৃতিক কারণে মাটি ক্ষয় হয়। বন্যার ফলে মাটি ক্ষয়ে গিয়ে অনুর্বর হয়ে পড়ে। মাটিতে তখন গাছপালা জন্মাতে পারে না। বৃষ্টিপাত ও বায়ুপ্রবাহ একইভাবে মাটির উপরের উর্বর স্তর সরিয়ে নিয়ে মাটি অনুর্বর করে ফেলে।

মানুষের নানা কাজ মাটিকে দূষিত করে। বন ও গাছপালার ধ্বংস সাধন, অতিমাত্রায় কৃষিকাজ, অতিরিক্ত পানিসেচ ইত্যাদির কারণে মাটি দূষিত হয়। গাছপালা না থাকলে এবং অতিমাত্রায় কৃষিকাজ করলে মাটির উর্বর স্তর ক্ষয় হয়ে মাটি অনুর্বর হয়ে পড়ে। অতিরিক্ত পানিসেচের ফলে মাটিতে জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততার সৃষ্টি হয়। মাটির নিচের লবণ পানিতে দ্রবীভূত হয়ে উপরে উঠে এসে মাটিকে অনুর্বর করে তোলে। নানা ধরনের বর্জ্য পদার্থ মাটি দূষণের অন্যতম কারণ। ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ এবং প্রকৃতিতে ধীরে ধীরে মিশে যায় না এমন পদার্থ (পলিথিন, প্লাস্টিক) মাটিকে দূষিত করে।

মাটি দূষিত হলে তাতে গাছপালা, পোকামাকড়, অণুজীব জন্মাতে পারে না। এর ফলে মাটি অনুর্বর হয়ে ধীরে ধীরে মানুষের ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য উর্বর উৎপাদনশীল মাটি প্রয়োজন। এ কারণে মাটি যাতে অনুর্বর ও দূষিত না হয় আমাদের সবারই সেদিকে নজর দেয়া প্রয়োজন। বেশি করে গাছপালা লাগানো মাটি দূষণ রোধের একটি উপায়। কলকারখানাগুলো যেন তাদের বর্জ্য যেখানে সেখানে না ফেলে সে বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। আমরা সবাই মাটি দূষণের বিরুদ্ধে সচেতন হলে দূষণ রোধ করা সম্ভব।

বায়ুমন্ডল

পৃথিবীর স্থলভাগে ও জলভাগকে বেষ্টিত করে যে বায়ুবীয়াস্তর আছে তাকে বায়ুমন্ডল (atmosphere) বলে। এটি তিনটি স্তরে বিন্যস্ত (চিত্র ১৪.২)।

(১) ভূস্তর সলগ্ন ট্রফোস্ফিয়ার, ভূপৃষ্ঠের বাইরের দিকে প্রায় ১০ কি মি (মেরু অঞ্চল) থেকে ১৬ কি মি (বিষুব রেখার কাছে) পর্যন্ত বিস্তৃত।

(২) স্ট্রাটোস্ফিয়ার, ট্রফোস্ফিয়ারের বাইরের দিকে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৮০ কি মি উপরের দিক পর্যন্ত বিস্তৃত।

(৩) এর বাইরে প্রায় ৩৫০০ কি মি পর্যন্ত আয়নোস্ফিয়ার।

কুজবাটিকা, কুয়াশা, বালুকণা, মেঘ এবং বায়ুপ্রবাহ শুধু ভূপৃষ্ঠ সলগ্ন ট্রফোস্ফিয়ারে সীমাবদ্ধ। এই স্তরে বায়ুর বিভিন্ন উপাদানের গড় অনুপাত (ঘনত্ব ভিত্তিক) নিম্নরূপ : নাইট্রোজেন ৭৮%, অক্সিজেন ২১%, আরগন ০.৯৩% কার্বন ডাইঅক্সাইড ০.০৩% এবং সামান্য পরিমাণে জলীয় বাষ্প, মিথেন, হিলিয়াম, ক্রিপ্টন ইত্যাদি।

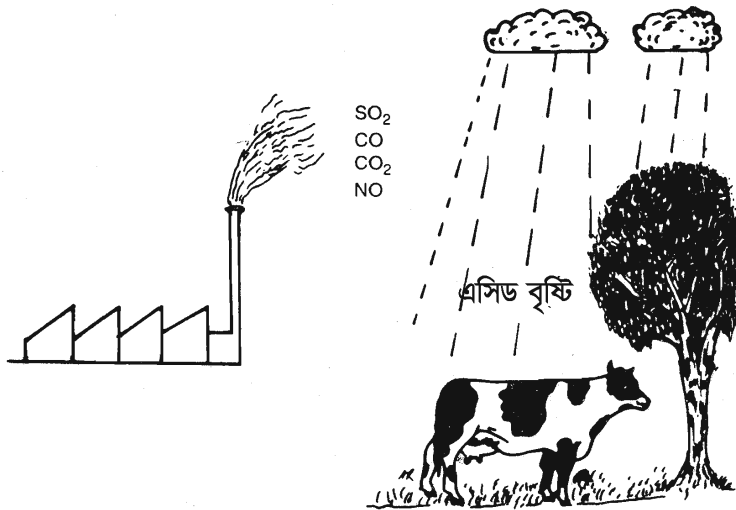
স্ট্রাটোস্ফিয়ারের নিম্নাংশ (ভূপৃষ্ঠ থেকে ২৫-৩০ কি মি) অক্সিজেন ও জোনের একটি ঘনস্তর থাকে। একে ওজোন ঢাল (Ozone barrier) বলে। সূর্যের তেজস্ক্রিয় রশ্মিসমূহ, বিশেষত আল্ট্রা ভায়োলেট UV বা অতিবেগুনি রশ্মির ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে জীবনকে রক্ষা করে। আয়নোস্ফিয়ারে বায়ুর ঘনত্ব অত্যন্ত পাতলা এবং সূর্যের তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাবে বায়ুর উপাদানগুলো আয়নে (ion) বিশ্লিষ্ট অবস্থায় থাকে।

বায়ু দূষণ

মাটির মত বায়ু প্রাকৃতিক কারণে এবং মানুষের সৃষ্ট কারণে দূষিত হয়। ধূলিঝড়, দাবাগ্নি, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি প্রাকৃতিক কারণে বায়ু দূষিত হয়। এসব ঘটনায় ধূলাবালি, ধোঁয়া, ও বিষাক্ত গ্যাস বাতাসের সাথে মিশে বায়ু দূষিত করে।

কলকারখানার ধোঁয়া, যানবাহনের ধোঁয়া, ময়লা আবর্জনা থেকে বের হওয়া দুর্গন্ধ বায়ুকে দূষিত করে। যানবাহন এবং কলকারখানার ধোঁয়ায় CO₂, CO, SO₂ এবং আরও নানা ধরনের ক্ষতিকারক বায়ুবীয় পদার্থ থাকে। বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড যদি বেড়ে যায় তাহলে কী হবে? বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বাড়লে যে

প্রতিক্রিয়া হয় তা গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া নামে পরিচিত। এ অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়ার ফলে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। এতে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে গিয়ে মহাপ্লাবনের সম্ভাবনা রয়েছে। সমুদ্রতীরের এবং ভূমধ্যের অনেক নিচু দেশ এতে প্লাবিত হবে। কার্বন মনোক্সাইড রক্তের সাথে রক্তের অক্সিজেন পরিবহণ ক্ষমতা একেবারে নষ্ট করে দেয়। অক্সিজেনের অভাবে মানুষ তখন মারা যায়। সালফার ডাইঅক্সাইড এবং নাইট্রোজেন সার থেকে উৎপন্ন নাইট্রিক অক্সাইড বৃষ্টির পানির সাথে মিশে এসিড রেইনের



চিত্র ১৪.২ : বায়ু দূষণ

বা অল্প বৃষ্টির সৃষ্টি করে যা উদ্ভিদ, প্রাণী এবং দালানকোঠা ও যন্ত্রপাতির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। মানুষের ব্যবহার করা বিভিন্ন দ্রব্য থেকে CFC (ক্লোরোফ্লুরো কার্বন) গ্যাস বের হয়ে বায়ুমণ্ডলে মিশেছে। ক্লোরোফ্লুরো কার্বন গ্যাস ওজোন স্তর ক্ষতির জন্য দায়ী। এ সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

বায়ু দূষণ বন্ধ করার প্রধান উপায় উদ্ভিদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। এতে O_2 এবং CO_2 এর পরিমাণের ভারসাম্য বজায় থাকবে। অন্যদিকে বায়ুতে যাতে দূষিত গ্যাস না মেশে তার ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। কলকারখানা ও যানবাহনে ফিল্টার ব্যবহার করলে অবস্থার উন্নতি হবে।

পানি দূষণ

আমাদের দেশে পানি এত বেশি যে পানি দূষণের প্রভাব আমরা অনেক ক্ষেত্রেই অনুভব করি না। বন্যা, বৃষ্টি ইত্যাদির ফলে প্রাকৃতিক উপায়ে পানি দূষিত হয়। বন্যার ফলে পানির সাথে নানা ধরনের দূষিত পদার্থ মিশে যায়। মানুষের সৃষ্ট কারণেই পানি দূষণ বেশি হয়। কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ, গৃহস্থালির ময়লা আবর্জনা, বৃষ্টিতে ধুয়ে আসা রাসায়নিক সার ও পোকা মারার ওষুধ পানির সাথে মিশে পানি দূষিত করে। পানি দূষণের ফলে জলজ উদ্ভিদ এবং প্রাণীর দাবুণ ক্ষতি হয়। পানির অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়, ফলে অনেক মাছ ও জলজ প্রাণী মরে ভেসে ওঠে। ইউরোপের দেশগুলোতে পানি দূষণের বিরুদ্ধে কঠোর আইন আছে। জলজ যানবাহনের তেল, ময়লা আবর্জনা থেকে যেন পানি দূষিত না হয় তার ব্যবস্থা সব জলযানকে নিতে হয়। না নিলে কঠোর শাস্তি অথবা মোটা অঙ্কের জরিমানা দিতে হয়। আমাদের দেশে পানি দূষণ বন্ধ করতে হলে প্রথমে এ বিষয়ে জনসাধারণকে বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে সচেতন করে তুলতে হবে। পরবর্তীতে আইনের প্রয়োগ খুব কঠিন এবং নিরপেক্ষভাবে করতে হবে।

শব্দ দূষণ

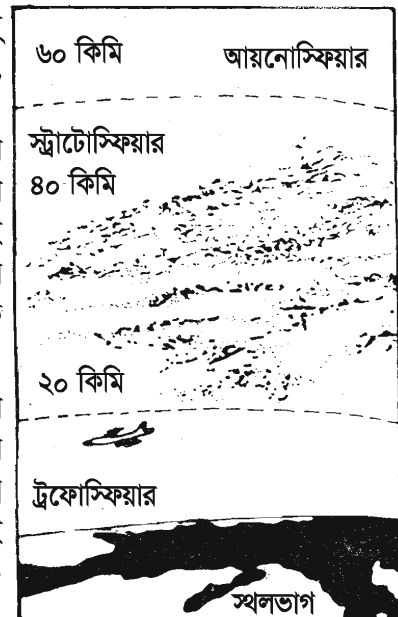
নগর জীবনের প্রাত্যহিক সঙ্গী হচ্ছে শব্দ। ভোরে ঘুম ভাঙে যানবাহন চলাচলের শব্দে, ফেরিওয়ালার ডাকে। সারাদিন অফিসে নানা মেশিনের শব্দ, ফোনের শব্দ, লোকজনের উচ্চস্বরে কথা বলা খুব সাধারণ শব্দ দূষণ। ঘরে ফিরে রেডিও, T.V. অথবা টেপরেকর্ডারে শব্দ শোনাও এক ধরনের শব্দ দূষণ।

শব্দ যদি একটা নির্দিষ্ট মাত্রা (৮০ ডেসিবেল) ছাড়িয়ে যায় তখন তা দূষণের পর্যায়ে চলে আসে। শব্দ দূষণের প্রভাব প্রাণীর ওপর বেশ ক্ষতিকর। এর ফলে উচ্চ রক্তচাপ, নিদ্রাহীনতা, শ্রবণশক্তি হ্রাস এবং চরম অবস্থায় মানসিক বৈকল্যের সৃষ্টি হতে পারে।

ওজোন স্তর

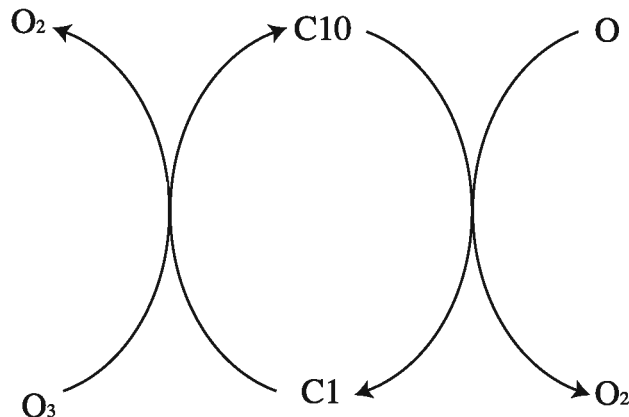
ওজোন এক ধরনের গ্যাস। তিনটি অক্সিজেন পরমাণু মিলে ওজোনের একটি অণু তৈরি করে। ওজোনের রাসায়নিক সংকেত O_3 । ট্রফোস্ফিয়ার, স্ট্রাটোস্ফিয়ার, আয়নোস্ফিয়ার-বায়ুমণ্ডলের এ স্তরগুলোর পরিচয় তোমরা নিশ্চয়ই জান। ভূপৃষ্ঠের ২৫ থেকে ৩০ কিলোমিটার উপরে বায়ুমণ্ডলের স্ট্রাটোস্ফিয়ার অঞ্চলে ওজোন গ্যাসের একটি ঘন স্তর রয়েছে। ট্রফোস্ফিয়ার অঞ্চলেও ওজোন গ্যাস রয়েছে। ওজোন গ্যাসের এই স্তর পৃথিবীকে চারদিক থেকে ঢেকে রেখেছে। এই স্তরকে যে ওজোন ঢাল (Ozone barrier) বলে তা তোমরা জেনেছ। হাজার হাজার বছর ধরে ওজোনের এ আবরণ পৃথিবীর জীবজগৎকে সূর্যের বিকিরিত মারাত্মক আলট্রাভায়োলেট রশ্মি থেকে রক্ষা করে আসছে।

আলট্রাভায়োলেট রশ্মি তিন ধরনের। দীর্ঘতরঙ্গ দৈর্ঘ্যের UV-A, মাঝারি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের UV-B এবং ক্ষুদ্রতরঙ্গ দৈর্ঘ্যের UV-C। স্ট্রাটোস্ফিয়ার অঞ্চলের ওজোন গ্যাসের আবরণ সবচেয়ে মারাত্মক আলট্রাভায়োলেট রশ্মি UV-C এর পুরো অংশ এবং স্বল্প ক্ষতিকর UV-B এর বেশিরভাগ অংশই আটকে রাখে। ট্রফোস্ফিয়ার অঞ্চলের ওজোন গ্যাসের আবরণ এবং মেঘ UV-B রশ্মির অবশিষ্ট অংশকে ভূপৃষ্ঠে আসা থেকে বিরত রাখে।



চিত্র ১৪.৩ : ওজোন স্তর

মারিও মলিনা এবং শেরউড রোলান্ড নামে দু জন আমেরিকান বিজ্ঞানী ১৯৭৪ সালে প্রথম ধারণা দেন যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত রাসায়নিক যৌগ ক্লোরোফ্লোরো কার্বন CFC ওজোন স্তরের ক্ষতির জন্য দায়ী। অ্যারোসলের টিনে এবং নানা রকমের ফোম তৈরিতে CFC যৌগ ব্যবহার করা হয়। বায়ুমণ্ডলে ছাড়া পেয়ে এগুলো উপরের স্তরে উঠে যায়। CFC যৌগগুলো বায়ুমণ্ডলের নিচের স্তরে সহজে ভাঙে না। স্ট্রাটোস্ফিয়ার অঞ্চলে আলট্রাভায়োলেট রশ্মির সংস্পর্শে এসে CFC ভেঙে ক্লোরিন ছেড়ে দেয়। মুক্ত ক্লোরিন পরমাণু তখন অনুঘটক হিসেবে কাজ করে ওজোন অণুকে ভেঙে একটি অক্সিজেন অণু এবং একটি অক্সিজেন পরমাণু সৃষ্টি করে। এ প্রক্রিয়া যুগ যুগ ধরে চলতে থাকে। কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, ট্রাইক্লোরোমিথেন এবং হেলোন নামে আরও কয়েকটি রাসায়নিক যৌগ ওজোন স্তরের ক্ষতি করে।



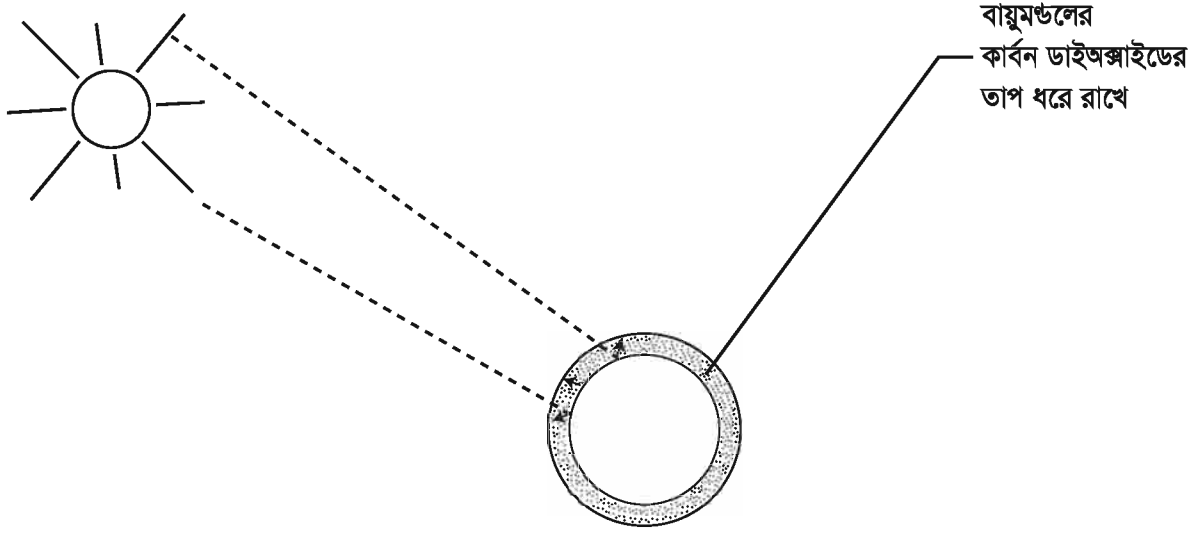
চিত্র ১৪.৪ : ক্লোরিন দিয়ে ওজোন অণুর ভাঙন

আলট্রাভায়োলেট রশ্মি জীবদেহের জন্য ক্ষতিকর। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, UV-A এবং UV-B এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে ত্বকের ক্যানসার হওয়ার ঘটনা বেড়ে যায়। এ ছাড়া UV-B এর কারণে নানা ধরনের চোখের অসুখ যেমন চোখে ছানি পড়া, চোখের লেন্সের বিকৃতি এবং বৃন্দদের মধ্যে চোখের দৃষ্টিহীনতা বেড়ে যায়। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ার ফলে বিভিন্ন ধরনের সংক্রামক রোগের সংক্রমণের ঘটনা বেড়ে যায়।

গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া

গ্রিনহাউস কাকে বলে তোমরা জান। শীতপ্রধান দেশে ঠান্ডা থেকে বাঁচানোর জন্য ঘরের ভেতরে গাছপালা লাগানো হয়। এ ঘরগুলো সাধারণত কাচের তৈরি। এর ফলে সূর্যের আলো ঘরের ভেতরে ঢুকতে পারে। ঘরের ভেতরে গাছপালা সূর্যের আলোতে সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে শর্করা খাদ্য তৈরি করে বেঁচে থাকতে পারে। সূর্যের আলোতে ঘরের পরিবেশ গরম থাকে। কাচ তাপ কুপরিবাহী বলে বাইরের ঠান্ডা ভেতরে ঢুকতে পারে না, ভেতরের গরমও বাইরে বের হতে পারে না।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইড অনেকটা গ্রিনহাউসের কাচের মত কাজ করে। সূর্যের আলো পৃথিবীকে উত্তপ্ত করে। উত্তাপের অনেকটা বিকিরিত হয়ে বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে হারিয়ে যায় মহাশূন্যে। এর ফলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ মোটামুটি এক রকম থাকে। কিন্তু বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গেলে অবস্থা কিন্তু এ রকম থাকে না। কার্বন ডাইঅক্সাইড পৃথিবী থেকে বিকিরিত তাপের খানিকটা ধরে রাখে। এতে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। বিজ্ঞানীরা হিসাবে করে দেখেছেন যে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ দিন দিন বেড়েই চলেছে। কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ কেন বাড়ছে তোমরা নিশ্চয়ই জান। ব্যাপক হারে গাছপালা কমে যাওয়া এর একটি প্রধান কারণ। জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার আর একটি প্রধান কারণ। পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন, কয়লা এগুলো জীবাশ্ম জ্বালানি। কলকারখানা, যানবাহন এবং গৃহস্থালির কাজে এসবের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। এর ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণও দিন দিন বাড়ছে।



চিত্র ১৪.৫ : গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া

গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়ার দরুণ বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ বেড়ে গেলে পরিবেশের ওপর এর প্রতিক্রিয়া কী হবে বলতে পার? তোমার জান পৃথিবীর দু মেরু অঞ্চলে বিপুল পরিমাণ বরফ জমে আছে। বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ বাড়তে থাকলে এসব বরফ বেশি করে গলতে শুরু করবে। এর ফলে সমুদ্রে পানির উচ্চতা বাড়তে থাকবে। সমুদ্রের অনেক দ্বীপ, সমুদ্র তীরের অনেক শহর ও দেশ ধীরে ধীরে পানিতে ডুবে যাবে। বাংলাদেশের অনেক অঞ্চল বঙ্গোপসাগরের পানিতে তলিয়ে যাবে।

পরিবেশ সংরক্ষণে মানুষের ভূমিকা

আগের আলোচনা থেকে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে পরিবেশ দূষণের জন্য মানুষের বিভিন্ন কাজ দায়ী। মানুষ জেনে কিংবা না জেনে পরিবেশকে দূষিত করেছে। কাজেই পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে জ্ঞান এবং সচেতনতা সৃষ্টি করা পরিবেশ দূষণ রোধের প্রাথমিক দায়িত্ব হওয়া দরকার। পরিবেশ দূষণের জ্ঞান, দূষণ রোধের ক্ষমতা এবং দূষণ প্রতিরোধের জন্য ইচ্ছা ও আগ্রহ থাকলে পরিবেশ দূষণ রোধ করা সম্ভব।

পরিবেশের ওপর নগরায়ন ও শিল্পায়নের প্রভাব

স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সুন্দরভাবে বসবাস করার জন্য বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, স্কুল কলেজ, দোকানপাট, বাজার, হাসপাতাল, পোস্টঅফিস ইত্যাদি সকল কিছুর প্রয়োজন। এ সবকিছু নিয়ে গড়ে ওঠে শহর বা নগর। শহর বা নগর গড়ে ওঠার পদ্ধতিকে নগরায়ন বলে। একটা আদর্শ শহর তৈরি করার জন্য কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ দিকে খেয়াল রাখতে হয়। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর মত আমাদের দেশের শহরগুলো সুপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠেনি। ঢাকার নতুন অংশ এবং চট্টগ্রাম শহরের কিছু অংশ ছাড়া একান্ত পরিকল্পনাহীনভাবে আমাদের শহরগুলো গড়ে উঠেছে।

একটা আদর্শ শহর স্থাপন করার সময় কতগুলো বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে খেয়াল করতে হয়।

১। একটা শহর গড়ে ওঠার জন্য প্রথমে একটা উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা প্রয়োজন।

২। শহরে স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে বাস করার উপযোগী পরিষ্কার পরিছন্ন ও আরামদায়ক বাসগৃহ নির্মাণ করা প্রয়োজন। এসব বাসগৃহে পরিসুত ও বিশুদ্ধ পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ এবং পয়ঃনিষ্কাশনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৩। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং টাটকা তরিতরকারি, মাছ মাংস নিয়মিতভাবে যাতে পাওয়া যায় সেজন্য দোকানপাট এবং বাজার থাকা দরকার।

৪। এসব দোকানপাট এবং বাজারে স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিষ্কার-পরিছন্ন পরিবেশ বজায় রাখার জন্য জনস্বাস্থ্য বিভাগকে নিয়মিত তদারক করতে হবে।

- ৫। রোগ নিরাময়ের জন্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র, মাতৃসদন ইত্যাদিতে জনস্বাস্থ্য রক্ষামূলক ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- ৬। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য স্কুল কলেজের পাশাপাশি পাঠাগার স্থাপন, চিত্তবিনোদন এবং স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য খেলাধুলা করার বিভিন্ন ব্যবস্থা, যেমন খেলার মাঠ, ক্লাব, পার্ক ইত্যাদি থাকা প্রয়োজন।
- ৭। বয়স্কদের মানসিক এবং দৈহিক প্রশান্তির জন্য উপযুক্ত চিত্তবিনোদনের এবং অবসর কাটানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- ৮। বিভিন্ন সংক্রামক অসুখ বিসুখ যাতে মহামারীর আকার ধারণ করতে না পারে সেজন্য রোগ প্রতিষেধক ও প্রতিরোধকের ব্যবস্থা থাকা দরকার।
- ৯। শহরবাসীদের কর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকা উচিত।

শহরে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপের জন্য শহরের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গাগুলোতে এবং শহরের আশপাশে অবাস্তিত বসতি গড়ে ওঠে। এসব বসতিতে ছিন্নমূল মানুষ একান্ত দুরবস্থায় জীবন কাটায়। এ অবস্থা ক্রমশ প্রকট আকার ধারণ করেছে। ফলে দেখা দিচ্ছে বিভিন্ন সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত সমস্যা। অপরিবর্তিত নগরায়নের ফলে পরিবেশের অত্যন্ত অবনতি ঘটে।

গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে নবাগত লোকের বসবাসের জন্য যেসব বসতি তৈরি হয় সেখানকার পরিবেশ নোংরা এবং অস্বাস্থ্যকর। কারণ এসব বসতিতে পানির ব্যবস্থা, পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকে না। গ্রামের মত শহরে নদীনালা, খালবিল, পুকুর, কুয়া ইত্যাদি উৎস থেকে খাবার পানি সংগ্রহ করার সুযোগ নেই বলে এসব বস্তির অধিবাসীরা প্রায়ই নানা ধরনের পানিবাহিত রোগে ভুগতে থাকে। এসব বসতি থেকে শহরের অন্যান্য অঞ্চলেও অসুখ-বিসুখ ছড়িয়ে যায়। তবে শহরে উঁচুতে রাখা বৃহদাকার পানির ট্যাংকে পরিমিত এবং ক্লোরিন মেশানো পানি জমা করা হয়। পরে এই ট্যাংক থেকে পাইপের সাহায্যে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে পানি সরবরাহ করা হয়। কিন্তু অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজনমত এই পানির সংকুলান হয় না। ফলে শহরবাসীরা প্রায়ই পানির সংকটে কষ্ট পায়।

জ্বালানি সরবরাহ অপরিবর্তিত নগরায়নের একটা বিশেষ সমস্যা। আগে শহরেও রান্নার জন্য লাকড়ি ও ঝুঁটে ব্যবহার করা হত। কিন্তু বর্তমানে লাকড়ির বদলে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়। আজকাল অনেক দেশে জৈব গ্যাস বা বায়োগ্যাস ব্যবহার করা হচ্ছে। ঝুঁটে এবং লাকড়ি উভয় থেকেই বায়ু দূষণকারী ধোঁয়া বের হয়। অপরিবর্তিত নগরায়নের ফলে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ সবখানে এবং সবসময় নিশ্চিত নয়।

দূতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন গ্রামের মানুষ জীবিকার অন্বেষণে শহরের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এদের জন্য নগরায়ন অবশ্যই পরিবর্তিত হতে হবে। তা না হলে সে শহরের অধিবাসীদের প্রকৃত স্বাচ্ছন্দ্য থাকবে না এবং পরিবেশ উত্তরোত্তর দূষিত হতে থাকবে।

মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন বা তৈরির জন্য বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কলকারখানা, যন্ত্রপাতি স্থাপন করাকে শিল্পায়ন বলে। শিল্পায়নের লক্ষ্যেই সারা পৃথিবীতে গড়ে উঠেছে নানা ধরনের শিল্প-কারখানা।

আগে মানুষ প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত জিনিসপত্রের ওপর বেশি নির্ভর করত। কিন্তু মানব সভ্যতা উন্নয়নের সাথে তাল রেখে শিল্পায়নও দূততালে উন্নততর হচ্ছে। কিছুকাল আগেও পৃথিবীতে বিশেষ করে বাংলাদেশে মানুষের জন্মহার এবং মৃত্যুহারের মধ্যে একটা সমতা ছিল। তখন ঘৃণিঝড়, দুর্ভিক্ষ, বিভিন্ন ধরনের মারাত্মক রোগ, ক্ষতিকর পশুর আক্রমণ ও দংশন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে যত মানুষ মারা যেত বর্তমানে সেসব কারণে আর তত মানুষ মারা যায় না। প্রতিটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহ ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবার জন্য আজকাল প্রতিকারের ব্যবস্থা আছে। যেমন ঘৃণিঝড়ের সংকটে আগে থেকেই জানা যায় এবং নিরাপদ আশ্রয়স্থলে আশ্রয় নিয়ে জীবন রক্ষা করা যায়। যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় দুর্ভিক্ষ আগের মত হয় না, হলেও দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলে সহজেই খাদ্য পৌঁছানো যায়। বন্যপ্রাণী শিকার করা বন্ধ হওয়ায় এবং বন্যপ্রাণীদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থাসমূহ মানুষের জীবনকে আগের চেয়ে নিরাপদ করেছে। বিভিন্ন কঠিন এবং দুরারোগ্য রোগের কার্যকরী প্রতিরোধক এবং প্রতিষেধক গ্রহণ করে বর্তমানে মানুষ অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু এড়াতে সক্ষম হয়েছে। এজন্য মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে মানুষ অধিক

দিন বেঁচে অধিকতর সংখ্যক সন্তানের জন্ম দিতে পারে। সর্বোপরি বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ পরিবার-পরিকল্পনা গ্রহণ করার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী না হওয়ায় এ দেশে দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ক্রমে ক্রমে আবাদি জমি এবং বনভূমি কমে যাচ্ছে। কাজেই আমাদের দেশের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজের চাহিদা কৃষিকাজ থেকে মিটানো আর সম্ভব হচ্ছে না। এজন্য প্রয়োজন সুপরিকল্পিতভাবে শিল্প-কারখানা গড়ে তোলা। কিন্তু আমাদের প্রচলিত শিল্পায়ন প্রাকৃতিক সম্পদের ওপরই নির্ভরশীল। এ দেশে উৎপাদিত কাঁচামাল প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয় বলে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

শিল্পায়ন প্রধানত দু'ধরনের হয়

(ক) এমন ধরনের জিনিস উৎপাদন করতে হবে, যা বর্তমানে বাইরে থেকে আমদানি করতে হয়। যেমন, উন্নত ধরনের কাপড় উৎপাদন।

(খ) এমন জিনিস উৎপাদন করতে হবে যার জন্য বাইরে থেকে কাঁচামাল আমদানি করে এনে এ দেশের কম মূল্যের শ্রমিক নিয়োগ করে জিনিস তৈরি করে তুলনামূলকভাবে কম দামে বিদেশে রপ্তানি করা যায়। যেমন, তৈরী পোশাক ও সেরামিক শিল্প। বাইরে থেকে কাপড় কিনে এনে এ দেশে অপেক্ষাকৃত কম মজুরি কাজে লাগিয়ে পোশাক তৈরি করে রপ্তানি করা হয়। এতে প্রচুর লাভ হয়।

অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা শিল্পায়ন নানাভাবে পরিবেশের অবনতি ঘটায়। মনুষ্য বসতিপূর্ণ লোকালয়ে কোন শিল্প-কারখানা স্থাপন করা উচিত নয়। কারণ :

১। কলকারখানার ধোঁয়া সেখানকার বাতাস দূষিত করে।

২। কলকারখানায় অব্যবহৃত ও উদ্বৃত্ত দ্রব্যাদি এবং উপজাত দ্রব্য হিসেবে তৈরি দ্রব্যাদি ঠিকমত অপসারণ না করলে অনেক সময় সেসব পচে গিয়ে মাটি এবং বাতাস উভয়ই দূষিত হতে পারে।

৩। অনেক সময় উপজাত দ্রব্য হিসেবে কারখানার বর্জ্য পদার্থসমূহ নদী বা অন্যান্য জলাশয়ে ফেলা হয়। এতে উক্ত জলাশয়ের পানি দূষিত হয়ে সেখানকার মাছ ও প্রাণীর ক্ষতি হতে পারে। ঐ দূষিত পানি ব্যবহার করলে মানুষের ক্ষতি হতে পারে। কাজেই অপরিকল্পিতভাবে যেখানে সেখানে শিল্প-কারখানা স্থাপন করা ঠিক নয়।

৪। লোকালয়ের মধ্যে উচ্চ শব্দ সৃষ্টিকারী কলকারখানা স্থাপন করলে সেখানকার অধিবাসীরা শব্দ দূষণের শিকার হতে পারে। এভাবে অপরিকল্পিত শিল্পায়ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পরিবেশের ক্ষতি করে। পরিবেশকে স্বাস্থ্যসম্মত রাখার জন্য অপরিকল্পিতভাবে শিল্পায়ন গড়ে উঠলে পরিবেশের বিশেষ অবনতি ঘটে। কাজেই কোন শিল্প-কারখানা স্থাপন করার আগে উপরিউক্ত বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখা প্রয়োজন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোন গ্যাসটি ওজোন স্তর ক্ষয়ের জন্য দায়ী?

ক. কার্বন ডাইঅক্সাইড

খ. কার্বন মনোঅক্সাইড

গ. ক্লোরোফ্লোরো কার্বন

ঘ. সালফার অক্সাইড

২। অতি বেগুনি রশ্মির ক্ষেত্রে কোন কথাটি সঠিক?

i. UV-A -এর প্রভাবে বৃক্ষদের দৃষ্টিহীনতা বেড়ে যায়

ii. UV-B -এর প্রভাবে চোখের লেন্সের বিকৃতি ঘটে

iii. UV-C -এর প্রভাবে ত্বকের ক্যান্সার হওয়ার ঘটনা বেড়ে যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

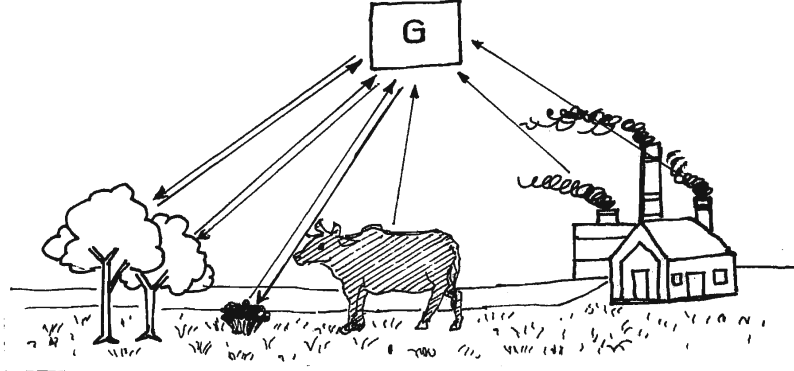
ক. i

খ. ii

গ. i ও ii

ঘ. i ও iii

নিচের চিত্র অবলম্বনে ৩ নং ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



৩। চিত্রে G চিহ্নিত গ্যাসটির নাম কী?

ক. সালফার ডাইঅক্সাইড

খ. অক্সিজেন

গ. কার্বন মনোক্সাইড

ঘ. কার্বন ডাইঅক্সাইড

৪। G চিহ্নিত গ্যাসটি -

i. ঢাকা শহরে বেশি উৎপন্ন হচ্ছে

ii. ঘন বনাঞ্চলে বেশি উৎপন্ন হচ্ছে

iii. মুমূর্ষু রোগীর চিকিৎসায় ব্যবহৃত হচ্ছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

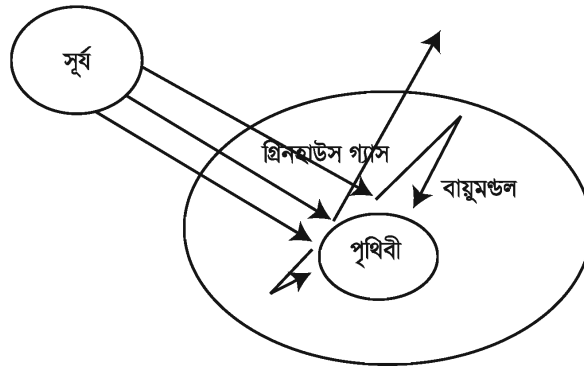
খ. ii

গ. i ও ii

ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। গ্রিনহাউস গ্যাসের ক্রমশ বৃদ্ধির ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে এবং গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়াও তীব্র হয়ে উঠছে। এক হিসাব মতে, এক অনু সি, এফ, সি গ্যাস ১০০০ অণু কার্বন ডাইঅক্সাইডের সমপরিমাণ তাপ শোষণ করতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর মোট গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া ৪৯% ভাগ কার্বন ডাইঅক্সাইড একাই ঘটিয়ে থাকে। অন্য এক জরিপে দেখা যায় যে, পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হচ্ছে নগরায়ন। নিম্নের চিত্রে একটি গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া দেখানো হল।



চিত্র: গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া

ক. গ্রিনহাউস গ্যাস কী?

খ. কার্বন ডাই অক্সাইডের ক্ষমতা সি, এফ. সি গ্যাসের চেয়ে কম হলেও বিশ্বের প্রায় অর্ধেক গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়ার জন্য কার্বন ডাইঅক্সাইড-ই দায়ী কেন?

গ. উপরের চিত্র অবলম্বনে গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

ঘ. গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে নগরায়নের প্রভাব হ্রাসের জন্য মানুষের করণীয় বিশ্লেষণ কর।

অধ্যায় পনের

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য- উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিস্তৃতি

বাংলাদেশ মাত্র ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এক ছোট ভূখণ্ডের দেশ। ২০°৩৪ উত্তর অক্ষরেখা থেকে ২৬°৩৮ উত্তর অক্ষরেখা (latitude) এবং ৮৮°০১ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা থেকে ৯২°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা পর্যন্ত (longitude) এর অবস্থান। দেশটি ছোট হলেও এর উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পদ একেবারে কম নয়। নদনদী বিধৌত বাংলাদেশ বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ। এই দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অত্যন্ত বেশি। এ দেশের জনবসতি দিন দিন আরও ঘন হচ্ছে। এই বাড়তি জনসংখ্যার নানা ধরনের প্রয়োজন মিটানোর জন্য এদেশের মূল্যবান বনাঞ্চল ধ্বংস করে গড়ে উঠেছে মানুষের বাড়িঘর, তৈরি হচ্ছে আসবাবপত্র এবং বাড়ানো হচ্ছে চাষের জমি। ফলে ভয়াবহভাবে উজাড় হয়ে যাচ্ছে বনভূমি, বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বহু প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী এবং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে উদ্ভিদ ও প্রাণিজ সম্পদ। ফলে এ দেশের স্বাভাবিক ভূমিরূপের দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে।

কোনও অঞ্চলের ভূমিরূপ বা ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি সকল অজীব পদার্থের সমন্বয়ে তৈরি হয় সেখানকার প্রকৃতি। কোনও অঞ্চলের প্রকৃতি এবং সেই প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবে অবস্থানরত উদ্ভিদকুল (Flora) এবং প্রাণীকুলকে (Fauna) নিয়ে গড়ে ওঠে সেই অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ। কোনও নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশে যে বৈশিষ্ট্যাবলি বিরাজ করে, তাদের ঐ অঞ্চলের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বলে। কোন অঞ্চলের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সেখানকার ভূপ্রকৃতি বা ভূমিরূপ ও জলবায়ুর ওপর নির্ভরশীল।

ভূপ্রকৃতি বা ভূমিরূপের ভিত্তিতে বাংলাদেশকে অনেকগুলো বিশেষ অঞ্চলে ভাগ করা যায়। এদের পরিবেশীয় উপাদান, উদ্ভিদরাজি (Flora) এবং প্রাণীকুল (Fauna) বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। নিচে এদের কয়েকটি সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।
যথা :

- | | |
|---|-----------------------------------|
| ১। সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি | ২। হাওর ও জলাভূমি অঞ্চল |
| ৩। প্লাইস্টোসিন কালের উচ্চভূমি বা সোপানসমূহ | ৪। টারশিয়ারি যুগের পাহাড়ি অঞ্চল |
| ৫। উপকূলীয় বনভূমি (ম্যানগ্রোভ বন) | ৬। সেন্ট মার্টিন্স দ্বীপ |

১। সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি

বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ সমভূমি এ অঞ্চলের অন্তর্গত। বিভিন্ন নদীবাহিত, বিশেষ করে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র পদ্মাবাহিত পলিমাটি দিয়ে এ অঞ্চল গঠিত।

পরিবেশীয় বৈশিষ্ট্য : পলি দিয়ে এ অঞ্চলের মাটি গঠিত, কাজেই মাটি বেশ উর্বর। বর্ষার সময় এ অঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা বর্ষার পানিতে প্লাবিত হয়, ফলে প্রচুর জলজ উদ্ভিদের জন্মে ও বিস্তার ঘটে। বর্ষার শেষে অনেক জলজ উদ্ভিদ পচে জৈব সারে পরিণত হয় এবং মাটিকে উর্বরতর করে।

উদ্ভিদ : নিম্নাঞ্চলের জলজ উদ্ভিদের মধ্যে শাপলা (Nymphaea nouchali : আমাদের জাতীয় ফুল), পদ্ম, কলমি, হেলেক্সা, শোলা, পাতা শেওলা, বাঁঝি, শ্যামাকলা, ক্ষুদিপানা, কুচিপানা, কচুরিপানা, টোপাপানা, গুড়িপানা, পানিফল, পানি মরিচ ও বিভিন্ন জাতের ঘাস প্রধান। এ অঞ্চলে প্রচুর মিঠাপানির শৈবাল জন্মে, এর মধ্যে ফাইটোপ্ল্যাংটনগুলো প্রাথমিক প্রডিউসার হিসেবে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর খাদ্য যোগান দেয়।

অনাবাদি জমিতে কলাকাসুন্দা, শ্বেতদ্রোণ, রক্তদ্রোণ, কাঁটানটে, নটেশাক, কাকমাছি, কান্তিকরি, ধুতুরা, হাতিশুড়, শিয়ালমতি, তারালতা, ভাট, মুক্তাবুরি, কচু, খাগড়া ইত্যাদি প্রধান।

বাড়ির আশপাশে সুপারি, নারিকেল, আম, কাঁঠাল, কলা, লিচু, তেঁতুল, কুল, জাম, বাঁশ, বরুন, পিপুল, আকন্দ ইত্যাদি প্রধান।

প্রধান ফসলের মধ্যে ধান, জলিধান, পাট ইত্যাদি প্রধান।

প্রাণী : এ অঞ্চলে বহু প্রজাতির বিভিন্ন ধরনের ছোটবড় প্রাণী বাস করে। এদের মধ্যে কুনোব্যাঙ, সোনাব্যাঙ, টিকটিকি, গিরগিটি, কাছিম, গুঁইসাপ, তক্ষক, গোখরা সাপ, দাঁড়াশ সাপ, বেজি, চডুই, শালিক, টিয়া, কাক, চিল, শকুন, মহিষ, গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া এ অঞ্চলের নদীতে শুমুক এবং বিভিন্ন প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। এ অঞ্চলের পুকুর এবং অন্যান্য জলাশয়ে বহু প্রজাতির ছোটবড় মাছ, পানিসাপ, কাছিম ইত্যাদি পাওয়া যায়।

২। হাওর ও জলাভূমি অঞ্চল

ভূপৃষ্ঠে নিচু জমিতে পানি জমে জলাভূমির সৃষ্টি হয়। নদনদী, পুকুর এবং হ্রদ ছাড়া বাংলাদেশের অন্যান্য জলাভূমিকে উৎপত্তিগত বিভিন্নতার জন্য তিন ভাগে ভাগ করা হয়— হাওর, বাঁওড় ও বিল।

(ক) হাওর : স্থলভাগের গভীরে প্রাকৃতিক ভূআলোড়নের কারণে কখনো কখনো ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে কোথাও কোথাও মাটি বসে গিয়ে গামলার মত হয়ে যায় এবং সেখানে প্রচুর পানি জমে। এইসব বিস্তীর্ণ জলাভূমিকে হাওর বলে। বাংলাদেশে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলকে ‘হাওর বেসিন’ অঞ্চল বলে। কিশোরগঞ্জ এবং নেত্রকোনা জেলার পূর্বাঞ্চলও হাওর এলাকার অন্তর্গত। হাকালুকি, টাংগুয়ার হাইল, দুব্রিয়ার ইত্যাদি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হাওর।

(খ) বাঁওড় : পুরাতন নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে যেসব অশ্ব ক্ষুরাকৃতি জলাশয় প্রাকৃতিকভাবে গঠিত হয় তাদের বাঁওড় বলে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অনেকগুলো বাঁওড় আছে। এদের মধ্যে কয়েকটি হল বড় বাইশদিয়া, ছোট বাইশদিয়া, বালুহার, মারজাত, জয়দিয়া ইত্যাদি।

(গ) বিল : পুরাতন নদীর গতিপথের ধার ঘেঁষে যেসব জলাশয় সৃষ্টি হয় তাদের বিল বলে। বাংলাদেশের বৃহত্তর রাজশাহী, রংপুর, বগুড়া, পাবনা, ফরিদপুর ও খুলনা জেলায় অনেক বিল আছে। এদের মধ্যে চলনবিল, পাথরাইল, মান্দা, পারুল, রক্তদহা, ডাকাতিয়া, গোপালগঞ্জ বখরা, চান্দা ইত্যাদি অন্যতম।

পরিবেশীয় বৈশিষ্ট্য: হাওর, বাঁওড় ও বিল অঞ্চলে বছরের বেশিরভাগ সময়ই পানি থাকে। তবে শীতকালে পানি কমে যায় এবং সাধারণত ধান চাষ হয়। কোথাও কোথাও সবসময়ই কিছু-না-কিছু পানি থাকে।

উদ্ভিদ : হাওর, বাঁওড় ও বিল অঞ্চলের জলজ পরিবেশে সাধারণ জলজ উদ্ভিদগুলোই জন্মে। এ ছাড়া বিশেষভাবে নল খাগড়া, ইকড়, হিজল, করোচ, গোটা, গামার, বরুন এবং বন গোলাপ জন্মে। এখানে হিজল ও নল খাগড়ার বন আছে।

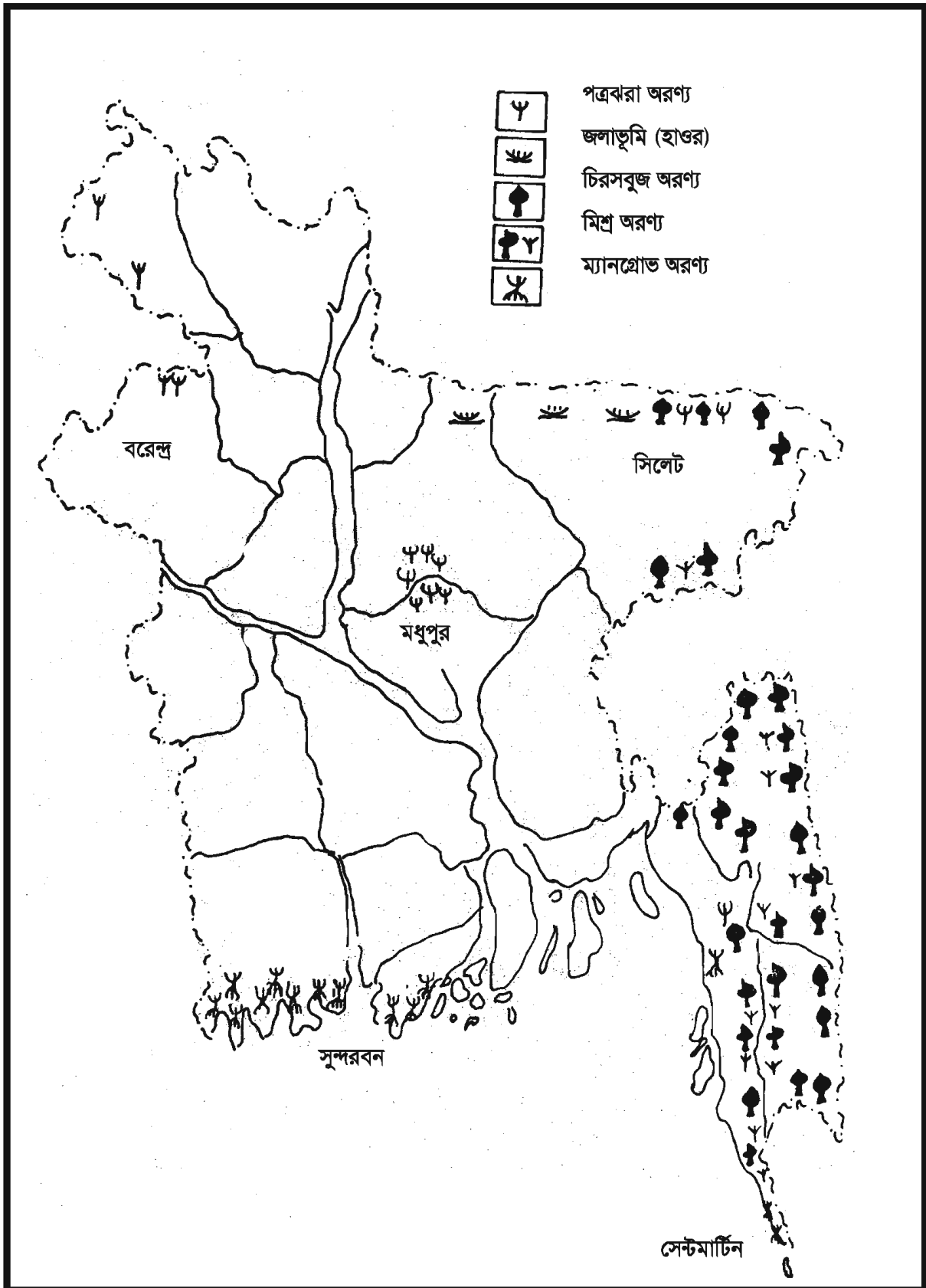
প্রাণী : এসব অগভীর জলাভূমিতে টাকি, মেনি, বাইম, বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, কুনোব্যাঙ, সোনাব্যাঙ, কাছিম, পানিসাপ, সারস, বক, কাঁদাখোঁচা পাখি, চিল, ঈগল, পানকোঁড়ি, বক ইত্যাদি প্রাণী পাওয়া যায়।

৩। প্লাইস্টোসিন উচ্চভূমি (Pleistocene uplands) বা সোপানসমূহ

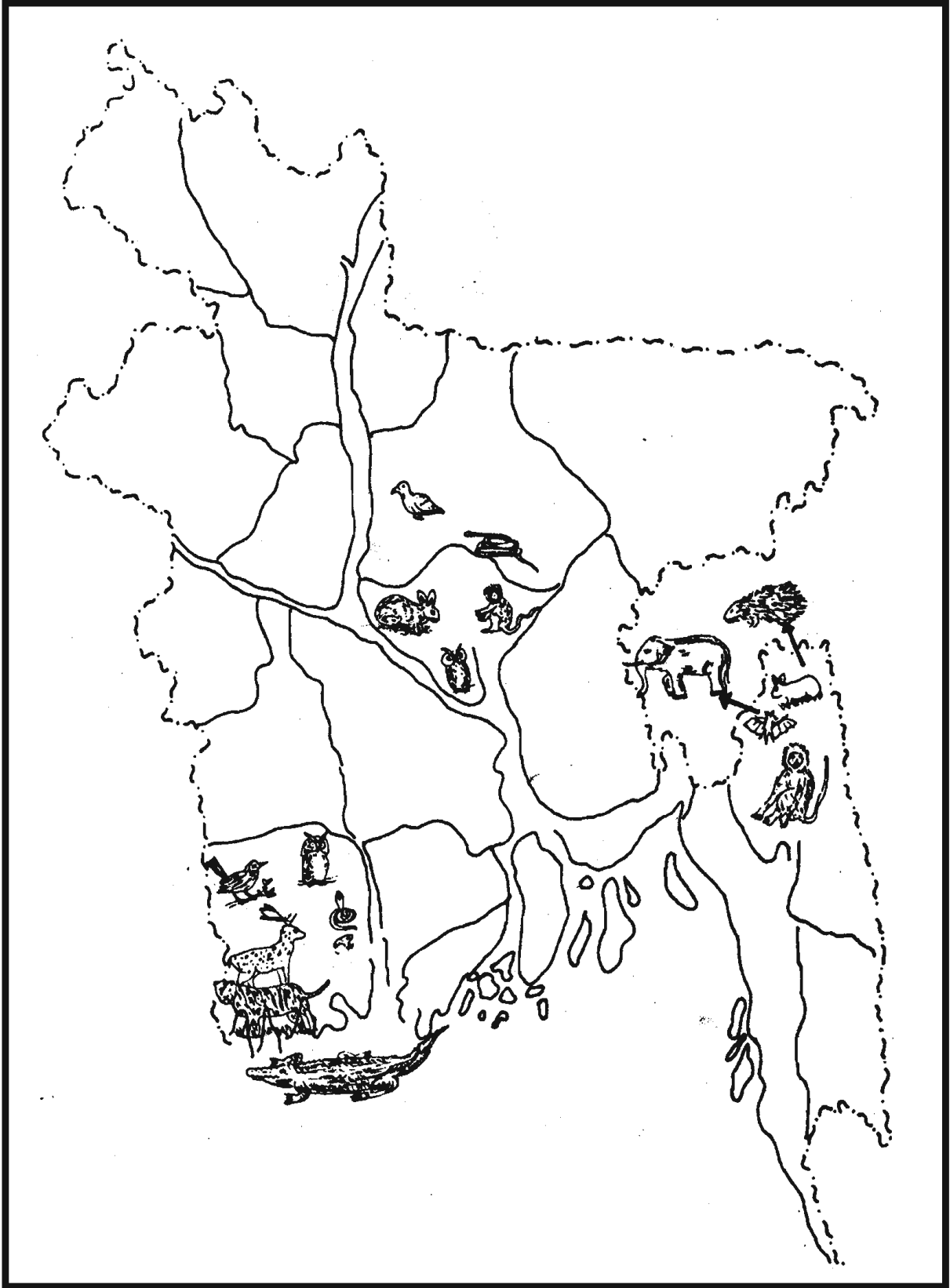
প্লাইস্টোসিন যুগে (বর্তমান থেকে ২৫,০০০ বছর পূর্বে) পৃথিবীর অনেক অঞ্চল উঁচু হতে থাকে এবং উচ্চভূমিতে পরিণত হয়। এইসব অঞ্চলকে প্লাইস্টোসিন উচ্চভূমি বা সোপান বলে। বাংলাদেশের বরেন্দ্রভূমি, মধুপুর গড় এবং লালমাই পাহাড় এই উচ্চভূমির অংশ। এসব অঞ্চলের পরিবেশীয় বৈশিষ্ট্য এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল প্রায় একই রকম। তবে শালবনের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য।

ক) বরেন্দ্রভূমি : বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে টাঙ্গাইলবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নওগাঁ, জয়পুরহাট ও দিনাজপুরের অংশবিশেষ বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত। এর আয়তন প্রায় ৯৩০০ বর্গ কিমি এবং সমুদ্রতল থেকে উচ্চতা সাধারণত ৬-১২ মিটার (২০-৪০ ফিট)। এর কোন কোন অংশে মাটি ধাপে ধাপে বিন্যস্ত (terraced)।

খ) মধুপুর গড় : টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর, জামালপুর, গাজীপুর, ঢাকা ও নরসিংদীর কিছু অংশ নিয়ে মধুপুর গড় গঠিত। এর আয়তন প্রায় ৪১০০ বর্গ কিমি এবং সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা ১৫-৩০ মিটার (৫০-১০০ ফুট)। ইতিপূর্বে জামালপুর থেকে ঢাকা পর্যন্ত প্রায় ১৬০ কিমি দীর্ঘ এলাকায় শালবন ছিল। এই বনভূমি এখন টুকরা টুকরা হয়ে গেছে। চন্দা, রাজেন্দ্রপুর বা ভাওয়ালকে আলাদা বন হিসাবে বর্ণনা করা হলেও এরা মধুপুর গড়েরই অংশ। এর পূর্বাংশ ব্রহ্মপুত্র ও শীতলক্ষ্যা নদী দ্বারা মূল উচ্চভূমি থেকে বিচ্যুত। এগারোসিন্দুর, শিবপুর ও মনোহরদী থানা এবং সোনারগাঁ এই খন্ডাংশের অন্তর্গত।



চিত্র ১৫.১ : বাংলাদেশের বনাঞ্চলের বিস্তৃতি



চিত্র ১৫.২ : বাংলাদেশের প্রাণীকুলের বিস্তৃতি

গ) লালমাই পাহাড়: কুমিল্লা শহরের নিকট লালমাই পাহাড় প্রায় ১৪.৫ কিমি (৯ মাইল) লম্বা এবং প্রস্থে ০.৮–২.৪ কিমি ($\frac{1}{2}$ – $1\frac{1}{2}$ মাইল)। এটিও প্লাইস্টোসিন উচ্চভূমির একাংশ। এই পাহাড়ের উচ্চতা ৬–১২ মিটার (২০–৪০ ফুট) সর্বোচ্চ চূড়া ৪৬ মিটার (১৫০ ফিট) এর বেশি। ময়নামতির ‘শালবন বিহার’ আশ্রম নামের উৎপত্তি মনে হয় এখানকার শালবনের উপস্থিতি থেকেই।

পরিবেশীয় বৈশিষ্ট্য : প্লাইস্টোসিন উচ্চভূমির মাটি অনুর্বর, অম্লীয় এবং লাল, কোথাও কোথাও ধূসর বর্ণের। বৃষ্টিপাত অপরিাপ্ত, বছরে ২০০০ কিমি এর কম। আবহাওয়া কিছুটা চরমভাবাপন্ন, গ্রীষ্মে উচ্চ তাপমাত্রা, শুষ্ক শীতকাল, বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম ইত্যাদি এখানকার পরিবেশীয় বৈশিষ্ট্য। এই পরিবেশ পাতাঝরা বন সৃষ্টিতে সাহায্য করে। মধুপুর অঞ্চলে চালা (উঁচু) মাটিতে বন গজায়। চালার ফাঁকে ফাঁকে নিচু জমিকে বাইদ বলে। বাইদ অঞ্চলে ধান চাষ হয়।

প্রধান উদ্ভিদ : শালবনের উপস্থিতি এইসব উচ্চভূমির একটি বৈশিষ্ট্য। শালবনকে পাতাঝরা বা পর্ণমোচী বন হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ শীতকালে এইসব বনে গাছের পাতা ঝরে যায়। কোথাও কোথাও শালবন গজারী গড় নামেও পরিচিত। শালবনের প্রধান বৃক্ষ (প্রায় ৯৭%) হচ্ছে শাল গাছ (*Shorea robusta*) যা থেকে শালবন নামের উৎপত্তি। অন্যান্য গাছের মধ্যে বনচালতা, গাছি গজারী, কড়ই, কুম্ভী, গামারী, পলাশ, ভেলা, বহেরা, হরীতকী ইত্যাদি। এরা প্রায় সবাই পাতাঝরা উদ্ভিদ। মধুপুর ও ভাওয়াল অঞ্চলে অনেক কাঁঠাল গাছ লাগানো হয়েছে। বরেন্দ্র অঞ্চলে শালবন অনেক কমে গেছে। দিনাজপুরের ফুলপুর ও ঘোড়াঘাট আর নওগার ধামরহাটে এখনও কিছু শালবন আছে। ধামরহাটের শালবন ভারতের শালবনের সাথে মিশে গেছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও রাজশাহীর গোদাগাড়ীর বরেন্দ্রভূমিতে এখন আর শালবন নেই বললেই চলে। এখানে সামান্য শালগাছ ছাড়া কিছু পোড়াশাল, কড়ই, সিনুরী ইত্যাদি গাছ দেখা যায়।

প্রধান প্রধান প্রাণী : বরেন্দ্র অঞ্চলে প্রাণীকুলের মধ্যে বানর, কাঠবেড়ালী, শিয়াল, খাটাশ, কয়েক প্রজাতির সাপ, বেজী এবং বিভিন্ন প্রকার পাখিই প্রধান। মধুপুরে বানর, হনুমান, শিয়াল, বাগদাস, কাঠঠোকরা, পেঁচা চিল, নেউল, গুঁইসাপ, কাঠবেড়ালী, গেছো ব্যাঙ প্রধান। এখানে এককালে প্রচুর চিতাবাঘ ও হরিণ ছিল, এখন নেই বললেই চলে।

৪। টারশিয়ারি যুগের পাহাড়ি অঞ্চল :

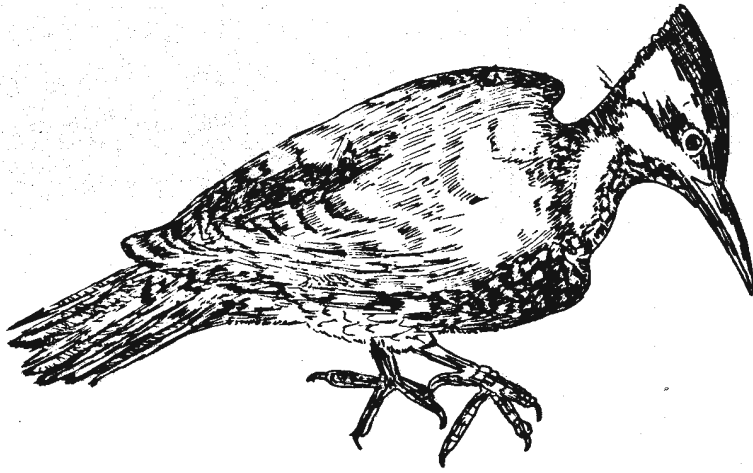
বাংলাদেশের উত্তর পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বের পাহাড়গুলো টারশিয়ারী যুগে হিমালয় পর্বতমালা উত্থিত হওয়ার সময় সৃষ্টি হয়। এরা আসামের লুসাই ও মায়ানমারের আরাকান পাহাড়ের সমগোত্রীয়। বৃহত্তর সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় এইসব পাহাড় অবস্থিত।

ক) সিলেটের পাহাড় : সিলেট জেলার উত্তর-পূর্বাংশে এবং মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার দক্ষিণে ঘাস ও বৃক্ষ আচ্ছাদিত পাহাড় বা টিলা আছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এদের উচ্চতা সাধারণত ৩০–৬০ মিটার (১০০–২০০ ফুট)। এসব পাহাড়ে চা চাষ হয়। পাথারিয়া পাহাড় সিলেট অঞ্চলের সর্বোচ্চ পাহাড়। এর উচ্চতা প্রায় ২৪০ মিটার (৮০০ ফুট)।

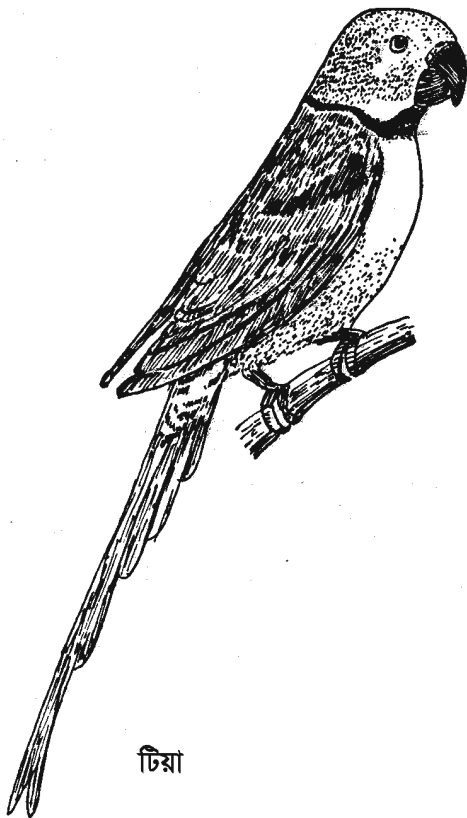
খ) চট্টগ্রামের পাহাড় : উত্তরে চট্টগ্রাম জেলায় কয়েকটি ছোট পাহাড় সমুদ্র উপকূলের সমান্তরালে উত্তর-দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত। সীতাকুণ্ড ও চন্দ্রনাথ পাহাড় এদের অন্যতম। এখানের সর্বোচ্চ চূড়া প্রায় ৩৫০ মিটার (১১৫৫ ফুট)। দক্ষিণ কক্সবাজার ও টেকনাফের মধ্যে কয়েক সারি ছোট ছোট পাহাড় আছে।

গ) পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড় : রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাগুলোতে অনেক পাহাড় আছে। এই পাহাড়গুলো উত্তর-দক্ষিণ বরাবর বিস্তৃত। এদের উচ্চতা সাধারণত ৬০০ মিটার (২০০০ ফিট) এর বেশি হয় না। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়গুলোর মধ্যে তাজিওডং (বিজয়) সর্বোচ্চ, প্রায় ১২৩১ মি. (৪০৩৯ ফুট)। অন্যান্য উঁচু চূড়ার মধ্যে মৌডক মুয়াল— প্রায় ১০০০ মিটার (৩২৯২ ফুট), রেং টিয়াং প্রায় ৯৫০ মিটার (৩১৪১ ফুট) এবং পিরামিড পাহাড় প্রায় ৯২০ মিটার (৩০১৬ ফুট)।

পরিবেশীয় বৈশিষ্ট্য : পাহাড়ি অঞ্চলের ভূমি উঁচু, বৃষ্টিপাত বেশি এবং বছরের বেশিরভাগ সময়ই বৃষ্টিপাত হয়। এখানকার বায়ু জলীয় বাষ্পপূর্ণ। সিলেট অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বছরে ৫০০০ মিমি এর বেশি। চট্টগ্রাম জেলায় প্রায় ৩০০০ মিমি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে ২৫০০–২৭৫০০ মিমি।



কাঠচোকরা



টিয়া



চিল

চিত্র ১৫.৩ : বনাঞ্চলের বিভিন্ন ধরনের পাখি

উদ্ভিদ : বনের উপস্থিতি বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এসব বনে বিভিন্ন রকমের উদ্ভিদ, লতাগুলু, বাঁশ, বেত ও ঘাস জন্মে। পূর্বে এসব অঞ্চলে ঘন প্রাকৃতিক বনে সমাবৃত ছিল। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অতিমাত্রায় বনজ সম্পদ আহরণের কারণে এসব বনাঞ্চলের পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে।

বাংলাদেশের বনাঞ্চলের ব্যবস্থাপনা দু'ধরনের—(১) সরকারের বন বিভাগের ব্যবস্থাপনাধীন রিজার্ভ (Reserve forest) বা সংরক্ষিত বন এবং (২) আনক্লাসড স্টেট ফরেস্ট (Unclassed State forest)। এগুলো স্থানীয় জেলা প্রশাসন নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনার অধীন। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বনগুলো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এসবের অনেক এলাকা এখন বৃক্ষহীন।

বন ব্যবস্থাপনার কারণে প্রাকৃতিক বনভূমির অনেকাংশই আর অক্ষত নেই। প্রাকৃতিক বনভূমিতে এক সাথে বহু প্রজাতির গাছ জন্মে। কিন্তু বেশি মূল্যবান কাঠ উৎপাদনের লক্ষ্যে বহু এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো গাছ কেটে ফেলে সেখানে একই প্রজাতির বহু গাছ লাগানো হয়েছে। একে মনোকালচার (monoculture) বলে। এসব বনকে প্ল্যান্টেশন (Plantation) বা 'বন বাগান' বলে। এসব বাগানে সেগুন, গামার, রাবার প্রভৃতি মূল্যবান প্রজাতির গাছ লাগানো হয়। তাই এসব বাগানের উদ্ভিদ বৈচিত্র্য অনেক কম।

কোন একটি উদ্ভিদের প্রাধান্যের জন্য বনের বিভিন্ন নাম দেয়া হয়। যেমন বেত বনে প্রধানত বেত আহরণ করা হয়। একইভাবে বাঁশ বনে বিভিন্ন ধরনের বাঁশ জন্মে। সেগুন ও গামার বনের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া অনেক বৃক্ষশূন্য পাহাড়ে বিভিন্ন ধরনের ঘাস, বিশেষ করে ছন ঘাস (Sun grass) জন্মায়। এদের ছন বন বলে।

বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চলের বৃক্ষশোভিত বনভূমি প্রধানত দু'প্রকার।

(১) **ক্রান্তীয় চিরহরিৎ (Tropical Evergreen) বা চিরসবুজ বন :** এসব বনের বড় বড় গাছের পাতা শীতকালে ঝরে যায় না, যেমনটি শালবনে ঘটে। তাই এদের ক্যানোপি (tree canopy) বা গাছের শীর্ষভাগ সারাবছরই সবুজ দেখা যায়।

(২) **মিশ্র চিরসবুজ (Mixed Evergreen) বন :** এসব বনের কিছু কিছু গাছ চিরসবুজ। আবার কোন কোন প্রজাতির পাতা শীতকালে ঝরে যায়। চিরসবুজ ও পাতা ঝরা গাছের মিশ্রণ ঘটে বলে এদের মিশ্র চিরসবুজ বন বলে।

এসব বনে সব গাছ সমান উঁচু নয়। ফলে এদের মাথাগুলোকে তিন বা দুই স্তরে সাজানো মনে হয়। সর্বোচ্চ গাছগুলো ৬০ মিটার (২০০ ফুট) পর্যন্ত লম্বা হয়। যেমন গর্জন, চাপালিস, সিভিট, তেলগু। এদের প্রথম স্তরের গাছ বলে। মাঝারি উচ্চতার গাছগুলো দ্বিতীয় স্তর গঠন করে। যেমন চিকরাশি ও গামার। তৃতীয় স্তরের গাছগুলো দ্বিতীয় স্তর অপেক্ষা ছোট হয়। যেমন জারুল ও উড়ি আম।

সিলেটের বনাঞ্চল : ক্রান্তীয় চিরসবুজ এবং মিশ্র সবুজ ধরনের। এখানে প্রথম স্তরের বৃক্ষের মধ্যে চাপালিশ, ডেওয়া, চাম রাতা, আমড়া, পদক ও বন চালতা প্রধান। দ্বিতীয় স্তরের উদ্ভিদের মধ্যে ঝুঁইকদম, চম্পা, পানি ডুমুর বান্দরহোলা, চিকরাশি ও গামার প্রধান। বাঁশের মধ্যে মুলী, খাঁং, পারুয়া প্রধান। পাথারিয়া এলাকায় কিছু গর্জন আছে। এ ছাড়া কোন কোন এলাকায় সেগুন, লোহাকাঠ, মালাকা এবং কড়ই লাগানো হয়েছে। সিলেটের বনে প্রচুর অর্কিড, বিভিন্ন ধরনের কচু, ফার্ন ও পরগাছা জন্মে। সিলেট বনে বেত হয়।

চট্টগ্রাম এলাকার বনগুলো চিরসবুজ ও মিশ্র সবুজ প্রকৃতির। এখানে প্রথম স্তরের বৃক্ষের মধ্যে গর্জন, চাপালিশ, চন্দুল, কড়ই, নারিকেল প্রধান। দ্বিতীয় স্তরে চিকরাশি, জারুল, বহেরা, তুন, টেকিজাম প্রধান। খোলা বনাঞ্চলে বাঁশ ও ছন জন্মে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বনভূমিতে চিরসবুজ, মিশ্র সবুজ, পাতা ঝরা, বেত ও বাঁশ বন দেখা যায়। এখানে সিভিট, গর্জন, চন্দুল, নাগেশ্বর, বাটনা, টালি, পিতরাজ, পুনাইল, কড়ই, গামার, ভাদি, বান্দরহোলা, চাপালিশ, উদল, আমড়া, শিলভাদি ইত্যাদি প্রধান। এদের মধ্যে গামার, কড়ই, ভাদি, শিলভাদি, উদল, আমড়া পাতাঝরা বৃক্ষ। এ অঞ্চলে প্রচুর বাঁশবন ও ছনবন দেখা যায়। বেতও পাওয়া যায়। অনেক সেগুন গাছ আছে, তবে এগুলো সবই লাগানো।

প্রধান প্রধান প্রাণী :

সিলেট অঞ্চল : হনুমান ও বানর প্রধান স্তন্যপায়ী প্রাণী। এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের পাখি বাস করে।

চট্টগ্রাম অঞ্চল : হাতি, চিতাবাঘ, হরিণ, উল্লুক, বিভিন্ন ধরনের সাপ ও পাখি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল : গেছো ব্যাঙ, কুনো ব্যাঙ, বৃহদাকার নির্বিষ অজগর, বিবাক্ত গোখরা সাপ, গুঁইসাপ পাওয়া যায়। বড় ইঁদুর, বাদুড়, বানর, হনুমান, চিতাবাঘ, উল্লুক, ভল্লুক, হাতি, বনগরু ইত্যাদি। হাতি ডাঙায় বাসকারী বৃহত্তম প্রাণী। এখানের বনাঞ্চলে মৌচুসী, দোয়েল, টিয়া, সাতভাই ছাতারে, কাঠঠোকরা ও অন্যান্য পাখি পাওয়া যায়।

৫। উপকূলীয় বনভূমি বা ম্যানগ্রোভ বনভূমি (Mangrove forest)

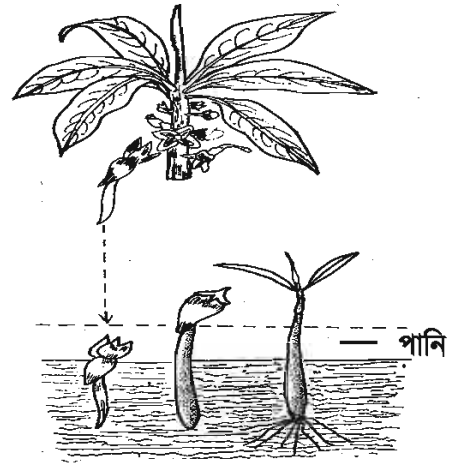
পরিবেশীয় বৈশিষ্ট্য : বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী এলাকার মাটি লবণাক্ত, কর্দমাক্ত এবং জলাবদ্ধ। এ ছাড়া প্রাত্যহিক জোয়ার ভাটা একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশীয় নিয়ামক। এগুলোর প্রত্যেকটিই সাধারণ গাছপালার জন্য প্রতিকূল। এই প্রতিকূল পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য এখানকার গাছগুলোর কিছু অভিযোজনিক বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন—

- (১) লবণাক্ত মাটির জন্য এদের শিকড় মাটির খুব গভীরে প্রবেশ করে না। তাই বাড়ি ঝাপটা থেকে রক্ষা পাবার জন্য অনেক গাছের (যেমন— সুন্দরী) মূল ডানাবৎ (root buttress) ছড়ানো হয়।
- (২) অনেক গাছের (যেমন— বোরা) ঠেসমূল (stilt root) হয়।
- (৩) মাটিতে পর্যাপ্ত অক্সিজেনের অভাব থাকায় অনেক গাছের (যেমন— সুন্দরী, বাইন, কেওড়া) মাটির নিচের সমান্তরালভাবে বিস্তৃত মূল হতে খাড়াভাবে নিউমেটাফোর বা শ্বাসমূল উপরে উঠে আসে। শ্বাসমূলে বায়ু ছিদ্র এবং ভিতরে বায়ুকুঠুরি থাকে। এরা গ্যাসীয় আদান প্রদানে সাহায্য করে।
- (৪) জোয়ার ভাটার টানে বীজ ভেসে যায় বলে কিছু কিছু গাছে জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম হয়। ফলে গাছে থাকার অবস্থাতেই বীজের অঙ্কুরোদগম হয় এবং মূল বড় ও ভারী হলে ফলটি মাটিতে পড়ে। বোরা, খলসি, হারগোজা প্রভৃতি উদ্ভিদে জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম হয়। সুন্দরী ও গেওয়া গাছের জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম হয় না।

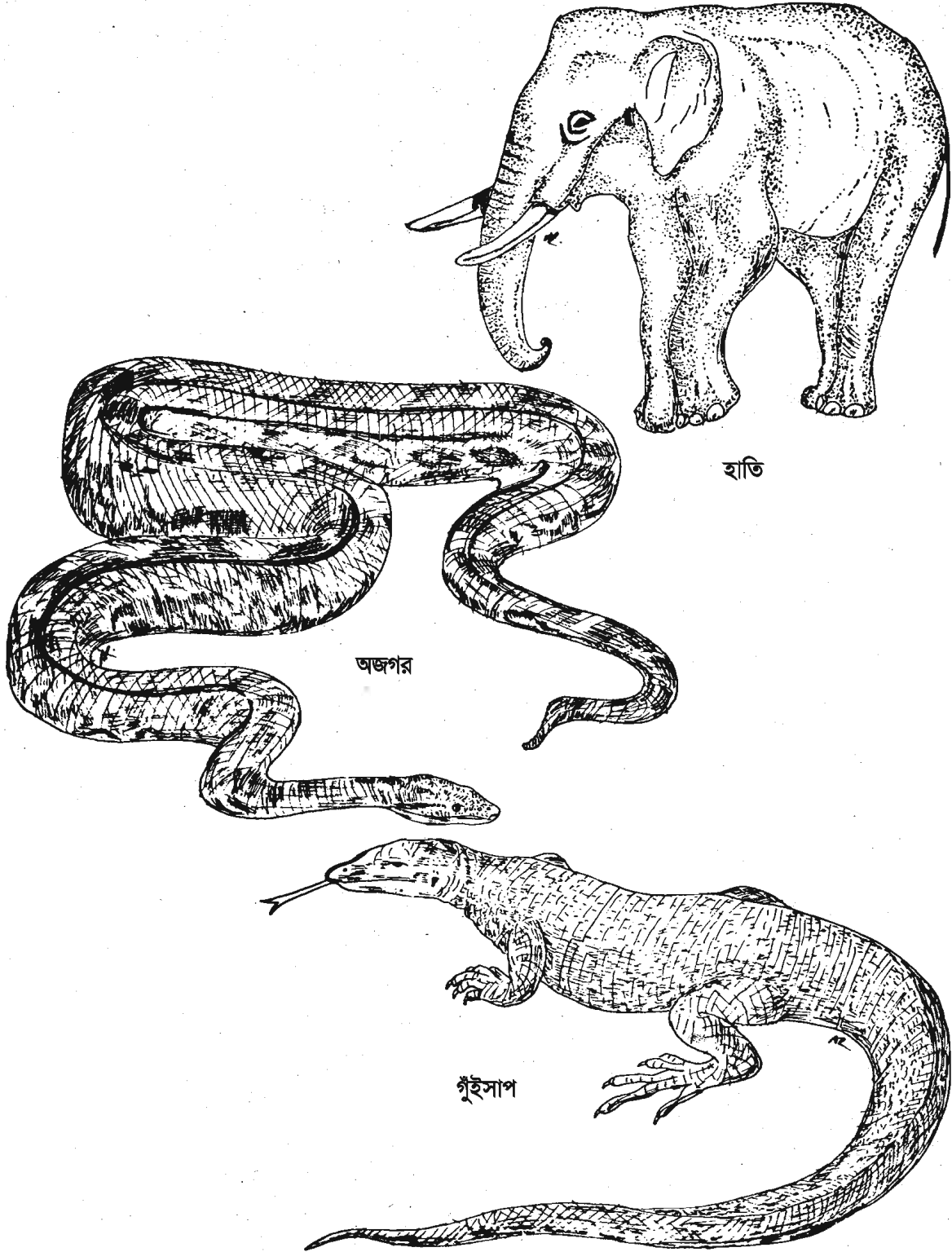
উপকূলীয় বনভূমির বিস্তৃতি : উপকূলীয় প্রতিকূল পরিবেশের জন্য অভিযোজিত গাছগুলোকে ম্যানগ্রোভ বলে। এদের দ্বারা সৃষ্ট বনভূমিকে ম্যানগ্রোভ বন (mangrove forest) বলে। আঞ্চলিক ভাষায় অনেক সময় এদের ‘পেরা বন’ বলে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে ‘সুন্দরবন’ এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ‘চকোরিয়া সুন্দরবন’ প্রাকৃতিক বন। এ ছাড়া উপকূলীয় অঞ্চলকে বাড় ও জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা করার জন্য উপকূল বরাবর অনেক ম্যানগ্রোভ গাছ রোপণ করে বনায়ন করা হয়েছে। মানুষের তৈরি এইসব বনভূমিকে ‘উপকূলীয় বনায়ন’ বা Coastal afforestation বলে। এদের সম্বন্ধে নিচে আলোচনা করা হল।

- (১) **সুন্দরবন :** বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বন হল সুন্দরবন। বৃহত্তর খুলনা জেলার দক্ষিণাঞ্চল এবং পটুয়াখালী জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের মোট ৫১০০ বর্গ কিমি (প্রায় ২০০০ বর্গমাইল) এলাকা নিয়ে সুন্দরবন গঠিত। বনের পূর্বে বালেশ্বর নদী, পশ্চিমে রায়মঙ্গল নদী, উত্তরে দেশের মূলভূমি এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।

বাংলাদেশের মোট বনাঞ্চলের ৪৭ ভাগই হল সুন্দরবন এবং বন বিভাগের রাজস্ব আয়ের অর্ধেকেরও বেশি আসে সুন্দরবন হতে। এ বন থেকে সরাসরি কাঠ, জ্বালানি, মাছ, মধু ও মোম পাওয়া যায়। প্রতি বছর সুন্দরবন থেকে ৯৭০০০ টন গোলপাতা, ২২০ টন মধু এবং ৫০ টন মোম আহরণ করা হয়। এ ছাড়া এ বন সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ থেকে দেশের লোকালয়কে রক্ষা করে।



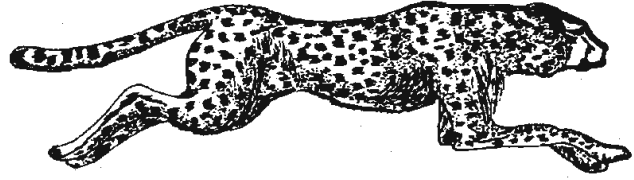
চিত্র ১৫.৪ : জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম



চিত্র ১৫.৪ ক : পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে বসবাসকারী কয়েকটি প্রাণী



উল্লুক



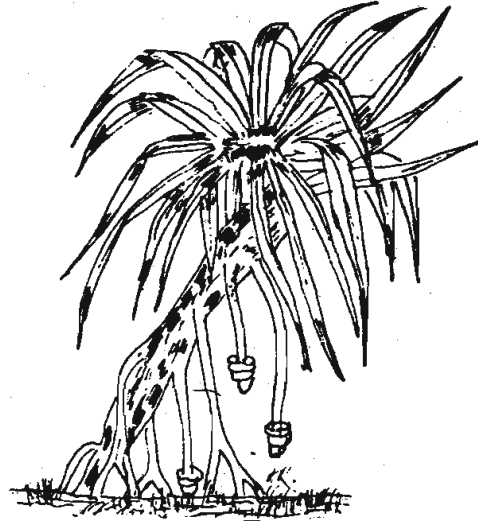
চিতাবাঘ

চিত্র ১৫.৪ খ : পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে বসবাসকারী কয়েকটি প্রাণী

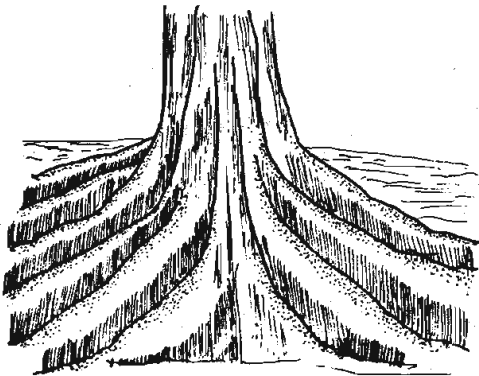
লবণাক্ততার পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে সুন্দরবনকে সাধারণত তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়, যথা—

অলবণাক্ত অঞ্চল : সাধারণত নদী, নালা, খালের কাছের অঞ্চল অলবণাক্ত। এ অঞ্চলের প্রধান বৃক্ষ সুন্দরী (*Heritiera fomes*)। এ ছাড়া গেওয়া, কেওড়া, গোলপাতা, আমুর, হিন্তাল, হারগোজা প্রভৃতি উদ্ভিদ বেশি জন্মে।

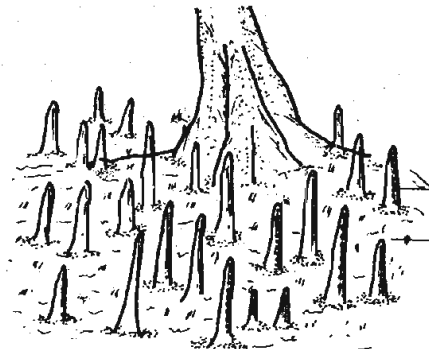
মৃদু লবণাক্ত অঞ্চল : এ অঞ্চলের প্রধান গাছ গেওয়া (*Excoecaria agallocha*) এবং অন্যান্য উদ্ভিদের মধ্যে আছে পশুর, খাপু, কাঁকড়া, সাদা বাইন, কালা বাইন এবং পাক্সা সুন্দরী।



ঠেস মূল



ডানাবৎ মূল



শ্বাসমূল

ছিদ্র

কাদা পানি

চিত্র ১৫.৫ : সুন্দরবন বনাঞ্চলের উদ্ভিদের বিভিন্ন রকম মূল

লবণাক্ত অঞ্চল : এ অঞ্চলের প্রধান বৃক্ষ গরান (*Ceriops roxburghiana*), ধুন্দুল, পশুর, কাঁকড়া ইত্যাদি।

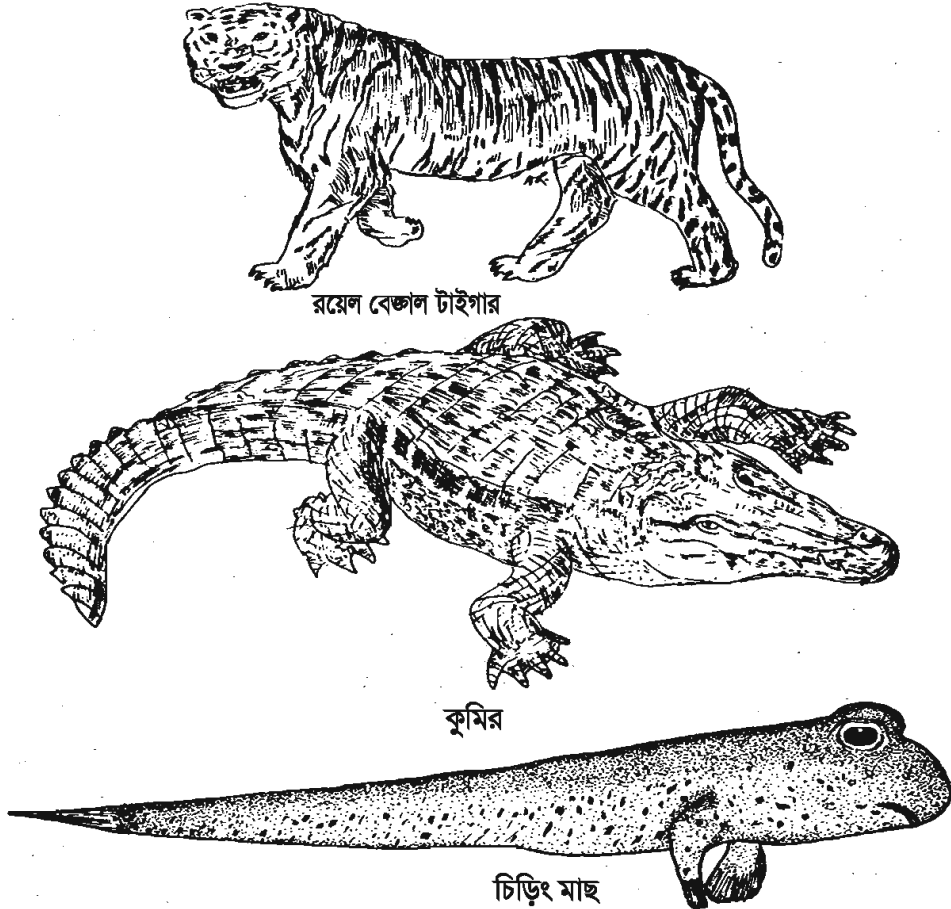
সুন্দরবনের প্রধান প্রধান প্রাণী : এ বনে বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণী বাস করে। এদের অনেকেরই বিস্তৃতি শুধু ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। বায়বীয় বা শ্বাসমূলগুলোর মধ্যে কয়েক প্রজাতির ছোট প্রাণী বাস করে। এখানে প্রচুর লাল কাঁকড়া, চিড়ি এবং চিড়িং মাছ পাওয়া যায়। কাদায় লাফিয়ে চলার জন্য এই মাছের বক্ষ পাখনাগুলো বিশেষভাবে গঠিত। সুন্দরবনের উল্লেখযোগ্য প্রাণী হচ্ছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার। এই প্রাণী দেখতে যেমন সুন্দর, এর গায়ে শক্তিও তেমন বেশি। এরা অত্যন্ত সাহসী এবং হিংস্র। একসময় সমগ্র এশিয়া মহাদেশে এ বাঘের বিস্তৃতি ছিল। কিন্তু এই মূল্যবান প্রাণী এখন বিলুপ্ত প্রায়। সুন্দরবনের বনাঞ্চলে এখন মাত্র শ'দুয়েক বাঘ আছে। এ ছাড়া এ বনে ভোদর, বনবিড়াল ও গোখরা সাপ, শূকর, বানর ও চিত্রা হরিণ আছে। এ বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীতে রয়েছে বিরাটাকার কুমির। সুন্দরবনে প্রচুর মৌচাক তৈরি হয়। এসব মৌচাক থেকে প্রচুর মোম ও মধু পাওয়া যায়।

(২) **চকোরিয়া সুন্দরবন :** কক্সবাজার জেলার মাতামুহুরী নদীর মোহনায় অবস্থিত ম্যানগ্রোভ বনের নাম চকোরিয়া সুন্দরবন। পূর্বে এ বনের যে আয়তন ছিল বর্তমানে তার অর্ধেকের চেয়েও কম আয়তন নিয়ে টিকে আছে এ বন।

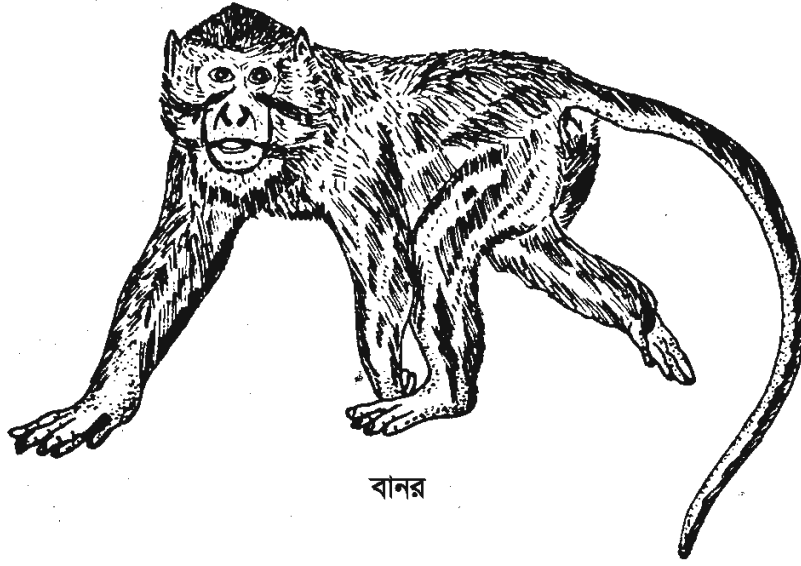
উদ্ভিদ : চকোরিয়া সুন্দরবনের প্রধান উদ্ভিদ হল বাইন, ওরা, কেওড়া, সইলাকাঁটা, গরান, কাঁকড়া, হিন্তাল, গোলপাতা, হারগোজা, খলশি, হোদো (টাইগার ফার্ন), নোনালতা, সুন্দরীলতা এবং অতি অল্প পরিমাণে সুন্দরী (বর্তমানে প্রায় নেই বললেই চলে)।

টেকনাফের কাছাকাছি নাফ নদীর তীরেও একটি ম্যানগ্রোভ বন আছে, তবে সেখানে কোন সুন্দরী গাছ নেই।

প্রধান প্রধান প্রাণী : বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, সাপ, পাখি।



চিত্র ১৫.৭ (ক) : গরান বা ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের প্রাণী



বানর

চিত্র ১৫.৭ (খ) : গরান বা ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের প্রাণী

(৩) উপকূলীয় বনায়ন (Coastal afforestation) : উনুক্ত উপকূলীয় অঞ্চলে উপর্যুপরি সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসের দরুন মানুষের জীবন ও সম্পদের যে ক্ষতি হত তা প্রতিরোধ করার জন্য উপকূল বরাবর ম্যানগ্রোভ গাছের চারা লাগানো হয়। এর ফলে এসব অঞ্চলে মনোরম বন সৃষ্টি হয়েছে এবং কিছুদিনের মধ্যে ঐ অঞ্চলের মাটির গুণগত মান পরিবর্তন হয়ে কৃষিযোগ্য হয়েছে।

উদ্ভিদ : উপকূলীয় বনায়নে মূলত বাইন ও কেওড়া গাছ লাগানো হয়। তুলনামূলকভাবে বেশি লবণাক্ত মাটিতে বাইন এবং মোহনা অঞ্চলে যেখানে লোনা পানির সাথে নদী বাহিত মিঠা পানি মেশে সেখানে কেওড়া গাছ লাগানো হয়।

৬। সেন্টমার্টিন দ্বীপ

ভূতাত্ত্বিকভাবে সেন্টমার্টিন দ্বীপ একটি মহাদেশীয় দ্বীপ। তবে এখানে কিছু প্রবাল জন্মে। সেজন্য অনেকেই এটিকে প্রবাল দ্বীপ (Coral island) বলে মনে করেন। এটি টেকনাফের মূল ভূখণ্ড হতে সমুদ্রের প্রায় ১২ কিমি ভেতরে অবস্থিত। দ্বীপটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫ কিমি এবং প্রস্থে কোথাও ৬০০ মিটার আবার কোথাও ২০০ বা ১০০ মিটার। দ্বীপের আশপাশে যে ছোট ছোট দ্বীপ আছে সেগুলোকে স্থানীয় লোকরা সিরাদিয়া বা পৃথক দ্বীপ বলে। এর উত্তর অংশ প্রশস্ত এবং জিনজিরা নামে পরিচিত। এখানে লোকবসতি আছে। দ্বীপের দক্ষিণ দিকে কোন লোকালয় নেই, তবে একটি ম্যানগ্রোভ বন আছে। জিনজিরাতে একটি মিঠাপানির নিম্নভূমি আছে।

পরিবেশীয় বৈশিষ্ট্য : ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ মাটি, পরিমিত বৃষ্টিপাত, পরিমিত তাপ এই দ্বীপের প্রধান পরিবেশীয় বৈশিষ্ট্য। ম্যানগ্রোভ বন এলাকায় জোয়ারের সময় লোনা পানি প্রবেশ করে, ভাটার সময় নেমে যায়। জায়গাটি জলাবদ্ধ ও কর্দমাক্ত থাকে।

উদ্ভিদ : দ্বীপের তীরবর্তী বালিময় এলাকাতে ঝাউ, নিসিন্দা, ভাট, নাটা এবং ছাগলখুরি লতা আছে। এগুলো বালির ঢিপির উদ্ভিদ। দ্বীপের চারদিকে বহু জায়গায় বড় জাতের কেয়া গাছ আছে। জিনজিরার জলাভূমিতে জলজ উদ্ভিদ আছে। দক্ষিণ পাড়ায় আছে ছোট ম্যানগ্রোভ বন। এ বনে কোন সুন্দরী গাছ নেই। আছে ক্রিপা, খলশি, সইলাকাঁটা, হাড়গোজা, ভোলা ইত্যাদি। লাগানো গাছের মধ্যে আছে আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, সুপারি, বাতাবী লেবু, কুল এবং প্রচুর

নারিকেল। বাড়ির আশপাশে আছে চালতা, কড়ই, কলমি, উদল, ডুমুর ইত্যাদি। দ্বীপে সাধারণত ধনে, মরিচ, পিঁয়াজ, রসুন, ধান, মিষ্টি আলু চাষ করা হয়। এ দ্বীপে প্রবাল ও বড় বড় পাথরের ওপর আছে কিছু বাদামী ও লোহিত শৈবাল। বর্তমানে এ দ্বীপে বনায়নের চেষ্টা চলছে।

প্রধান প্রধান প্রাণী : দ্বীপে আছে বড় বড় সামুদ্রিক কাছিম। ডিম পাড়তে এরা ডাঙায় আসে এবং একসাথে প্রচুর ডিম পাড়ে। এ ছাড়া দক্ষিণের নিচু দ্বীপ এলাকায় আছে লক্ষ লক্ষ লাল কাঁকড়া। আছে প্রচুর সামুদ্রিক পাখি। দ্বীপের চারদিকে সমুদ্রে আছে বিভিন্ন জাতের সামুদ্রিক মাছ। দ্বীপের চারদিকে রয়েছে কয়েক প্রজাতির প্রবাল, বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক শামুক, ঝিনুক ও বিষাক্ত সাপ।

এ দ্বীপের অধিবাসীরা সাধারণত মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। বর্তমানে এ দ্বীপের উত্তর অংশে লোকসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা উপকূলের বালির ওপরের পাথর ও প্রবাল সংগ্রহ করে পর্যটকদের কাছে বিক্রি করে থাকে। ফলে সমগ্র উপকূল এলাকা থেকে মাটি ধুয়ে যাচ্ছে। এতে এ দ্বীপের পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও ভারসাম্য রক্ষায় বিভিন্ন উদ্ভিদ অঞ্চলের গুরুত্ব : উদ্ভিদ, প্রাণী, পানি, আলো, বাতাস, তাপ, মাটি এগুলো হল প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান। এগুলোর সমন্বয়েই কোন একটি এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ গঠিত হয়। সূচনালগ্ন থেকেই মহান সৃষ্টিকর্তা এগুলোর মধ্যে একটি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে দেন। কোন একটি এলাকার পরিবেশের যে কোন একটি উপাদানের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটলে মোট উপাদানগুলোর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ভারসাম্য বিনষ্ট হয় এবং সাথে সাথে সামগ্রিক পরিবেশের ওপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এর ফলে স্বাভাবিক পরিবেশ বিনষ্ট হয়, ক্রমেই পরিবেশ আমাদের বসবাসের অনুপযোগী হতে থাকে। কোন একটি অঞ্চলের বা দেশের উদ্ভিদরাজি, বিশেষ করে বনাঞ্চল, স্বাভাবিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও ভারসাম্য রক্ষায় প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে থাকে; কারণ উদ্ভিদই হল প্রাথমিক প্রডিউসার। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন একটি জলাভূমিতে যদি কোন প্রকার উদ্ভিদ না জন্মে, তাহলে ঐ জলাভূমিতে কোন প্রকার মাছ বাঁচতে পারবে না, আর মাছ না থাকলে মাছের ওপর নির্ভরশীল বক ও অন্যান্য পাখি, সাপ এগুলো থাকতে পারবে না। কোন একটি এলাকার বনাঞ্চল যদি ধ্বংস করা হয় তাহলে ঐ অঞ্চলে ভূমির পানি ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পাবে, বৃষ্টির পরিমাণ কমে যাবে, ভূমির ক্ষয় তীব্র হবে, নদনদী ভরাট হবে, বর্ষায় সহজেই বন্যা হবে, আবার পানির স্তর নিচে চলে যাবার জন্য শুকনো মৌসুমে প্রচণ্ড খরা দেখা দেবে, ফসলের ফলন কমে যাবে, মানুষের অভাব অনটন বেড়ে যাবে। আবার ঐ বনাঞ্চলে বাসরত পশুপাখি, সাপ, ব্যাঙ সবই ক্রমে ক্রমে লোপ পাবে, না হয় খাবারের জন্য ফসলক্ষেত বা লোকালয়ে চলে আসবে। গাছপালার সংখ্যা কমে গেলে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হবে। কাজেই আমাদের নিজেদের জন্য এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মে স্বাভাবিক জীবন ধারণের জন্য আমাদের বর্তমান বনজ সম্পদ সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করতে হবে এবং প্রতি বছর বেশি করে বনজ ও ফল গাছ লাগিয়ে বাড়তি লোকের অনুপাত অনুসারে উদ্ভিদ সম্পদ বাড়াতে হবে।

বিলুপ্ত প্রায় উদ্ভিদ ও প্রাণী সংরক্ষণ : পৃথিবীতে ভূমির পরিমাণ সীমিত কিন্তু ক্রমেই বাড়ছে মানুষ। বাড়তি মানুষের থাকার জন্য নতুন করে ঘরবাড়ি নির্মাণ, তাদের সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য স্কুল-কলেজ নির্মাণ, তাদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল নির্মাণ, তাদের চলাচলের জন্য নতুন রাস্তা নির্মাণ, তাদের খাবারের জন্য অধিক চাষের জমি যোগান। এসব কারণে প্রতিনিয়তই বনভূমি ধ্বংস হচ্ছে। বিভিন্ন জরিপের তথ্য থেকে জানা যায়, পৃথিবীতে বর্তমানে গড়ে প্রতি মিনিটে ৫০ একর করে বন ধ্বংস হচ্ছে। বনাঞ্চল ধ্বংসের কারণে ইতোমধ্যেই বহু উদ্ভিদ প্রজাতি এবং তাদের ওপর নির্ভরশীল প্রাণী পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেছে এবং আরও অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণী বিলুপ্তির পথে। বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ ও প্রাণী এই পরিবেশেরই অবিচ্ছেদ্য উপাদান। তাই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে হলে এদের অবশ্যই বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। যাতে করে এগুলো থেকে আমরা পাই জীবন রক্ষাকারী

মূল্যবান ওষুধ বা ফসল উন্নয়নের মূল্যবান জীন। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশে অনেক উদ্ভিদ ও অনেক প্রাণী বিলুপ্ত হতে চলেছে। এদের অবশ্যই বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। অশ্বগন্ধা, লতাকসুতুরী, জংলী পিঁয়াজ, মন্টেসিয় এগুলো উদ্ভিদ বিলুপ্তপ্রায়। ঘড়িয়াল, সবুজ কচ্ছপ, পাইথন, পদ্ম গোখরা, পাহাড়ি ময়না, ডোরাকাটা বাঘ প্রভৃতি প্রাণীও বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্ত হওয়ার পথে। এদের রক্ষা করতে হলে যে প্রাকৃতিক পরিবেশে এরা জন্মে সে প্রাকৃতিক পরিবেশ ঐভাবেই সংরক্ষণ করতে হবে, বনভূমি ধ্বংস সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে, প্রকৃতি থেকে কোন উদ্ভিদে বেহিসেবি আহরণ করা চলবে না, জমিতে কীটনাশক, ছত্রাকনাশক, আগাছানাশক যতটা সম্ভব কম ব্যবহার করতে হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। নিচের কোনটি শ্বাসমূলের বৈশিষ্ট্য?

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| ক. পানি শোষণ করা | খ. অক্সিজেন গ্রহণ করা |
| গ. কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করা | ঘ. গাছকে দৃঢ়তা প্রদান করা |

২। পাতাঝরা বন সৃষ্টিতে সহায়ক পরিবেশ -

- উচ্চমাত্রা বিশিষ্ট গ্রীষ্মকাল
- আর্দ্রতাবিহীন শুষ্ক শীতকাল
- কম জলীয় বাষ্প পূর্ণ বাতাস

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |



উপরের চিত্র অবলম্বনে ৩নং ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

৩। চিত্রের প্রাণীটি কোন ধরনের?

- | | |
|----------------|-------------------|
| ক. স্তন্যপায়ী | খ. মৎস্যভুক্ত |
| গ. সন্ধিপদী | ঘ. তরুণাস্থিযুক্ত |

৪। ক চিহ্নিত অঙ্গটির সাহায্যে প্রাণীটি -

- সাঁতার কাটে
- লাফিয়ে চলে
- শ্বাস নেয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। গোবিন্দ গুরু হাইস্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষক একবার নবম শ্রেণীর ছাত্রদের নিয়ে শিক্ষা সফরে সুন্দরবনে যান। বনের ভিতর চলতে চলতে একজন ছাত্র কিছুসংখ্যক গাছে উর্ধ্বমুখী মূল দেখতে পায়। কৌতূহলী হয়ে ছাত্রটি শিক্ষকের নিকট এই উর্ধ্বমুখী মূল ও অন্যান্য অভিযোজনিক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির কারণ জানতে চাইলে শিক্ষক তা বুঝিয়ে দেন। ব্যাখ্যা কর।

ক. সুন্দরবনের অন্য নাম কী?

খ. সুন্দরবনের উদ্ভিদের উর্ধ্বমুখী মূলকে অভিযোজনিক বৈশিষ্ট্য বলা হয় কেন?

গ. কক্সবাজার বনাঞ্চলে এ ধরনের বন শনাক্তকরণে তুমি কোন প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হবে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সুন্দরবন এলাকার বাইরে তোমার এলাকায় কৃত্রিমভাবে এ ধরনের বন তৈরি করা কতটুকু যুক্তিসংগত বিশ্লেষণ কর।

অধ্যায় ষোল

অর্থনৈতিক জীববিদ্যা

মানুষের খাবার জন্য চাই খাদ্য, পরিধানের জন্য চাই বস্ত্র, থাকার জন্য চাই বাসস্থান, রোগ থেকে ভাল হওয়ার জন্য চাই ওষুধ, পান করার জন্য চাই পানীয়। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য এগুলো অত্যাবশ্যক। এগুলো মানুষের মৌলিক চাহিদা। আমাদের এসব মৌলিক চাহিদা পূরণ করে থাকে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ। এ ছাড়াও উদ্ভিদ থেকে পাই কাগজ-সভ্যতার এক বিশেষ উপাদান, পাই রবার- যা ছাড়া সভ্যতা নিশ্চল হয়ে পড়ে, পাই বিভিন্ন জাতের রং, আঠা; পাই অত্যাবশ্যকীয় জ্বালানি; পাই কৃষি ও শিল্প উপকরণ; পাই আনন্দ ভ্রমণের নৌকা, পাই অক্সিজেনযুক্ত নির্মল বাতাস, আরও কত কী? এককথায় উদ্ভিদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম।

আমাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, ওষুধ ও পানীয় উৎপাদনকারী উদ্ভিদের (যা বাংলাদেশে জন্মে) সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিচে দেয়া হল।

(ক) খাদ্য উৎপাদনকারী উদ্ভিদ

যা খেলে দেহে কর্মশক্তি সৃষ্টি হয়, দেহের ক্ষয়পূরণ ও পুষ্টিসাধন হয় তাই খাদ্য। মানুষের খাদ্যকে পুষ্টি উপাদানের প্রকৃতি অনুযায়ী ছয় ভাগে ভাগ করা হয়। যথা : ১। শর্করা জাতীয় খাদ্য, ২। আমিষ জাতীয় খাদ্য, ৩। তেল জাতীয় খাদ্য, ৪। খনিজ লবণ জাতীয় খাদ্য, ৫। ভিটামিন জাতীয় খাদ্য এবং ৬। পানি। সব প্রকার খাদ্যেই কিছু পরিমাণ পানি থাকে। এখানে খাদ্য উৎপাদনকারী ১০টি উদ্ভিদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেয়া হল।

১। ধান : ধান গাছ ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ। এর কাণ্ড ফাঁপা, পাতা লম্বা, কাণ্ডবেষ্টক। কাণ্ডের মাথায় ধানের ছড়া হয়। বাংলাদেশে আউশ (ফাল্গুনের শেষ হতে বৈশাখের মাঝামাঝি জমিতে হয়) আমন (শ্রাবণ মাসে কর্দমাক্ত জমিতে চারা লাগানো হয়) এবং বোরো (নিচু জলাশয় জমিতে অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে চারা লাগানো হয়) এই তিন জাতের ধান চাষ করা হয়। এছাড়া উচ্চ ফলনশীল ইরি (IRRI) এবং বিরি (BRRI) ধানও চাষ করা হয়। ইরি এবং বিরি আউশ, আমন ও বোরো তিন জাতেরই হয়ে থাকে।

ব্যবহার : ধান থেকে চাউল পাই। চাউল থেকে ভাত পাই। ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য। ধান থেকে চিড়া, মুড়ি এগুলোও পাই।

২। গম : ধানের মত গমও ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ। গম গাছ ২-৩ ফুট উঁচু হয়ে থাকে। গম গাছেও কাণ্ডের মাথায় ছড়া হয়।

ব্যবহার : সুজি, ময়দা, আটা এগুলো গম থেকে পাই।



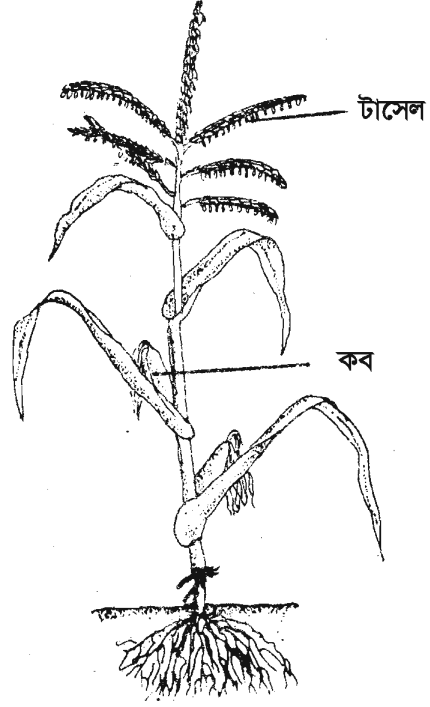
চিত্র ১৬.১ : ধান গাছ

অনেক দেশে এটাই প্রধান খাদ্য (শীতপ্রধান দেশসমূহ)।

৩। **ভুট্টা** : ভুট্টা একটি একবীজপত্রী বর্ষজীবী উদ্ভিদ। এটি ৩-৬ ফুট উঁচু হয়। এর কাণ্ড নিরেট, নিচের অংশ থেকে ঠেস মূল বের হয়। গাছে দু ধরনের মঞ্জরী হয়, পুং-মঞ্জরিকে বলা হয় টাসেল (tassel) এবং স্ত্রী মঞ্জরিকে বলা হয় কব (Cob)।

ব্যবহার : ভুট্টার দানা পুড়িয়ে খাওয়া হয়, দানা হতে কর্নফ্লেকস তৈরি করা হয়, আটা তৈরি হয়। ভুট্টার তেলে কোলেস্টেরল অত্যন্ত কম পরিমাণে থাকে বলে এটি স্বাস্থ্যকর। অনেক দেশে ভুট্টা প্রধান খাদ্য (মেক্সিকো)।

৪। **আলু** : আলু ছোট বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। কাণ্ড নরম, পাতা যৌগিক। মাটির নিচে কাণ্ডের মাথা সঞ্চিত হয়ে আলুতে পরিণত হয়। আলু আমাদের দেশে সবজি হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তবে অনেক দেশের প্রধান খাদ্য (আয়ারল্যান্ড)। ধান, গম, ভুট্টা, আলু এগুলো শর্করা জাতীয় খাদ্য।



চিত্র ১৬.২ : ভুট্টা গাছ

খাদ্য	শর্করা	আমিষ	চর্বি
চাউল	৮০	৭	০.৭
গম	৭২	১১	১.৫
ভুট্টা	৬৭	১১	৩.৬
আলু	১৮	২	০.১

উপরের ছকে প্রতি এক শ গ্রাম খাদ্য উপযোগী অংশে চাউল, গম, ভুট্টা এবং আলুর শর্করা, আমিষ ও চর্বির পরিমাণ তুলনা করা হল।

৫। **মসুর** : মসুর বর্ষজীবী শীতকালীন ফসল। পাতা যৌগিক, পত্রক সরু, লম্বা এবং প্রতি পাতায় পত্রক অনেকগুলো। ফুল প্রজাপতিসম, ফল চ্যাপ্টা। দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় এটি ভাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৬। **ছোলা** : ছোলা শীতকালীন ফসল। কাণ্ড ১-২ ফুট উঁচু হয়। পাতা পক্ষল যৌগিক। পত্রক উপবৃত্তাকার, কিনার খাঁজকাটা। ফুল প্রজাপতিসম।

৭। **বাদাম** : বাদাম বর্ষজীবী ছোট বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। পাতা যৌগিক, অচূড় পক্ষল। এর ফুল মাটির উপর হয় কিন্তু পরাগায়নের পর তা মাটির নিচে চলে যায়। তাই ফল হয় মাটির নিচে। মসুর, ছোলা, বাদাম এগুলো আমিষ জাতীয় খাদ্য; কারণ এদের আমিষ উপাদান অনেক। বাদামকে তেল জাতীয় খাদ্যও বলা চলে।

খাদ্য	আমিষ	চর্বি	শর্করা
মসুর	২৭	১	৫৫
ছোলা	২১	৪	৫৪
বাদাম	২৫	৪০	২৬

উপরের ছকে প্রতি এক শ গ্রাম খাদ্য উপযোগী অংশে মসুর, ছোলা ও বাদামের আমিষ, চর্বি ও শর্করার পরিমাণ তুলনা করা হল।

৮। আম : আম গাছ বড় বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ। এর পাতা সরল, লম্বা এবং একান্তর। মঞ্জুরিতে ফুল ধরে। গ্রীষ্মকালে ফল পাকে। আম ফলের রাজা। আমের বীজ থেকে চারা হয়, আবার কলম করেও গাছ লাগানো হয়। আমের রসালো মধ্যভাগ খাওয়া যায়।

৯। কলা : কলা গাছের কাণ্ড মাটির কাছাকাছি থাকে। একে রাইজোম বলে। রাইজোম থেকে বায়বীয় কাণ্ডের সৃষ্টি হয়। কলা গাছের বায়বীয় কাণ্ড আসলে পাতার খোলসের সমষ্টি। এটি প্রকৃত কাণ্ড নয়। কলা বারমাসী ফল। সাকার থেকে নতুন গাছ হয়। কলার বাইরের খোসা ছাড়া সবটুকু খাওয়া হয়। কলা অনেক দেশের প্রধান খাদ্য। দেহে লৌহ উপাদানের অভাব কলা খেয়ে পূরণ করা যায়।

১০। কাঁঠাল : কাঁঠাল বড় বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ। পাতা সরল, একান্তর, অনেকটা বি-ডিম্বাকার। এর ফল যৌগিক এবং অনেক বড় হয়। বীজ থেকে চারা হয়। কাঁঠালের মঞ্জুরিপত্র, পুষ্পপুট এবং বীজ খাওয়া হয়।

আম, কলা ও কাঁঠাল থেকে আমরা খনিজ লবণ ও ভিটামিন জাতীয় খাদ্য পেয়ে থাকি।

খাদ	পানি	আমিষ	চর্বি	শর্করা	ক্যালসিয়াম (মিলিগ্রাম)	লৌহ (মিলিগ্রাম)	ক্যারোটিন IU	ভিটামিন বি _১ , বি _{১২}	ভিটামিন সি
আম	৭৮	১	১.৭	২০	১৬	১.৩	৩০০	++	৪১
কলা	৬২	৭	০.৮	২৫	১৩	৯	—	++	২৪
কাঁঠাল	৮৮	১.৮	০.১	৯.৯	২৬	০.৫	৪৭০০	++	২১

উপরের ছকে আম, কলা ও কাঁঠাল-এর বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের তুলনা করা হল।

খ) বস্ত্র উৎপাদনকারী উদ্ভিদ

মোলায়েম আঁশ হতে সুতা ও বস্ত্র তৈরি হয়। তুলা, পাট এ ধরনের আঁশ প্রদানকারী উদ্ভিদ। নিচে এ ধরনের পাঁচটি উদ্ভিদের সর্বাঙ্গীকৃত বর্ণনা দেয়া হল।

১। তুলা : তুলা বলতে কার্পাস তুলাকে বুঝায়। কৃষি অবস্থায় তুলা বর্ষজীবী উদ্ভিদ। গাছ ৩-৪ ফুট উঁচু হয়। ফলের ভেতর বীজ হয় এবং বীজের গায়ে তুলার আঁশ হয়। এজন্য তুলাকে গাত্রভস্তু বা সার্কোস ফাইবার বলা হয়। শিমুল তুলার আঁশ হয় ফলের ভিতরের গায়ে, বীজের গায়ে নয়।

ব্যবহার : সুতা তৈরি এবং বিভিন্ন প্রকার সুতি কাপড় তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।



চিত্র ১৬.৩ : তুলা গাছের একাংশ

২। পাট : পাট একটি বর্ষজীবী বীরুৎ। এর কাণ্ড সরু এবং সাধারণত শাখাবিহীন। পাতা সরল, একান্তর ও পিচ্ছিল। ফুল হলুদ। বাংলাদেশে দুই প্রজাতির পাট চাষ হয়। একটি হল তোষা পাট— যার আঁশ সোনালি বর্ণের, ফল লম্বা, বীজ নীল এবং সাধারণ উঁচু জমিতে চাষ করা হয়। অপরটি হল সাদা বা সুতিপাট— যার আঁশ সাদা বর্ণের, ফল গোলাকার, বীজ খয়েরি এবং সাধারণত নিচু জমিতে চাষ হয়। কাণ্ডের বাকল তথা সেকেন্ডারি ফ্লোয়েম টিস্যু হতে আঁশ পাওয়া যায়। এ জাতীয় আঁশকে বাস্ট ফাইবার বলে।

ব্যবহার : কাপড়, কার্পেট, চট ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

৩। মেস্তা পাট : মেস্তা বর্ষজীবী বীরুৎ। ১০-১৫ ফুট উঁচু হয়। ফুল বেশ বড় ও হলুদ বর্ণের। কাণ্ডের বাকল থেকে বাস্ট ফাইবার সংগ্রহ করা হয়।

ব্যবহার : কার্পেট, মোটা কাপড় তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

৪। শন পাট : শন পাট বর্ষজীবী উদ্ভিদ। কাণ্ড সাধারণ ৬-১০ ফুট উঁচু হয়। ফুল হলুদ ও প্রজাপতিসম। ফল অনেকটা বেলুনের মত। কাণ্ডের বাকল থেকে বাস্ট ফাইবার সংগ্রহ করা হয়।

ব্যবহার : মোটা কাপড়, তাঁবুর কাপড়, পর্দার কাপড়, টিস্যু পেপার, সিগারেটের কাগজ ইত্যাদি তৈরিতে এ আঁশ ব্যবহার করা হয়।

৫। বাঁশ : বাঁশ বহুবর্ষজীবী বৃক্ষ সদৃশ উঁচু উদ্ভিদ। বাঁশের কাণ্ড হতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম সুতা রেয়ন তৈরি করা হয়। চটগ্রাম অঞ্চলে অধিক বাঁশ উৎপন্ন হয় বলে চটগ্রামে রেয়ন উৎপাদনের কারখানা স্থাপিত হয়েছে।

ব্যবহার : বিভিন্ন প্রকার বস্ত্র তৈরি করা। এ ছাড়া বাঁশ কাগজের মণ্ড উৎপাদনের একটি প্রধান উৎস।

(গ) বাসস্থান নির্মাণে ব্যবহৃত উদ্ভিদ

বাসস্থানের খুঁটি, বেড়া, চালা, দরজা, জানালা, আসবাবপত্র তৈরি ইত্যাদিতে অনেক উদ্ভিদ বা উদ্ভিদাংশ ব্যবহার করা হয়। এখানে এমন কয়েকটি উদ্ভিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হল।

১। বাঁশ : গ্রামবাংলায় বাসস্থান নির্মাণে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় বাঁশ। বাঁশ হল সরু ও বেশ লম্বা কাণ্ড বিশিষ্ট উদ্ভিদ। কাণ্ডের গোড়া থেকে সাকার—এর সাহায্যে এদের বংশবৃদ্ধি হয় এবং অনেকগুলো বাঁশ এক সাথে জন্মে থাকে। একে বলা হয় বাঁশঝাড়। বাংলাদেশে ১৯ প্রকার বাঁশ আছে।



চিত্র ১৬.৪ : পাট গাছের একাংশ



চিত্র ১৬.৫ : শন পাট গাছের একাংশ

ব্যবহার : খুঁটি হিসেবেই বাঁশ বেশি ব্যবহার করা হয়, তবে বেড়া ও অন্যান্য কাজেও বাঁশ ব্যবহার করা হয়।

২। ছন : ছন এক প্রকার লম্বা ও সরু ঘাস বিশেষ। জমিতে একবার লাগালে আর লাগাতে হয় না। প্রতি বছরই একবার করে ছন কেটে নেয়া হয় এবং নতুন করে আবার জন্মে থাকে। সাকার দিয়ে নতুন গাছের জন্ম হয়।

ব্যবহার : ঘরের চালা নির্মাণে ব্যবহার করা হয়।

৩। গোলপাতা : গোলপাতা এক প্রকার পাম জাতীয় উদ্ভিদ। কাণ্ড মাটির কাছাকাছি থাকে। পাতা নারিকেল পাতার মত, তবে খাড়াভাবে থাকে। মাঝখানের দুটি কচি পাতা রেখে বাকি পাতাগুলো বছরে একবার কেটে নেয়া হয়।

ব্যবহার : ঘরের চালা নির্মাণ।

৪। শাল : বড় বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ। পাতা সরল ও একান্তর। শীতকালে সব পাতা ঝরে যায়। ফল ডানায়ুক্ত।

ব্যবহার: ঘরের খুঁটি ও অন্যান্য শক্ত কাজে ব্যবহৃত হয়। শাল কাঠ খুবই শক্ত এবং টেকসই। কাঠের রং খয়েরি।

৫। সেগুন : সেগুন গাছ অনেক উঁচু হয়। পাতা সরল ও প্রতিমুখ। বর্ষাকালে শাখার মাথায় বড় বড় মঞ্জরি হয়। ফুল সাদা এবং ছোট।

ব্যবহার : দামি দরজা, শৌখিন ও মূল্যবান আসবাবপত্র তৈরিতে সেগুন কাঠ ব্যবহার করা হয়। কাঠের রং সোনালি হলুদ।

৬। সুন্দরী : সুন্দরী মাঝারি ধরনের বৃক্ষ। পাতা সরল। এটি চির সবুজ বৃক্ষ।

ব্যবহার : খুঁটি, দরজা-জানালা ফ্রেম ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা হয়। কাঠের রং লালচে ধরনের।

৭। গর্জন : গর্জন চিরসবুজ বৃক্ষ। কাণ্ড কম শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট এবং অনেক উঁচু হয়। পাতা সরল।

ব্যবহার : ঘরের বর্গা, দরজা-জানালা ফ্রেম, খুঁটি এসব কাজে বেশি ব্যবহার করা হয়। কাঠ হালকা লাল বর্ণের।

৮। গামারী : উঁচু পত্রঝরা বৃক্ষ। পাতা সরল। ফুল হলুদ।

ব্যবহার : দরজা, জানালা কপাট, ভাল আসবাবপত্র তৈরিতে বেশি ব্যবহার করা হয়। কাঠ সাদা বর্ণের।

৯। কাঁঠাল : শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট বড় বৃক্ষ। পাতা সরল ও একান্তর।

ব্যবহার : দরজা-জানালা ও আসবাবপত্র তৈরিতে বেশি ব্যবহার করা হয়। কাঠের রং হলুদ-লাল।

১০। কড়ই : কড়ই পত্রঝরা উঁচু বৃক্ষ। পাতা যৌগিক। ফল চ্যাপ্টা।

ব্যবহার : আসবাবপত্র, দরজা-জানালা নির্মাণে ব্যবহার করা হয়। সারকাঠ অনেকটা কালচে বর্ণের। শিল কড়ই কাঠ উঁচু মানের এবং রেনডি কড়ই নিচু মানের।

(ঘ) ওষুধ প্রদানকারী উদ্ভিদ

বাংলাদেশের মানুষ যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন অসুখে গাছপালা ব্যবহার করে আসছে। ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয় বলে এদেরকে বলা হয় ওষুধ প্রদানকারী উদ্ভিদ। **ভেষজ উদ্ভিদ** বা **বনৌষধি** নামেও এরা পরিচিতি। এখানে দশটি ওষুধ প্রদানকারী উদ্ভিদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেয়া হল।

১। অর্জুন : অর্জুন একটি বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ। এর পাতা সরল, প্রতিমুখ, দেখতে অনেকটা পেয়ারা পাতার মত। ফল কামরাঙার মত পাঁচটি শির ও খাঁজ বিশিষ্ট।

ব্যবহৃত অংশ : গাছের বাকল।

ব্যবহার : প্রধান ব্যবহার হৃদরোগে। অর্জুন ছাল ভালভাবে পিষে চিনি ও গরুর দুধের সাথে প্রতিদিন সকালে খেলে যাবতীয় হৃদরোগে আরোগ্য হয় বলে জানা যায়।

২। কালমেঘ : এটি একটি ছোট বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। সাধারণত ১-৩ ফুট উঁচু হয়। পাতা সরল, প্রতিমুখ, কিছুটা লম্বা ধরনের। বর্ষার শেষ হতে শীতকাল পর্যন্ত ফুল ও ফল হয়। পাতা বেশ তিতা। বাজারে চিরতা নামে বিক্রি হয়, যদিও এটি আসল চিরতা নয়।

ব্যবহৃত অংশ : সমস্ত গাছ, বিশেষ করে পাতা।

ব্যবহার : ছোট ছেলেমেয়েদের জ্বর, ক্রিমি, অজীর্ণ ও লিভার দোষে এটি একটি অত্যন্ত ভাল ঔষুধ। পাতার রস এক চামচ পরিমাণ খেতে হয়।

৩। তুলসী : তুলসী একটি অতি পরিচিত বীরুৎ বা ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। এটি সাধারণত ২-৪ ফুট উঁচু হয়ে থাকে। কাণ্ড চার কোণাকার। পাতা সরল, প্রতিমুখ, অনেকটা ডিম্বাকার, সুগন্ধযুক্ত। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহৃত অংশ : পাতা।

ব্যবহার : সাধারণ সর্দি-কাশিতে তুলসী পাতার রস বেশ উপকারী। ছোট ছেলেমেয়েদেরকে সাধারণত তুলসী পাতার রসের সাথে আদার রস ও মধু মিশিয়ে খাওয়ানো হয়।

৫। থানকুনি : থানকুনি একটি ছোট লতানো জাতীয় উদ্ভিদ। এর প্রতি পর্ব হতে নিচে মূল এবং উপরে শাখা ও পাতা গজায়। পাতা সরল, একান্তর, বৃকের মত, সাধারণত আধা ইঞ্চি হতে দু ইঞ্চি লম্বা হয়।

ব্যবহৃত অংশ : সমস্ত উদ্ভিদ, বিশেষ করে পাতা।

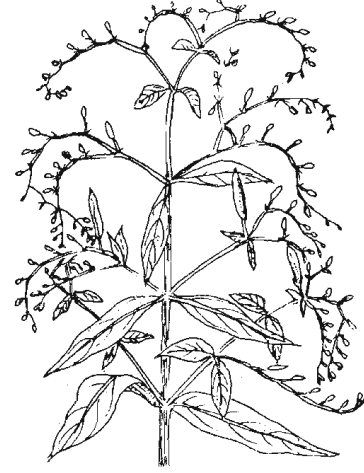
ব্যবহার : আমাদের দেশে থানকুনি বেশি ব্যবহার করা হয় ছোট ছেলেমেয়েদের পেটের অসুখ, বিশেষ করে বদহজমি ও আমাশয় রোগে। থানকুনি আয়ুর্বর্ধক, মেধাবর্ধক, স্মৃতিবর্ধক, আমশুল ও আমরক্ত নাশক, শরীর গঠন এবং বিভিন্ন প্রকার চর্মরোগ নাশক।

৬। দূর্বা : দূর্বা গ্রামবাংলার একটি অতি পরিচিত ঘাস। এটি বহুবর্ষজীবী শয়ান লতান বীরুৎ।

ব্যবহৃত অংশ : সমস্ত গাছ।

ব্যবহার : কাটাস্থান থেকে রক্তপড়া বন্ধ করতে দূর্বা একটি অব্যর্থ ঔষুধ। সাধারণত কচিপাতা ও ডগা চিবিয়ে অথবা পানি ছাড়া বেঁটে কাটা স্থানে চাপ দিয়ে বসিয়ে দিতে হয়। এ ছাড়া দূর্বার রস তিল তেলের সাথে পাক করে মালিশ করলে চর্মরোগ আরোগ্য হয়, মাথার চুল ওঠা বন্ধ হয়।

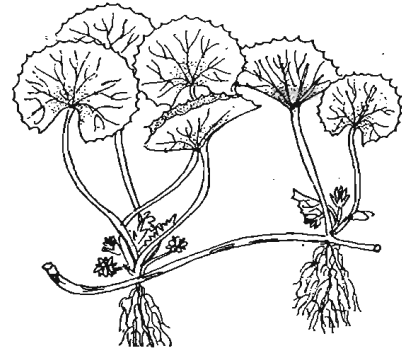
৭। নিম : আমাদের দেশে নিম একটি অতি-পরিচিত বড় বৃক্ষ। পাতা যৌগিক। লম্বা মঞ্জুরিতে মিষ্টি গন্ধযুক্ত ছোট ছোট সাদা ফুল ফোটে। ফল কাঁচা অবস্থায় সবুজ, পাকা অবস্থায় হলুদাভ।



চিত্র ১৬.৬ : কালমেঘ গাছের একাংশ



চিত্র ১৬.৭ : তুলসী গাছের একাংশ



চিত্র ১৬.৮ : থানকুনি গাছ

ব্যবহৃত অংশ : বাকল, পাতা এবং ছোট ডাল। ফুল, ফল, বীজ এবং তেলও ব্যবহৃত হয়।

ব্যবহার : নিম পাতা সিদ্ধ পানিতে গোসল করলে বিভিন্ন চর্মরোগ থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া যায়। সকালে খালি পেটে নিমছাল চূর্ণ সামান্য লবণসহ খেলে পেটের কৃমি মরে যায়। কাঁচা হলুদসহ নিমপাতা বেঁটে খোস-পাঁচড়ায় লাগালে দ্রুত আরোগ্য হয়। আমাদের দেশে নিমের ডাল দাঁতের ব্রাশ হিসেবেই অধিক ব্যবহৃত হয়।

৮। বানরলাঠি বা সোনালু : এটি মধ্যমাকৃতির বৃক্ষ। এর পাতা যৌগিক। প্রতি পাতায় ৪-৮ জোড়া পত্রক থাকে। এর হলুদ ফুলগুলো লম্বা মঞ্জুরিতে ঝুলে থাকে। ফল সরু, লম্বা।

ব্যবহৃত অংশ : ফলের মজ্জা।

ব্যবহার : ফলের মজ্জা অতি উৎকৃষ্ট জোলাপ। এটি কোষ্ঠবদ্ধতা, শূল বেদনা এবং অগ্নিমান্দ্য রোগে ব্যবহৃত হয়। ৬/৭ গ্রাম পরিমাণ মজ্জা এককাপ পরিমাণ গরম দুধে গুলে ছেঁকে নিয়ে সকালে খালি পেটে খেতে হবে। টনসিল, গঁটে বাত এসব রোগেও এটি উপকার করে থাকে।

৯। বাসক : বাসক একটি গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। সাধারণত ৭/৮ ফুট উঁচু হয়ে থাকে। পাতা সরল প্রতিমুখ।

ব্যবহৃত অংশ : পাতা।

ব্যবহার : বাসক পাতার রস কাশি নিরাময়ের জন্য অধিক ব্যবহৃত হয়। সর্দি, কাশি, হাঁপানি রোগেই এটি বেশি উপকার সাধন করে থাকে। সমপরিমাণ আদার রস ও মধুসহ বাসক পাতার রস খেলে অধিক কার্যকরী হয়।

১০। বেল : বেল একটি অতি পরিচিত ফলবান বৃক্ষ। এর পাতা যৌগিক, তিন ফলক বিশিষ্ট। ফুলগুলো সবুজাভ সাদা। ফল গোলাকার এবং বড়।

ব্যবহৃত অংশ : পাতা ও ফল।

ব্যবহার : ওষুধ হিসেবে কাঁচা বেলই অধিক ব্যবহৃত হয়। কাঁচা বেলকে চাকা চাকা করে কেটে রোদে শুকানো হয়। একে বলে বেলশুঁঠ। বেলশুঁঠ উদরাময়, রক্ত আমাশয় এবং পরিপাকতন্ত্রের অন্যান্য অসুখে ভাল কাজ করে। বেলপাতা ঘিয়ে ভেজে সামান্য চিনির সাথে খেলে ক্রমশ স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়।

১১। সর্পগন্ধা : সর্পগন্ধা একটি বহুবর্ষজীবী বীজুৎ। এটি ১-২½ ফুট উঁচু হয়। প্রতি পর্বে সাধারণত ৩টি পাতা থাকে। বর্ষায় ফুল ও ফল হয়। ফল পাকলে কালো হয়।

ব্যবহৃত অংশ : মূলের বাকল। শীতকালে মূলের বাকল সংগ্রহ করা হয়।

ব্যবহার : উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সর্পগন্ধা মূলের বাকলের রস বা গুঁড়ো ব্যবহার করা হয়। পাগল চিকিৎসায়ও এটি ব্যবহৃত হয়।

(ঙ) পানীয় উৎপাদনকারী উদ্ভিদ

যা আমরা পান করে থাকি তাই পানীয়। বিভিন্ন উদ্ভিদ থেকে আমরা পানীয় পেয়ে থাকি। এখানে কয়েকটি পানীয় উৎপাদকারী উদ্ভিদের সৎক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হল।



চিত্র ১৬.৯ : বাসক গাছের একাংশ



চিত্র ১৬.১০ : সর্পগন্ধা গাছের একাংশ

১। ডাব : ডাব বা নারিকেল একটি চিরসবুজ অশাখ বৃক্ষ। এর পক্ষল যৌগিক পাতাগুলো কেবল গাছের মাথার দিকে অবস্থিত। ফুল মঞ্জুরিতে অবস্থিত। স্ত্রী ফুল ও পুরুষ ফুল পৃথক।

ব্যবহৃত অংশ : ডাবের পানি। ডাবের পানি হল বীজের তরল শাঁস।

ব্যবহার : তৃষ্ণা নিবারণ এবং শরীর শীতলকরণ এ দুটি উদ্দেশ্যে ডাবের পানি ব্যবহার করা হয়। ডাবের পানি বেশ পুষ্টিকর।

২। চা : চা একটি ছোট বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ। বাগানে বার বার ছাঁটাই করে একে ঝোপের মত করে রাখা হয়। চায়ের পাতা সরল, একান্তর। ফুল বড় এবং সাদা বা হালকা গোলাপি।

ব্যবহৃত অংশ : কচি পাতা (দুটি পাতা একটি কুঁড়ি)।

ব্যবহার : হৃদযন্ত্রের উদ্দীপনা সৃষ্টির মাধ্যমে শারীরিক অবসাদ দূর করতে চা পান করা হয়। বাগানের কচি পাতাকে বিশেষ প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে বাজারে ছাড়া হয় এবং এই চা পাতা গরম পানিতে দিয়ে লিকার তৈরি করে দুধ/চিনি সহযোগে পান করা হয়।

৩। কফি : কফি ছোট বৃক্ষ বা গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। পাতা সরল এবং প্রতিমুখ, ফুল সাদা, সুগন্ধযুক্ত।

ব্যবহৃত অংশ : বীজ।

ব্যবহার : শারীরিক অবসাদ দূর করতে কফি পান করা হয়। বীজকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় ব্যবহার উপযোগী করা হয়। প্রক্রিয়াজাত বীজের গুঁড়ো থেকে পান করার জন্য কফি তৈরি করা হয়।



চিত্র ১৬.১১ : কফি গাছের একাংশ

৪। লেবু : লেবু ছোট বৃক্ষ বা ঝোপ জাতীয় উদ্ভিদ। কাণ্ড সাধারণত কণ্টকিত। পাতা সরল, একান্তর এবং তেল গ্রন্থিযুক্ত। ফলের অন্তঃত্বক রসভর্তি দানায়ুক্ত।

ব্যবহার : পিপাসা নিবারণ ও শরীর শীতল করতে লেবুর রসের শরবত ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। পানি, চিনি ও লেবুর রস সহযোগে এটি তৈরি হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের একটি সাধারণ পানীয়।

৫। আখ : কৃষি অবস্থায় আখ বর্ষজীবী বীৰুণ। কাণ্ড অশাখ, নিরেট এবং গিটযুক্ত। পাতা লম্বা, একান্তর, খোল ও ফলকে বিভক্ত। খোল কাণ্ডকে ঢেকে রাখে।

ব্যবহৃত অংশ : কাণ্ডের রস।

ব্যবহার : পিপাসা নিবারণ ও শরীর শীতল করতে আখের রস পান করা হয়। এর সাথে আদার রস মিশিয়ে দিলে সুপেয় হয়। ঢাকা শহরে ক্রমেই এই পানীয়ের ব্যবহার বেড়ে চলছে। জন্ডিস রোগীরা এটি অধিক ব্যবহার করে থাকেন। আখ থেকে গুড় তৈরি হয়।

৬। খেজুর : খেজুর অশাখ বৃক্ষ বিশেষ। পাতা এক পক্ষল যৌগিক, কাণ্ডের মাথায় গুচ্ছাকারে অবস্থিত। পত্রকের মাথা কণ্টকিত।

ব্যবহৃত অংশ : কাণ্ড নিঃসৃত রস। শীতকালে পাতার গুচ্ছের নিচে কাণ্ড চেঁছে সেখানে একটি পাত্র বেঁধে দেওয়া হয়। সারা রাত্রি রস নিঃসৃত হয়ে পাত্র ভরে থাকে। সকালে রসভর্তি পাত্র নামিয়ে আনা হয়। খেজুরের রস থেকে সুম্বাদু গুড় তৈরি হয়।

ব্যবহার : শীতের সকালে খেজুরের রস একটি উপাদেয় পানীয়। এটি ক্রিমিনাশক হিসেবে পরিচিত। তাই সাধারণত সকালে খালি পেটে পান করা হয়।

৭। ফলের রস : আম, আনারস, তরমুজ, কামরাঙা ইত্যাদি ফলের রস পানীয় হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আঙুর, আপেল, নাশপাতি, কলা ইত্যাদি ফলের রসও পানীয় হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তবে বাংলাদেশে এগুলোর চাষ হয় না বললেই চলে।

চা, কফি ছাড়া অন্যগুলোকে সফট ড্রিঙ্ক (soft drink) বা কোমল পানীয় বলা হয়।

চিংড়ি ও মাছ চাষ, রেশম পোকা ও মৌমাছি পালন

প্রাণীকুল প্রকৃতির মূল্যবান সম্পদ। মানুষের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে প্রাণীদের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। মৌমাছি, রেশমপোকা, লাফা, বিভিন্ন প্রজাতির শামুক, বিনুক, মাছ, ব্যাঙ, সাপ, কুমির কাছিম, গুঁইসাপ, হাঁস-মুরগি, ছাগল-ভেড়া, গরু-মহিষ ইত্যাদি প্রাণী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের উপকার সাধন করে। আবার বিভিন্ন রোগের জীবাণু, ফসলের অনিষ্টকারী ও বিষাক্ত পোকামাকড়, উইপোকা, ইঁদুর, হিংস্র জীবজন্তু ইত্যাদি সাধারণভাবে মানুষের ক্ষতি করে থাকে। মানুষের উপকারী এবং অপকারী প্রাণীদেরকে একত্রে অর্থনৈতিক গুরুত্ববিশিষ্ট প্রাণী বলে। প্রাণীবিজ্ঞানের যে শাখায় অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পন্ন প্রাণীদের সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়, তাকে অর্থনৈতিক প্রাণীবিজ্ঞান বলে।

অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন প্রাণীদের মধ্যে চিংড়ি, নানা প্রজাতির মাছ, মৌমাছি ও রেশম পোকার চাষ সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

চিংড়ি চাষ

পরিচিতি : চিংড়ি একটি সুস্বাদু ও উপাদেয় জলজ প্রাণী। চিংড়ি মাছ নয়। এরা Arthropoda (আর্থ্রোপোডা) পর্বের Crustacea (ক্রাস্টেশিয়া) শ্রেণীর প্রাণী। এদের দেহ দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম এবং উপাঙ্গগুলো সম্বন্ধযুক্ত বা খণ্ডিত।

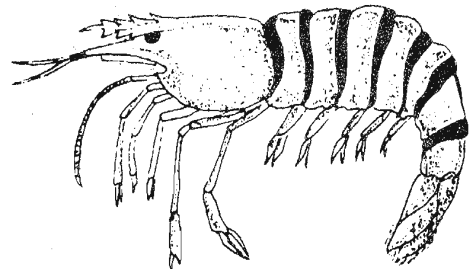
চিংড়ির দেহ শিরোবক্ষ এবং উদর এই দুটো অংশ নিয়ে গঠিত। শিরোবক্ষের দুটো অংশ যথা-মস্তক ও বক্ষ। চিংড়ির মোট উনিশ জোড়া উপাঙ্গ আছে। এসব উপাঙ্গ খাদ্য ধরা, খাদ্য গ্রহণ, হাঁটা, সাঁতার কাটা ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়। শিরোবক্ষে রোস্ট্রাম নামে সম্মুখমুখী একটা পাখীয় ভাবে চ্যাপ্টা ও ঝাঁজ যুক্ত প্রবৃন্দ আছে। চিংড়ি নিশাচর ও একলিঙ্গিক প্রাণী। এরা বক্ষ উপাঙ্গের সাহায্যে পানির তলদেশে মাটির উপর হেঁটে চলতে পারে। আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ি আছে। এদের মধ্যে কয়েকটা প্রজাতির চিংড়ি স্বাদুপানিতে এবং কয়েকটা প্রজাতির চিংড়ি সমুদ্রের লবণাক্ত পানিতে বাস করে। আবার কিছু কিছু প্রজাতি উপকূল অঞ্চলে বাস করে। চিংড়ি বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ মৎস সম্পদ।

চিংড়ির অর্থনৈতিক গুরুত্ব

- ১। চিংড়ি একটা সুস্বাদু আমিষ জাতীয় খাদ্য।
- ২। চিংড়ি চাষের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা যায়।
- ৩। চিংড়ি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে অংশ নেয়।
- ৪। মিঠাপানিতে তুলনামূলকভাবে কম খরচে চিংড়ি চাষ করে প্রচুর লাভবান হওয়া যায়।

সুতরাং সুপরিকল্পিতভাবে বিজ্ঞানসম্মত নিয়মানুযায়ী চিংড়ি চাষ অত্যন্ত লাভজনক।

চিংড়ির প্রকারভেদ : বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়গুলোতে বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায়। এদের মধ্যে *Macrobrachium* (ম্যাক্রোব্র্যাকিয়াম) গণের বেশ কয়েকটা প্রজাতির চিংড়ি আকারে বেশ বড় এবং অত্যন্ত সুস্বাদু হয়। মিঠা পানির এই বড় আকারের চিংড়িকে গলদা চিংড়ি বলে। আবার আমাদের সমুদ্রের লোনা পানিতে এবং মোহনা ও ঝাঁড়সমূহের কম লোনা পানিতে অনেক প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায়। এদের মধ্যে *Penaeas* (পিনিয়াস) গণের কয়েক প্রজাতির চিংড়ি অনেক বড় হয়। এসব সামুদ্রিক বা লোনা পানির চিংড়িকে বাগদা চিংড়ি বলে। গলদা এবং বাগদা উভয় ধরনের চিংড়ি রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। চিংড়ি চাষের জন্য সাধারণভাবে কিছুটা উষ্ণ আবহাওয়ার প্রয়োজন।



চিত্র ১৬.১২ : চিংড়ি

(ক) মিঠা পানির চিথড়ি বা গলদা চিথড়ির চাষ পদ্ধতি

আমাদের রপ্তানিকৃত চিথড়ির শতকরা ৭০ ভাগই গলদা চিথড়ি। দেশের অভ্যন্তরীণ, পুকুর, নদী-নালা, ডোবা, হাওর ইত্যাদিতে গলদা চিথড়ির চাষ হয়ে থাকে। আঠালো, নরম কাদামাটি, বা পচা মাটিযুক্ত পুকুর গলদা চিথড়ি চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী।

খুলনা, যশোর, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ও ঢাকার নরম মাটিযুক্ত পুকুরে ব্যাপকভাবে গলদা চিথড়ির চাষ করা হয়। পুকুরে চিথড়ি চাষ করার জন্য আগে পুকুরকে চাষের উপযোগী করে তৈরি করতে হবে।

১। গলদা চিথড়ি চাষের পুকুরে পানি ঢুকানো এবং পানি নিষ্কাশন করার জন্য দুটো স্লুইস গেট থাকা প্রয়োজন।

২। পুকুরের পাড় উঁচু রাখা প্রয়োজন এবং পুকুরের গভীরতা মধ্যম হওয়া উচিত। পুকুরের পাড়ে ঘাস থাকলে পাড় ভেঙে যায় না।

৩। পোনা ছাড়ার আগে পুকুর থেকে চিথড়ি খেকো রাক্ষুসে মাছ সরিয়ে ফেলতে হবে এবং পুকুরের তলদেশ পরিষ্কার করে তাতে চুন এবং গোবর সার প্রয়োগ করতে হয়। এতে পুকুরের উর্বরতা বাড়ে এবং প্রচুর পরিমাণে প্ল্যাংকটন উৎপন্ন হয়। এতে চিথড়ি তাড়াতাড়ি আকারে বড় হয়।

৪। ভাল উৎপাদন পাবার জন্য কেবলমাত্র কাক্ষিত চিথড়ির পোনা পুকুরে ছাড়তে হয়।

৫। কাক্ষিত পোনা পাবার জন্য আমাদের দেশে বিভিন্ন জায়গায় ডিম পরিস্ফুটনের জন্য বেশ কয়েকটা হ্যাচারি বা ডিম ফোটানোর ট্যাংক (বা পাত্র) স্থাপিত হয়েছে। প্রাকৃতিকভাবে নিষিক্ত হওয়া ডিম বিশিষ্ট মা-গলদা চিথড়িকে হ্যাচারিতে ছাড়তে হয়। হ্যাচারিতে নিয়মিত ও পরিমাণমত উপযুক্ত খাদ্য দিতে হয়। মা চিথড়ি একসাথে প্রায় ৭ হাজার থেকে ৩ লক্ষ ডিম পাড়ে। ১৬-২৪ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে চিথড়ির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ‘নপলিয়াস’ লার্ভা বের হয়ে আসে। এদেরকে নিয়মিত আঠেমিয়া (এক ধরনের আঠোপোড়া), ও প্রয়োজনীয় খাবার দিতে হবে। এরপর কয়েকটা ধারাবাহিক ধাপ অতিক্রম করে নপলিয়াস লার্ভাগুলো পূর্ণাঙ্গ চিথড়িতে পরিণত হয়।

এছাড়া প্রাকৃতিকভাবে পরিস্ফুটিত পোনাও সংগ্রহ করে পুকুরে চাষ করা যায়। বাংলাদেশে কাউখালি, নোয়াখালী, নোয়াপাড়া, কালুঘাট, হালদা, ডাকাতিয়া, রামপাল, ডুমুরিয়া, পশুর ইত্যাদি নদী থেকে প্রাকৃতিকভাবে পরিস্ফুটিত চিথড়ির পোনা সংগ্রহ করা হয়।

লোনাপানির চিথড়ি বা বাগদা চিথড়ির চাষ পদ্ধতি : প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে সনাতন পদ্ধতিতে ঘেরের মাধ্যমে বাগদা চিথড়ির চাষ চলে আসছে। এই পদ্ধতিতে পূর্ণিমা বা অমাবশ্যার সময়ে বাগদা চিথড়ির পোনাসহ জোয়ারের পানি ঘেরের মধ্যে ঢুকিয়ে চিথড়ির চাষ করা হত। কিন্তু এতে অন্যান্য অনাকাঙ্ক্ষিত প্রজাতির চিথড়ি এবং রাক্ষুসে চিথড়ি খেকো মাছও ঘেরে ঢুকে যাওয়ায় ফলন কম হত। এজন্য বর্তমানে উন্নত পদ্ধতিতে খামার তৈরি করে বাগদা চিথড়ির চাষ করা হচ্ছে।

এ পদ্ধতিতে উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলোতে ঘেরের মধ্যে খামার তৈরি করা হয়। বাগদা চিথড়ি মূলত সামুদ্রিক প্রাণী হলেও এরা প্রজননের জন্য কম লোনা পানিতে আসে। এ সময় স্লুইস গেটের মাধ্যমে শুধু কাক্ষিত প্রজাতির পোনা বাছাই করে ঘেরের মধ্যে প্রবেশ করানো হয়। এতে রাক্ষুসে মাছ ঢুকতে পারে না বলে উৎপাদন বেশি হয়। খামারেও প্রয়োজনমত বাড়তি খাদ্য দিতে হয়। খামারে ছাড়ার আগে পোনাগুলোকে ২-৫ দিন হাপায় রেখে তাদেরকে বন্ধ পানির পরিবেশে বাস করার জন্য ধাতস্থ করিয়ে নিতে হয়। এতে পরিবেশ পরিবর্তনের জন্য মৃত্যুর সম্ভাবনা কমে যায়। বাংলাদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহের মধ্যে খুলনা, সুন্দরবনের মোহনা এলাকা, কক্সবাজার, মহেশখালী, চকোরিয়া, বাগেরহাট, চট্টগ্রাম ইত্যাদি স্থানে প্রচুর বাগদা চিথড়ির চাষ হয়।

গলদা চিংড়ি ও বাগদা চিংড়ির পার্থক্য :

গলদা চিংড়ি	বাগদা চিংড়ি
১। প্রধানত মিঠাপানির চিংড়ি, তবে অল্প লোনা পানিতেও পাওয়া যায়।	১। প্রধানত সামুদ্রিক তথা লোনা পানির চিংড়ি, তবে প্রজনন ঋতুতে অল্প লোনা পানিতে আসে।
২। এদের দেহের বর্ণ স্বচ্ছ সাদাটে বা নীলাভ।	২। এদের দেহে বাঘের মত লালচে বাদামি আড়াআড়ি ডোরা থাকে।
৩। এদের দেহ প্রস্থচ্ছেদে কিছুটা গোলাকার।	৩। দেহ পার্শ্বীয়ভাবে চ্যাপ্টা।
৪। এদের দেহকে সম্পূর্ণভাবে বাঁকানো যায়।	৪। সম্পূর্ণভাবে বাঁকানো যায় না।
৫। চলন পদের প্রথম দুই জোড়ায় চিমটা থাকে।	৫। চলন পদের প্রথম তিন জোড়ায় চিমটা থাকে।

মাছের পরিচিতি, চাষ পদ্ধতি এবং মাছ চাষের গুরুত্ব

মাছ : মাছ Chordata (কর্ডাটা) পর্বের Vertebrata (ভার্টিব্রাটা) উপপর্বের Pisces (মৎস্যকুল) গ্রুপের প্রাণী। মাছ বাংলাদেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জলজ প্রাকৃতিক সম্পদ। মাছ প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের একটা প্রিয় ও সাধারণ আমিষ জাতীয় খাদ্য হিসেবে গৃহীত হয়ে আসছে। আমাদের প্রাণিজ আমিষের শতকরা ৮০ ভাগ মাছ থেকেই পাওয়া যায়। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্য তালিকায় মাথাপিছু মাছের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কমে গেছে। একদিকে পুকুর ডোবা, খাল-বিল বন্ধ করে বাড়িঘর তৈরির ফলে মাছ চাষের ক্ষেত্র কমে যাচ্ছে, অন্যদিকে অপরিবর্তিতভাবে মাছ ধরার ফলে ক্রমশ মাছের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। সুতরাং মাছ বা মৎস্যসম্পদ কমে যাওয়ার প্রধান কারণ দুটো। যথা :

১। **প্রাকৃতিক কারণ :** আমাদের অনেক নদনদীতে পলি পড়ে যাওয়ায় সেগুলো ভরাট হয়ে গেছে। অনেক নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছে ফলে নদীগুলো মাছের বসবাস এবং প্রজননের জন্য অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশে ঋতুগুলোর আবির্ভাব এবং চলে যাওয়ার সময়ের কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। নির্দিষ্ট সময়ে বর্ষার আগমন না ঘটায় কারণে এবং অনাবৃষ্টির জন্য খাল-বিল শুকিয়ে যাওয়ার কারণে মাছের আবাসস্থল বিনষ্ট হয়ে মাছের উৎপাদন অত্যন্ত কমে গেছে।

২। **মানুষের সৃষ্ট কারণ :** বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজন অনুযায়ী মাছের চাহিদা মিটানোর জন্য অপরিবর্তিতভাবে মাছ ধরা হয়ে থাকে। অথচ জেলেদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় এবং একই পুকুরের একাধিক মালিক থাকায় মাছের চাষ ঠিকমত হচ্ছে না। ধান, পাট ও অন্যান্য ফসল বেশি করে উৎপাদন করার জন্য এবং মানুষের আবাসস্থল গড়ে তোলার জন্য বহু পুকুর, খাল-বিল ইত্যাদি ভরাট করে ফেলায় মাছের আবাসস্থল কমে গেছে। আবাদি জমিতে কীটপতঙ্গ দমনের জন্য ব্যবহৃত কীটনাশকসমূহ মাছের জন্য ক্ষতিকর। এসব কীটনাশক সেচের পানিতে বা বৃষ্টির পানিতে মিশে পুকুরে, নদীতে, খালে, বিলে গিয়ে পড়ে। এতে অনেক সময় মাছ রোগাক্রান্ত হয়, মারা যায় এবং খাবারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। মাছ সংরক্ষণের কারণে মাছ এখন অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্মূল্য হয়ে উঠেছে।

মাছ চাষের গুরুত্ব ও পদ্ধতি

মাছ চাষের গুরুত্ব : একসময় গ্রামবাংলার অধিবাসীদেরকে মাছে ভাতে বাঙালি বলা হত। কিন্তু বর্তমানে সেই প্রবাদ আর খাটে না। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের মাছের উৎপাদন বাড়ে নি। মাথাপিছু ৪ গ্রাম আমিষ খাওয়া উচিত। আমিষের এই চাহিদা মিটানোর জন্য আমাদের দেশে ২৬ লক্ষ টন মাছ উৎপাদন করার প্রয়োজন। কিন্তু বসতবাড়ি তৈরির জন্য বহু খাল, বিল, পুকুর ভরাট করার ফলে এবং অপরিবর্তিতভাবে মাছ ধরার ফলে বর্তমানে মাছের উৎপাদন অত্যন্ত কমে গেছে। দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন ও শক্তিসঞ্চয়ের জন্য যে সুস্বাদু খাদ্য প্রয়োজন, তার মধ্যে আমিষ জাতীয় খাদ্য অন্যতম। আমাদের দেশে মাছ থেকে শতকরা প্রায় ৮০% প্রাণিজ আমিষ ও

প্রয়োজনীয় ভিটামিন পাওয়া যায়। মাছ চাষ করার মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বাড়িয়ে আমরা আমাদের ঘাটতি পূরণ করতে পারি। আমাদের দেশে যে সকল হাজারিমাছ পুকুর আছে সেগুলোকে সংস্কার করে মাছ চাষ করলে দেশে মাছের চাহিদা অনেকখানি পূরণ হবে। মাছ চাষের গুরুত্ব সম্বন্ধে সকলেরই ধারণা থাকা উচিত। বর্তমানে মাছের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য এবং উন্নত উপায়ে মাছ চাষ করার জন্য সরকারি পর্যায়ে কার্যকরী উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ব্যক্তিগতভাবেও অনেকে মাছের চাষ করছেন। তাছাড়া শহর অঞ্চলে ও বাড়ির লনে বা ছাদে চৌবাচ্চা তৈরি করে অনেকে শিং, মাগুর, তেলাপিয়া ইত্যাদি মাছের চাষ করছেন।

মাছ চাষ পদ্ধতি : মাছ চাষ বলতে প্রধানত অভ্যন্তরীণ স্বাদু পানির মাছ চাষকে বুঝায়। সফলভাবে মাছ চাষ করার জন্য একটি আদর্শ পুকুর প্রয়োজন। আদর্শ পুকুরের আয়তন বেশি বা কম হতে পারে। আদর্শ পুকুর গভীরতায় প্রায় ৩ মিটার হয়। আদর্শ পুকুরে কার্প জাতীয় মাছের চাষ সহজ ও লাভজনক। কার্প (Carp) গ্রুপের মাছ সাধারণভাবে তৃণভোজী।

কার্প জাতীয় মাছ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় আদর্শ পুকুরের বৈশিষ্ট্য

- ১। আদর্শ পুকুরের চারপাশ খোলামেলা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও আলো-বাতাসযুক্ত হতে হবে।
- ২। আদর্শ পুকুরে প্রচুর পরিমাণে প্ল্যাংকটন জাতীয় খাদ্য থাকতে হবে।
- ৩। পুকুরের পাড় দিয়ে যাতে বর্ষার পানি ঢুকতে না পারে এজন্য পাড় উঁচু রাখতে হবে।
- ৪। পুকুরে পর্যাপ্ত পানি থাকতে হবে ও প্রয়োজনমত পানি বদলানোর ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- ৫। পুকুরের আগাছা এবং রান্সুসে মাছ সরিয়ে ফেলতে হবে।
- ৬। পানি ঠাণ্ডা রাখার জন্য গ্রীষ্মে কলমী লতা, হেলেক্স ইত্যাদি জলজ উদ্ভিদ থাকা দরকার।
- ৭। আদর্শ পুকুরে কাপড় কাচা ও সাবান মেখে গোসল করা যাবে না।

আদর্শ পুকুরে কার্প জাতীয় মাছ চাষ : এটা কয়েকটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে বিভক্ত। যথা—

- ১। পুকুর প্রস্তুতি,
- ২। পোনা মাছ সংগ্রহ ও পরিবহন,
- ৩। পোনা পুকুরে ছাড়া ও পালন,
- ৪। পালিত মাছের পরিচর্যা এবং
- ৫। সার প্রয়োগ ও খাদ্য প্রদান।

(ক) আদর্শ পুকুর তৈরি : কয়েকটি ধাপে আদর্শ পুকুর তৈরি হয়। যথা :

- ১। প্রয়োজনমত নতুন পুকুর কেটে বা পুরোনো পুকুর সংস্কার করে আদর্শ পুকুর তৈরি করতে হবে।
- ২। পুকুরে চুন দিয়ে জীবাণু ধ্বংস করতে হবে। জৈব সার দিয়ে পুকুরকে উর্বর করতে হবে। ফলে প্রচুর প্ল্যাংকটন উৎপাদন হবে।
- ৩। পুকুর তৈরি হয়ে গেলে কাক্ষিত মাছের পোনা ছাড়তে হবে।

কার্প জাতীয় মাছের জীবনচক্র পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত। যথা : (ক) ডিম, (খ) ডিমপোনা বা রেণু, (গ) ধানীপোনা (ঘ) চারা পোনা ও (ঙ) পূর্ণাঙ্গ মাছ।

(খ) পোনা সংগ্রহ ও পালন : ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের কার্প জাতীয় মাছ চাষের জন্য পর্যায়ক্রমে তিন ধরনের পুকুর ব্যবহার করা উত্তম। যেমন :

(i) **আঁতুড় পুকুর (Nursery Pond) :** নদী বা মৎস্য খামার থেকে সংগৃহীত পোনা সংগ্রহ করে আঁতুড় পুকুরে ছাড়তে হয়। এসব পুকুর আয়তনে ছোট এবং গভীরতায় কম থাকে। এখানে পোনা ২০-২২ মিলিমিটার লম্বা হয়। এদেরকে এখন ধানীপোনা বলে। এরপর ধানীপোনাগুলো পালন পুকুরে স্থানান্তরিত করা হয়।

(ii) **পালন পুকুর (Rearing Pond)** : এসব পুকুর আঁতুড় পুকুর অপেক্ষা বড় ও গভীরতর। এ পুকুরে নিয়মিত খাদ্য ও সার দিতে হয়। এখানে ৩/৪ মাস থাকার পর ধানীপোনাগুলো বড় হয়ে চারা পোনায় পরিণত হয়। চারাপোনা (Fingerling) ১০০-২৫০ মিমি লম্বা হয়। এরপর চারা পোনাদেরকে সঞ্চার বা মজুদ পুকুরে স্থানান্তরিত হয়।

(iii) **সঞ্চার বা মজুদ পুকুর (Stocking pond)** : এ পুকুর আয়তনে বড়। এ পুকুরে অল্প সময়ের মধ্যে বেশি পরিমাণ মাছ বাজারজাত করার উপযোগী হয়। পুকুরে নিয়মিত জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ করতে হয় এবং পরিপূরক খাবার দিতে হয়। বছরের শেষে প্রতিটা মাছের গড় ওজন হয় ৭০০-৮০০ গ্রাম। প্রতি হেক্টরে প্রায় ২,০০০-২,৫০০ কেজি মাছ উৎপন্ন হয়। সফলভাবে মাছ চাষ করার জন্য সব অবস্থার মাছের, বিশেষ করে রেণু পোনা এবং ধানীপোনা পর্যায়ে বিশেষ যত্ন নিতে হয়। মাছের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি, প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ করা ইত্যাদির ঠিকমত পরিচর্যা করা আবশ্যিক।

আদর্শ পুকুরে কার্প জাতীয় মাছের চাষ সহজ ও লাভজনক। কারণ (i) কার্প মাছ তৃণভোজী প্রাণী। (ii) এরা পরস্পরের ক্ষতি করে না। (iii) পানির ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বাস করে বলে এদের নিজেদের মধ্যে স্থান ও খাদ্য নিয়ে প্রতিযোগিতা কম থাকে। কাতল মাছ উপরের স্তরের, রুইমাছ মধ্যস্তরের এবং মৃগেল ও কালবাউস নিচের স্তরের খাবার খায়। ফলে একই পুকুরে এই চার ধরনের মাছ একই সাথে চাষ করলে সব স্তরেই খাদ্যই ঠিকমত ব্যবহার হয়। ফলে এই ধরনের মাছ চাষ লাভজনক হয়।

ইদানীং বিদেশ থেকে আমদানিকৃত ঘেসো রুই (Grass carp) এবং রূপালি রুই (Silver carp) বাংলাদেশী রুই মাছের সাথে একই পুকুরে চাষ করা হচ্ছে। বিভিন্ন প্রজাতির মাছের একই সাথে চাষ করার পদ্ধতিকে মিশ্রচাষ (Composite fish culture) বলে। বিদেশ থেকে আমদানিকৃত এসব কার্প মাছ বেশ তাড়াতাড়ি বড় হয় এবং খেতেও সুস্বাদু বলে এসব মাছের চাষ লাভজনক। তবে আমাদের দেশি রুই মাছকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করা হয়।

(গ) মাছের রোগের চিকিৎসা : মাছের নানা ধরনের রোগ হতে পারে। সুস্থ মাছের গা পিচ্ছিল ও রং চকচকে থাকে। দেহের আসল রং পরিবর্তিত বা নষ্ট হয়ে গেলে বুঝতে হবে যে মাছের কোন অসুস্থতা বা অসুবিধা হয়েছে। প্রতিমাসে একবার বা দুবার বেড়াঙ্গালের সাহায্যে মাছ ধরে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং প্রয়োজনমত চিকিৎসা করাতে হবে। খাদ্যাভাব, অপরিমিত বা অনুপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ, অক্সিজেনের অভাব, ঠান্ডা ও গরমের অত্যধিক তারতম্য, পরজীবীর আক্রমণ, ইত্যাদির জন্য মাছের বিভিন্ন ধরনের রোগ হতে পারে। এছাড়া মাছ বিভিন্ন প্রজাতির প্রোটোজোয়া, ক্রিমি, জোঁক এবং উঁকুন দ্বারা আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। নিচে মাছের কয়েকটি সাধারণ রোগের কথা বলা হল।

(i) **ফুলকা পচা রোগ :** এক ধরনের ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়। এ রোগে ফুলকার অংশবিশেষে রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত ঘটে বলে ফুলকা পচে যায়। ফলে শ্বসন ক্রিয়া ব্যাহত হয়ে মাছ মারা যায়। অতিরিক্ত পচা বা আধপচা জৈব পদার্থ পূর্ণ পুকুরে এবং অতিরিক্ত গরমে এ রোগ মহামারী আকারে দেখা দিতে পারে।

চিকিৎসা : পুকুরে পরিমিত চুন দিতে হবে ও মাছকে কৃত্রিম খাদ্য দিতে হবে।

(ii) **পাখনা বা লেজ পচা রোগ :** এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ রোগ হয়। এ রোগ মাছের গায়ে সাদা দাগ হয় এবং পাখনা ভেঁতা হয়ে যায়।

চিকিৎসা : ২,০০০ ভাগ পানিতে ১ ভাগ কপার সালফেট মিশিয়ে তাতে আক্রান্ত মাছকে ১ মিনিট ডুবিয়ে রাখলে মাছ রোগমুক্ত হয়।

(iii) **সাদা ফুটকী রোগ :** এক ধরনের প্রোটোজোয়ার আক্রমণে মাছের দেহে ফুটকির মত হয়।

চিকিৎসা : (i) এ রোগের চিকিৎসার জন্য লবণ বা পাথুরে চুনের গুঁড়া দিয়ে পুকুর শোধিত করতে হবে। (ii) ১০০ ভাগ পানিতে ৩ ভাগ লবণ মিশিয়ে তাতে আক্রান্ত মাছকে আধঘণ্টা চুবিয়ে রাখলে মাছ জীবাণুমুক্ত হয়।

(ঘ) **মাছের উঁকুন বা চাট :** মাছের উঁকুনের নাম আরগুলাস (*Argulus*) এসব উঁকুন ডিম্বাকার এবং সামান্য চ্যাপ্টা অঙ্গীয় দিকে একজোড়া চোষকের সাহায্যে এ উঁকুন মাছের আইশের নিচে চামড়ার সাথে লেগে থাকে। ফলে আইশ খসে পড়ে এবং দেহ অনাবৃত হয়ে যায়। এতে মাছের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়।

চিকিৎসা : (i) আক্রান্ত পুকুর থেকে মাছ সরিয়ে অন্য পুকুরে দেওয়া, (ii) পুকুরের পানি সেচের সাহায্যে শুকিয়ে ফেলে অন্তত ২৪ ঘণ্টা রোদে শুকানো, (iii) পুকুরের প্রতি লিটার পানিতে ১০-৩০ গ্রাম চুন ছিটানো।

(ঙ) **মাছের জেঁক :** মাছের জেঁকের দেহে দুটো চোষক থাকে। জেঁক একটি চোষকের সাহায্যে মাছকে আঁকড়ে ধরে এবং অপর চোষকের সাহায্যে মাছের রক্ত শোষণ করে।

চিকিৎসা : ১০০ ভাগ পানিতে ২৫ ভাগ লবণ মিশিয়ে তাতে আক্রান্ত মাছকে ১৫ মিনিটে রাখলে জেঁক মারা যায়।

মাছের পুকুরে সার প্রয়োগ এবং খাবার প্রদান করার পদ্ধতি

ঠিকমত দৈহিক বৃদ্ধির জন্য মাছের পরিমিত ও সুস্বাদু খাদ্য প্রয়োজন। এজন্য মাছ কী ধরনের খাদ্য খেতে পছন্দ করে এবং কোন ধরনের খাদ্য মাছের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন তা জানা আবশ্যিক। প্ল্যাংকটন মাছের প্রধান খাদ্য। পুকুরে সার দিলে উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন এবং প্রাণী প্ল্যাংকটন বৃদ্ধি পায়। মাছ সার খায় না। সার প্রয়োগ করলে পানির তলদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ উদ্ভিদ জন্মায় ফলে মাছের খাদ্য শৃঙ্খল বজায় থাকে। মাছ এসব ক্ষুদ্র উদ্ভিদ বা ক্ষুদ্র প্রাণী অথবা উভয়ই খেয়ে বাঁচে। সাধারণত নাইট্রোজেন, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম ইত্যাদি সার জলজ ক্ষুদ্র উদ্ভিদের জন্মানোর জন্য প্রয়োজন। মাছ মারা গেলে মৃতদেহ ব্যাকটেরিয়া দ্বারা বিশ্লিষ্ট হয়ে আবার জৈব উপাদানে পরিবর্তিত হয়। পরবর্তীতে এসব জৈব লবণ থেকে আবার উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন বা ক্ষুদ্র উদ্ভিদ জন্মায়। এভাবে পুকুরে খাদ্যচক্র চলতে থাকে।

পোনা সংগ্রহের স্থান : কার্প জাতীয় মাছ নদীর বহমান স্রোতযুক্ত পানিতে ডিম পাড়ে। নদী থেকে সময়মত ডিম বা ডিমপোনা সংগ্রহ করে পুকুরে ছাড়তে হয়। চট্টগ্রামের হালদা, পদ্মা, যমুনা ও অন্যান্য নদীতে ডিম ও ডিমপোনা পাওয়া যায়। মাছের ডিমের আবরণীর মধ্যে পরিস্ফুটনরত ভ্রূণ জীবিত অবস্থায় থাকে। এসব ডিম ও ডিমপোনা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে সংগ্রহ করা হয়। কুষ্টিয়ার গড়াই নদী এবং ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্র নদীতে ধানীপোনা পাওয়া যায়। ধানীপোনা ৮০-২৩০ মিমি পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। বৈশাখের শেষভাগ থেকে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত নদীতে পোনা পাওয়া যায়।

মৎস্য খামার : মৎস্যবীজ উৎপাদনে জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে অনেক উৎপাদন খামার তৈরি হয়েছে। এদের মধ্যে ৯৬টি সরকারি মৎস্য উৎপাদনকারী খামার আছে। পোনা সরবরাহ করার জন্য সরকারি পর্যায়ে ৭টি এবং বেসরকারি পর্যায়ে ৫০টি আধুনিক আঁতুড় পুকুর বা ডিম ফোটানোর কেন্দ্র বা হ্যাচারি (Hatchery) স্থাপিত হয়েছে। এগুলো থেকে কৃত্রিম উপায়ে বিভিন্ন ধরনের দেশি বিদেশি মাছের প্রজনন ঘটিয়ে ডিম ও পোনা সংগ্রহ করা হয়। চাঁদপুরে স্বাদু পানির মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র আছে। ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশি ও বিদেশি শিং মাগুর মাছের এবং মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটে শিং, মাগুর, পাবদা, লাল তেলাপিয়া, গুলসা ইত্যাদি মাছের কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

মৎস্য সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ

আমাদের দেশে যে পরিমাণ মাছ আহরণ করা হয় সেগুলোর ঠিকমত ও বিজ্ঞানসম্মত সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণ হয় না। এর ফলে প্রচুর মাছ খাওয়ার অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। এ ধরনের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সুষ্ঠুভাবে হিমায়িত করার ও ঠিকমত বাজারজাত করার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন সাধন করা এবং মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণের সুব্যবস্থা ইত্যাদি বিশেষ প্রয়োজন। এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করলে আমাদের দেশে মাছের চাহিদা বেশিরভাগ পূরণ করা সম্ভবপর হবে।

রেশম পোকার চাষ বা সেরিকালচার

রেশম কী : আমরা যে সিল্ক বা রেশমি কাপড় ব্যবহার করি তা রেশম মথ নামে এক ধরনের মথের লার্ভার লালগ্রন্থি বা রেশ গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসের তৈরি তন্তু বা রেশমি সুতা হতে তৈরি হয়। রেশম মথ আর্থ্রোপোডা (Arthropoda) পর্বের অন্তর্ভুক্ত ইনসেক্টা (Insecta) শ্রেণীর লেপিডপ্টেরা (Lepidoptera) বর্গের পতঙ্গ। রেশম মথের লালগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস বাতাসের সংস্পর্শে এসে শুকিয়ে রেশম সুতায় পরিণত হয়। রেশম সুতা অত্যন্ত সূক্ষ্ম, লম্বা,

স্থিতিস্থাপক এবং উজ্জ্বল। রেশমি কাপড় সারা পৃথিবীতে সুন্দর ও মূল্যবান কাপড় হিসেবে সমাদৃত।

বিভিন্ন প্রজাতির রেশম মথ বিভিন্ন মানের রেশম সুতা তৈরি করে। যেমন :

(ক) তুঁতজাত রেশম : এরা সবচেয়ে উন্নতমানের সিল্ক সুতা তৈরি করে।

(খ) এন্ডি রেশম : এরা এন্ডি নামের রেশমি সুতা তৈরি করে।

(গ) তসর রেশম : এরা তসর নামের রেশমি সুতা তৈরি করে।

এসব রেশমি সুতার মধ্যে তুঁতজাত রেশম দ্বারা তৈরি রেশম সুতা সর্বাপেক্ষা মূল্যবান রেশমি কাপড় বা সিল্ক তৈরি করে।

রেশম চাষের ইতিহাস : খ্রিস্ট জন্মের প্রায় দু হাজার বছর আগে চীন দেশে রেশম সুতা আবিষ্কৃত হয়। এরপর প্রায় দুই থেকে আড়াই হাজার বছর পর্যন্ত চীনারা একচেটিয়াভাবে অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে রেশমি সুতা ও রেশমি কাপড় তৈরি করত। খ্রিস্ট জন্মের প্রায় সাড়ে পাঁচশত বছর পর দু জন ইউরোপীয় পাদ্রী কৌশলে রেশম উৎপাদন করার কলাকৌশল শিখে ফেলেন এবং কিছু রেশম পোকার ডিম গোপনে ইউরোপে পাঠিয়ে দেন। ঐ সময় থেকেই ইউরোপে রেশম চাষ শুরু হয়। বর্তমানে জাপান, চীন, ইটালি, রাশিয়া, ভারত, ব্রাজিল ইত্যাদি দেশ উন্নতমানের রেশম সুতা ও রেশমি কাপড় তৈরি করে এবং রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। বাংলাদেশেও বিভিন্ন প্রজাতির রেশম পোকার চাষ হয়। ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর এবং বগুড়ায় তুঁতজাত রেশম পোকার চাষ হয়। রাজশাহীর আবহাওয়া এবং মাটির বৈশিষ্ট্য তুঁতগাছ উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী বলে রাজশাহীতে প্রধান তুঁতজাত রেশম পোকার চাষ হয়ে থাকে।

রেশম সুতার বৈশিষ্ট্য ও রেশম পোকার অর্থনৈতিক গুরুত্ব

(১) রেশম সুতা বেশ কিছুটা আর্দ্রতা ধারণ করতে পারে বলে এই সুতার তৈরি বস্ত্র শীত, গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই ব্যবহার করা হয়। (২) রেশমি সুতা বিদ্যুৎ অপরিবাহী বলে এই সুতা দিয়ে বৈদ্যুতিক তারের ইনসুলেটর আবরণের তৈরি হয়। (৩) রেশমি সুতা সার্জিক্যাল সুতা হিসেবে অস্ত্রোপচারের সময়ে ব্যবহার করা হয়। (৪) রেশম সুতার তৈরি কাপড় রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়। (৫) বাংলাদেশে উৎপাদিত রেশমি বস্ত্র, আমাদের বস্ত্র সমস্যা সমাধানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। (৬) রেশম উৎপাদনকারী ফার্ম বা কলকারখানায় চাকরি করে অনেকের কর্মসংস্থান হয় ও বেকার সমস্যার কিছুটা সমাধান হয়। (৭) রেশম চাষের দ্বারা ঘরে বসে গৃহিণীরাও অল্প পরিশ্রমে ও অল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে সংসারের সচ্ছলতা আনতে পারে। (৮) পিউপার দেহ-নিঃসৃত তেল ও দেহাবশেষ হাঁস-মুরগির খাদ্য হিসেবে এবং জমির সার হিসেবে কাজে লাগে।

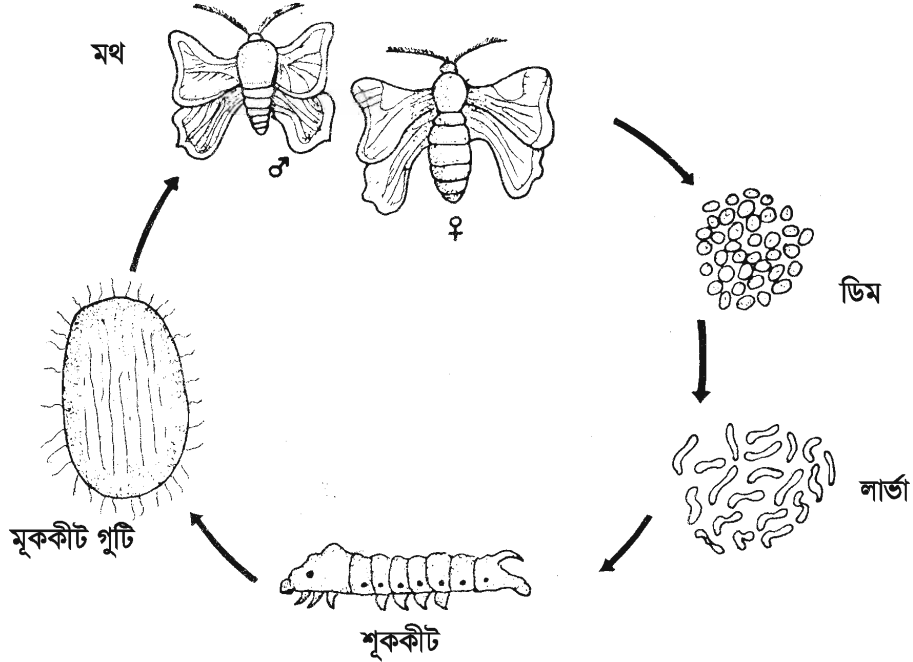
রেশম চাষ পদ্ধতি : রেশম চাষ কী? রেশমি সুতা উৎপাদন এবং রেশমি বস্ত্র তৈরির উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানসম্মতভাবে রেশম মথ পালন করার এবং তার গুটি বা কোকুন থেকে রেশমি সুতা সংগ্রহ করার সার্বিক প্রক্রিয়াকে রেশম চাষ বা রেশম মথের চাষ বলে। বাণিজ্যিকভাবে রেশম চাষ অত্যন্ত লাভজনক।

তুঁতজাত রেশম মথের জীবনচক্র : যে ধারাবাহিক ধাপসমূহ অতিক্রম করার মাধ্যমে কোন জীব জাইগোট দশা থেকে প্রজননক্ষম পূর্ণাঙ্গ দশায় পরিণত হয়, তাকে জীবনচক্র বলে। কোন জীবের জীবনচক্রের ধাপগুলো চক্রাকারে আবর্তিত হতে থাকে। সব প্রজাতির রেশম মথের জীবন ইতিহাসে সাধারণভাবে চারটা ধাপ চক্রাকারে আবর্তিত হতে থাকে। যথা (ক) ডিম, (খ) শূককীট বা লার্ভা বা পুল, (গ) মূককীট বা পিউপা এবং (ঘ) পূর্ণাঙ্গ মথ।

জীবনচক্র (Life cycle) ও রেশম চাষ

১। **ডিম সংগ্রহ :** পূর্ণাঙ্গ পুরুষ ও স্ত্রী রেশম মথের উড়ন্ত অবস্থায় যৌনমিলন ঘটে। স্ত্রী মথের দেহে ডিম নিষিক্ত হয়ে জাইগোটে পরিণত হয়। এর পর পরই পুরুষ মথ মারা যায়। স্ত্রী মথ এরপর ডিম পাড়া শুরু করে। ডিম সংগ্রহ করার জন্য স্ত্রী মথকে কাগজ বিছানো বাঁশের ডালায় ডিম পাড়তে দেয়া হয়। স্ত্রী মথের দেহ নিঃসৃত এক ধরনের আঠালো পদার্থের সাহায্যে ডিমগুলো ডালার কাগজে লেগে থাকে। স্ত্রী মথ একসাথে ৩০০-৫০০ টা ডিম পেড়ে থাকে। ডিমগুলো দেখতে সরিষার দানা বা ছোট ছোট পুঁতির মত এবং হলুদ রঙের। ডিম পরিস্ফুটিত হয়ে পলু বা শূককীট বের হয়। ডিম ফুটে গীষ্মকালে ৮-১০ দিন লাগে। তাপমাত্রা কম থাকলে ডিম ফুটে আরও বেশি সময় লাগে।

২। শূককীট বা লার্ভা (Larva) : শূককীট সরু ছোট এবং বাদামি রঙের। শূককীটের মাথায় একজোড়া ক্ষুদ্র সৎবেদী শৃঙ্গ ও শূককীটের বক্ষে তিন জোড়া সন্ধিযুক্ত এবং নখর বিশিষ্ট পা আছে। এই নখর খাওয়ার সময় তুঁত পাতাকে ধরে রাখে। শূককীটের উদরে পাঁচ জোড়া সন্ধিহীন উপপদ আছে। এগুলো চলনে সহায়তা করে। শূককীট দশাই রেশম মথের সক্রিয় দশা এবং গ্রীষ্মকালে শূককীট দশা প্রায় ২০-২৫ দিন স্থায়ী হয়। নবজাত শূককীটকে কচি তুঁতপাতা খুব ছোট ছোট কুচি করে কেটে খেতে দেওয়া হয় এরা ক্রমে বড় হতে থাকে। এর মধ্যে শূককীট চারবার খোলস বদলায়। পরিণত শূককীট প্রায় ৬০ মিমি লম্বা হয়। বেশি করে তুঁতপাতা খেতে দিলে শূককীটের দৈহিক বৃদ্ধি ভাল হয়। বড় শূককীট থেকে বড় গুটি তৈরি হয়, ফলে উন্নতমানের রেশম সুতা পাওয়া যায়। শূককীট দশার শেষে মূককীট বা পিউপা দশা শুরু হয়।



চিত্র ১৬.১৩ : রেশম পোকার জীবন চক্র

৩। মূককীট বা পিউপা (Pupa) : শূককীট দশার শেষের দিকে রেশম পোকা পাতা খাওয়া বন্ধ করে এবং এদের দেহ সংকুচিত হয়ে যায়। এ সময় শূককীট তার দেহের চারদিকে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গুটি তৈরি করে গুটির ভিতরেই অবস্থান করতে থাকে এবং মূককীটে পরিণত হয়। শূককীটের লালান্ধ্রি থেকে নিঃসৃত রসে সুতার মত তন্তু তৈরি হয়। এই তন্তু বাতাসের সংস্পর্শে এলে শক্ত হয়ে ডিম্বাকৃতি গুটি বা কোকুন গঠন করে। গুটি তৈরি হতে ৩-৪ দিন লাগে। গুটির ভিতরের মূককীটকে ‘পুতুলি’ও বলে। মূককীট এরপর গুটির ভিতরে রূপান্তরিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ মথে পরিণত হয়। এ সময় মূককীট কিছু খায় না এবং নিষ্ক্রিয় থাকে। আট-দশ দিনে মূককীট দশা পূর্ণ হয় এবং কোকুনের একপ্রান্ত কেটে পূর্ণাঙ্গ মথ বের হয়ে আসে।

পূর্ণাঙ্গ মথ : পূর্ণাঙ্গ মথের মাথায় একজোড়া বড় পালকের মত শঁড় থাকে। এদের বুক তিন জোড়া পা এবং পিঠে দু জোড়া পাখা থাকে। মথ বেশি ভাল করে উড়তে পারে না। পুরুষ মথ সাধারণত একদিন এবং স্ত্রী মথ ৩-৪ দিন বাঁচে। ডিম দেবার পর স্ত্রী মথ মারা যায়। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড-এর বীজাগারে উন্নত প্রজাতির রেশম বা গুটি পাওয়া যায়। প্রয়োজনমত ঐসব বীজাগার থেকে উন্নত জাতের এবং রোগমুক্ত সুস্থ বীজ সংগ্রহ করা যায়।

রেশম পোকার রোগ ও চিকিৎসা : রেশম মথের শূককীট কটারোগ, কালশিরা, রসা রোগ ও চূর্ণাকাঠি রোগ ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক এবং নানা ধরনের পরজীবীর আক্রমণে এসব রোগ হয়।

কটারোগ (Pebrin) : এক ধরনের প্রোটোজোয়ার আক্রমণে কটারোগ হয়। এ রোগে আক্রান্ত শূককীটের দেহে গোলমরিচের মত কালো কালো দাগ হয় এবং শূককীট অপুষ্টির কারণে মারা যায়।

চিকিৎসা : (১) এ রোগ দমন করার জন্য আক্রান্ত শূককীট সরিয়ে ফেলতে হয়। (২) উপযুক্ত জীবাণুনাশকের দ্রবণে রোগমুক্ত ডিমগুলো কয়েক মিনিট রেখে বিশোধিত করে ভাল পানিতে ধুয়ে ফেলতে হয়।

রেশম সংগ্রহ প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : এই প্রক্রিয়া কয়েকটি ধাপে ঘটে। যেমন : (১) গুটি তৈরি হয়ে যাবার পর প্রথম সেগুলোকে একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রাখতে হয়। ফলে শূককীট মারা যায়। তা না হলে শূককীট কয়েক দিনের মধ্যেই কোকুন বা গুটি কেটে বের হয়ে যায়। তাহলে সুতার ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে যায়।

(২) গুটিগুলোকে এরপর কিছুক্ষণ সিঁদ্ব করতে হবে। এতে গুটির আঠালো পদার্থগুলো অপসারিত হয়ে যায়। এতে সহজেই গুটি থেকে সুতা ছাড়িয়ে নেওয়া যায়।

(৩) আট-দশটা গুটির সুতো একসাথে রিল-এ জড়িয়ে রেশম সংগ্রহ করা হয়। প্রায় ৭০০০টা গুটি থেকে মাত্র এক কিলোগ্রাম সুতা পাওয়া যায়।

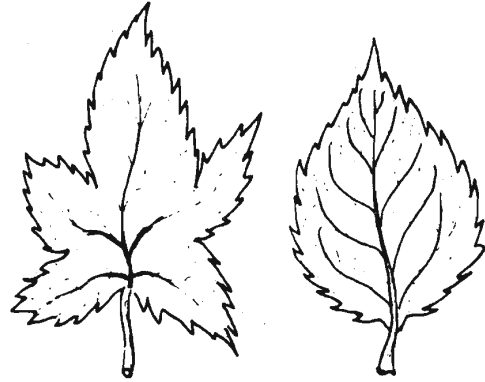
(৪) সবগুলো মেরে না ফেলে পরবর্তী বীজ হিসেবে ব্যবহার করার জন্য কিছু গুটি রেখে দিতে হয়।

বাংলাদেশের রেশম চাষের বর্তমান অবস্থা ও সম্ভাবনা : বৃহত্তর রাজশাহী জেলায় সরকারি পর্যায়ে রেশম চাষের গবেষণা কেন্দ্র সৃষ্টি হয়েছে। এই গবেষণা কেন্দ্র বিপুল এবং সোনালি নামে দুটো উন্নতজাতের রেশম পোকা উদ্ভাবন করেছে। তুঁতজাত রেশম পোকাকার শূককীট তুঁতগাছের কচি পাতা খেয়ে বাঁচে বলে এই রেশম মথের চাষ করার জন্য প্রচুর তুঁতগাছ প্রয়োজন।

১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড স্থাপিত হয়েছে। এই বোর্ড (ক) তুঁতপাতার চাষ, (খ) গুটি উৎপাদন এবং (গ) বস্ত্র বুনন এই তিন ধরনের কাজের উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করে।

তুঁত গাছের চাষ (Cultivation of Mulberry) : রেশম পোকাকার শূককীট তুঁত গাছের পাতা ও রস খেয়ে বাঁচে। এজন্য রেশম চাষের জন্য তুঁত চাষ অপরিহার্য। বাংলাদেশের বিশেষ করে রাজশাহীর ভোলাহাট, শিবগঞ্জ, রোহনপুর ও তার আশপাশের এলাকাসমূহে এবং ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, পাবনা, বগুড়া, দিনাজপুর ইত্যাদি অঞ্চলে প্রচুর তুঁতগাছ জন্মে। গাছ ছ'মাসের হলেই পাতা তোলা শুরু হয়।

বছরে কমপক্ষে ৪/৫ বার পাতা সংগ্রহ করা যায়। বাংলাদেশে প্রধানত দু'ধরনের তুঁত পাতার চাষ হয়। দেশি তুঁতপাতার পত্রফলকটা অনেক খন্ডাংশযুক্ত। এসব গাছের বৃষ্টিও কম, পাতাও কম হয়। তবে রেশম পাওয়া যায়। তুঁতগাছের বিভিন্ন ধরনের ছত্রাকজনিত রোগ হয়। উন্নত ফলনের জন্য তুঁতগাছকে রোগ থেকে মুক্ত রাখা আবশ্যিক।



দেশি পাতা

বিদেশি পাতা

চিত্র ১৬.১৪ : তুঁত পাতা

মৌমাছি পালন (Bee keeping)

মৌমাছি আর্থ্রোপোডা (Arthropoda) পর্বের ইনসেক্টা (Insecta) শ্রেণীর হাইমেনোপ্টেরা (Hymenoptera) বর্গের এক ধরনের সামাজিক পতঙ্গ। এরা মোম ও মধু তৈরি করে একে উদ্ভিদের পরাগায়ন ঘটিয়ে এরা মানুষের উপকার করে। মৌমাছির দলবৈধে ফুল থেকে মধু আহরণ করে তাদের চাকে সঞ্চিত রাখে। মানুষ মৌচাক থেকে মধু ও মোম সংগ্রহ করে নানা কাজে লাগায়। তবে এদের উদরে অবস্থিত হুল ফুটিয়ে আত্মরক্ষা এবং আক্রমণ দুই-ই করতে পারে বলে এদের চাক থেকে মধু ও মোম সংগ্রহ করা বিপজ্জনক।

মৌমাছির শ্রেণীবিভাগ : একটি মৌচাকে বা মৌমাছির বাসায় তিন ধরনের মৌমাছি থাকে। এদের দৈহিক গঠন এবং কাজ পৃথক।

(ক) রানী মৌমাছি, (খ) পুরুষ মৌমাছি এবং (গ) কর্মী মৌমাছি—এই তিন ধরনের মৌমাছি এক সাথে একই চাকে থেকে নিজ নিজ নির্দিষ্ট কাজ সুন্দরভাবে করে চলে।

(ক) রানী মৌমাছি : রানী মৌমাছি আকারে সবচেয়ে বড়। ডিম পাড়াই এদের একমাত্র কাজ। রানী মৌমাছি দিনে প্রায় ১৫০০টি ডিম পাড়তে পারে। এর জীবনকাল তিন বছর। প্রতিটি চাকে একটি মাত্র সক্রিয় রানী থাকে। চাকে নতুন রানী জন্মালে পুরাতন রানী তাকে হুল ফুটিয়ে মেরে ফেলে।

(খ) পুরুষ বা রাজা মৌমাছি : একটি চাকে কয়েকটি পুরুষ মৌমাছি থাকতে পারে। এরা শুধু প্রজননে অংশ নেয়। এদের হুল নেই। এরা মধু সংগ্রহ করে না।

(গ) কর্মী মৌমাছি : এরা প্রকৃতপক্ষে স্ত্রী মৌমাছি। কিন্তু এরা বন্ধ্যা অর্থাৎ ডিম পাড়ে না। মৌচাক তৈরি করা, মধু সংগ্রহ করা, রাজা, রানী এবং শূককীট বা লার্ভাদের পরিচর্যা করা, হুল ফুটিয়ে শত্রুকে দমন করা, চাকের সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ করা, এসব কাজই কর্মী মৌমাছিরাজা করে থাকে। কর্মী মৌমাছিরাজা মৌচাকের কুঠুরি পরিষ্কার করে ও দেহ থেকে মোম নিঃসৃত করে নতুন কুঠুরি তৈরি করে। বয়স্ক কর্মীরাজা ফুলের মধু ও পরাগ সংগ্রহ এবং মৌচাকে মধু সঞ্চিত করে। কর্মীরাজা এক ফুল থেকে অন্য ফুলে ঘুরে বেড়িয়ে মধু ও পরাগরেণু সংগ্রহ করার সময় পরোক্ষভাবে ফুলের পরাগায়ন ঘটায়। মৌমাছি কর্তৃক পরাগায়নের ফলে অনেক ফসলের উৎপাদন সম্ভব হয় ও অনেক ফসলের ফলন প্রায় ২০-২৫% বৃদ্ধি পায়।



চিত্র ১৬. ১৫ : বিভিন্ন ধরনের মৌমাছি

মৌমাছিদের জীবনচক্র (Life cycle) : জাইগোট দশা থেকে পূর্ণাঙ্গ প্রজননক্ষম দশা প্রাপ্তি পর্যন্ত যে ধাপগুলো অতিক্রম করা হয়, তাকে জীবের জীবনচক্র বলে। মৌমাছিদের জীবনচক্রে চারটা ধাপ দেখা যায়। যথা : ডিম, লার্ভা, পিউপা এবং পূর্ণাঙ্গ দশা।

ডিম (Egg) : রানী ও পুরুষ মৌমাছি আকাশে উড়ন্ত অবস্থায় মিলিত হয়। এরপর রানী পুরুষ মৌমাছির কাছ থেকে শুক্রাণু সংগ্রহ করে চাকে ফিরে যায় এবং পুরুষ মৌমাছি মারা যায়। রানী চাকে ডিম পাড়ার জন্য নির্ধারিত কুঠুরিগুলোর প্রতিটির মধ্যে একটি করে ডিম পাড়ে। ডিমগুলো খুবই ক্ষুদ্রাকার এবং এদের কিছু নিষিক্ত এবং কিছু অনিষিক্ত। কুঠুরির মধ্যেই ডিম পরিস্ফুটিত হয়ে শূককীট বা লার্ভায় পরিণত হয়।

লার্ভা বা শূককীট (Larva) : এরা ক্ষুদ্রাকার ও সাদা। কর্মী মৌমাছিরাজা এ সময় পুরুষ মৌমাছি ও রানীর জন্য সংরক্ষিত কুঠুরির লার্ভাকে রাজকীয় জেলি (Royal Jelly) নামে অত্যন্ত পুষ্টিকর খাবার খাওয়ায়। অপরপক্ষে সাধারণ কুঠুরিগুলোর লার্ভাকে ফুলের রেণু এবং মধু দিয়ে তৈরি অর্ধপাচ্য মৌ-রুটি খাওয়ায়। কয়েকদিনের মধ্যে মোম দিয়ে কুঠুরির মুখ বন্ধ করে দেয়। এর ভিতরেই লার্ভা পিউপায় পরিণত হয়। লার্ভা দশা ৪-৭ দিন স্থায়ী হয়।

মূককীট বা পিউপা (Pupa) : মূককীটের চারদিকে একটা আবরণী তৈরি হয়। এই আবরণীর মধ্যে মূককীট রূপান্তরিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ মৌমাছিতে পরিণত হয়ে ঢাকনা কেটে কুঠুরি থেকে বেরিয়ে আসে। অনিষিক্ত ডিম্মাণু থেকে

পুরুষ বা রাজা এবং নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে রানী এবং অসংখ্য কর্মী মৌমাছি জন্ম নেয়। ডিম ফুটে পূর্ণাঙ্গ কর্মী হতে ২৪ দিন, এবং পূর্ণাঙ্গ রানী তৈরি হতে প্রায় ১৫ দিন সময় লাগে।

নতুন রানী : চাকে এক বা একাধিক রানী মৌমাছি জন্ম লাভ করে। মৌচাকের নিচের পাশের দিকে আঙুলের মত লম্বাকৃতি কুঠুরিতে নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে হবু রানীর জন্ম হয়। কর্মীরা এই রানীকে শূককীট অবস্থায় রাজকীয় জেলি নামে পুষ্টিকর তরল খাওয়ায় বলে রানী বেশ তাড়াতাড়ি বড় হয়। রানী কুঠুরি থেকে বের হয়ে রাজার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য আকাশে ওড়ে। এ সময় পুরুষ বা রাজার দেহ থেকে শূক্ৰাণু রানীর দেহের শূক্ৰধানীতে জমা হয়। পরবর্তীতে রানী এই সঞ্চিত শূক্ৰাণু দিয়ে বাকি জীবন ইচ্ছানুযায়ী ডিম নিষেক করায় বা করায় না। সাধারণত পুরনো রানী হবু রানীর মূককীটকে হুল ফুটিয়ে মেরে ফেলে। কখনো কখনো মৌচাক বেশি বড় হয়ে গেলে বা অন্য কোন কারণে নতুন মৌচাক তৈরি করতে হলে পুরাতন রানী কিছু কর্মীকে নিয়ে পুরাতন মৌচাক ছেড়ে ঝাঁক বেঁধে চলে যায় ও নতুন মৌচাক তৈরি করে। এ রকম এক একটা ঝাঁকে প্রায় ২৫,০০০-৩০,০০০ মৌমাছি থাকে। অপরপক্ষে পুরাতন চাকে নতুন রানী, নতুন ও পুরাতন কর্মী এবং রাজা বাস করতে থাকে। এভাবে প্রাকৃতিকভাবে নতুন মৌচাক তৈরি হয়। প্রতিটি সাধারণ মৌচাকে ৫৫ হাজারেরও বেশি মৌমাছি থাকে।

মধু : মৌচাকে যে ঘন, আঠালো, মিষ্টি ও ভারী তরল পদার্থ পাওয়া যায়, তাকে মধু বলে। কর্মী মৌমাছির ফুল থেকে পুষ্পসার বা নেট্টার নামক রস সংগ্রহ করে। মৌমাছিদের পাকস্থলিতে এ রস থেকে পানি অপসারিত হয়ে মধুতে পরিণত হয়। মধুতে পানি এবং বিভিন্ন খনিজ পদার্থ ও বিভিন্ন ধরনের চিনি জাতীয় পদার্থ থাকে।

মোম : যে, সাদা, কঠিন পদার্থ দিয়ে মৌমাছির বাসা বা মৌচাক গঠিত হয়, তাকে মোম বলে। মোম কর্মী মৌমাছির দেহে অবস্থিত মোম গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত পদার্থ থেকে তৈরি হয়।

মৌমাছির অর্থনৈতিক গুরুত্ব :

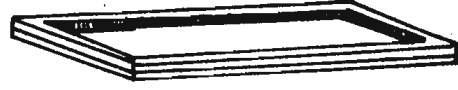
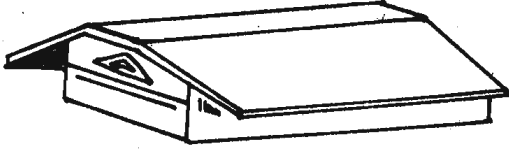
- ১। (ক) মৌমাছি মধু তৈরি করে, (খ) মৌমাছি মোম তৈরি করে এবং (গ) মৌমাছি বিভিন্ন ফুলের পরাগায়ন ঘটিয়ে (ঘ) ফল উৎপাদনে অংশ নেয়, (ঙ) প্রজাতির ধারাকে রক্ষা করে এবং (চ) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে।
- ২। **মধুর ব্যবহার :** (ক) মধু প্রাচীনকাল থেকেই পুষ্টিকর রক্তবর্ধক ও বলদায়ক খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। (খ) ওষুধ হিসেবে মধু ব্যবহৃত হয়। (গ) মধু মিষ্টান্ন হিসেবেও খাওয়া হয়।
- ৩। **মোমের ব্যবহার :** (ক) মোম হতে মোমবাতি তৈরি হয়। (খ) শিল্পক্ষেত্রে এবং আসবাবপত্র তৈরিতে মোম ব্যবহৃত হয়। (গ) কানুশিল্পে এবং গবেষণাগারে মোম ব্যবহার করা হয়।
- ৪। মৌমাছি পালনের সাথে জড়িত থেকে এবং মধু ও মোমের ব্যবসা করে অনেকে জীবিকা নির্বাহ করে।
- ৫। মোম ও মধু বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়।
- ৬। কৃত্রিম উপায়ে মৌমাছি প্রতিপালন করে ঘরে বসেই অল্প পরিশ্রম এবং অল্প পুঁজিতে অর্থ উপার্জন করে গৃহিণীরা সংসারের সচ্ছলতা আনতে পারে।

কৃত্রিমভাবে মৌমাছি পালন প্রক্রিয়া ও মধু সংগ্রহ করার পদ্ধতি

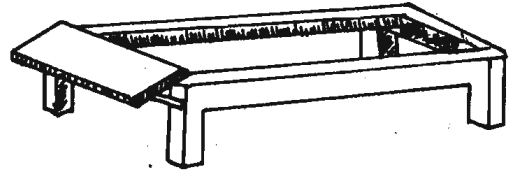
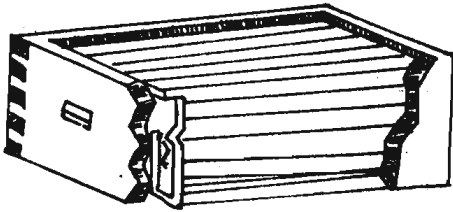
প্রাচীন পদ্ধতিতে বনজঙ্গলের মৌচাক খুঁজে তা থেকে মধু সংগ্রহ করা হয়। এ পদ্ধতিতে ধোঁয়া দিয়ে মৌমাছি তাড়িয়ে মোম এবং মধু সংগ্রহ করা হয়। এভাবেই আমাদের সুন্দরবন থেকে মৌয়াল (মৌ-সংগ্রহকারী) রা মোম ও মধু সংগ্রহ করে। কিন্তু প্রাকৃতিকভাবে তৈরি মৌচাকের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। এজন্য কৃত্রিমভাবে মৌমাছি পালন করা হয়। পৃথিবীর অনেক দেশের মত বর্তমানে আমাদের দেশেও কৃত্রিম পদ্ধতিতে মৌমাছি চাষ করা হচ্ছে। এ পদ্ধতিতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সহজে মোম ও মধু পাওয়া যায়।

কৃত্রিম মৌমাছি : বাংলাদেশে মৌমাছি চাষের জন্য একটি সরল ধরনের মৌবাক্স বা চাক বাক্স উদ্ভাবন করা হয়েছে। চতুর্ভুজাকৃতি এই চাক বাক্সের উপরের দিক খোলা। এর ভিতরে লম্বা কাঠি ঝুলানো থাকে। বাক্সের ভিতরে যাতে বর্ষাকালে বৃষ্টির পানি না ঢুকতে পারে সেজন্য বাক্সের উপরে ঢাকনা দেবার ব্যবস্থা থাকে। মৌবাক্সটা বাড়ির

আশপাশে সরিষা ক্ষেতে বা অন্য কোনখানে মাটি থেকে কিছুটা উপরে রাখতে হয়। মৌবাক্স রাখার সময়ই ভিতরে কিছুটা মধু ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই মধুর গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে নির্দিষ্ট ছিদ্রপথে মৌমাছির মৌবাক্সে ঢোকে এবং জন্মগত স্বভাববশত তার ভিতরে মৌচাক বাঁধে এবং মধু সংগ্রহ করতে থাকে। এভাবে কৃত্রিম পদ্ধতিতে মৌমাছির চাষ করা হয়। প্রাকৃতিকভাবে গঠিত মৌচাকের কাছাকাছি কোন মৌবাক্স রাখলে নতুন জন্মলাভ করা মৌমাছির সহজেই তার মধ্যে বাসা বাঁধে।



চিত্র : চাল বা ঢাকনা



চিত্র ১৬.১৬ : মৌবাক্স ও তার ভিতর বুলন্ত কাঠি অপত্য প্রকোষ্ঠ

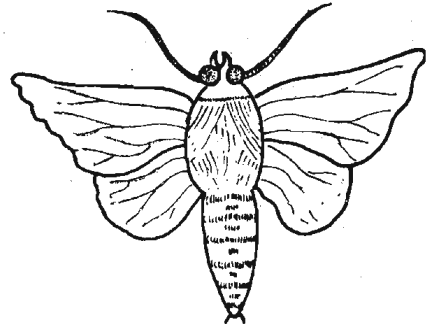
মধু সংগ্রহ : প্রাচীন পদ্ধতিতে মধু ভর্তি মৌচাকে ধোঁয়া দিয়ে মধু এবং মোম সংগ্রহ করা হয়। বর্তমানে বিশেষভাবে তৈরি যন্ত্রের সাহায্যে আধুনিক পদ্ধতিতে মধু নিষ্কাশন করা হয়। এই পদ্ধতিতে কৃত্রিম চাক নষ্ট হয় না বলে তা একাধিকবার ব্যবহার করা যায়।

ধান ও পাটের ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ বা পেস্ট

মানুষের সুখ, স্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক লাভকে যেসব প্রাণী ক্ষতিগ্রস্ত করে, তাদের পেস্ট (pest) বলে। এসব প্রাণী বিভিন্নভাবে মানুষের অসুবিধার সৃষ্টি করে। এদের মধ্যে কতগুলো পোকা আছে যারা ঝাঁকে ঝাঁকে মাঠের ফসল আক্রমণ করে ফলন কমিয়ে দেয়। এখানে ধান এবং পাটের দুটো করে ক্ষতিকর পোকার স্থানীয় নাম, বৈজ্ঞানিক নাম, এদের দ্বারা সংঘটিত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এবং এদের দমন পদ্ধতির কথা আলোচনা করা হল।

১। ধানের হলুদ মাজরা পোকা (Yellow Stem borer)

: এদের বৈজ্ঞানিক নাম *Scirpophaga incertulus* (স্কিরপোফাগা ইনসারটুলাস)। পূর্ণ বয়স্ক মথ হলুদ রঙের। স্ত্রী মথ ধানের পাতার উপর ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে লার্ভা বের হয়ে কাণ্ড ছিদ্র করে ভিতরে প্রবেশ করে। ৩৫-৪৬ দিন পর লার্ভা বা শূককীট পিউপা বা মুককীটে পরিণত হয়। ৬-১০ দিন পর মুককীট পূর্ণাঙ্গ দশায় পরিণত হয়।



চিত্র ১৬.১৭ : মাজরা পোকা

ক্ষয়ক্ষতি : কাণ্ড খেয়ে ফেলায় গাছের শীষ শুকিয়ে মরে যায়।

প্রতিকার বা দমন পদ্ধতি

(ক) জৈবিক দমন : হাত দিয়ে ডিম নষ্ট করে ফেলতে হয়।

(খ) রাসায়নিক পদ্ধতি : উপযুক্ত কীটনাশক দিয়ে পোকা মেরে ফেলতে হয়।

২। ধানের পামরী পোকা (*Rice hispa*) : এই পোকার বৈজ্ঞানিক নাম *Diurapha armigera* (ডাইরুফাডিসপা আর্মিজেরা)। এদের রং কালো এবং পিঠে কাঁটা থাকে। স্ত্রী পোকা ধান গাছের পাতায় ডিম পাড়ে। ১-৩ দিনের মধ্যে শূককীট বের হয়। শূককীট ৯-১২ দিনে হালকা বাদামি মূককীটে পরিণত হয়। ৩-৪ দিন পর মূককীট পূর্ণাঙ্গ পোকায় পরিণত হয়। পূর্ণবয়স্ক পোকা ৯-১২ দিন বাঁচে।

ক্ষয়ক্ষতি : শূককীট ও পূর্ণবয়স্ক পোকা ধান পাতার সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে। এতে পাতা শুকিয়ে সাদা হয়ে যায়। ফলে সবুজ অংশ না থাকায় সালোকসংশ্লেষণ হয় না। ফলে গাছের খাদ্য তৈরি হয় না। এতে গাছের ক্ষতি হয় ও ধানের ফলন কমে যায়।

প্রতিকার বা দমন পদ্ধতি

ক) জৈবিক দমন : (i) আলোর ফাঁদ পেতে পোকা মারতে হবে, (ii) আক্রান্ত পাতা পুড়িয়ে বা পুঁতে ফেলতে হবে। (iii) হাত দিয়ে পোকা মেরে ফেলতে হবে।

খ) রাসায়নিক দমন : কীটনাশক দিয়ে পোকা মারতে হবে।

১। পাটের বিছাপোকা (*Jute hairy caterpillar*) : এর বৈজ্ঞানিক *Spilosoma obliqua* (স্পাইলোসোমা অবলিকা)। স্ত্রী পোকা বা মথ পাতার নিচের দিকে বহুসংখ্যক ডিম পাড়ে। ৫-৬ দিনে শূককীট বের হয়। এর ৯-১০ দিন পর মূককীট অবস্থায় পরিণত হয়। এরপর পূর্ণাঙ্গ দশাপ্রাপ্ত হয়।

ক্ষয়ক্ষতি : শূককীট বিহার মত। এরা দলবদ্ধভাবে পাতার সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে। কখনো কখনো ডগাও খেয়ে ফেলে। ফলে গাছ দুর্বল হয়ে যায় এবং পাটের ফলন কম হয়।

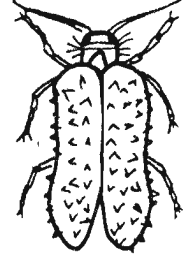
২। পাটের চেলে পোকা : (*Jute Stem weevil*) এর বৈজ্ঞানিক নাম *Apion corchori* (এপিয়ন করকরি)। পূর্ণবয়স্ক পোকা ছোট ও ধূসর বর্ণের। মাথার সামনে বাঁকা শঁড় আছে। স্ত্রী পোকা গাঁট ছিদ্র করে বহুসংখ্যক ডিম পাড়ে। ৩-৪ দিনে ডিম ফুটে লার্ভা বের হয় এবং কাণ্ডে ঢুকে কাণ্ডের রস খায়। ১০-১৩ দিন পর লার্ভা শূককীটে পরিণত হয়।

ক্ষয়ক্ষতি : পাট গাছের গায়ে গিটের সৃষ্টি হয়। পাট পচানোর সময় গিটের জায়গায় আঁশ ছিঁড়ে যায়। ফলে পাটের ফলন কম হয় ও মান কমে যায়।

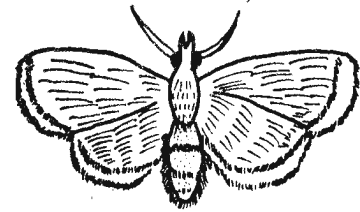
প্রতিকার বা দমন পদ্ধতি

(ক) জৈবিক দমন : আক্রান্ত আগা কেটে পোকা মেরে ফেলতে হয়।

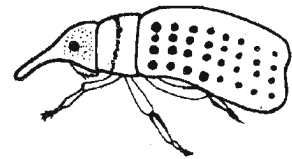
(খ) রাসায়নিক দমন : উপযুক্ত কীটনাশক পানির সাথে মিশিয়ে জমিতে ছিটাতো হয়।



চিত্র ১৬.১৮ : পামরী পোকা



চিত্র ১৬.১৯ : পামরী পোকা



চিত্র ১৬.২০ : পাটের চেলে পোকা

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। চট্টগ্রামের রেয়ন উৎপাদনের কারখানার প্রধান কাঁচামাল কোনটি?

- | | |
|---------|------------|
| ক. বাঁশ | খ. বেত |
| গ. ছন | ঘ. নারিকেল |

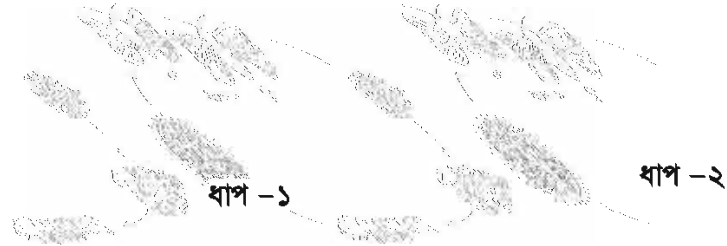
২। মৎস্য চাষীরা পুকুরে মাঝে মাঝে চুন দিয়ে থাকেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যাচ্ছের—

- ছত্রাক দমন করা
- ব্যাক্টেরিয়া দমন করা
- উঁকুন দমন করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের চিত্র অবলম্বনে ৩নং ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



ধাপ - ৩

ধাপ - ৫

ধাপ - ৪

৩। ওয় ধাপটি কী নামে পরিচিত?

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| ক. শূককীট বা লার্ভা বা পলু | খ. শূককীট বা লার্ভা বা পিউপা |
| গ. শূককীট বা লার্ভা বা পুডালি | ঘ. শূককীট বা পলু বা পিউপা |

৪। জীবনচক্রের স্বাভাবিক অবস্থায় চিত্রের যে ধাপে রেশম পোকা মারা যায় সেটি হল -

- | | |
|------------|------------|
| ক. ধাপ - ১ | খ. ধাপ - ২ |
| গ. ধাপ - ৩ | ঘ. ধাপ - ৪ |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। গাজীপুরের সাইফুল্লাহ সাহেব আজ একজন সফল মৌচাষী। পঁচিশ বছর আগে বিসিকের মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে কৃত্রিমভাবে মৌমাছি চাষ শুরু করেন। আজ তাঁর প্রায় ২০০টি মৌবাক্স রয়েছে এবং এ কাজে ৪-৫ জন কর্মচারী নিয়োজিত আছে। সরিষা, আম, লিচু প্রভৃতি ফুলের মৌসুমে তাঁর কর্মচারীরা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মৌবাক্স স্থাপন করে বছরে ৫০-৬০ মণ মধু সংগ্রহ করে। এ কাজে শুধু তিনি নিজেই লাভবান হচ্ছেন না বরং যেসব ক্ষেতে বা বাগানে মৌবাক্স স্থাপন করা হচ্ছে তাদের ফলনও বহুলাংশে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ক. মৌ চাষ কী?

খ. মৌবাক্সে মৌ চাষ করা সুবিধাজনক কেন?

গ. সাইফুল্লাহ সাহেবের অনুসরণে তোমার বাগান বাড়িতে কীভাবে মৌচাষ করবে তা বর্ণনা কর।

ঘ. অর্থনৈতিক ও পরিবেশ উন্নয়নে সাইফুল্লাহ সাহেবের কৃত্রিম মৌচাষের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

ব্যবহারিক

(উদ্ভিদবিজ্ঞান)

প্রাথমিক কথা

ব্যবহারিক জ্ঞান ছাড়া বিজ্ঞান শিক্ষা কখনো পূর্ণতা লাভ করে না। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তত্ত্বীয় জ্ঞান (theoretical knowledge) এবং ব্যবহারিক জ্ঞান (practical knowledge) একটি অন্যটির পরিপূরক। একটির জ্ঞান ভিন্ন অন্যটি অসমাপ্ত থেকে যায়। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মত জীববিজ্ঞানেও তত্ত্বীয় জ্ঞানের সাথে সাথে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবহারিক ক্লাসে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান লাভ করতে হলে ছাত্রছাত্রীদের অবশ্যই কতকগুলো নিয়ম বা নির্দেশাবলি পালন করতে হবে।

নির্দেশাবলি (Instructions)

- ১। ব্যবহারিক কাজটি ভালভাবে করতে হলে ছাত্রছাত্রীদের অবশ্যই ঐ বিষয়ে ভাল তত্ত্বীয় জ্ঞান লাভ করতে হবে।
- ২। ব্যবহারিক ক্লাসে প্রদত্ত কাজ সম্বন্ধে শিক্ষক কী কী নির্দেশ দান করেন তা গুরুত্ব সহকারে লক্ষ করে পালন করতে হবে।
- ৩। ব্যবহারিক কাজ করতে যেসব যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য বস্তু প্রয়োজন পড়ে তা সাথে রাখতে হবে এবং প্রতিটির ব্যবহার জানতে হবে।
- ৪। প্রদত্ত নমুনাটি প্রথমত ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- ৫। প্রদত্ত নমুনার তত্ত্বীয় জ্ঞানের সাথে ব্যবহারিক জ্ঞানের কোন পার্থক্য দেখা দিলে তা শিক্ষককে দেখাতে হবে এবং খাতায় লিখে নিতে হবে।
- ৬। ছাত্রছাত্রীদের সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে।
- ৭। পেনসিল তীক্ষ্ণ করার জন্য পেনসিল কাটার যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে। কখনো মেঝে বা টেবিলের উপর ঘষে পেনসিল চোখা করবে না।
- ৮। ব্যবহারিক ক্লাসে যথাসম্ভব নীরবতা পালন করতে হবে।
- ৯। বসবার জায়গা সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং ব্যবহারিক খাতা, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, ব্যবচ্ছেদক ট্রে সুন্দরভাবে সুবিধামত স্থানে সাজিয়ে নিতে হবে।
- ১১। ব্যবহারিক ক্লাস শেষ করার পূর্বে প্রদত্ত নমুনাসহ বসবার জায়গা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সাজিয়ে রেখে যেতে হবে।

ব্যবচ্ছেদ (dissection)

- ১২। নমুনাটি ব্যবচ্ছেদ করার আগে শ্রেণীশিক্ষক কী কী উপদেশ ও নির্দেশ দান করেন তা গুরুত্ব সহকারে শুনতে হবে এবং সে নির্দেশমত কাজ করতে হবে।
- ১৩। ব্যবচ্ছেদ ট্রেতে পরিমাণমত পানি নিয়ে সে পানির মধ্যে ব্যবচ্ছেদ করতে হবে।
- ১৪। ব্যবচ্ছেদ করার পর ময়লা পানি ফেলে পরিষ্কার পানি ব্যবহার করতে হবে।
- ১৫। ব্যবচ্ছেদ করার সময় অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শ্রেণীকক্ষের যেখানে সেখানে ফেলা চলবে না, সর্বদা পেট্রিডিসে ফেলতে হবে।

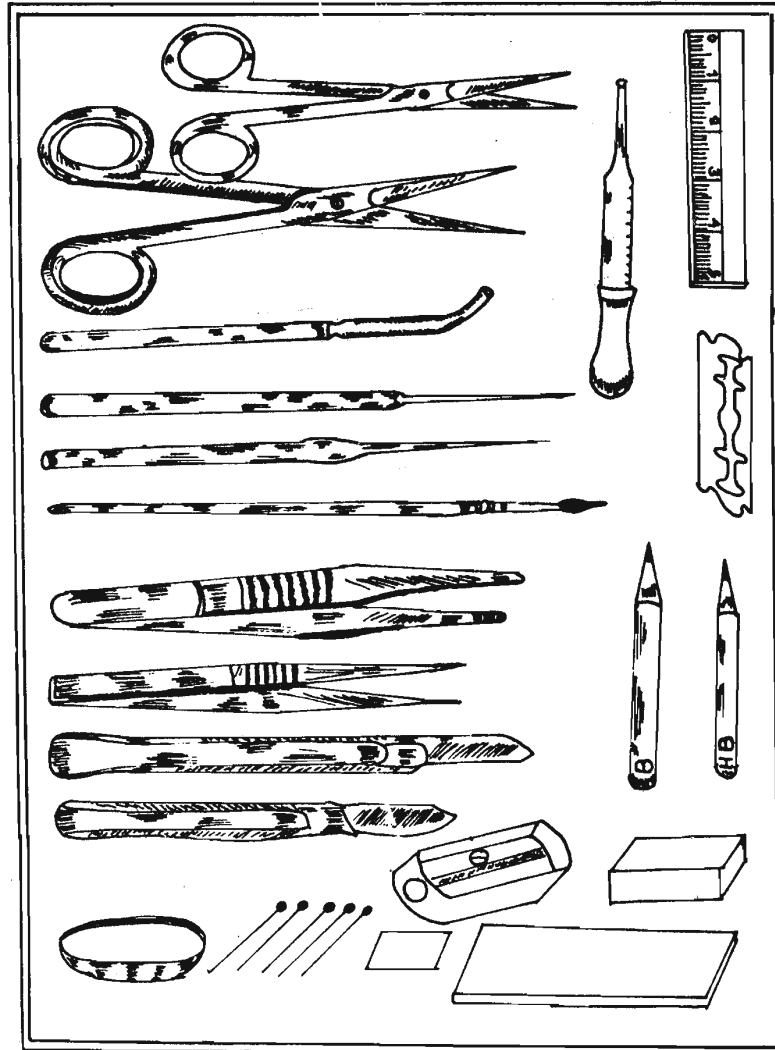
১৬। ধৈর্য ও মনোযোগ সহকারে ব্যবচ্ছেদ করতে হবে এবং ব্যবচ্ছেদ ভালভাবে করার পর শিক্ষককে তা দেখাতে হবে।

১৭। ব্যবচ্ছেদ করার সময় নমুনাটি যেন পানিতে ডুবে থাকে সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে।

ব্যবহারিক ক্লাসের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি

প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে নিম্নলিখিত সরঞ্জামাদি সাথে রাখতে হবে:

- ১। কাজ করার জন্য একটি ডিসেকটিং বক্স।
- ২। ছবি আঁকার জন্য বিভিন্ন প্রকার পেনসিল (H, HB, 2B), পেনসিল কাটার যন্ত্র (সার্পনার), রবার, স্কেল প্রভৃতি।
- ৩। অণুবীক্ষণ যন্ত্র, স্লাইড, কভার স্লিপ প্রভৃতি পরিষ্কার করার জন্য পরিষ্কার পাতলা কাপড়।
- ৪। ডেস্ক পরিষ্কার করার জন্য ছোট তোয়ালে।
- ৫। ল্যাবরেটরি নোট খাতা।
- ৬। অণুবীক্ষণ যন্ত্র, রং, স্লাইড, এলকোহল, গ্লিসারিন প্রভৃতি।



চিত্র ১ : ব্যবহারিক ক্লাসের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম

ডিসেকটিং বক্স বা ব্যবচ্ছেদ যন্ত্রের বাক্স (Dissecting box)

প্রদত্ত নমুনা পর্যবেক্ষণ ও ব্যবচ্ছেদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি একত্রে যে বাক্সের ভেতর রাখা হয় তাকে ডিসেকটিং বক্স বলে। ডিসেকটিং বক্সে সাধারণত নিম্নলিখিত সরঞ্জামাদি থাকে—

- ১। ছেদন সঁই ২টি (হাতল বিশিষ্ট)
- ২। কাঁচি২টি (একটি সূক্ষ্ম ফলকবিশিষ্ট ও অন্যটির ফলক অপেক্ষাকৃত চওড়া)
- ৩। স্কাপেল২টি (ধারাল ক্ষুদ্র ছুরি)
- ৪। চিমটা২টি (একটি সূক্ষ্ম এবং অন্যটি ভোঁতা)
- ৫। তুলি২টি
- ৬। ওয়াচ গ্লাস২টি
- ৭। ব্লো-পাইপ১টি
- ৮। রেজর১টি
- * ৯। বিবর্ধক কাচ১টি
- * ১০। ব্লেন্ড১ডজন
- ১১। কিছু আলপিন
- ১২। ড্রপার১টি, ইত্যাদি।

* বিবর্ধক কাচ (magnifying glass) বাক্সে নাও থাকতে পারে। এ ছাড়া ডিসেকটিং বক্সে সাধারণত ব্লেন্ড (রেজরের পরিবর্তে) কিনে নিতে হয়।

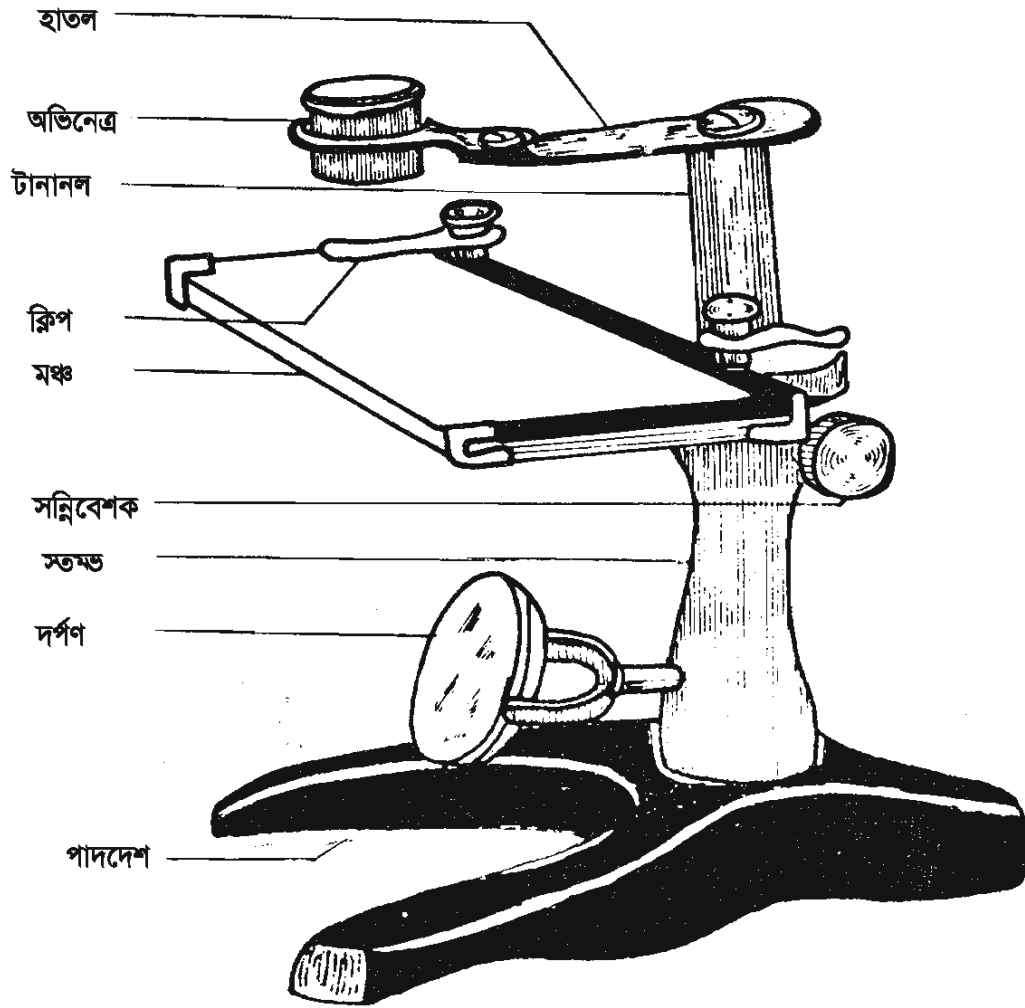
অণুবীক্ষণ যন্ত্র এবং এর ব্যবহার (microscope and its uses)

যে যন্ত্রের সাহায্যে ক্ষুদ্র বস্তুকে অনেকগুণ বড় করে দেখা যায় তাকে অণুবীক্ষণ যন্ত্র (গ্রিক—Micros=ক্ষুদ্র + skopeein=দেখ) বলে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারক অ্যান্থনি ফন লিউয়েনহোক (Anthony Von Leeuwenhoek)। অণুবীক্ষণ যন্ত্র বিভিন্ন প্রকার হতে পারে, যেমন— আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র, ইলেকট্রনিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র, ফেজ কন্ট্রাস্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্র প্রভৃতি। আমাদের দেশে পরীক্ষাগারে আমরা যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করে থাকি তা আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র। আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবার দু প্রকার। যথা—(ক) সরল এবং (খ) যৌগিক।

(ক) সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র (simple microscope) : গঠনশৈলী ও কার্যপদ্ধতি অত্যন্ত সরল বলে একে সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র বলা হয়। এ ধরনের অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে সচরাচর অপেক্ষাকৃত কোন বৃহত্তর অঙ্গ বা অংশের পর্যবেক্ষণ বা ব্যবচ্ছেদ (dissection) করা হয়, তাই এর অপর নাম ব্যবচ্ছেদ অণুবীক্ষণ যন্ত্র (dissecting microscope)। একটি সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের গঠন ও ব্যবহার প্রণালি দেখান হল :

গঠন : সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের গঠনপ্রণালি একেবারেই সরল। এতে একটি দেহ, স্লাইড রাখার জন্য একটি মঞ্চ (পুরু কাচের), স্লাইডকে আটকানোর জন্য দুটি ক্লিপ, একটি হাতল, হাতলে স্থাপিত একটি অভিনেত্র বা আইপিস (লেন্স), একটি মিরর বা দর্পন থাকে। অভিনেত্রকে উপর নিচে ওঠানামা করার জন্য একটি সল্লিবেশন আছে। সমস্ত দেহটি একটি পাদদেশে স্থাপিত।

কার্যপ্রণালি : প্রথমে স্লাইডটি মঞ্চের উপর রেখে দুটি ক্লিপ দিয়ে একে আটকাতে হবে। পরে দর্পণকে নাড়াচাড়া করে স্লাইডে আলো ফেলতে হবে। এবার অভিনেত্রে চক্ষু রেখে সল্লিবেশকের সাহায্যে অভিনেত্রকে এমন পর্যায়ে এনে স্থির করতে হবে যে পর্যায়ে স্লাইডের বস্তুটি সর্বাধিক স্পষ্ট দেখায়। এবার স্লাইডের বস্তুটি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে অথবা ব্যবচ্ছেদ করতে হলে অভিনেত্রে চক্ষু রেখে সুবিধা অনুসারে চিমটা, সঁই প্রভৃতি দিয়ে বস্তুটিকে ব্যবচ্ছেদ করতে হবে।



চিত্র ২ : একটি সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র ও এর বিভিন্ন অংশ

(খ) যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র (compound microscope) : এদের গঠনশৈলী বেশ জটিল এবং ব্যবহার প্রণালিও অপেক্ষাকৃত জটিল প্রকৃতির। একটি যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ এবং এদের কাজ দেয়া হল :

যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিভিন্ন অংশকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা : ১। যান্ত্রিক অংশ (mechanical parts) এবং (২) আলোক সম্বন্ধীয় অংশ (optical parts)।

১। যান্ত্রিক অংশ

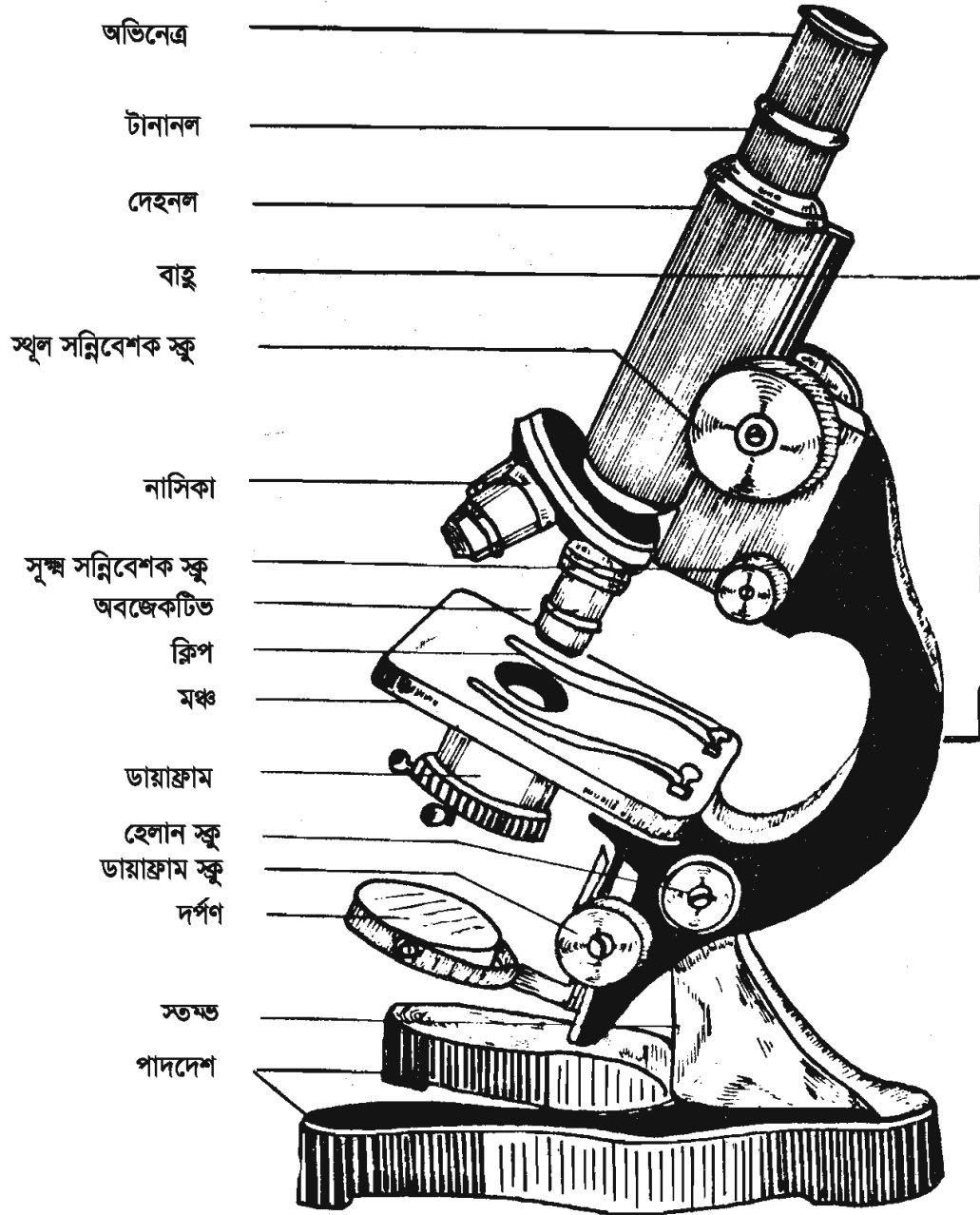
(ক) বেজ (base) বা পাদদেশ : যে চ্যাপ্টা অঙ্গের উপর সমস্ত দেহটি বসান থাকে তাকে বেজ বা পাদদেশ বলে।

(খ) পিলার (pillar) বা স্তম্ভ : পাদদেশের সাথে পিছনের দিকের খাড়া অংশকে পিলার বা স্তম্ভ বলে।

(গ) আর্ম (arm) বা হাতল : পিলারের উপর হেলান স্ক্রু দ্বারা আটকান উপরের বক্স অংশকে আর্ম বা হাতল বলে। যন্ত্রটিকে স্থানান্তরের সময় আমরা হাতলে ধরে স্থানান্তরিত করে থাকি।

(ঘ) বডি টিউব (body tube) বা দেহনল : এটি একটি লম্বা নল। বন্ধ হাতলের শেষ মাথায় এটি আটকান থাকে। হাতলের মাথা এবং দেহনলের মাঝখানে দুটি স্ক্রু আছে। একটিকে বলা হয় স্থূল সন্নিবেশক স্ক্রু এবং অন্যটিকে বলা হয় সূক্ষ্ম সন্নিবেশক স্ক্রু। সন্নিবেশক স্ক্রুকে ঘুরিয়ে দেহনলকে উপরে নিচে ঠাণ্ডা করা যায়।

(ঙ) ড্র-টিউব (draw-tube) বা টানানল : টানানলটি দেহনলে বসান থাকে। একে ইচ্ছা করলে উপরে টানা সম্ভব হয়।



চিত্র ৩ : একটি যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র ও এর বিভিন্ন অংশ

(চ) নোজপিস (nose piece) বা নাসিকা : এটি চক্রাকারের এবং দেহনলের নিম্নাংশে আটকান। এতে তিনটি প্যাঁচকাটা ছিদ্র থাকে যাতে বিভিন্ন বিবর্ধন ক্ষমতাসম্পন্ন অভিলক্ষ (objectives) লাগান হয়।

(ছ) স্টেজ বা মঞ্চ (stage) : মঞ্চটি আয়তাকার এবং গোড়ার দিকে হাতলের সাথে আটকান থাকে। মঞ্চের মাঝখানে একটি ছিদ্র থাকে যার মধ্য দিয়ে আলো এসে পড়ে। মঞ্চের গোড়ার দু দিকে দুটি ক্লিপ থাকে। মঞ্চে স্লাইড রেখে ক্লিপ দিয়ে স্লাইডকে আটকিয়ে দেওয়া হয়।

(জ) ডায়াফ্রাম (diaphragm) : একে ইচ্ছামত প্রসারিত ও সংকুচিত করে আলোকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। এটি মঞ্চের নিচে অবস্থিত।

(ঝ) স্থূল ও সূক্ষ্মসন্নিবেশক স্ক্রু (coarse and fine adjustment screws) : হাতলের (আর্ম) মাথায় দু পাশে দুটি বড় স্ক্রু থাকে। একে স্থূল সন্নিবেশক স্ক্রু বলে। স্ক্রুর সাহায্যে টানানলকে অতি তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করা যায়। স্থূল সন্নিবেশক স্ক্রুর ঠিক নিচেই থাকে আর এক জোড়া স্ক্রু। এ স্ক্রুর সাহায্যে টানানলকে অতি সূক্ষ্মভাবে ঠাণ্ডা করা যায়। একে সূক্ষ্ম সন্নিবেশক স্ক্রু বলে।

২। আলোক সম্বন্ধীয় অংশ

(ক) আইপিস (eye-piece) বা অভিনেত্র : টানানলের অভ্যন্তরে ঢুকান এটি একটি ছোট নল বিশেষ। এর উপরে এবং নিচে একটি করে লেন্স থাকে। এতে চোখ রেখে স্লাইডের বস্তু দেখতে হয়।

(খ) অবজেকটিভস (objectives) বা অভিলক্ষ : অভিনেত্রের মত এটিও ছোট নল বিশেষ। এতেও লেন্স লাগান থাকে। সাধারণত বিভিন্ন বিবর্ধন ক্ষমতাসম্পন্ন তিনটি অভিলক্ষ নাসিকার তিনটি প্যাঁচের মধ্যে লাগান থাকে। অভিনেত্র এবং অভিলক্ষের গায়ে বিবর্ধন ক্ষমতা লেখা থাকে।

(গ) কনডেন্সার (condenser) : এটি দুটি লেন্সের সমষ্টি মাত্র। এটি মঞ্চের ছিদ্রের নিচে আটকান থাকে। এর মধ্য দিয়ে আলোক অভিসারী হয়ে স্লাইডের বস্তুর উপর পড়ে।

(ঘ) মিরর (mirror) বা দর্পণ : এটি একটি প্লেনো কনকেভ দর্পণ। এটা স্তম্ভের গোড়ায় আটকান থাকে। দর্পণকে ইচ্ছামত একদিক সেরিক ঘুরিয়ে ডায়াফ্রাম ও কনডেনসারের মধ্য দিয়ে লক্ষ্যবস্তুতে আলো ফেলা যায়।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা বস্তুটি আকারে কতগুণ বর্ধিত হল তা নির্ণয় করা যায় অভিলক্ষ এবং অভিনেত্রের গায়ে লেখা বিবর্ধন ক্ষমতা গুণ করে। [মনে করি অভিনেত্রের বিবর্ধন ক্ষমতা (magnification power) 10x এবং অভিলক্ষের বিবর্ধন ক্ষমতা 20x। তা হলে দর্শনীয় বস্তু 20 X 10 = 200 গুণ বর্ধিত হল।]

সরল ও যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহার প্রণালি ব্যবহারিক ক্লাসে শিক্ষক মহোদয়ের নিকট হতে প্রত্যক্ষভাবে শিখে নিতে হবে।

ব্যবহারিক কার্যপ্রণালি

ব্যবহারিক ক্লাসে নিম্নলিখিত কাজ সম্পাদন করতে হবে

- ১। প্রদত্ত নমুনার কী করতে হবে প্রথমে তা শিক্ষকের কাছে জেনে নিতে হবে বা প্রশ্ন পড়ে বুঝে নিতে হবে।
- ২। নমুনাটির ব্যাহিক আকার, আকৃতি ও অন্যান্য শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য ভালভাবে লক্ষ করতে হবে এবং প্রয়োজনে খাতায় অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশের নাম চিহ্নিত করতে হবে।
- ৩। নমুনাটি মূল, কাণ্ড, পাতা প্রভৃতি হলে এবং এদের অন্তর্গত পরীক্ষা করার প্রয়োজন হলে ভাল র্লেড (রেজর) দিয়ে উত্তম প্রচ্ছদন কেটে স্লাইডে মাউন্ট করতে হবে এবং সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করে খাতায় লেবেল যুক্ত চিত্র অঙ্কন করতে হবে।
- ৪। প্রয়োজনীয় চিত্র অঙ্কন ও বর্ণনা লেখার পর এর শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করতে হবে এবং সাথে সাথে নমুনাটি কী ছিল তা প্রয়োজনে বর্ণনা ও শনাক্ত করতে হবে।
- ৫। ছবি সর্বদাই বড় করে আঁকতে হবে। ছবি আঁকার সময় প্রথমে শক্ত পেনসিল দিয়ে অত্যন্ত হালকাভাবে লাইন করতে হবে। যখন বুঝা যাবে ছবি অঙ্কনের কাঠামো ঠিক হয়েছে তখন হালকা লাইনের উপর HB পেনসিল দিয়ে স্পষ্ট দাগ দিতে হবে। প্রয়োজনবোধে 2B ও 3B পেনসিল দিয়ে শেড দিতে হবে। ছবির লেবেল একদিকে এবং এক লাইনে করতে সচেষ্ট হতে হবে।

সপুষ্পক উদ্ভিদের গঠন বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ

পরীক্ষার উপকরণ : ফুল, ফল ও মূলসহ একটি ছোট উদ্ভিদ (যেমন-সরিষা), চিমটা, সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র (অথবা বিবর্ধক কাচ)।

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি : গাছটি হাতে নাও এবং মনোযোগের সাথে পর্যবেক্ষণ কর। ফুল পর্যবেক্ষণে প্রয়োজন হলে সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা বিবর্ধক কাচ ব্যবহার কর। নিচের যে বর্ণনার সাথে তোমার নমুনাটির মিল হয় তা তোমার ব্যবহারিক শিটে লিখ।

মূল : গুচ্ছমূল/ প্রধান মূল।

কাণ্ড : তিন কোণা/চার কোণা/ মোটামুটি নলাকার; মসৃণ/রোমযুক্ত/কাঁটায়ুক্ত।

পাতা : সরল/যৌগিক, বোটা আছে/বোটা নেই; প্রতি পর্ব থেকে একটি/দুটি/অধিক : প্রধান শিরা একটি/একাধিক; শিরাবিন্যাস জালিকা/সমান্তরাল।

ফুল : একটি/একসাথে একাধিক; পাতার কক্ষে/শাখার শীর্ষে; ফুলের বোটা আছে/বোটা নেই।

বৃতি : বৃত্তাংশ ৪টি/৫টি; পৃথক/পরস্পর সংযুক্ত; সবুজ/রঙিন; সবকটি একই রকম/একই রকম নয়।

দল : পাপড়ি ৪টি/৫টি; পৃথক/পরস্পর সংযুক্ত; সাদা/হলুদ/নীল/ বেগুনি/গোলাপি/অন্যরকম; সবকটি একই রকম/একই রকম নয়।

পুষ্পতবক : পুংকেশর ৪টি/৫টি/৬টি/অধিক; পৃথক/পরস্পর সংযুক্ত; পাপড়ির সাথে লাগানো/ লাগানো নয়; সবকটির দৈর্ঘ্য সমান/ অসমান; পরাগধানী আছে/নেই।

স্ত্রীস্তবক : গর্ভকেশর আছে/নেই; গর্ভাশয় ১টি/একাধিক; গর্ভদন্ড ১টি/২টি/অধিক; গর্ভমুণ্ড ১টি/অধিক; গর্ভাশয় বৃতি ও দলের নিচে/ উপরে।

ফল : আছে/নেই; রসালো/ শুকনো; ফেটে যায়/ ফেটে যায় না।

মন্তব্য কর

- ১। একবীজপত্রী উদ্ভিদ কী দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ? : দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ
- ২। ফুল উভলিঙ্গা কী একলিঙ্গা? : উভলিঙ্গা
- ৩। ফুল অধিগর্ভ কী অধোগর্ভ? : অধোগর্ভ
- ৪। ফুল একপ্রতিসম কী বহুপ্রতিসম? : বহুপ্রতিসম

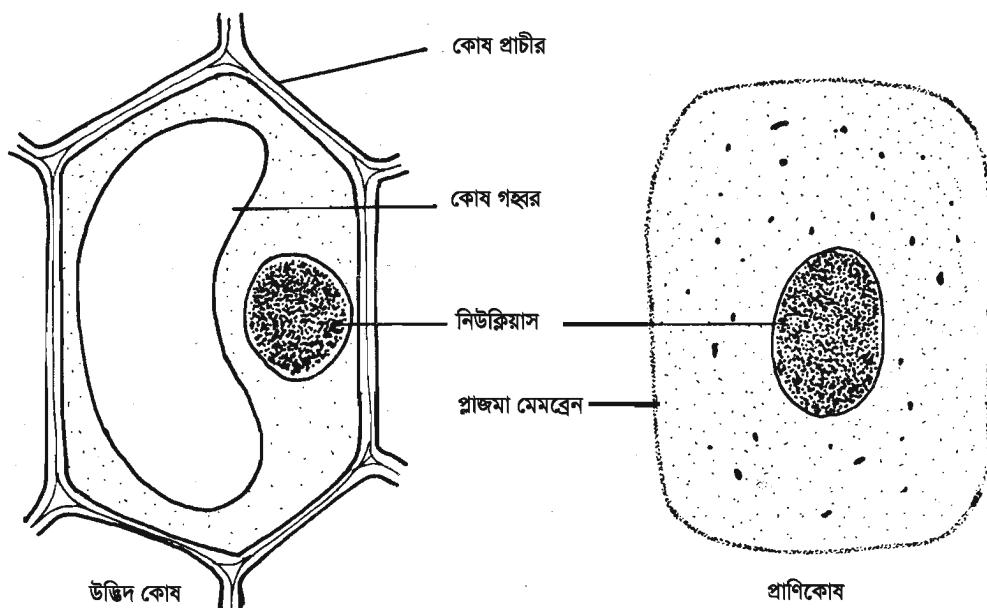
মোট লেখাগুলো সরিষা উদ্ভিদের জন্য প্রযোজ্য।

উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষের গঠন বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ

পরীক্ষার উপকরণ যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র, কাচের স্লাইড, কাভার স্লিপ, চিমটা, পানি, তাজা পিঁয়াজ।

কার্যপদ্ধতি-১: তাজা পিঁয়াজ হতে একটি মাংসল শঙ্কপত্র বেছে নিতে হবে এবং চিমটা দিয়ে এর বহিঃত্বক হতে পাতলা আবরণ তুলে নিতে হবে। এবার স্লাইডে এক ফোঁটা পানি দিয়ে তাতে পাতলা আবরণটি স্থাপন করতে হবে। আবরণটির উপর একটি কাভার স্লিপ দিয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

পর্যবেক্ষণ: অণুবীক্ষণ যন্ত্রের উচ্চ অভিলক্ষের নিচে পর্যবেক্ষণ করলে এক স্তর কোষ দেখা যাবে। কোষগুলো সুনির্দিষ্ট আকৃতি বিশিষ্ট, প্রতিকোষে পুরু কোষপ্রাচীর আছে, কোষপ্রাচীরের কাছাকাছি সাইটোপ্লাজমে নিউক্লিয়াস অবস্থিত এবং প্রতি কোষে বড় কোষ গহ্বর আছে।



চিত্র ৪ : উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষের গঠন বৈশিষ্ট্য

কার্যপদ্ধতি-২ : হাত ভাল করে ধুয়ে আঙুল দিয়ে ঘষে গালের ভেতর থেকে পাতলা সাদা ঝিল্লী তুলে আনতে হবে। ঝিল্লীটি আঙুল দিয়ে স্লাইডের সাথে ঘষতে হবে। এতে করে স্লাইডের উপর একটি আঠালো প্রলেপ পড়বে। এর পর স্লাইডটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

পর্যবেক্ষণ : অণুবীক্ষণ যন্ত্রের অভিলক্ষের নিচে পর্যবেক্ষণ করলে কোষ দেখা যাবে। কোষগুলো মোটামুটি গোলাকার, প্রতিকোষে একটি পাতলা ঝিল্লী আছে, কিন্তু কোষ প্রাচীর নেই। নিউক্লিয়াস কোষের মাঝখানে অবস্থিত এবং কোষে কোন কোষ গহ্বর নেই। উদ্ভিদ কোষ এবং প্রাণিকোষ পর্যবেক্ষণের পার্থক্যগুলো পাশাপাশি ছকে সাজিয়ে নাও। পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ :

উদ্ভিদ কোষ	প্রাণিকোষ
কোষ অনেকটা ষড়ভুজি।	কোষ গোলাকার।
কোষে পুরু কোষপ্রাচীর আছে।	কোষে কোন কোষপ্রাচীর নেই।
বড় কোষ গহ্বর আছে।	কোন কোষ গহ্বর নেই।
নিউক্লিয়াস কোষপ্রাচীরের কাছাকাছি।	নিউক্লিয়াস কোষের মাঝখানে।

স্থায়ী স্লাইড-এর সাহায্যে মাইটোসিস-এর ধাপসমূহ পর্যবেক্ষণ

শিক্ষক মহোদয় স্থায়ী স্লাইড অণুবীক্ষণ যন্ত্রে স্থাপন করে দেবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে তা পর্যবেক্ষণ করে বৈশিষ্ট্য দেখে মাইটোসিস-এর কোন ধাপ তা শনাক্ত করতে বলবেন।

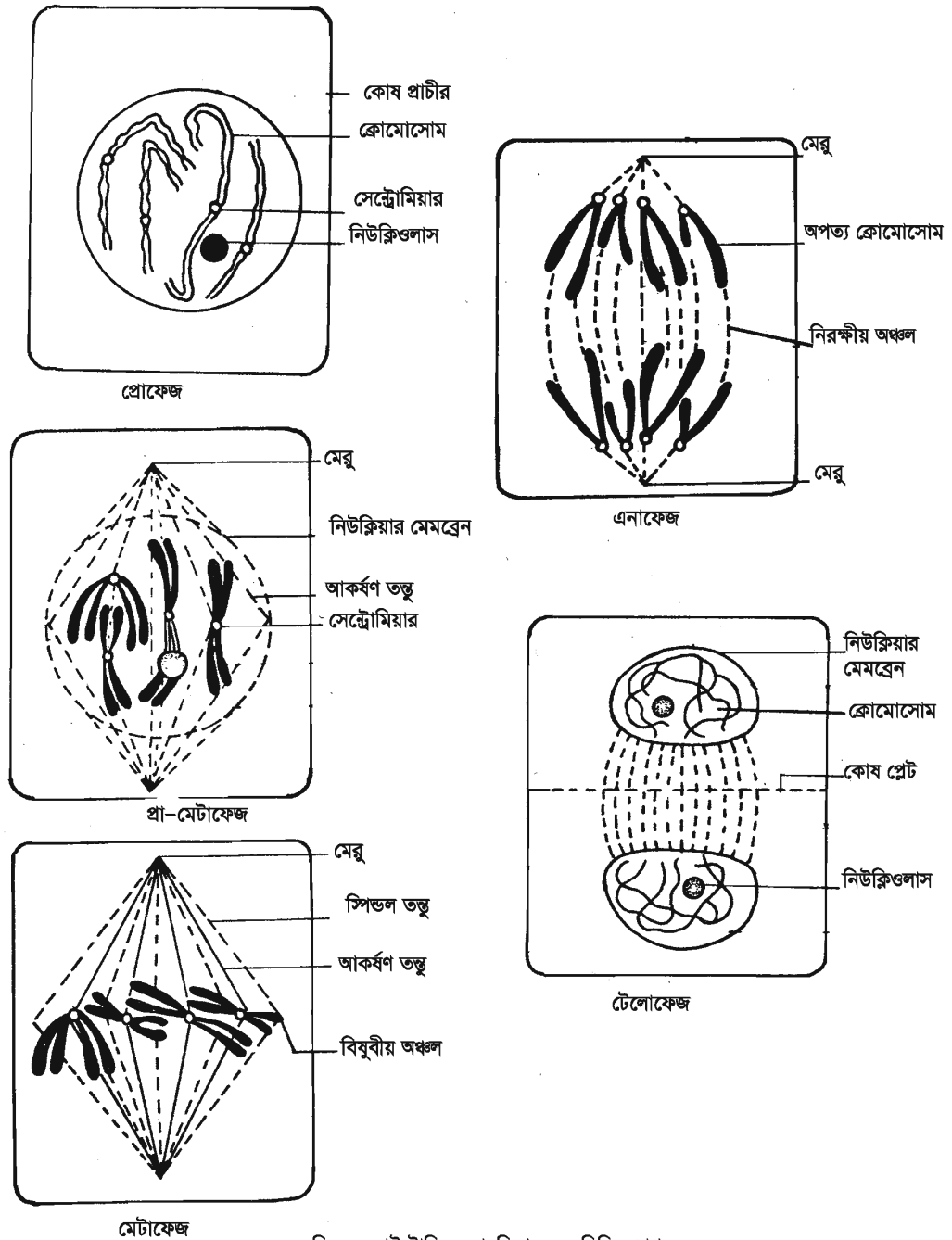
১। **প্রোফেজ :** এ স্লাইড-এ কতকগুলো ক্রোমোসোম দেখা যায়। ক্রোমোসোমগুলো লম্বা এবং বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত। এতে কোন স্পিন্ডল তন্তু দেখা যায় না। কাজেই এটি মাইটোসিস-এর প্রোফেজ পর্যায়।

২। **প্রো-মেটাফেজ :** এ স্লাইড-এ কতকগুলো ক্রোমোসোম দেখা যায়। এতে স্পিন্ডল যন্ত্রও দেখা যায়। ক্রোমোসোমগুলো বিষুবীয় অঞ্চলের দিকে ধাবমান মনে হয়। ক্রোমোসোমগুলো ক্রোমোটাইড-এ বিভক্ত। কাজেই এটি মাইটোসিস-এর প্রোমেটাফেজ পর্যায়।

৩। **মেটাফেজ** : এ স্লাইড-এ কতকগুলো ক্রোমোসোম দেখা যায়। এতে স্পিন্ডল যন্ত্র দেখা যায়। ক্রোমোসোমগুলো বিষুবীয় অঞ্চলে অবস্থিত। ক্রোমোসোমগুলো ক্রোমাটিড-এ বিভক্ত। কাজেই এটি মাইটোসিস-এর মেটাফেজ পর্যায়।

৪। **এনাফেজ** : এ স্লাইড-এ দু প্রস্থ ক্রোমোসোম দেখা যায়। দু প্রস্থ ক্রোমোসোম দু মেরুর কাছাকাছি অবস্থিত। কাজেই এটি মাইটোসিস-এর এনাফেজ পর্যায়।

৫। **টেলোফেজ** : এ স্লাইড-এ দু প্রস্থ ক্রোমোসোম দেখা যায়। দু প্রস্থ ক্রোমোসোম দু মেরুতে অবস্থিত। স্পিন্ডল যন্ত্র দেখা যায় না। দু মেরুতে ক্রোমোসোমকে ঘিরে নিউক্লিয়াসের মেমব্রেন আছে। কাজেই এটি মাইটোসিস-এর টেলোফেজ পর্যায়।



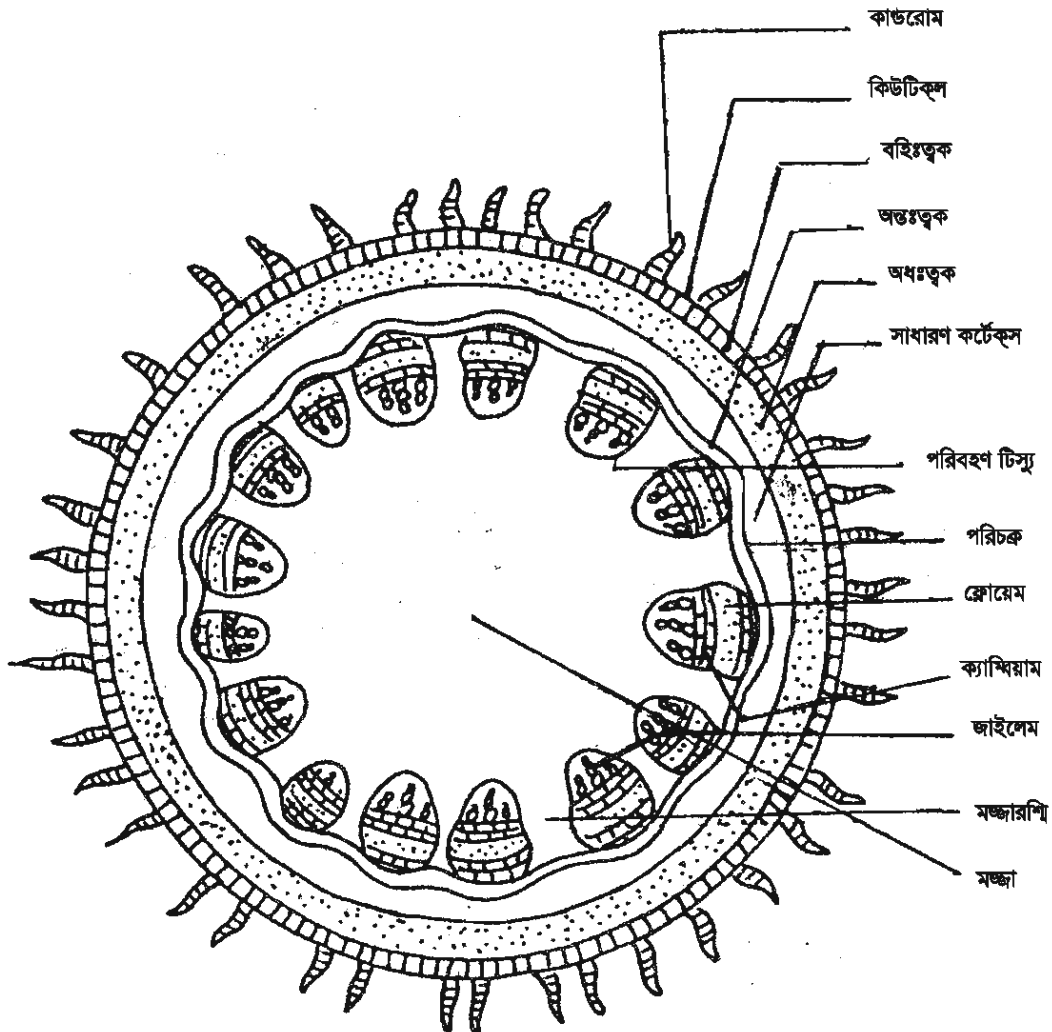
চিত্র ৫: মাইটোসিস কোষবিভাজনের বিভিন্ন ধাপ

দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদকাণ্ডে টিস্যুতন্ত্রের বিন্যাস পর্যবেক্ষণ

[আশপাশ থেকে যে কোন একটি কচি ও সরু দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ কাণ্ড সংগ্রহ করতে হবে। বনসরিষা, মুক্তাবুরি এ ধরনের যে কোন উদ্ভিদ দেখা যায়। ভেড়েচুটা মোটা থাকে। এর প্রস্থচ্ছেদ করা শিক্ষার্থীদের জন্য সম্ভব নাও হতে পারে। তবে মোটা কাণ্ডকে ভাগ করে সেকশন করা এ পর্যায়ে সমীচীন। তাকে কিউটিকল, ভাস্কুলার বাণ্ডল বৃত্তাকারে অবস্থিত, প্রতি বাণ্ডলে জাইলেম ও ফ্লোয়েম আছে এটুকু দেখাতে পারলেই চলবে।]

পরীক্ষার উপকরণ : যে কোন দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কচি কাণ্ড, অণুবীক্ষণ যন্ত্র, ওয়াচ গ্লাস, পানি, ব্লেড, স্যাক্সানিনের লাল রং, তুলি, কাভার স্লিপ ইত্যাদি।

কার্যপদ্ধতি : কচি কাণ্ড বাম হাতে ধরে ডান হাতে ব্লেড দিয়ে অতি পাতলা সেকশন কাটতে হবে। ব্লেডের মাথায় এবং কাণ্ডের মাথায় পানি রাখতে হবে যেন সেকশনের ভিতরে বাতাস না ঢোকে। সেকশনগুলো ওয়াচ গ্লাসের পানিতে রাখতে হবে। এবার একটি স্লাইড-এ এক ফোঁটা পানি নিয়ে ওয়াচ গ্লাস হতে তুলির সাহায্যে একটি সমান পাতলা সেকশন উঠাতে হবে। স্লাইডের পানিতে স্যাক্সানিন-এর সামান্য লাল রং দিতে হবে। এবার সেকশনের উপর একটি কাভার স্লিপ দিয়ে স্লাইডটিকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।



চিত্র ৬: কচি দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদে টিস্যুতন্ত্রের বিন্যাস

পর্যবেক্ষণ : প্রস্বচ্ছেদে কাণ্ডটি মোটামুটি বৃত্তাকার দেখা যাবে। পর্যবেক্ষণে নিম্নলিখিত টিস্যুতন্ত্র দেখা যাবে। সবচেয়ে বাইরে একসারি প্যারেনকাইমা কোষের একটি স্তর পরিলক্ষিত হয়। এটি ত্বকীয় টিস্যুতন্ত্র। এটি বহিঃত্বক। ত্বকের বাইরে কিউটিকল আছে। (কোন কোন ত্বকীয় কোষ হতে এককোষী বা বহুকোষী রোম বের হতে পারে)। বৃত্তাকার সেকশনটির মধ্যের দিকে আর একটি বৃত্তাকার স্তর দেখা যায়। এ স্তর দিয়ে পরিবেষ্টিত অবস্থায় বৃত্তাকারে অবস্থিত কতকগুলো ভাস্কুলার বান্ডল দেখা যায়। প্রতিটি ভাস্কুলার বান্ডলের পরিধির দিকে ফ্লোয়েম টিস্যু, মাঝখানে পাতলা ক্যাম্বিয়াম (সাধারণত বুঝা যায় না) এবং কেন্দ্রের দিকে জাইলেম টিস্যু অবস্থিত। ভাস্কুলার বান্ডলের সমন্বয়ে গঠিত হয় পরিবহণ টিস্যুতন্ত্র। পরিবহণ টিস্যু বলয় এবং বহিঃত্বকের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে বলা হয় কর্টেক্স বা বহির্মজ্জা। কর্টেক্স হল গ্রাউন্ড টিস্যু বা ভিন্ডি টিস্যুতন্ত্র। পরিবহণ টিস্যু দিয়ে পরিবেষ্টিত অবস্থায় যে মজ্জা আছে তাও গ্রাউন্ড টিস্যু।

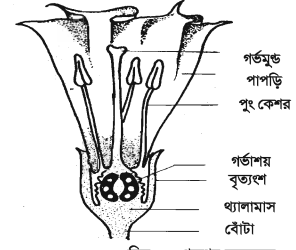
সিদ্ধান্ত : বহিঃত্বকে কিউটিকল আছে, প্রতিটি ভাস্কুলার বান্ডলে জাইলেম ও ফ্লোয়েম টিস্যু আছে। কাজেই প্রস্বচ্ছেদটি একটি কচি কাণ্ডের। ভাস্কুলার বান্ডল একটি বলয়ে বৃত্তাকারে অবস্থিত, জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মাঝখানে ক্যাম্বিয়াম আছে। কাজেই প্রস্বচ্ছেদটি দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ কাণ্ডের।

বিভিন্ন দলের উদ্ভিদের গঠন বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ

Spirogyra, *Agaricus*, মস, ফার্ন, *Cycas* নারিকেল ও পেয়ারা গাছ ভিন্ন ভিন্ন দলের উদ্ভিদ। এদের গঠন বৈশিষ্ট্য একরকম নয়। শিক্ষক মহোদয় শিক্ষার্থীদের এ উদ্ভিদগুলো দেখাবেন। ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষার্থীরা নিচের ছকটি পূরণ করবে। প্রথমটি পূরণ করা আছে।

বৈশিষ্ট্য	<i>Spirogyra</i>	<i>Agaricus</i>	মস	ফার্ন	<i>Cycas</i>	নারিকেল গাছ	পেয়ারা গাছ
১। বর্ণ (সবুজ, সবুজ নয়)	সবুজ						
২। মূল আছে/নেই	নেই						
৩। গুচ্ছ মূল/ প্রধান মূল	–						
৪। কাণ্ড আছে/নেই	নেই						
৫। কাণ্ড শাখান্বিত/শাখাহীন	–						
৬। পাতা আছে/নেই	নেই						
৭। পাতা সরল/ যৌগিক	–						
৮। পাতা সর্বত্র/কাণ্ডের মাথায়	–						
৯। শিরাবিন্যাস সমান্তরাল/জালিকা	–						
১০। ফুল আছে/নেই	নেই						
১১। ফুলে গর্ভাশয় আছে/নেই	–						
১২। ফুল একলিঙ্গ/উভয়লিঙ্গ	–						
১৩। বীজ হয়/হয় না	হয় না						
১৪। ফল হয়/ হয় না	হয় না						

ধুতুরা ফুলের লম্বচ্ছেদ কেটে বিভিন্ন অংশ শনাক্ত করে চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন :
একটি ধুতুরা ফুল নাও। ফুলটিকে লম্বভাবে কাট। এর বিভিন্ন অংশগুলো শনাক্ত কর।
তোমার খাতায় এর একটি চিহ্নিত চিত্র এঁকে শিক্ষককে দেখাও।



চিত্র ৭ : পুষ্পের লম্বচ্ছেদ

বিভিন্ন ধরনের ফুল পর্যবেক্ষণ

তোমার আশপাশ থেকে নমুনা সংগ্রহ করে নমুনা অনুযায়ী ছকটি পূরণ কর।

ক্রমিক সংখ্যা	ফুলের নাম	সম্পূর্ণ	অসম্পূর্ণ	উভলিঙ্গ	একলিঙ্গ	একপ্রতিসম	বহুপ্রতিসম	হাইগোগাইনাস	এপিগাইনাস
১	ধুতুরা	+	-	+	-	-	+	+	-
২	জবা	+	-	+	-	-	+	+	-
৩	কুমড়া	-	+	-	+	+	-	-	+
৪	অপরাজিতা	+	-	+	-	+	-	+	-
৫									
৬									
৭									
৮									
৯									
১০									

বিভিন্ন পরাগী ফুলের বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ

তোমরা তোমাদের আশপাশের পরিবেশ থেকে চার ধরনের পরাগী ফুলের নমুনা সংগ্রহ কর। নিম্নের ছকে এদের বৈশিষ্ট্যগুলো লিপিবদ্ধ কর।

ফুলের ধরন	বর্ণ	সুগন্ধ	মধু	পরাগরেণু	গর্ভমুণ্ড	ফুলের আকার
পানিপরাগী						
বায়ুপরাগী						
প্রাণিপরাগী						
পতঙ্গপরাগী						

ফল ও বীজের বিস্তার পর্যবেক্ষণ

তোমার পরিবেশের উদ্ভিদ পর্যবেক্ষণ করে এদের ফল ও বীজ কীভাবে বিস্তার লাভ করে তা নিচে দেয়া একটি ছকে রেকর্ড/লিপিবদ্ধ কর।

উদ্ভিদের নাম	বায়ু	পানি	প্রাণী	পাখি	স্ফুটন

বিভিন্ন উদ্ভিদের প্রজননের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ

তোমাদের পরিবেশের বিভিন্ন উদ্ভিদ পর্যবেক্ষণ কর। কোন উদ্ভিদ কীসের মাধ্যমে প্রজনন করে নিচের ছকটিতে তা রেকর্ড/লিপিবদ্ধ কর।

উদ্ভিদের নাম	কাণ্ড	মূল	পাতা

বিভিন্ন উদ্ভিদে ফটোপিরিয়ডিজম পর্যবেক্ষণ

তোমার পরিবেশে যেসব গাছপালা আছে, সেগুলো পর্যবেক্ষণ কর। নিচের ছকে এদের নাম লিখে নামের পাশে যথাযথ ঘরে টিক চিহ্ন দাও। খাতায় ছকটি পূরণ করে তোমার শিক্ষককে দেখাও।

উদ্ভিদের নাম	ছোট দিন	নিরপেক্ষ দিন	বড়দিন

কিসমিসের সাহায্যে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার পরীক্ষা

পরীক্ষার উপকরণ : কিসমিস, বাটি, পানি।

কার্যপদ্ধতি : একটি বাটিতে পানি নেই এবং পানিতে একটি কিসমিস রাখি। পর্যবেক্ষণের জন্য একে কিছুক্ষণ রেখে দেই।

পর্যবেক্ষণ : এক ঘণ্টা পর দেখা যাবে কিসমিসটি বাটি থেকে পানি শোষণ করে ফুলে টসটসে হয়েছে।

সিদ্ধান্ত : কিসমিসটি অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি শোষণ করে টসটসে হয়েছে।

ব্যাখ্যা : কিসমিসের বাইরে বাটিতে ছিল কেবল পানি, কিসমিসের কোষ আবরণীতে আছে বৈষম্যভেদ্য ঝিল্লী এবং কোষের ভিতরে আছে অত্যন্ত ঘন মিষ্টি রস (চিনির দ্রবণ)। তাই বাটি থেকে পানি বৈষম্যভেদ্য ঝিল্লী ভেদ করে ভিতরে ঘন দ্রবণে প্রবেশ করেছে, ফলে কিসমিসটি ফুলে টসটসে হয়েছে।

আলুর সাহায্যে কোষ থেকে কোষান্তরে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার পরীক্ষা

পরীক্ষার উপকরণ : একটি বড় আলু, পানি, বাটি, চিনির দ্রবণ, ছুরি।

কার্যপদ্ধতি : বাটির অর্ধেক পরিমাণ পানি নেই। আলুটির খোসা ছাড়িয়ে নেই। পরে দু মাথা কেটে নেই এবং এক মাথায় একটি গর্ত করি। চিনির দ্রবণ দিয়ে গর্তের অর্ধেক পরিমাণ ভর্তি করি এবং আলুটিকে বাটির পানিতে রাখি যেন গর্তটি উপরে থাকে। গর্তে দ্রবণের উচ্চতা মেপে নেই। এ অবস্থায় পরীক্ষণ সেটটিকে রেখে দেই।

পর্যবেক্ষণ : কিছুদিন পর দেখা যাবে আলুর গর্তের ভিতরের দ্রবণের উচ্চতা বেড়েছে।

সিদ্ধান্ত : আলুর চারদিকে ছিল পানি, গর্তে চিনির দ্রবণ। আলুর কোষপ্রাচীর ভেদ্য এবং ঝিল্লী বৈষম্যভেদ্য। বাইর থেকে দ্রাবক (পানি) পর পর অনেকগুলো কোষ পার হয়ে গর্তের ভিতরে অধিক ঘন দ্রবণে প্রবেশ করেছে। সামগ্রিক পরিবেশে বাইরে থেকে পানি গর্তের ভিতরে প্রবেশের প্রক্রিয়াটি হল অসমোসিস। পর পর বেশ কিছু কোষ পার হয়ে পানি গর্তে প্রবেশ করেছে, তাই প্রক্রিয়াটি হল কোষ থেকে কোষান্তরে অভিস্রবণ প্রক্রিয়া।

***Peperomia* উদ্ভিদের সাহায্যে উদ্ভিদ কাণ্ডে ও পাতায় রস আরোহণ প্রক্রিয়া**

পরীক্ষার উপকরণ : মূলসহ একটি তাজা *Peperomia* উদ্ভিদ, টেস্টটিউব, পানি, লাল রং।

কার্যপদ্ধতি : একটি টেস্টটিউবে কিছু পানি নেই এবং এতে সামান্য লাল রং মিশাই। *Peperomia* গাছটিকে এমনভাবে টেস্টটিউবে স্থাপন করি যেন এর মূলগুলো কেবল লাল রং মিশ্রিত পানিতে ডুবে থাকে। এ অবস্থায় পর্যবেক্ষণের জন্য রেখে দেই।

পর্যবেক্ষণ : ঘণ্টাখানেক পর দেখা যাবে লাল রং কাণ্ডের ভিতর দিয়ে ক্রমে পাতা পর্যন্ত পৌঁছেছে। (*Peperomia* উদ্ভিদের কাণ্ড স্বচ্ছ, তাই এর ভিতর দিয়ে রসের প্রবাহ দেখা যায়।)

বেলজারের সাহায্যে পাতার প্রস্বেদন প্রক্রিয়ার পরীক্ষা

পরীক্ষার উপকরণ : টবে লাগানো একটি পাতাবহুল ছোট গাছ, একটি বেলজার, মোম, পলিথিন।

কার্যপদ্ধতি : পলিথিন দিয়ে টবটিকে আবৃত করতে হবে যাতে করে টবের মাটি থেকে কোন জলীয় বাষ্প বের হয়ে বাইরে আসতে না পারে। এরপর টবটিকে একটি টেবিলে রেখে একটি বেলজার দিয়ে গাছসহ ঢেকে দিতে হবে। বাইরে থেকে যেন কোন জলীয়বাষ্প ভিতরে ঢুকতে না পারে তার জন্য বেলজার ও টেবিলের মধ্যবর্তী ফাঁকে মোম গলিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। এ অবস্থায় পরীক্ষণ সেটটিকে রেখে দিতে হবে।

পর্যবেক্ষণ : কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে বেলজারের গায়ে বিন্দু বিন্দু পানির কণা জমা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত : বাইরে থেকে বা টবের মাটি থেকে বেলজারের ভিতরে জলীয়বাষ্প প্রবেশের কোন সুযোগ ছিল না। কাজেই জলীয়বাষ্প বের হয়েছে পাতা হতে প্রস্বেদন ক্রিয়ার ফলে এবং জলীয়বাষ্প বেলজারের শীতল গায়ে লেগে পানি কণায় পরিণত হয়েছে।

বেলজার না থাকলে স্বচ্ছ পলিনের ব্যাগ দিয়ে উদ্ভিদের কিছু ছোট ডাল পাতাসহ বেঁধে রাখলে প্রস্বেদনের ফলে ব্যাগের ভিতরে বিন্দু বিন্দু পানি জমা হবে। এভাবেও পরীক্ষণটি দেখান যেতে পারে।

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন নির্গমনের পরীক্ষা

পরীক্ষার উপকরণ : একটি কাচের বীকার, *Hydrilla* উদ্ভিদ, একটি ফানেল, একটি টেস্টটিউব, পানি, শিখাহীন জ্বলন্ত কাঠি।

কার্যপদ্ধতি : *Hydrilla* নামক জলজ উদ্ভিদকে বীকারে রেখে একটি ফানেল দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। *Hydrilla* উদ্ভিদকে এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যেন এর কাটা কাণ্ড ফানেলের নলের দিকে থাকে। এবার বীকারে এমন পরিমাণ পানি ঢালতে হবে যাতে করে ফানেলের নলটি পানিতে ডুবে থাকে। এবার একটি টেস্টটিউব সম্পূর্ণ পানি ভর্তি করে ফানেলের নলের উপর উপুড় করে রাখতে হবে। এ অবস্থায় পরীক্ষণ সেটটিকে সূর্যালোকে (অথবা পরীক্ষাগারে বৈদ্যুতিক বাত্ব জ্বালিয়ে) রাখতে হবে।

পর্যবেক্ষণ : কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে *Hydrilla* উদ্ভিদ হতে বুদবুদ আকারে গ্যাস বের হচ্ছে এবং টেস্টটিউবে জমা হচ্ছে। কিছু গ্যাস জমা হলে টেস্টটিউবটি সাবধানের সাথে উঠিয়ে আনতে হবে এবং একটি শিখাহীন জ্বলন্ত কাঠি টিউবটি সোজা করে তার মাথায় ধরতে হবে। দেখা যাবে কাঠিটি দপ করে জ্বলে উঠেছে।

সিদ্ধান্ত : যেহেতু গ্যাসটি শিখাহীন কাঠিটিকে জ্বলতে সাহায্য করেছে সেহেতু গ্যাসটি অক্সিজেন, কারণ অক্সিজেন নিজে জ্বলে না, অন্যকে জ্বলতে সাহায্য করে।

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় আলোর প্রয়োজনীয়তার পরীক্ষা

পরীক্ষার উপকরণ : টবে লাগানো সবুজ পাতা বিশিষ্ট একটি গাছ, কালো কাগজ, এলকোহল, আয়োডিন দ্রবণ, ক্লিপ। পরীক্ষার আগে গাছটিকে অনেচ্ছপ অন্ধকারে রাখতে হবে।

কার্যপদ্ধতি : একটি পাতার একাংশের উভয় দিক কালো কাগজ দিয়ে আবৃত করে ক্লিপ দিয়ে আটকিয়ে দেই যেন ঐ অংশে সূর্যালোক প্রবেশ করতে না পারে। এর পর গাছসহ টবটিকে সূর্যালোকে রেখে দেই। এক ঘণ্টা পর পাতাটিকে ছিঁড়ে এনে এলকোহলে সিদ্ধ করতে হবে যাতে করে ক্লোরোফিল মুক্ত হয়। এবার সিদ্ধ পাতাটিকে আয়োডিন দ্রবণে ডুবাতে হবে।

পর্যবেক্ষণ : আয়োডিন দ্রবণ থেকে উঠিয়ে আনলে দেখা যাবে কালো কাগজ দিয়ে আবৃত অংশ ছাড়া বাকি সবটুকু অংশই নীল (গাঢ় বেগুনি বা কালো) বর্ণের হয়েছে।

সিদ্ধান্ত : শ্বেতসার ও আয়োডিন দ্রবণ বিক্রিয়া করে শ্বেতসার নীল (গাঢ় বেগুনি বা কালো) বর্ণের হয়। কালো কাগজ দিয়ে আবৃত অংশে সূর্যালোক পৌছাতে পারেনি, তাই ঐ অংশে সালোকসংশ্লেষণ হয়নি, অর্থাৎ শ্বেতসার প্রস্তুত হয়নি। শ্বেতসার প্রস্তুত হয়নি বলে ঐ অংশ আয়োডিন দ্রবণে বিক্রিয়া করে নীল (গাঢ় বেগুনি বা কালো) হয়নি। এতে প্রমাণিত হয় সালোকসংশ্লেষণ তথা শ্বেতসার প্রস্তুতের জন্য সূর্যালোক অপরিহার্য।

সবাত শ্বসন প্রক্রিয়ায় তাপের উৎপত্তি পরীক্ষা

উপকরণ : একটি থার্মোফ্লাস্ক, কিছু অজ্জুরিত ছোলাবীজ, থার্মোমিটার।

কার্যপদ্ধতি : থার্মোফ্লাস্কে কিছু অজ্জুরিত ছোলা বীজ রেখে ছিপি দিয়ে এর মুখ ভালভাবে বন্ধ করি। এবার ছিপির মধ্য দিয়ে একটি থার্মোমিটার প্রবেশ করাই যেন এর বায়ুটি ছোলা বীজগুলোর মাঝে থাকে। থার্মোমিটারে পারদের রিডিং লিখে রাখি।

পর্যবেক্ষণ : কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে থার্মোমিটারে পারদ কিছুটা উপরে উঠেছে।

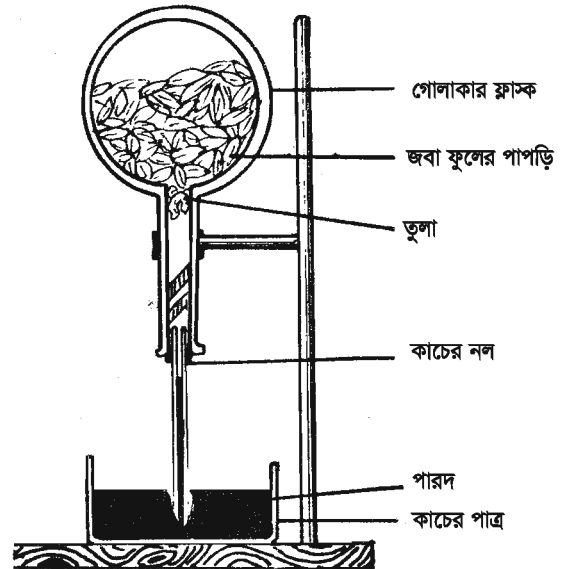
সিদ্ধান্ত : পারদ উপরে ওঠা অর্থই হল তাপ বেড়ে যাওয়া এবং এ তাপ অজ্জুরিত ছোলাবীজের শ্বসনের ফলেই হয়েছে।

শ্বসন প্রক্রিয়ায় CO₂ নির্গত হওয়ার পরীক্ষা

পরীক্ষার উপকরণ : গোলতলি ফ্লাস্ক, কাচনল, ফুলের পাপড়ি, পারদ, বীকার, কস্টিক পটাশ, চিমটা, তুলা।

কার্যপদ্ধতি : বেশ কিছু তাজা ফুলের পাপড়ি গোলতলি ফ্লাস্কে রাখি। ফ্লাস্কের নলের ভিতরে দু টুকরা কস্টিক পটাশ ঢুকিয়ে দেই এবং পরে কিছু তুলা প্রবেশ করাই। বীকারে কিছু পরিমাণ পারদ নেই এবং তাতে কাচনলটি স্থাপন করি। কাচনলটি গোলতলি ফ্লাস্কের নলের সাথে যুক্ত করে ফাঁক মোম দিয়ে বন্ধ করে দেই। নল ও ফ্লাস্ক স্ট্যান্ডের সাথে আটকিয়ে দেই। এ অবস্থায় পর্যবেক্ষণের জন্য রেখে দেই।

পর্যবেক্ষণ : সরু নল দিয়ে পারদকে কিছুটা উপরে উঠতে দেখা যাবে।



চিত্র ৮: শ্বসন -এ CO₂ নির্গত হওয়ার পরীক্ষা

সিদ্ধান্ত : গোলতলি ফ্লাস্কের ভিতরের অক্সিজেন গ্রহণ করে পাপড়িগুলো শ্বসন কাজ চালিয়েছে এবং এ সময় একটি গ্যাস ত্যাগ করেছে। ত্যাগ করা গ্যাস কস্টিক পটাশ শোষণ করে নিয়েছে। ফলে নলে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে এবং বায়ুমণ্ডলের চাপে তাই বীকারের পারদ কাচনল দিয়ে উপরে উঠেছে। যেহেতু ত্যাগ করা গ্যাসটি কস্টিক পটাশ শোষণ করেছে, সেহেতু গ্যাসটি CO_2 ।

টবে লাগান গাছের সাহায্যে উদ্ভিদের ফটোট্রপিজম পরীক্ষা

পরীক্ষার উপকরণ : টবে লাগানো একটি চারা গাছ। বড় ছিদ্রযুক্ত একটি বাস্ক।

কার্যপদ্ধতি : চারাসহ টবটিকে বাস্কের ভিতর রাখি। বাস্কটিকে এমন জায়গায় রাখি যেন ছিদ্রপথে সূর্যের আলো ঢুকতে পারে।

পর্যবেক্ষণ : এক সপ্তাহ পর দেখা যাবে গাছের কাণ্ড আলোর উৎসের দিকে বাঁকা হয়ে গেছে।

সিদ্ধান্ত : কাণ্ডের গমন আলোর দিকে হয়। আলোর দিকে কাণ্ডের গমনকে (তথা বৃদ্ধিকে) ফটোট্রপিজম বলে।

ভূদিকমুখিতার পরীক্ষা

পরীক্ষার উপকরণ : অঙ্কুরিত ছোলা বীজ, একটি চালনি।

কার্যপদ্ধতি : অঙ্কুরিত ছোলা বীজগুলোকে একটি চালনিতে রাখি এবং চালনিটিকে মাটির একটু উপরে টানিয়ে রাখি। এভাবে ২/৩ দিন রেখে দেই। [সময় সময় বীজে পানি দিতে হবে, যাতে বীজ প্রয়োজনীয় পানি পায়।]

পর্যবেক্ষণ : ২/৩ দিন পর দেখা যাবে অঙ্কুরিত বীজের মূল চালনির ফাঁক দিয়ে মাটির দিকে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সিদ্ধান্ত : উদ্ভিদের মূলের চলন ভূঅভিমুখী।

পানি দিকমুখিতার পরীক্ষা

উপকরণ : অঙ্কুরিত ছোলাবীজ, কাঠের গুঁড়ো (sawdust) দিয়ে ভর্তি করি এবং এর তলার দিকে চারটি অঙ্কুরিত ছোলা বীজ স্থাপন করি। পানি দিয়ে কাঠের গুঁড়োকে সিক্ত রাখি। চালনির দু দিকে ঠেস দিয়ে পরীক্ষণ সেটটিকে মাটি থেকে কিছুটা উপরে রাখি।

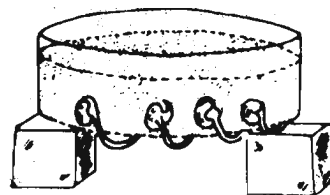
পর্যবেক্ষণ : একদিন পর দেখা যাবে বীজের মূল চালনির ফাঁক দিয়ে বের হয়ে এসেছে। (ভূদিকমুখিতার কারণে) কিন্তু আবার বেকে চালনিতে প্রবেশ করেছে।

সিদ্ধান্ত : চালনির গুঁড়ো পানিতে সিক্ত থাকায় চারা গাছের মূল পানি দিকমুখিতার কারণে পুনরায় চালনির ছিদ্র পথে সিক্ত গুঁড়োতে প্রবেশ করেছে।

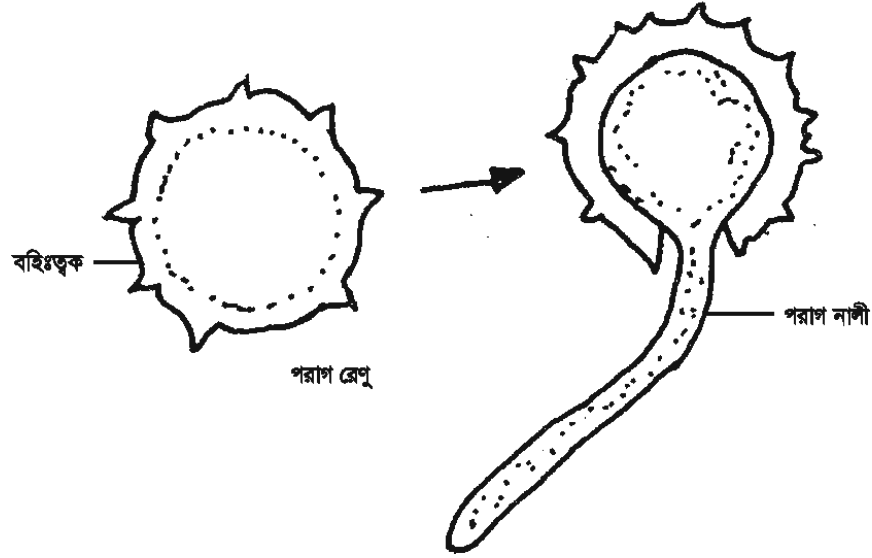
পরাগ থেকে পরাগ নালীর অঙ্কুরোদগম পরীক্ষা

পরীক্ষার উপকরণ : সুকরোজ (চিনি), সোডিয়াম বোরোট দ্রবণ, স্লাইড, অণুবীক্ষণ যন্ত্র, তাজা পরাগরেণু, পেট্রিডিস।

কার্যপদ্ধতি : একটি ছোট পেট্রিডিস-এ সামান্য পরিমাণ (১০-১৫ ভাগ) সুকরোজ দ্রবণ নেই এবং এর সাথে ০.০১ ভাগ সোডিয়াম বোরোট দ্রবণ মিশাই। এ মিশ্রিত দ্রবণে বেশ কিছু পরিমাণ পরাগরেণু ছিটিয়ে দেই। এ অবস্থায় একদিন রেখে দেই।



চিত্র ৯: পানি দিকমুখিতার পরীক্ষা



চিত্র ১০: পরাগ থেকে পরাগনালীর অঙ্কুরোদগম পরীক্ষা

পর্যবেক্ষণ : একদিন পর পেট্রিডিসটিকে সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে রেখে পর্যবেক্ষণ করি। দেখা যাবে বেশ কিছু পরাগরেণু অঙ্কুরিত হয়ে পরাগনালিকা সৃষ্টি করেছে।

[সকাল ১০টায় গিমা শাকের পরাগরেণু সংগ্রহ করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখলে এমনিতেই অঙ্কুরিত পরাগ দেখা যাবে। ১০-২০ ভাগ চিনির দ্রবণেই অধিকাংশ পরাগরেণু অঙ্কুরিত হয়। কাজেই সোডিয়াম বোরেট দ্রবণ না হলেও এ পরীক্ষাটি করা যাবে। পরাগধানী যখন ফেটে যায় তার কয়েক ঘণ্টা পর পরাগ সংগ্রহ করলে অনেক ক্ষেত্রেই অঙ্কুরিত পরাগরেণু দেখা যায়।]

ব্যবহারিক

(প্রাণিবিজ্ঞান)

(ক) কেঁচো (Earthworm)

কেঁচোর শ্রেণীবিন্যাস

Kingdom (জগৎ)	: Animalia
Phylum (পর্ব)	: Annelida
Class (শ্রেণী)	: Oligochaeta
Order (বর্গ)	: Neo-oligochaeta
Family (গোত্র)	: Megascolecidae
Genus (গণ)	: <i>Metaphire</i> (<i>Pheretima</i>)
Species (প্রজাতি)	: <i>Metaphire posthuma</i>

কেঁচো Annelida পর্বের অন্তর্ভুক্ত প্রাণী। কেঁচো মাটিতে বাস করে।

বাহ্যিক গঠন

১। কেঁচোর দেহ নলাকার এবং দু প্রান্ত সরু।

২। এর দেহের রং মাটির মত। পিঠের দিকের রং গাঢ় এবং পেটের দিকের রং হালকা। পিঠে একটি সরু, লম্বা ও কালো দাগ আছে।

৩। কেঁচোর দেহ প্রকৃত খন্ডায়িত অর্থাৎ ভিতরে ও বাইরে খন্ডায়িত। একটি কেঁচো প্রায় ১০০ খন্ডাংশ বিশিষ্ট হয়।

৪। এদের সম্মুখ প্রান্তে মুখছিদ্র এবং পশ্চাৎ প্রান্তে পায়ুছিদ্র অবস্থিত।

৫। সম্মুখ প্রান্তের কাছে ১৪, ১৫ এবং ১৬ খন্ডাংশকে ঘিরে ক্লাইটেলাম নামে একটি মাংসল ফিতার মত আবরণ থাকে।

৬। কেঁচোর দেহত্বকে সিটা নামক কাঁটার মত অঙ্গ থাকে।

৭। কেঁচোর অঙ্গকীয় দিকে একটি স্ত্রী জনন ছিদ্র এবং একজোড়া পুরুষ জনন ছিদ্র থাকে।

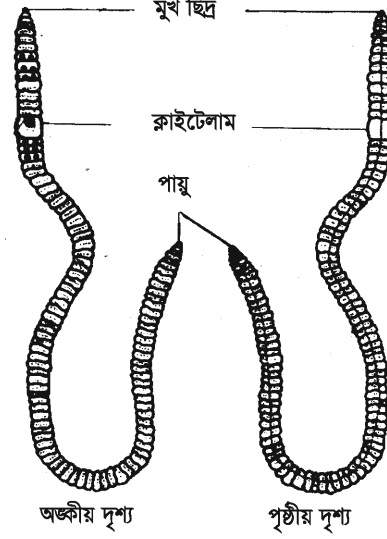
পরিপাক তন্ত্র (Digestive system)

ব্যবচ্ছেদকরণ

সকল অমেরুদণ্ডী প্রাণীকে পিঠের দিক দিয়ে ব্যবচ্ছেদ করতে হয়। কেঁচো অমেরুদণ্ডী প্রাণী। তাই কেঁচোকে পিঠের দিক দিয়ে ব্যবচ্ছেদ করতে হবে। কেঁচোর ভিতর সম্মুখপ্রান্ত থেকে পশ্চাৎ প্রান্ত পর্যন্ত পৌষ্টিকনালী বিস্তৃত থাকে। পৌষ্টিকনালী সাতটি অংশে বিভক্ত। যথা :

১। মুখছিদ্র ও মুখগহ্বর (Mouth & buccal cavity) : সম্মুখে ১ম খন্ডাংশের মধ্যস্থলে মুখছিদ্র থাকে। এর মাধ্যমে খাদ্য মুখগহ্বরে প্রবেশ করে। মুখছিদ্রের পিছনে মুখগহ্বর অবস্থিত। এটি একটি প্রশস্ত গহ্বর।

২। গলবিল (Pharynx) : মুখগহ্বরের পিছনে গোলাকার পেশিবহুল গলবিল থাকে। গলবিলে খাদ্য পিষ্ট হয়।



চিত্র : কেঁচোর বাহ্যিক গঠন

৩। **অন্নালী বা গলনালী (Oesophagus)** : এটি গলবিলের পরবর্তী নলাকার অংশ। এর মাধ্যমে খাদ্য গিজার্ভে যায়।

৪। **গিজার্ভ (Gizzard)** : অন্নালীর পিছনে গিজার্ভ অবস্থিত। এ অংশটি পেশিবহুল।

৫। **পাকস্থলি বা প্রাকঅন্ত্র (Stomach or preintestine)** : গিজার্ভ এর পিছনে পাকস্থলি বা প্রাকঅন্ত্র অবস্থিত। এটি নলাকার। পাকস্থলিতে খাদ্য পরিপাক হয়।

৬। **অন্ত্র (Intestine)** : পাকস্থলির পিছনে অন্ত্র অবস্থিত। অন্ত্র নলাকার এবং সর্বাপেক্ষা লম্বা অংশ। অন্ত্রে খাদ্য পরিপাক হয় এবং পরিপাককৃত খাদ্য শোষিত হয়।

৭। **মলাশয় (Rectum)** : পৌষ্টিকনালীর শেষে প্রায় ২৫টি খণ্ডাংশ নিয়ে নলাকার মলাশয় গঠিত। মলাশয়ে মল জমা থাকে। মলাশয়ের পশ্চাৎ প্রান্তে পায়ুছিদ্র থাকে।

ব্যবচ্ছেদ প্রণালি

১। কেঁচোকে ব্যবচ্ছেদ ট্রেতে রেখে দু প্রান্ত পিন দিয়ে আটকে দিতে হবে। পিঠের দিক উপরে রাখতে হবে।

২। কেঁচোর পিঠের কালো সূতার মত দাগ বরাবর ব্লেন্ড বা কাঁচি দিয়ে সোজা করে কাটতে হবে।

৩। পিঠের দিক থেকে দেহ প্রাচীর সরালে ভিতরে নলের মত লম্বা পৌষ্টিকনালী দেখা যাবে।

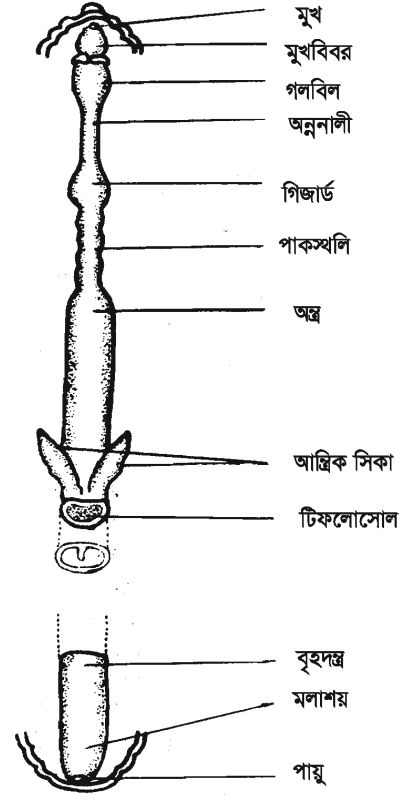
৪। এখন পৌষ্টিকনালীর বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণ কর।

(খ) চিংড়ি (Prawn)

চিংড়ি Arthropoda পর্বের Crustacea শ্রেণীর প্রাণী। চিংড়ি একটি পুষ্টিকর ও সুস্বাদু খাদ্য হিসেবে পরিচিত ও সমাদৃত। বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক এবং স্বাদু পানির চিংড়ি আছে। গলদা চিংড়ি এক প্রজাতির স্বাদু পানির চিংড়ি। সকল প্রজাতির বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ গঠনে বেশ মিল আছে। বাগদা এক ধরনের সামুদ্রিক চিংড়ি।

চিংড়ির শ্রেণীবিন্যাস

Kingdom (জগৎ)	: Animalia
Phylum (পর্ব)	: Arthropoda
Class (শ্রেণী)	: Crustacea
Order (বর্গ)	: Decapoda
Family (গোত্র)	: Palaemonidae
Genus (গণ)	: Macrobrachium
Species (প্রজাতি)	: <i>M. rosenbergii</i>



চিত্র : কেঁচোর পরিপাকঅন্ত্র

গলদা চিংড়ির বাহ্যিক গঠন

১। চিংড়ির সারা দেহ কাইটিন সমৃদ্ধ দৃঢ় বহিরাবরণ বা বহিঃকঙ্কাল দিয়ে আবৃত। বহিঃআবরণ বা খোলসটি অনেকগুলো খন্ডাংশে বিভক্ত। খোলসে দাগ বা ফোটা থাকে।

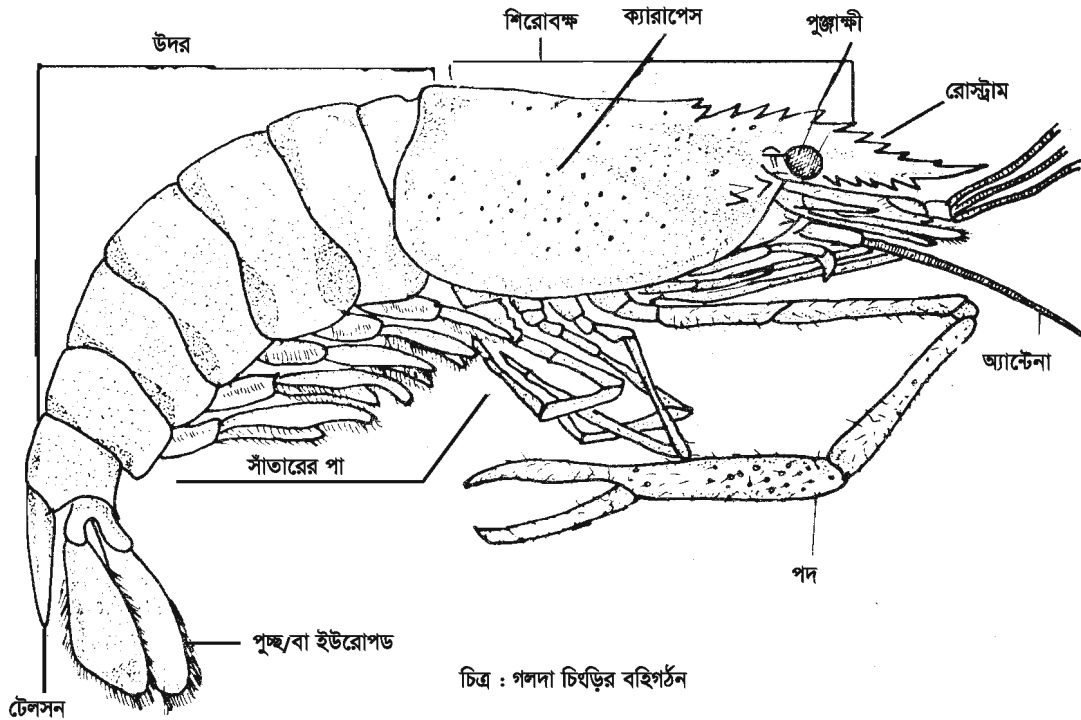
২। চিংড়ির দেহ লম্বাটে, দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম ও কিছুটা মাকু আকৃতির হয়।

৩। চিংড়ির দেহ প্রধান দুটি অংশে বিভক্ত। যথা শিরোবক্ষ : (Cephalothorax) ও (খ) উদর (Abdomen)।

(ক) শিরোবক্ষ : শিরোবক্ষ আবার দুইটি অংশে বিভক্ত যথা :

(i) মস্তক বা শির (Head): মস্তক শিরোবক্ষের সামনের অংশ। মস্তকে পাঁচ জোড়া সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গ আছে। এগুলো হচ্ছে যথাক্রমে (ক) এ্যান্টেনিউল, (খ) এ্যান্টেনা, (গ) ম্যান্ডিবল (ঘ) ম্যাক্সিলিউলা এবং (ঙ) ম্যাক্সিলা।

(ii) বক্ষ (Thorax) : মস্তকের ঠিক পিছনে বক্ষ অবস্থিত। মস্তক ও বক্ষ মিলিত হয়ে শিরোবক্ষ গঠিত হয়েছে। বক্ষে মোট আট জোড়া উপাঙ্গ আছে। বক্ষ অঞ্চলের প্রথম তিন জোড়া পা ম্যাক্সিলার মত, এদের ম্যাক্সিলিপেড বলে। শেষে পাঁচ জোড়া উপাঙ্গ হাঁটার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই পাগুলো নলাকার, লম্বা ও সন্ধিযুক্ত। ১ম ও ২য় চলার পা সাঁড়াশি যুক্ত। শিরোবক্ষ ক্যারাপেস নামক শক্ত আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে। ক্যারাপেসের সামনের প্রান্তে এক জোড়া কালো, গোলাকার সবৃত্তক পুঞ্জাক্ষী থাকে। পুঞ্জাক্ষী দুটির মধ্যবর্তী স্থানে একটি পার্শ্বীয়ভাবে চ্যাপ্টা এবং করাতের মত ঝাঁজ কাটা রোস্ট্রাম থাকে।



চিত্র : গলদা চিংড়ির বহির্গঠন

(খ) উদর (Abdomen) : শিরোবক্ষের পিছনের লম্বা অংশটি উদর। উদরের পৃষ্ঠীয় দিক গোলাকার এবং পার্শ্বীয় দিক কিছুটা চ্যাপ্টা। উদর ছয়টি খন্ডাংশ নিয়ে গঠিত।

উদরের প্রতি খন্ডাংশে একজোড়া করে মোট ছয় জোড়া সাঁতার কাটার উপাঙ্গ আছে। এগুলোকে প্লিওপড বা সন্তরনী বলে। প্রথম পাঁচ জোড়া পা একই রকম। পাগুলো সন্ধিযুক্ত।

ইউরোপড (Uropod) : ষষ্ঠ বা শেষ উদরীয় উপাঙ্গকে ইউরোপড বা পুচ্ছপদ বলে। এগুলো বেশ বড় ও দাঁড়ের মত। উদরের শেষ প্রান্তে অবস্থিত কাঁটার মত ক্রমশ সরু হয়ে যাওয়া অংশকে টেলসন বলে।

চিথড়ির পরিপাকতন্ত্রের ব্যবচ্ছেদ

চিথড়ি অমেরুদণ্ডী প্রাণী। এইজন্য চিথড়িকে পিঠের দিক দিয়ে ব্যবচ্ছেদ করতে হবে।

চিথড়ির পরিপাকতন্ত্র দুটি অংশ নিয়ে গঠিত। যথা : (ক) পৌষ্টিকনালী ও (খ) পুষ্টি গ্রন্থি।

(ক) অগ্র পৌষ্টিকনালীর তিনটি অংশ। যথা :

১। অগ্র পৌষ্টিকনালী ২। মধ্য পৌষ্টিকনালী

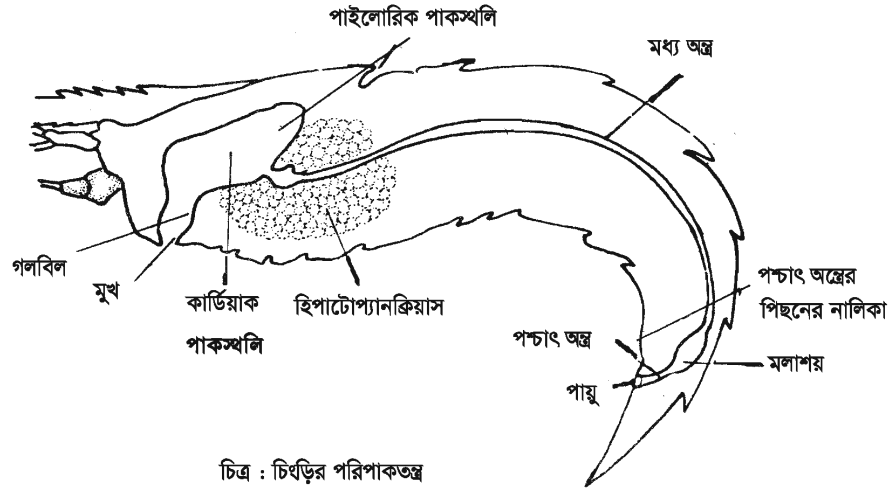
৩। পশ্চাৎ পৌষ্টিকনালী

১। অগ্র পৌষ্টিকনালী : অগ্র পৌষ্টিকনালী আবার চারটি অংশ নিয়ে গঠিত। যথা :

(i) মুখছিদ্র : এটি একটি বৃহদাকার ছিদ্র। মাথার অভ্যন্তরীণ দিকে তৃতীয় ও চতুর্থ মস্তক খণ্ডাংশের সংযোগস্থলে মুখছিদ্র অবস্থিত। এই ছিদ্রের মাধ্যমে মুখগহ্বর প্রবেশ করে।

(ii) মুখগহ্বর : মুখছিদ্রের পিছনে একটি খাটো গহ্বর। এখানে খাদ্য পিষ্ট হয়।

(ii) গলনালী বা অনুনালী : মুখছিদ্রের পিছনে একটি খাটো এবং প্রশস্ত গলনালী আছে। এ নালীর মাধ্যমে খাদ্য মুখগহ্বরের হতে পাকস্থলিতে যায়।



চিত্র : চিথড়ির পরিপাকতন্ত্র

(iv) পাকস্থলি : পাকস্থলি একটি বৃহদাকার থলির মত অঙ্গ। এটি গলনালীর পিছনে অবস্থিত। পাকস্থলির সামনের থলিকার মত অংশকে কার্ডিয়াক পাকস্থলি এবং পিছনের ক্ষুদ্রাকার অংশকে পাইলোরিক পাকস্থলি বলে। পাকস্থলিতে খাদ্য পরিপাক হয়।

২। মধ্য পৌষ্টিকনালী বা মধ্যঅন্ত্র : এটি সোজা, লম্বা, সরু ও নালীর মত অংশ। পাকস্থলির অংশ। এটি পৃষ্ঠীয় মধ্যরেখা বরাবর পিছন দিকে অগ্রসর হয়ে ৬ষ্ঠ উদরীয় খণ্ডাংশ পর্যন্ত যায়।

কাজ : মধ্য অন্ত্রে পরিপাককৃত খাদ্য শোষিত হয় এবং অপরিপাককৃত খাদ্য মলাশয়ে গিয়ে জমা থাকে।

(গ) পশ্চাৎ পৌষ্টিকনালী বা পশ্চাৎ অন্ত্র : এটি মধ্য অন্ত্রের পিছন থেকে পায়ু ছিদ্র পর্যন্ত একটি খাটো নালী। এই নালীর দুইটি অংশ। যথা:

(i) রেকটাম বা মলাশয় : পশ্চাৎ পৌষ্টিকনালীর সামনের ছোট থলিকার মত অংশের নাম মলাশয় বা রেকটাম।

(ii) পিছনের সরু নালিকা অংশ : এটি মলাশয়ের পিছনে অবস্থিত। এ অংশের শেষ প্রান্তে পায়ু ছিদ্র থাকে। এই নালীতে অপাচ্য বর্জ্য পদার্থ জমা হয়। পায়ু ছিদ্র পথে মল বাইরে নিষ্কাশিত হয়।

৩। **পুষ্টি গ্রন্থি** : চিথড়ির পুষ্টি গ্রন্থির নাম হেপাটোপ্যানক্রিয়াস। এটি কমলা রঙের এবং শিরোবক্ষ গহ্বরের অনেকখানি অঞ্চলজুড়ে অবস্থিত। বৃহদাকার গ্রন্থি পাকস্থলির নিচে এবং দু পাশ ঘিরে অবস্থিত। এই গ্রন্থি একাধারে উচ্চস্তরের প্রাণীদের যকৃৎ, অগ্ন্যাশয় এবং ক্ষুদ্রান্ত্রের মত কাজ করে। এ গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত উৎসেচক পরিপাকে অংশ নেয়।

ব্যবচ্ছেদ প্রণালি

প্রথমে চিথড়িকে হাতে নিয়ে পিঠের মধ্যরেখা বরাবর পিছন থেকে সামনের দিকে লম্বালম্বিতাবে কাঁচি দিয়ে খোসা কেটে ফেলতে হবে। এরপর সাবধানে পরিপাকতন্ত্র পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

(গ) ঘাস ফড়িং (Grass hopper):

ঘাস ফড়িং একটি পরিচিত অমেদুদণ্ডী প্রাণী। এটি (Arthropoda) বা সন্ধিপদী পর্বের Insecta বা পতঙ্গ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত প্রাণী। ঘাস ফড়িং-এর বৈশিষ্ট্যাবলি Insecta শ্রেণীর সাধারণ প্রতিনিধিদের মতই। এদেরকে সারা পৃথিবীতে পাওয়া যায়। এরা ঘাস এবং ছোট গাছের ফাঁকে ফাঁকে থাকে এবং ঘাস ও গাছের পাতা খায়। কোন কোন অঞ্চলে এরা দলবদ্ধ হয়ে পঙ্গপাল (Locust) দশা (phase) প্রাপ্ত হয়।

ঘাস ফড়িং-এর শ্রেণীবিন্যাস

Kingdom (জগৎ)	: Animalia
Phylum (পর্ব)	: Arthropoda
Class (শ্রেণী)	: Insecta
Order (বর্গ)	: Orthoptera
Family (গোত্র)	: Locustidae
Genus (গণ)	: <i>Schistocera</i>
Species (প্রজাতি)	: <i>S. gregaria</i>

বাহ্যিক গঠন

১। ঘাস ফড়িং-এর দেহটা সরু, লম্বাটে, নলাকৃতি এবং কিছুটা পার্শ্বীয়ভাবে চ্যাপ্টা। এরা প্রায় ৮ সেমি লম্বা।

২। এদের গায়ের রং হলদে বাদামি। ফলে এরা প্রকৃতিতে আত্মগোপন করে থাকতে পারে।

৩। সম্পূর্ণ দেহ শক্ত কিউটিকল বা ত্বক দ্বারা আবৃত। কিউটিকল অনেকগুলো নির্দিষ্ট খণ্ডাংশে বিভক্ত।

৪। ঘাস ফড়িং-এর দেহ মস্তক, বক্ষ ও উদর এই তিন অংশে বিভক্ত।

(ক) **মস্তক (Head)** : মস্তক বড় এবং কিছুটা ত্রিকোণাকার। মস্তকে একজোড়া বৃহদাকার পূঞ্জাক্ষী ও একজোড়া অ্যান্টেনা আছে। মস্তকের সম্মুখ প্রান্তে মুখছিদ্র থাকে। মুখছিদ্রকে ঘিরে কতগুলো মুখোপাঙ্গ থাকে।

(খ) **বক্ষ (Thorax)** : বক্ষে তিন জোড়া সন্ধিযুক্ত পা এবং বক্ষের পৃষ্ঠীয় দিকে দু জোড়া লম্বাটে পাখনা আছে। সামনের পাখনা দুটি কিছুটা পুরু এবং পিছনের পাখনা দুটি চওড়া পাতলা পর্দার মত।

(গ) **উদর (Abdomen)** : ঘাস ফড়িং-এর উদর লম্বাটে এবং পিছনের দিকে ক্রমশ সরু। উদরের পশ্চাৎ প্রান্তে একজোড়া উপবৃন্দ আছে। এদের পায়ু সাঁড়সি (anal cerci) বলে। উদরের দু পাশে মোটা আট জোড়া শ্বাসছিদ্র আছে।

ঘাস ফড়িং-এর পরিপাকতন্ত্র (Digestive system of Grass hopper)

ব্যবচ্ছেদকরণ

ঘাস ফড়িং একটি অমেদুদন্তী প্রাণী। এজন্য এদের পিঠের দিকে ব্যবচ্ছেদ করতে হবে। ঘাস ফড়িং-এর পরিপাকতন্ত্র পৌষ্টিকনালী এবং লালগ্রন্থি নিয়ে গঠিত। পৌষ্টিকনালী তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত।

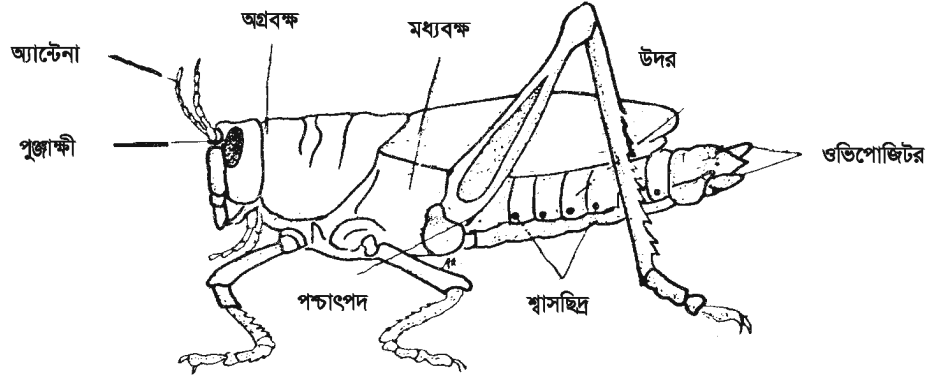
(ক) অগ্র পৌষ্টিকনালী (Fore gut) : এই অংশে কয়েকটি অঙ্গ থাকে। যথা :

(i) মুখছিদ্র : পৌষ্টিকনালীর সম্মুখ প্রান্তে মুখছিদ্র থাকে। এর মাধ্যমে খাদ্য গৃহীত হয়। মুখছিদ্রের চারদিকে মুখোপাঙ্গ থাকে।

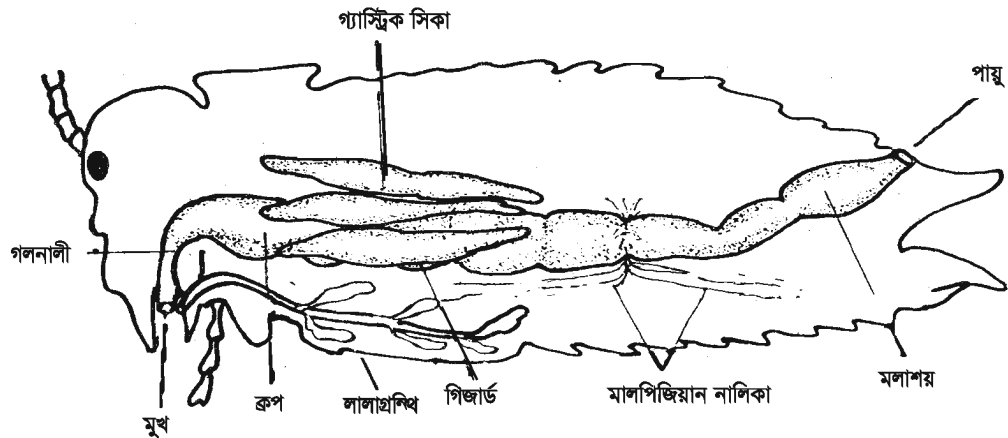
(ii) গলবিল : মুখছিদ্রের পিছনে, ক্ষুদ্রাকার গলবিল অবস্থিত।

(iii) গলবিল বা অনুনালী : গলনালীর প্রথম অংশ সরু এবং পিছনের অংশ প্রসারিত হয়ে রূপ নামক থলিতে পরিণত হয়েছে। এখানে খাদ্য আংশিক পরিপাক হয় ও জমা থাকে।

(iv) গিজার্ড : রূপের পরবর্তী অংশকে গিজার্ড বলে। এটি পুরু প্রাচীরযুক্ত, শক্ত, পেশিবহুল ও কিছুটা মোচাকৃতির। গিজার্ড খাদ্য চূর্ণ ও পেষণ করে।



চিত্র: ঘাস ফড়িং এর বাহ্যিক গঠন (পার্শ্বীয় দৃশ্য)



চিত্র: ঘাস ফড়িং-এর পরিপাকতন্ত্র

(খ) **মধ্য পৌষ্টিকনালী বা মেসেনটেরন** : গিজার্ডের পরবর্তী অংশকে মধ্য অন্ত্র বা পাকস্থলি বলে। এটি একটি বৃহদাকার প্রশস্ত থলি। পাকস্থলিতে খাদ্য পরিপাক হয়। গিজার্ড এবং পাকস্থলির সংযোগস্থলে হেপাটিক সিকা বা যকৃৎসিকা থাকে। এই সিকাগুলো মধ্যঅন্ত্রে উন্মুক্ত হয়। সিকাগুলো উৎসেচক নিঃসরণ করে।

(গ) **পশ্চাৎ পৌষ্টিকনালী** : পাকস্থলির পিছনের অংশকে পশ্চাৎ পৌষ্টিকনালী বলে। এটি দুটি অংশে বিভক্ত। যথা :

(i) **ইলিয়াম বা ক্ষুদ্রান্ত্র** : এটি সামনের নলাকার অংশ। পরিপাককৃত খাদ্য শোষিত হয়।

(ii) **বৃহদন্ত্র** : ইলিয়ামের পরবর্তী অংশ বৃহদন্ত্র। বৃহদন্ত্র নলাকার কোলন এবং থলিকার মত রেকটাম বা মলাশয় নিয়ে গঠিত। মলাশয়ের শেষ প্রান্তে পায়ুছিদ্র বিদ্যমান। মলাশয়ের অপাচ্য খাদ্য মল হিসেবে জমা হয়। পায়ুপথে মল বের হয়ে যায়।

লালা গ্রন্থি : ঘাস ফড়িং-এর অন্ননালী এবং ক্রপের গায়ে ল্যাপ্টানো অবস্থায় একজোড়া ছোট ও শাখান্বিত লালা গ্রন্থি থাকে। লালা গ্রন্থিদ্বয় থেকে লালানালী বের হয়ে সামনের দিকে গিয়ে মুখগহ্বরে উন্মুক্ত হয়। লালাগ্রন্থি লালারস নিঃসরণ করে।

ব্যবচ্ছেদ প্রণালি

১। প্রথমে ব্যবচ্ছেদ ট্রেতে ঘাস ফড়িং নিয়ে মাথা ও উদরের শেষ দিকে পিন দিয়ে আটকাতে হবে।

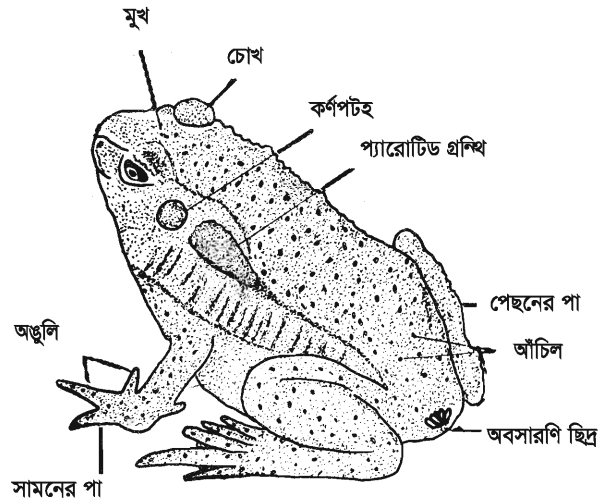
২। পিঠের দিক উপরে থাকবে।

৩। পিঠের মধ্যরেখা বরাবর কাঁচি বা ধারালো রেড দিয়ে পিছন থেকে সামনের দিকে কাটতে হবে।

৪। এরপর চিমটার সাহায্যে সাবধানে চর্বি ও ট্রাকিয়া পরিষ্কার করে পৌষ্টিকতন্ত্র পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

কুনোব্যাঙ

ব্যাঙ উভয়চর শ্রেণীর একটি অতি পরিচিত প্রাণী। এর দেহ দ্বিপাশ্রীয় প্রতিসম। ব্যাঙের গায়ের রং ধূসর এবং সারাদেহ আঁচলযুক্ত। এদের দেহ মাথা ও ধড় দুটি অংশে বিভক্ত।



চিত্র: ব্যাঙের বাহ্যিক গঠন

মাথা : ব্যাঙের মাথার আকার অনেকটা সমবাহু ত্রিভুজের মত। এর মুখছিদ্রটি বেশ বড়। মুখছিদ্রটি চোয়াল দ্বারা আবৃত। মাথার সম্মুখভাগে নাসারন্ধ্র ও পশ্চাতে চক্ষুদ্বয় অবস্থিত। চক্ষুর পিছনে রয়েছে কর্ণপটহ। কর্ণপটহের পিছনে প্যারোটিড গ্রন্থি নামে দুটি গ্রন্থি অবস্থিত।

ধড় : ব্যাঙের দেহের সামনের পা হতে পিছনের পা পর্যন্ত বিস্তৃত অংশটি ধড় নামে পরিচিত। ধড়ের একেবারে শেষ প্রান্তে পায়ু অবস্থিত।

ব্যাণ্ডের ব্যবচ্ছেদ প্রণালি

একটি জীবন্ত কুনোব্যাণ্ডকে পরীক্ষাগারে নিয়ে আসার পর কাচের মুখওয়ালা বোতলের মধ্যে রাখ। বোতলের মধ্যে ক্লোরোফর্ম ভিজানো এক খন্ড তুলা ঢুকিয়ে দাও। এবার বোতলের মুখ বন্ধ করে কয়েক মিনিট রেখে দাও। এতে ব্যাণ্ডটি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে। ক্লোরোফর্ম কাছে না থাকলে মস্তিস্কের পিছনে পিন ফুটিয়ে অথবা লবণ পানি খাইয়েও ব্যাণ্ডকে অজ্ঞান করা যায়। এবার অজ্ঞান ব্যাণ্ডটিকে চিৎ করে মোমের ট্রের মাঝখানে রাখ এবং সামনের পা ও পিছনের পা টান টান করে আলপিন দিয়ে ট্রের মোমের সাথে আটকে দাও। এবার ট্রেতে পানি ঢেলে দাও যাতে ব্যাণ্ডটি পানিতে ডোবানো থাকে।

এবার চিত্রের চিহ্নিত স্থানে চিমটা দিয়ে চামড়াটি ধরে কাঁচি দিয়ে ফুটো কর এবং দাগাঙ্কিত স্থান বরাবর চামড়া কেটে মাংসপেশি থেকে আলাদা করে ফেল। আলাদা করা চামড়াটি দুপাশে পিন দিয়ে আটকে রাখ। এবার পৌষ্টিক তন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গের সাথে চিত্র অনুযায়ী পর্যবেক্ষণ কর। চার্ট ও নমুনা ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে কুনোব্যাণ্ডের পৌষ্টিকতন্ত্র পরীক্ষা করে দেখ।

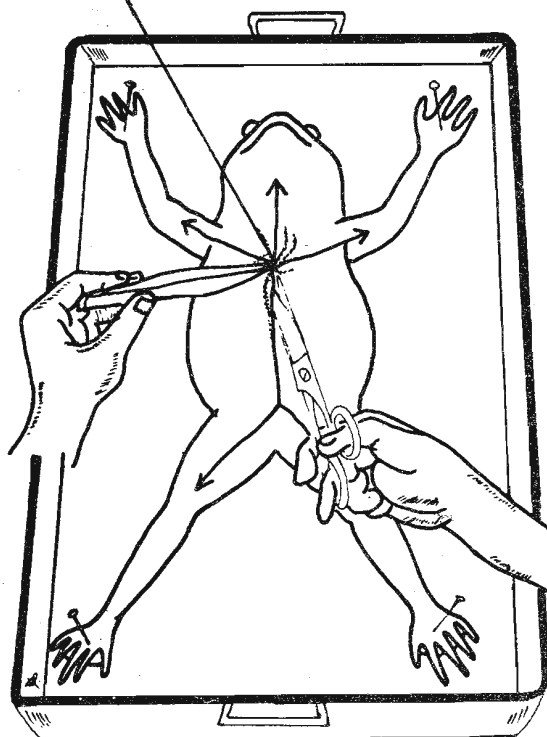
কুনোব্যাণ্ডের পৌষ্টিকতন্ত্রের পরীক্ষা

উপকরণ : ব্যাণ্ড ব্যবচ্ছেদ করার যন্ত্রপাতি, মোমের ট্রে, পিন, ক্লোরোফর্ম ও পানি।

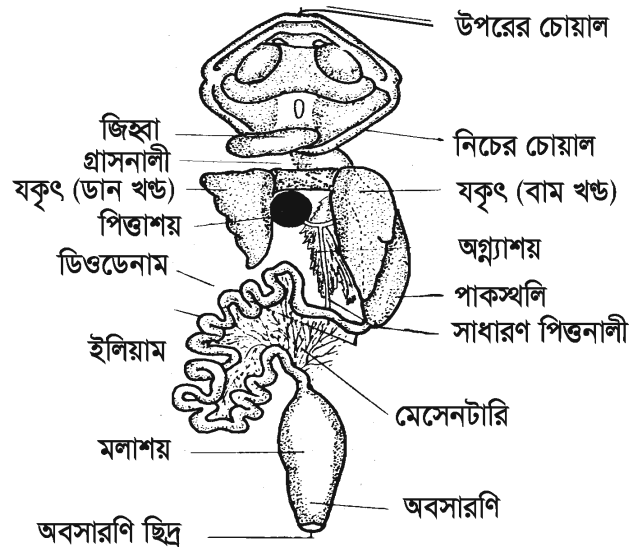
ব্যাণ্ডের পৌষ্টিকতন্ত্র মুখ হতে পায়ুপথ পর্যন্ত বিস্তৃত একটি নালী পথ। এটি নিম্নলিখিত অঙ্গগুলো দ্বারা গঠিত।

- ১। মুখ (Mouth) : ব্যাণ্ডের মুখ ও মুখগহ্বর মোটামুটি প্রশস্ত। এটি দন্তবিহীন চোয়াল দ্বারা আবদ্ধ। উর্ধ্ব চোয়াল অনড়।
- ২। মুখগহ্বর (Buccal Cavity) : মুখছিদ্রের পিছনে মুখগহ্বরটি অবস্থিত। নিচের চোয়ালের দ্বারা অগ্রভাগে একটি লম্বা মাংসল জিহ্বা সংযুক্ত আছে। জিহ্বার আগা ঠোঁতা। জিহ্বার পিছনের ছিদ্রটি গ্লান্ডিস।

এই রেখা বরাবর কাটতে হবে



চিত্র: কুনোব্যাণ্ডের অঙ্গীয় দেশের দেহত্বক ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি



চিত্র: ব্যাঙের পৌষ্টিকতন্ত্র

৩। গলবিল (Pharynx) : গলবিল মুখগহ্বরের শেষ অংশ।

৪। গ্রাসনালী বা অনুনালী (Oesophagus) : গলবিলের নিম্নাংশে অবস্থিত একটি সরুনালী।

৫। পাকস্থলি (Stomach) : এটি একটি থলের মত পেশিবহুল অংশ। পাকস্থলির সম্মুখ প্রান্ত প্রশস্ত, পশ্চাৎভাগ সরু। এর প্রশস্ত প্রান্তটি কার্ডিয়াক প্রান্ত এবং পশ্চাৎভাগের সরু অংশটি পাইলোরিক প্রান্ত ক্ষুদ্রান্ত্রের সাথে যুক্ত।

৬। ক্ষুদ্রান্ত্র (Small Intestine) : ক্ষুদ্রান্ত্র দুটি অংশে বিভক্ত। যথা: (ক) ডিওডেনাম ও (খ) ইলিয়াম।

(ক) ডিওডেনাম (Duodenum) : এটি ক্ষুদ্রান্ত্রের অগ্রবর্তী সরু অংশ, যা পাকস্থলির সাথে যুক্ত। এ অংশটি পাকস্থলির সাথে সমান্তরাল থেকে U-আকৃতি ধারণ করে।

(খ) ইলিয়াম (Ileum) : ডিওডেনামের পরবর্তী কুণ্ডলাকার অংশ যা বৃহদন্ত্র পর্যন্ত বিস্তৃত।

৭। বৃহদন্ত্র (Large Intestine) : অন্ত্রের বেশ প্রশস্ত ও ছোট অংশটি বৃহদন্ত্র। বৃহদন্ত্রের প্রশস্ত অংশটি হল মলাশয় এবং নিচের সরু অংশটি অবসারণি।

৮। অবসারণি ছিদ্র (Rectum) : পৌষ্টিকনালীর সর্বশেষ অংশটি অবসারণি ছিদ্র। এই ছিদ্রের মাধ্যমে মল ও মূত্র দেহের বাইরে নির্গত হয়।

পরিপাক গ্রন্থি (Digestive Gland) : যকৃৎ ব্যাঙের দেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি। এটি দুটি অংশে বিভক্ত। হৃৎপিণ্ডের দুপাশে যকৃৎ খন্ড অবস্থিত। যকৃৎ অংশের মধ্যরেখা বরাবর পিত্তথলি অবস্থিত।

অগ্ন্যাশয় (Pancreas) : ডিওডেনাম ও পাকস্থলির মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত একটি হালকা হলুদ বর্ণের গ্রন্থি।

বক্ষ অস্থিচক্র বা পেকটোরাল গার্ডল (Pectoral Girdle)

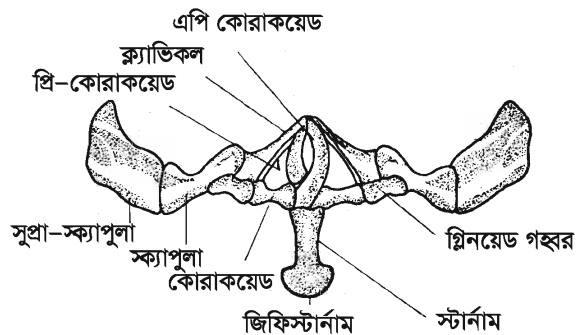
এটি ব্যাঙের বক্ষ অস্থিচক্র।

১। বক্ষ অস্থিচক্রটি একই রকম দুটি অংশ নিয়ে গঠিত।

২। প্রতিটি অর্ধাংশ সুগ্রাস্কাপুলা, স্ক্যাপুলা, ক্ল্যাভিকল, কোরাকয়েড, প্রি-কোরাকয়েড, গ্লেনয়েড গহ্বর ও এপিকোরাকয়েড নিয়ে গঠিত।

৩। বক্ষ অস্থিচক্রের নিম্ন প্রান্তে স্টার্নাম থাকে।

৪। সুগ্রাস্কাপুলা প্রশস্ত ও পাতলা। স্ক্যাপুলা, শক্ত, পুরু ও লম্বাকৃতি।



চিত্র: বক্ষ অস্থি চক্র

হিউমেরাস বা প্রগন্ডাস্থি (Humerus) : এটি ব্যাঙের সামনের পায়ের হিউমেরাস বা প্রগন্ডাস্থি।

১। হাড় বা অস্থিটি দেখতে লম্বা ও পেছনের দিকটা সরু।

২। এরা শীর্ষভাগে অবস্থিত মাথার মত অংশটি গোলাকার।

৩। হাড়টির পেছনের দিকে ট্রকলিয়া অবস্থিত।

৪। এতে ডেলটয়েড রিজ বিদ্যমান।

রেডিও-আলনা (Radio-Ulna) : এটি ব্যাঙের সামনের পায়ের রেডিও আলনা অস্থি।

১। রেডিয়াস এবং আলনা হাড় বা দুটি একত্রিত হয়ে এ হাড়টি গঠিত হয়েছে।

২। হাড়টির পেছনের দিকটি অপেক্ষাকৃত চওড়া।

৩। হাড়ের সামনের দিক অবতল।

কজি সন্ধি, করতল এবং অঙ্গুলি (Carpal, Metacarpal and Phalanges)

(ক) কজি সন্ধি

১। রেডিও আলনার পেছনে অবস্থিত ছোট ছোট গোলাকার অস্থি।

২। হাড়গুলো দু সারিতে সাজানো থাকে।

(খ) করতল

১। কজি সন্ধির নিচে অবস্থিত।

২। চারখানা সরু, লম্বা হাড় নিয়ে করতল গঠিত।

(গ) অগ্রপদের অঙ্গুলি বা ফ্যালানুজিস

১। সামনের পায়ে চারটি অঙ্গুলি থাকে।

২। ১ম ও ২য় অঙ্গুলি সরু ও নলাকার দুটি ক্ষুদ্র অস্থি বা অঙ্গুলিনলক নিয়ে গঠিত।

৩। ৩য় ও ৪র্থ অঙ্গুলিতে ৩টি করে অঙ্গুলিনলক থাকে।

শ্রোণীচক্র বা পেলভিক গার্ডেল (Pelvic girdle)

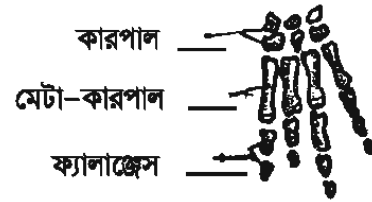
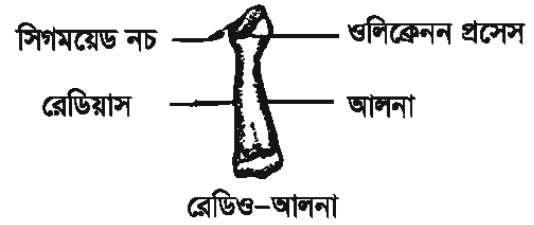
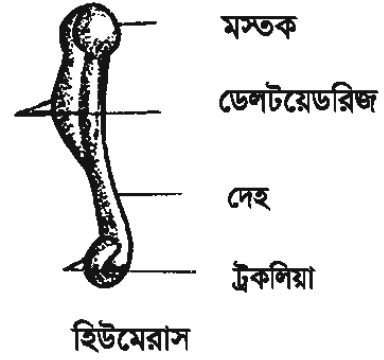
এটি ব্যাঙের শ্রোণীচক্র।

১। শ্রোণীচক্রটি দেখতে ইংরেজি 'V' অক্ষরের মত।

২। চক্রটি দুটি সাদৃশ্য অংশে বিভক্ত।

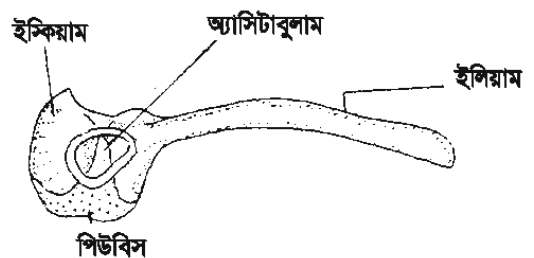
৩। প্রতিটি অর্ধাংশে ইলিয়াম, ইস্কিয়াম ও পিউবিস বিদ্যমান।

৪। হাড়গুলোর মিলনস্থলে অ্যাসেটাবুলাম অবস্থিত।



কজি সন্ধি, করতল ও অঙ্গুলি অস্থি

চিত্র: অগ্রপদের গঠন



চিত্র ৮. ২৩ : ব্যাঙের শ্রোণীচক্র (পার্শ্বীয় দৃশ্য)

ফিমার (Femur)

এটি ব্যাঙের পিছনের পায়ের ফিমার অস্থি।

১। হাড়টি লম্বা ও দণ্ডাকার। ২। হাড়টি কিছুটা বাঁকা।

৩। হাড়ের মাথা গোলাকার। পিছনের দিক স্ফীত।

টিবিও-ফিবুলা (Tibio-Fibula) : এটি ব্যাঙের পিছনের পায়ের টিবিও-ফিবুলা অস্থি।

১। হাড়টি লম্বা ও দু প্রান্ত প্রশস্ত।

২। টিবিয়া এবং ফিবুলা নামক হাড় দুটি সংযুক্ত, হাড়ের সংযোগস্থলে নেমিয়াল ক্রেস্ট নামক ঝাঁজ বিদ্যমান।

৩। ঝাঁজের প্রতিপার্শ্বে উঁচু অংশ স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

অ্যাস্ট্রাগ্যুলাস ক্যালকেনিয়াম (Astragalus Calcaneum) : এটি ব্যাঙের পিছনের পায়ের অ্যাস্ট্রাগ্যুলাস ক্যালকেনিয়াম অস্থি।

১। অস্থি বা হাড়টি অ্যাস্ট্রাগ্যুলাস ও ক্যালকেনিয়াম নামক দুটি হাড় নিয়ে গঠিত।

২। হাড় দুটি সরু, লম্বা মাঝখানে ফাঁক।

৩। হাড় দুটির প্রান্তভাগ সংযুক্ত।

৪। হাড়ের মাথা দুটি তরুণাস্থি দিয়ে আবৃত।

টারসাল, মেটা-টারসাল এবং ক্যালান্জেন্স

টারসাল অস্থিগুলো দুটি সারিতে অবস্থিত। প্রথমে সারি ছোট দুখানা হাড় নিয়ে গঠিত। এ হাড় দুখানা অ্যাস্ট্রাগ্যুলাস ক্যালকেনিয়ামের নিচে অবস্থিত।

মেটা-টারসাল

১। পাঁচখানা সরু লম্বা অস্থি নিয়ে গঠিত। এই অস্থি বা হাড়গুলোকে মেটা-টারসাল বলে।

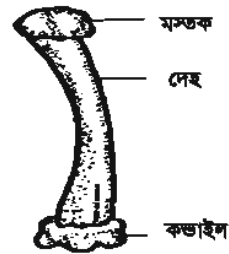
পঞ্চাদপদের অঙ্গুলি বা ফ্যালান্জেন্স

১। অঙ্গুলির অস্থি।

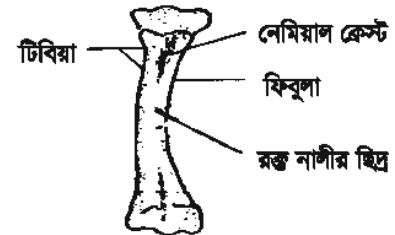
২। পেছনের পায়ে পাঁচটি অঙ্গুল আছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও

পঞ্চম অঙ্গুলে ৩ খানা করে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ

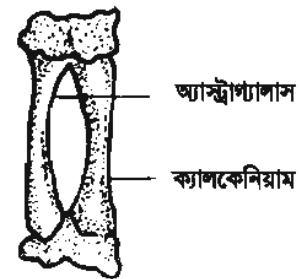
অঙ্গুলে ৪ খানা হাড় আছে।



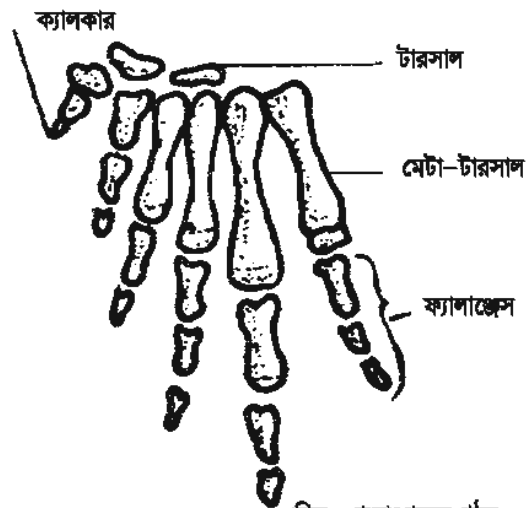
চিত্র : ফিমার



চিত্র : টিবিয়া-ফিবুলা



চিত্র : অ্যাস্ট্রাগ্যুলাস ক্যালকেনিয়াম



চিত্র : পঞ্চাদপদের গঠন

প্রথম কশেরুকা বা অ্যাটলাস (Atlas) : এটি ব্যাণ্ডের মেরুদণ্ডের ১ম কশেরুকা বা অ্যাটলাস।

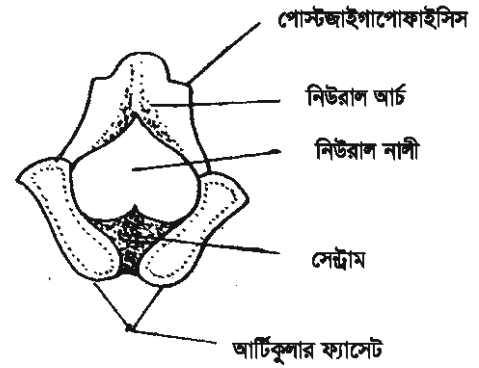
শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- ১। হাড়টি দেখতে আর্থির মত।
- ২। ট্রান্সভার্স প্রসেস নেই।
- ৩। নিউরাল নালী বেশ বড়।
- ৪। সেন্ট্রাম ক্ষুদ্র কিন্তু চওড়া।
- ৫। প্রি-জাইগাপোফাইসিস নেই।
- ৬। সেন্ট্রামের সম্মুখে প্রান্ত অবতল এবং পশ্চাৎপ্রান্ত উত্তর।

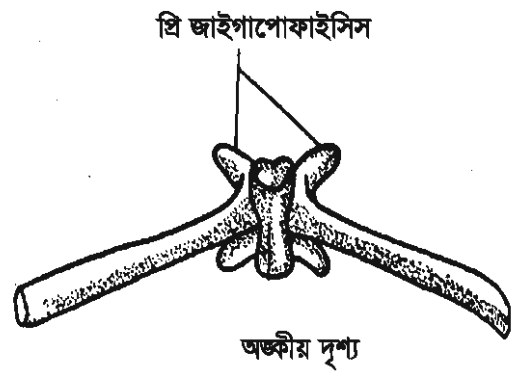
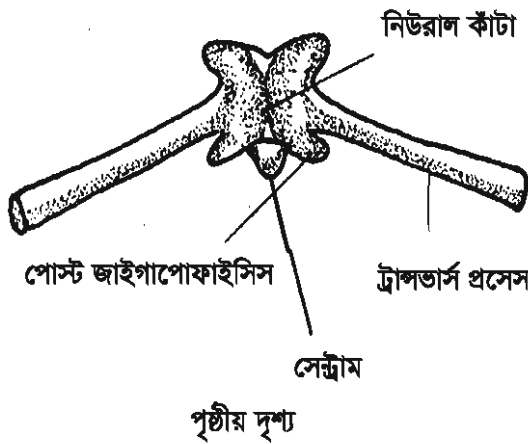
আদর্শ কশেরুকা (Typical Vertebra) :

এটি ব্যাণ্ডের আদর্শ কশেরুকা।

- ১। হাড়টিতে ক্ষুদ্র, পুরু সেন্ট্রাম আছে।
- ২। ছোট ও ভোঁতা নিউরাল কাঁটা আছে।
- ৩। নিউরাল আর্চের উভয় পার্শ্বে একটি করে সরু ও লম্বা ট্রান্সভার্স প্রসেস আছে।
- ৪। প্রিজাইগাপোফাইসিস ও পোস্ট জাইগাপোফাইসিস আছে।



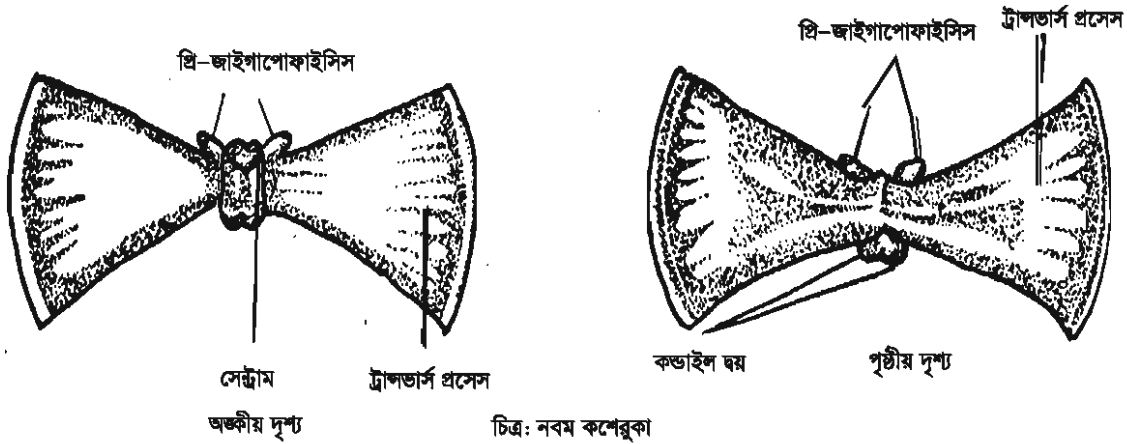
চিত্র : অ্যাটলাস



চিত্র : আদর্শ কশেরুকা

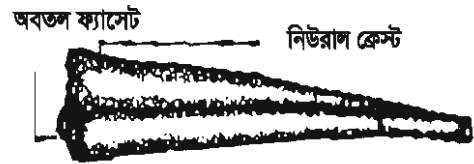
নবম কশেরুকা (Ninth Vertebra) : এটি ব্যাঙের মেরুদণ্ডের নবম কশেরুকা।

- ১। অস্থি বা হাড়টির ট্রান্সভার্স প্রসেস প্রশস্ত।
- ২। এর সম্মুখ প্রান্তে সেন্ট্রাম আছে।
- ৩। হাড়টির পশ্চাৎ অংশে দুটি কন্ডাইল আছে।
- ৪। এতে প্রিজাইগাপোফাইসিস আছে কিন্তু পোস্ট জাইগাপোফাইসিস নেই।
- ৫। নিউরাল নালী ও নিউরাল আর্চ সম্পূর্ণ বিকশিত নয়।



ইউরোস্টাইল (Urostyle) : এটি ব্যাঙের মেরুদণ্ডের সর্বশেষ অস্থি বা ইউরোস্টাইল।

- ১। হাড়টি দেখতে অনেকটা দণ্ডের মত।
- ২। এর পিছনের দিকটা ক্রমশ সরু।
- ৩। দণ্ডটির সামনের দিকে অবতল খাঁজ বা ফ্যাসেট আছে।
- ৪। হাড়টির মধ্যরেখা বরাবর ছুরির ফলার মত খাঁজটি নিউরাল ক্রেস্ট।
- ৫। এর নিউরাল নালীটি বেশ সূক্ষ্ম।



চিহ্ন : ইউরোস্টাইল

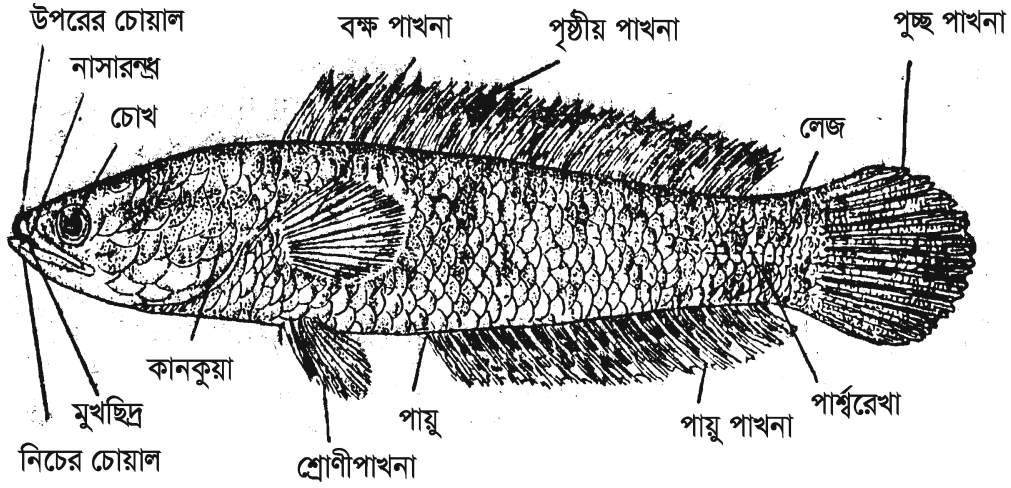
টাকি মাছ (Channa punctatus)

বাংলাদেশের নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর ও অন্যান্য জলাশয়ে টাকি মাছ বাস করে। বন্য জলাশয় ও শ্রোতহীন অঞ্চলে টাকি মাছ বসবাস করতে পছন্দ করে। এরা মাংসাশী মাছ। টাকি মাছের দেহ লম্বা ও দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম। এরা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১২-২০ সেমি। মাছের সমগ্র দেহ অঁইশে ঢাকা। ঘরের ছাদের টালি যেভাবে সাজানো হয় মাছের অঁইশও সেভাবে বিন্যস্ত ঢাকা। এদের দেহ ভেজা ও পিচ্ছিল। মাছের ত্বক হতে মিউকাস নিঃসরণের কারণে এরূপ হয়। টাকি মাছের পৃষ্ঠদেশ কালচে এবং পেটের দিকের রং হলদে ধূসর। মাছের দেহকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ১। মাথা, ২। খড় ও ৩। লেজ।

১। মাথা : টাকি মাছের মাথা দেখতে অনেকটা সাপের মাথার মত। মুখের অগ্রভাগ হতে কানকো পর্যন্ত অংশকে মাথা বলে। মাথার উপর ও নিচের দিক চাপা। মাছের মুখ অর্ধচন্দ্রাকৃতি, উর্ধ্ব ও নিম্ন চোয়াল দ্বারা বেষ্টিত। চোয়ালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাঁত আছে। উর্ধ্বচোয়ালের পিছনে এক জোড়া বহিঃনাসারন্ধ্র অবস্থিত। বহিঃনাসারন্ধ্রের সামান্য পেছনে প্রতি পার্শ্বে একটি করে মোট দুটি চোখ আছে। টাকি মাছের চোখে কোন পাতা থাকে না, তবে চোখটা পাতলা পর্দা দিয়ে আবৃত থাকে।

২। দেহকাণ্ড বা ধড় : মাছের কানকোর শেষ অংশ থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত অংশকে দেহকাণ্ড বা ধড় বলে। দেহকাণ্ডের অগ্রভাগে দুপাশে মধ্যরেখা বরাবর একটি করে বক্ষ পাখনা থাকে। বক্ষ পাখনার নিচে মাছের অঙ্গীয়দেশে এক জোড়া শ্রেণী পাখনা অবস্থিত। টাকি মাছের মাথার পিছন দিক থেকে লেজ পর্যন্ত পৃষ্ঠ পাখনা এবং অঙ্গীয়দেশের শ্রেণী পাখনার সামান্য পিছনে থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত পাখনাকে পায়ু পাখনা বলে। পাখনার সুচালো হাড়ের পাখনা রশ্মি থাকে। দেহকাণ্ড ও লেজের সংযোগস্থলে পায়ু ছিদ্র অবস্থিত।

চোখের পিছনে মাথার দুপাশে যে চ্যাপ্টা হাড় ফুলকাগুলো ঢেকে রাখে তাকে কানকো বলে।



চিত্র: টাকি মাছের বাহ্যিক গঠন

৩। লেজ : পায়ু ছিদ্রের পশ্চাৎ থেকে দেহের অবশিষ্টাংশ লেজ। লেজের শেষ প্রান্তজুড়ে একটি পাখার মত পাখনা থাকে। একে পুচ্ছ পাখনা বলে। টাকি মাছের মাথার পিছন থেকে লেজ পর্যন্ত দেহের মধ্যভাগে দু পাশে দুটি পার্শ্বীয় রেখা (lateral line organ) থাকে।

পৌষ্টিক তন্ত্র (Alimentary system)

টাকি মাছের পৌষ্টিকতন্ত্র পর্যবেক্ষন ও ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি

- ১। একটি মোমের ট্রের উপর একটি মৃত টাকি মাছ রাখ, যেন এর পেটের দিকটি উপরে থাকে।
- ২। মাছের কানকোর ভিতর দিয়ে দুটি বড় ও শক্ত পিন ঢুকিয়ে মোমের ভিতর আটকে দাও।
- ৩। লেজের পিছন দিকটাও পিন দিয়ে আটকে দাও।
- ৪। পেট বা উদরের দেহ প্রাচীর হালকাভাবে কাটো, খেয়াল রাখবে ভিতরের অঙ্গগুলো যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। পায়ু থেকে সম্মুখ দিকে কাটবে।
- ৫। এবার ত্বকসহ উদরের দেহ প্রাচীর কেটে ফেল। এবার টাকি মাছের পৌষ্টিকতন্ত্রের চিহ্নিত চিত্রের সাথে মিলিয়ে নাও।

মুখ : মাছের অগ্রপ্রান্তে অর্ধচন্দ্রাকার মুখ অবস্থিত। মুখ ঊর্ধ্ব ও নিম্ন চোয়াল দ্বারা বেষ্টিত। চোয়ালে দাঁত আছে। মুখছিদ্রের পরে মুখগহ্বর বা মুখবিবর অবস্থিত।

মুখগহ্বর বা মুখবিবর : মুখ ছিদ্রের পশ্চাতে মুখ গহ্বর অবস্থিত। এর মেঝেতে জিহ্বা থাকে।

গলবিহ : মুখবিবরের পিছন দিক গলবিলের সাথে যুক্ত। গলবিলের দু পাশে ফুলকা থাকে।

অন্ননালী বা গ্ৰাসনালী (Oesophagus) : গলবিলের পরবর্তী সরু ও ক্ষুদ্রাকার নালীটি হল গ্ৰাসনালী। এটি কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর পাকস্থলিতে উন্মুক্ত হয়।

পাকস্থলি : পাকস্থলি বেশ বড়। পাকস্থলির প্রথম অংশ কার্ডিয়াক প্রান্ত এবং অন্ত্রের সাথে সংযুক্ত প্রান্ত পাইলোরিক প্রান্ত

অন্ত্র : টাকি মাছের অন্ত্র প্যাচানো এবং নলাকার।

মলাশয় ও পায়ু : অন্ত্রের শেষাংশ মোটা ও ক্ষুদ্র থলির মত, একে মলাশয় বলে। এখানে মল জমা থাকে। শ্রেণী পাখনার পেছনে একটি ছিদ্র থাকে। একে পায়ু ছিদ্র বলে। পায়ু ছিদ্র পথে মল নির্গত হয়।

পরিপাক গ্রন্থি (Digestive gland) :

যকৃৎ : টাকি মাছের যকৃৎ বড়, বাদামি রঙের এবং দুখণ্ডে বিভক্ত। যকৃতের ঋণাংশের মাঝে পিত্তথলি থাকে। টাকি মাছের কোন অগ্ন্যাশয় নেই।

প্রধান পর্বগুলোর একটি করে প্রাণির বৈশিষ্ট্য, পর্যবেক্ষণ ও চিত্র অঙ্কন

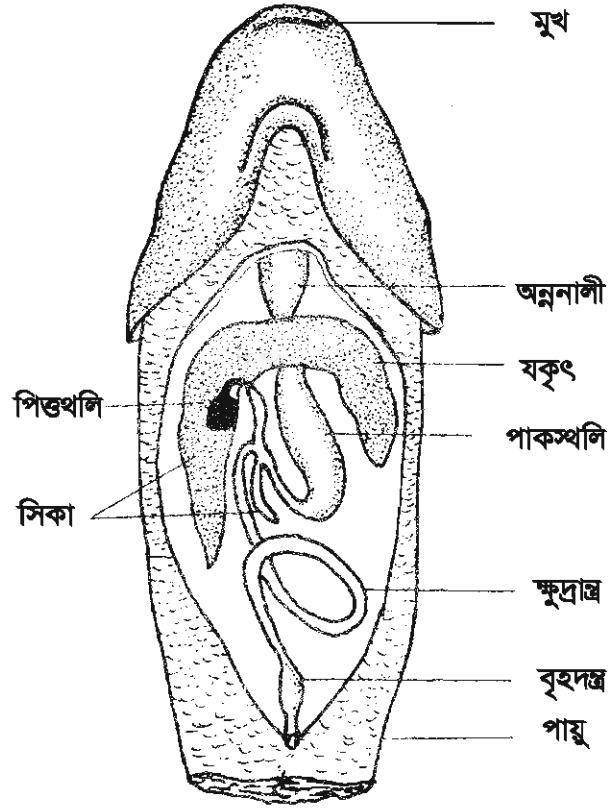
প্রোটোজোয়া (Protozoa)

অ্যামিবা (Amoeba proteus)

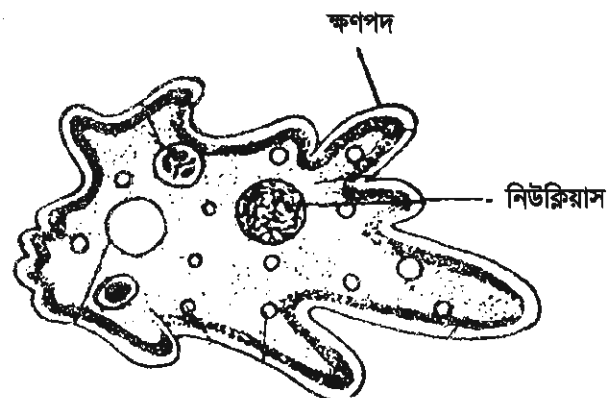
১। এককোষী প্রাণী, আণুবীক্ষণিক।

২। এরা প্রতিনিয়ত ক্ষণপদ সৃষ্টির মাধ্যমে আকার বদলায়।

৩। এদের দেহ কোষে একটি নিউক্লিয়াস থাকে। উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যের কারণে এটি *Amoeba*।



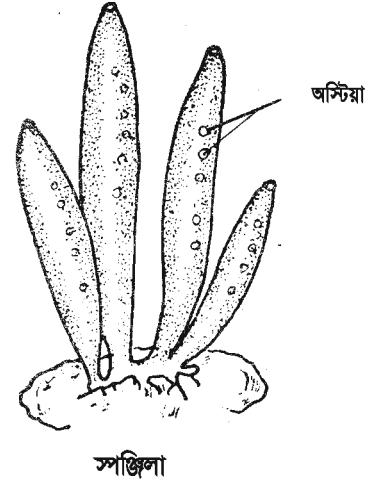
চিত্র : টাকি মাছের পৌষ্টিক তন্ত্র



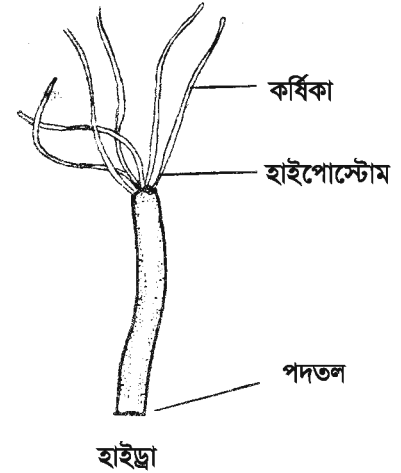
অ্যামিবা

পরিফেরা (Porifera)**স্পঞ্জ (Spongilla fragillis)**

- ১। এদের দেহ প্রাচীর অসংখ্য ছিদ্র যুক্ত। এ ছিদ্রগুলোকে অস্টিয়া বলে।
- ২। পূর্ণাঙ্গ প্রাণীরা কোন বস্তুর সাথে স্থায়ীভাবে আটকে থাকে।
- ৩। দেহের ভিতর বিভিন্ন ধরনের নালীতন্ত্র আছে। উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যের কারণে সরবরাহকৃত প্রাণিটি একটি স্পঞ্জ।

**নিডারিয়া (Cnidaria)****হাইড্রা (Hydra viridis)**

- ১। দেহ লম্বা। দেহের সম্মুখ দিকে হাইপোস্টোমাম নামক একটি মাত্র ছিদ্র থাকে। হাইপোস্টোমাম গোড়ার কর্শিকা বা আকর্ষি থাকে এবং দেহকাণ্ডের পশ্চাতে পদতল থাকে।
- ২। দেহের ভিতর সিলেন্টেরন নামক একটি মাত্র গহ্বর থাকে।
- ৩। দেহের সকল কোষ এক্টোডার্ম এবং এন্ডোডার্ম এই দু স্তরে সাজানো থাকে। এদের মধ্যে কোষবিহীন মেসোগ্লিয়া স্তর থাকে।
- ৪। এক্টোডার্মে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নেমাটোসিস্ট উৎপন্ন হয়। এগুলো শিকার ধরতে সাহায্য করে।

**প্লাটিহেলমিনথেস (Platyhelminthes)****যকৃৎ ক্রিমি (Fasciola hepatica)**

- ১। দেহ নরম এবং পাতার ন্যায় চ্যাপ্টা।
- ২। দেহের অগ্রভাগে এবং অঙ্গকীয়দেশে চোষক থাকে।
- ৩। অগ্রচোষকের মাঝে মুখছিদ্র অসংস্থিত।

**নেমাটোডা (Nematoda)****কেঁচোক্রিমি (Ascaris lumbricoides)**

- ১। দেহ নলাকার, তবে দুপ্রান্ত সরু। ২। দেহের দৈর্ঘ্য বরাবর চারটি রেখা থাকে।

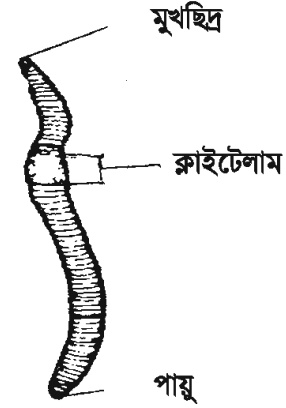


৩। দেহের অগ্রভাগে মুখছিদ্র অবস্থিত। ৪। মুখছিদ্রটি তিনটি ওষ্ঠ দ্বারা ঘেরা।

অ্যানিলিডা (Arthropoda)

কেঁচো *Metaphire* (*Pheretima posthuma*)

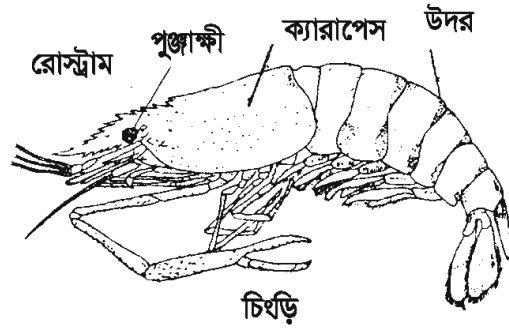
- ১। দেহ নলাকার এবং বহু খণ্ডে বিভক্ত।
- ২। প্রায় প্রতিটি খণ্ডকের মাঝ বরাবর সূক্ষ্ম কাঁটার মত সিটা (seta) থাকে।
- ৩। ১৪ হতে ১৬ নম্বর দেহ খণ্ডকজুড়ে ক্লাইটেলাম (Clitellum) থাকে।



আর্থ্রোপোডা (Arthropoda)

গলদা চিংড়ি (*Macrobrachium rosenbergii*)

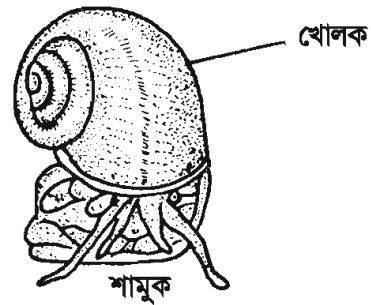
- ১। দেহ শিরোবক্ষ এবং উদর অঞ্চলে বিভক্ত। লেজবিহীন, টেলসন আছে।
- ২। মস্তক ও বক্ষ একত্রিত হতে শিরোবক্ষ গঠিত। দেহ শক্ত খোলকে (Carapace) আবৃত।
- ৩। শিরোবক্ষ বেস্টনকারী ক্যারাপেসের অগ্রভাগে করাতের মত রোস্ট্রাম (Rostrum) অবস্থিত।
- ৪। মস্তকের উভয় পার্শ্বের সবৃন্তক পুঞ্জাক্ষী বিদ্যমান।



মলাস্কা (Mollusca)

শামুক (*Pila globosa*)

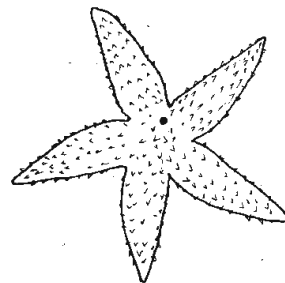
- ১। নরম দেহটি একটি মাত্র খোলক দ্বারা আবৃত।
- ২। গোলকের মুখে '৫'-এর মত একটি ঢাকনা আছে।
- ৩। খোলকটি প্যাচানো এবং উপরের অংশটি সরু উঁচু শৃঙ্গের মত।



একাইনোডার্মাটা (Echinodermata)

তারামাছ (*Asterias rubens*)

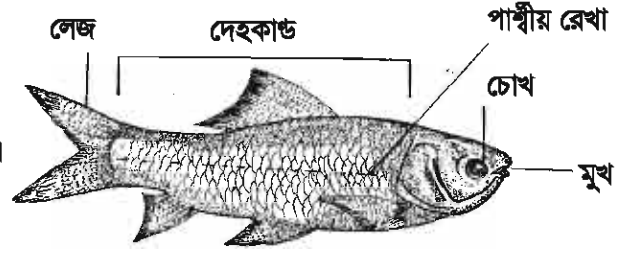
- ১। দেহটি তারার মত পাঁচটি বাহু নিয়ে গঠিত। দেহত্বক কাঁটা যুক্ত।
- ২। এদের মাথা নেই।
- ৩। প্রতিটি বাহুতে নালীপদ বিদ্যমান।



তারামাছ

অস্টিকথিস (Osteichthyes)**রুই মাছ (*Labeo rohita*)**

- ১। দেহ বড় বড় আইশ দিয়ে আবৃত।
- ২। ফুলকা সংখ্যা চারটি। ফুলকাগুলো কানকো দিয়ে ঢাকা।
- ৩। মাছের ঠোঁটগুলো মাৎসল।
- ৪। পার্শ্বীয় রেখা বেশ স্পষ্ট।
- ৫। একজোড়া বক্ষ পাখনা ও শ্রোণী পাখনা এবং বেজোড় পৃষ্ঠীয়, অঙ্গকীয় ও পুচ্ছ পাখনা আছে।
- ৬। দেহ মাথা, দেহকাণ্ড এবং লেজ নিয়ে গঠিত।

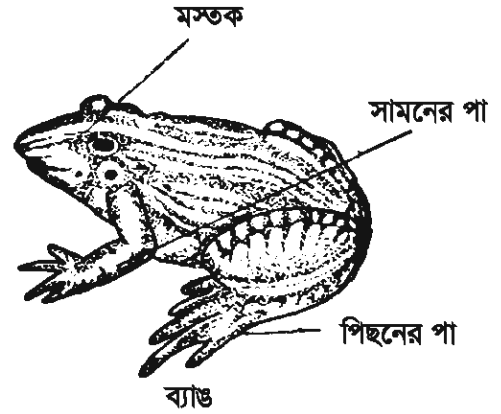


রুই মাছ

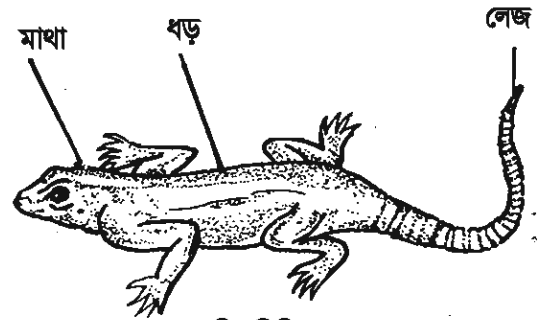
অ্যাম্ফিবিয়া (Amphibia)**কোলা ব্যাঙ বা সোনা ব্যাঙ (*Hoplobatrachus tigerinus*)**

ইতিপূর্বে (*Rana tigerinus*) নামে পরিচিত ছিল।

- ১। দেহটি মসৃণ ত্বকে আবৃত এবং কালো হলুদ রঙের দাগ বিদ্যমান।
- ২। মস্তকটি ত্রিকোণাকার।
- ৩। চোয়ালে দাঁত আছে।
- ৪। সামনের পায়ে ৪টি ও পেছনের পায়ে ৫টি করে আঙুল থাকে।

**রেপটিলিয়া (Reptilia)****টিকটিকি (*Hemidactylus brookii*)**

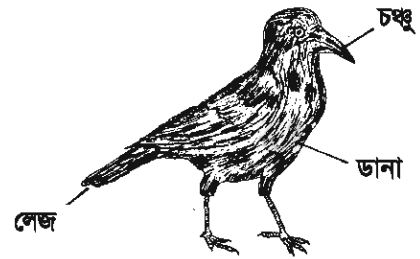
- ১। দেহটি তিনটি অংশে বিভক্ত— মাথা, ধড় ও লেজ।
- ২। মাথাটি ত্রিকোণাকার।
- ৩। মাথার দু পাশে এক জোড়া চক্ষু, এক জোড়া নাসারন্ধ্র, এক জোড়া কর্ণছিদ্র বিদ্যমান।
- ৪। ধড়ের সাথে দু জোড়া পা আছে। প্রতিটি পায়ে ৫টি করে আঙুল আছে।
- ৫। আঙুলগুলো প্যাডযুক্ত।



টিকটিকি

এভিস (Aves)**কাক (*Corvus splendens*)**

- ১। দেহ খুঁসর কালো রঙের পালকে ঢাকা।
- ২। এরা উড়তে পারে।
- ৩। শক্ত ঠোঁট ও নখরযুক্ত দুটি পা আছে।
- ৪। ডানায় লম্বা পালক আছে।



কাক

স্তন্যপায়ী (Mammalia)**ইঁদুর (*Rattus rattus*)**

- ১। আকারে ছোট একটি স্তন্যপায়ী প্রাণী।
- ২। দেহের তুলনায় লেজটি বড়, কান দুটি ছোট ও খাড়া হয়ে থাকে।
- ৩। দেহ লোমে আবৃত।
- ৪। চোয়ালে দাঁত আছে।
- ৫। নাকের সামনে গৌফ আছে।





সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন কর
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জ্ঞান মানুষকে সুবিবেচক করে



২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য